শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য

[প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে]

যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো)



ময়না প্রকাশনী

১৪।এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ প্রকাশক ॥
শ্যামসুন্দর সাহু
ময়না প্রকাশনী
১৪/এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
শুভ রথযাত্রা, ২০ জুন, ১৯৫৮

॥ তৃতীয় সংস্করণ ॥

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীতৃপ্তিমোহন ঘোষ
নিউ রাজলক্ষ্মী প্রিণ্টার্স
১৯এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

যে ভাবে কাজ করছেন, তাতে আমার বিশ্বাস, অদূরে ভক্তিযুক্ত বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হবে। শ্রীচৈতন্যদেবের বিষয়ে এঁরা নতুনভাবে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন।

প্রভুজীকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আর এক নতুন প্রভুজীর সন্ধান পেয়েছি। তিনি শুধু বয়সের ভারে বৃদ্ধ নন জ্ঞান বৃদ্ধ মহাতাপসও। বর্তমান যুগে আমার এই বাংলাদেশে এতবড় চৈতন্যভক্ত যোগী আমার আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সুদূরে নির্জন অরণ্যে একটি ভাংগা নড়বড়ে বাড়িতে কি করে বছরের পর বছর একাহারী হয়ে সাধনা করছেন, তা না দেখলে লিখে ঠিক বোঝান যায় না। সংযমী সিদ্ধ পুরুষ তিনি। কথাবার্তায় এতটুকুও অহং বোধ নাই। তিনি যেন এই বিংশ শতাব্দীর মানুষই নন।

চৈতন্যদেব সম্পর্কে তাঁর যে ধ্যান ধারণা তা এই পুস্তকের "চৈতন্য জীবনের অভিনব ব্যাখ্যা' অংশে সামান্য পরিমাণে দিতে চেষ্টা করেছি। বৈষ্ণব ধর্ম সাধনা ও দর্শন নিয়েও তাঁর সঙ্গে গভীর আলোচনা হয়েছিল, সে আলোচনা এই পুস্তকে অনাবশ্যক মনে করে লিপিবদ্ধ করা সমীচীন বোধ করিনি। যদি কখনো বৈষ্ণবধর্মের সর্বাত্মক ব্যাখ্যা করে যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে লিখতে পারি তখন প্রভুজীর আলোচনা রাখতে চেষ্টা করব।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা সবিনয়ে জানাই, প্রভুজীর সঙ্গে যে কথোপকথন এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ঠিক এইভাবে যে হয়েছিল তা নয়। যেভাবে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে এবং বিভিন্ন পুস্তকের উদ্ধৃতি এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়েছি, তিনি ঠিক ঠিক ঐভাবে অত খুঁটিনাটি কূট তর্কের জবাব দেন নি। বিষয়টি মোটামুটি বলে গেছেন এবং পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন। আমি বাড়ীতে এসে প্রয়োজনীয় পুস্তকটি খুঁজে মূল বক্তব্যটিকে আমার মত করে সাজিয়েছি আমার ভাষায়। বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে যেসব পদের উল্লেখ করেছেন, তিনি হয়ত পুরো পংক্তিগুলি না বলে একটি মাত্র পংক্তি বলেছেন, আমি সেখানে বাড়ীতে এসে বই খুঁজে সমগ্র অংশ লিপিবদ্ধ করেছি। তবে তাঁর মূল বক্তব্য থেকে কোথাও সরে আসিনি। সব থেকে আশ্চর্য হয়েছি তাঁর ইতিহাস জ্ঞানের প্রগাঢ়তা দেখে। সংসার-জীবনে তাঁর কি নাম ছিল জানি না, জিজ্ঞেসা [illegible] সাহস করিনি। তবে তিনি একথা বলেছিলেন সংসার আশ্রমে তাঁর বাড়ী ছিল [illegible] গঞ্জাম জেলার কোন এক গ্রামে। তাঁর একটি আলোকচিত্র দিতে পারলে বড় খুশী হোতাম। অনবরত বৃষ্টি এবং অরণ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকার জন্য আমার সে আশা পূর্ণ হলো না।

তোটা গোপীনাথ মন্দিরের চত্বরে সমাধিটি চৈতন্যদেবের সমাধি বলে শুধু অনেক

পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা যে মনে করেন, তাই নয়, হয়ত জয়দেব বাবুরে ধারণাও তাই। সুপ্রাচীন চৈতন্য চকড়ার নির্দেশ এত স্পষ্ট যে তাতে করে মনে হয় এইটি প্রকৃত শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধি। এত স্পষ্ট নির্দেশ আর কোথাও কোন গ্রন্থে খুঁজে পাইনি। এ বিষয়ে আমার যা মনে হয়েছে, তাহলো, ঐ সমাধি মন্দিরটি যদি সত্যও হয়, তাহলেও অত প্রাচীন নয়। যদিও সমাধি উৎখননের উপায় নাই, তাহলেও মন্দিরের পলেস্তরা খসিয়ে ইঁটের আকার দেখলেই বোঝা যাবে ইঁটগুলি কতদিনের প্রাচীন। তবে পণ্ডিতজী যেভাবে জগন্নাথ মন্দির সম্পর্কে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়াই করে জগন্নাথ মন্দিরের প্রকৃত শিল্পভাস্কর্য আজ জনসমক্ষে সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন, তা থেকে আমার নিজের প্রত্যয় হয়েছে যে, পণ্ডিতজীর কথা মিথ্যে হতে পারে না। তিনি না জেনেশুনে আমায় মিথ্যে করে বলতে পারেন না। চকড়াতে চৈতন্যদেহ সমাধির কথা নাই বটে, তবে বহির্বাস আর মালাকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল এই কথার উল্লেখ স্পষ্ট ভাবে আছে। আর বৈষ্ণব দাসের 'চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া'য় মৃতদেহকে সমাধির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যদিও স্থানের নাম সেখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ নাই। তবে একথার উল্লেখ আছে তাঁর দেহকে তোটা গোপীনাথে আনা হয়েছিল। এর থেকে সহজেই অনুমিত হয়, ঐ গোপীনাথ মন্দিরের চত্তরের কোথাও না কোথাও নিশ্চয় তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল।

পূর্ববর্তী সংস্করণে অনেক শকাব্দ ও খ্রীষ্টাব্দের ভুল হয়েছিল। আমার চোখ এড়িয়ে গেলেও এ বিষয়ে আমার শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের প্রখর দৃষ্টি এড়ায়নি কোন মতেই, তাই তাঁদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এই সংস্করণেও যে ভুল থাকবে না এমন কথা জোর করে বলতে পারছি না। এই নিবেদন যখন লিখছি, অর্থাৎ এখন আমি ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি শয্যায়। বই ছাপা হচ্ছে দ্রুত। প্রুফ দেখতে পারছি না। যতদূর সম্ভব খ্রীষ্টাব্দগুলি ঠিক করে দিয়েছি। তবু যদি ভুল থেকে যায় তাহলে আমি ক্ষমারও অযোগ্য বলে বিবেচিত হবো।

যতদূর ছাপা কপি এসেছে তার মধ্যে ৬২ পৃষ্ঠায় দেখছি ভুল ছাপা হয়েছে ১৪৭০-এর জায়গায় ১৪৭৯—আর ১৫৯৭ না হয়ে হয়েছে ১৫০৪। ঠিক ওর পরের বাক্য হবে—'১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে পুরুষোত্তমদেবের কথা কিছু জানা যায় নাই।' যা ছাপা হয়েছে তা ভুল বলে গণ্য হবে। ৬৩ পৃষ্ঠায় হবে প্রথম স্তম্ভের শেষ বাক্য—'এ হলো ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা।' ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দ কিছুতেই নয়।

বই প্রকাশের পর যদি দেখি কোথাও মারাত্মক ভুল হয়েছে, তাহলে পিছনে শুদ্ধিপত্র দেওয়ার চেষ্টা করব। আশাকরি আমার ইতিহাস সচেতন পাঠকবৃন্দ যথা সময়ে এ

বিষয়ে আমাকে অবহিত করবেন। তাঁদের সকল অভিমত আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সম্ভব হলে তা সংশোধন করতেও চেষ্টা করব।

এছাড়া কলকাতা থেকে চিত্তরঞ্জন দেবশর্মা মহাশয় ৩৯ পৃষ্ঠায় একটি ওড়িয়াপদ —"সমাধি করলি স্বর্বে নাম রতন ঘোষি" পংক্তিটির বাংলা অর্থ যা আমি লিখেছিলাম, তার ভ্রম দর্শিয়ে পত্র দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। উক্ত পদের যথার্থ বাংলা অর্থ হবে—"প্রভুর শ্রীঅঙ্গকে নাম সংকীর্তন করে যেন সমাধিস্থ করা হয়।" যা লেখা আছে 'রতন ঘোষের তত্ত্বাবধানে' তা মারাত্মক রকমের ভুল। আমার এই অনবধানতার জন্য সকলের কাছে 'দন্তে তৃণ করি' ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশা করি শ্রদ্ধাবান পাঠকবৃন্দের কাছে আমি এই ভুলের জন্য মার্জনা পাব।

'চৈতন্য জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায়ে' যে সব তথ্য দিয়েছি, তার সবগুলিই প্রাচীন বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস বাবাজীর 'শ্রীচৈতন্য চকড়া' থেকে সংগৃহীত। সে কথা উক্ত অধ্যায়ের গোড়াতেই উল্লেখ করেছি। তবে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হলো উক্ত নবাবিষ্কৃত পুঁথিতে যে সব অজ্ঞাত তথ্য লিপিবদ্ধ আছে তার সবগুলিই আমার এই পুস্তকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দ যদি উক্ত 'শ্রীচৈতন্য চকড়া' সংগ্রহ করে পাঠ করেন, তাহলে তাঁদের অচরিতার্থ জিজ্ঞাসা তৃপ্তিলাভ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। একথাও জানাচ্ছি উক্ত গ্রন্থ এখনো পাওয়া যাচ্ছে।

'গম্ভীরায় শ্রীচৈতন্য' ছবিটি অজানা এক ভক্ত শিল্পীর অঙ্কিত ছবির অনুকরণে আমার পুত্র শ্রীমান্ স্নাত জানা (এম. এ. পাঠরত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পেন্সিল স্কেচ এঁকে দিয়েছে। যদি যথাযথ অঙ্কিত না হয়ে থাকে তাহলে সে ত্রুটি আমার পুত্রের অক্ষমতার। এ জন্য অনামক শিল্পীর কোন অপরাধ নাই। তিনি তাঁর শিল্প দৃষ্টিতে চির অমর হয়ে থাকবেন শিল্প রসিকদের মানসপটে। এই ছবিটির প্রতিকৃতি বরানগর পাটবাড়ীতেও রয়েছে।

এই সংস্করণ মুদ্রণের পূর্বে গিয়েছিলাম 'বরানগর পাটবাড়ী'তে। এই সংগ্রহশালা প্রতিটি চৈতন্যভক্তের দেখা একান্ত প্রয়োজন। বৈষ্ণব ধর্মের এটি একটি অমূল্য সংগ্রহশালা। এখানের প্রাচীন গ্রন্থ সম্ভার ও পুঁথিপত্র বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেষক মাত্রেরই পরম সম্পদ বলে মনে হবে। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের উপবীত সংরক্ষিত আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের পাদুকা বলে যে পাদুকা যুগলের ফটো খবরের কাগজে মুদ্রিত হয়েছিল তা প্রকৃত মহাপ্রভুর পাদুকা নয় বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের ১৫৬ পৃষ্ঠায় 'প্রেমবিলাস' থেকে যে উদ্ধৃতিটি আছে তার

শেষের পংক্তি হবে, 'রাঢ়দেশে ভরতপুর করিলেন বাড়ী।' যথা স্থানেই এ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হলো। যাঁরা ভরতপুর যেতে পারবেন না, তাঁরা উক্ত বরানগর পাটবাড়ীতে গেলেই গদাধরের মুক্তার মত হস্তাক্ষর ও মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত লিখিত গীতার শ্লোকের আলোকচিত্র দেখতে পারবেন।

আমার এই গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য শুধু যে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করা তা নয়, সেই সঙ্গে আমি চাইছি বর্তমান যুব মানস চৈতন্য অনুসন্ধানে নিজেদের নিয়োজিত করুন। রাজনৈতিক সচেতনতার যুগে চৈতন্যদেব আমাদের বর্তমান সমস্যাকে তৎকালে কিভাবে কোন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন, তা যদি আজকের যুব মানস বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে যথার্থ সাম্যবাদ আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একথা যেমন মহাত্মা গান্ধীজী বুঝেছিলেন, ঠিক সাম্যবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কসও উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে সাম্যবাদের প্রবর্তন করতে হলে ভারতের আবহাওয়ার অনুকূলেই যে বীজ রোপণ করতে হবে। অন্যথায় তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে।

পরিশেষে জানাই, অন্য দুটি সংস্করণের মত বর্তমান সংস্করণটিকেও যদি শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ সাদরে এবং সাগ্রহে গ্রহণ করেন, তাহলে আমার সকল শ্রম সার্থক বলে মনে করব। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দকে জানাই আমার হার্দিক ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

যুধিষ্ঠির জানা

দ্বিতীয় সংস্করণ : এখান থেকেই শুরু

শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য-এর প্রথম সংস্করণ এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হয়েছে। এতে স্পষ্টই বুঝতে পারছি চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতুহল এখনো শেষ হয়নি। বাংলার প্রেমের ঠাকুরের শেষ দিনটি কিভাবে শেষ হয়েছিল তা' জানতে সকলেই আগ্রহী। এই আগ্রহ আমার প্রাণে উৎসাহ জুগিয়েছে, হৃদয়ে করেছে আশার সঞ্চার। নিজের অনুসন্ধান ও পরিশ্রমকে মনে করেছি সার্থক।

বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহু চিঠি আমার কাছে আসতে শুরু করেছে পাঠকদের কাছ থেকে। এখনো আসছে। চিঠিগুলিতে যেমন আছে প্রশংসা, তেমনি প্রশ্ন আছে বহু। ব্যস্ততার মধ্যেও এ পর্যন্ত আমি প্রায় ৫০টি পত্রের জবাব দিয়েছি যাঁদের পত্রের জবাব এখনো দিতে পারিনি, একটু অবসর হলেই একে একে সকলের জবাব দেব। আমার অক্ষমতার জন্য তাঁদের কাছি আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করবেন তাঁরা।

দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের জন্য ক্রমাগত তাগাদা আসছে পাঠক এবং প্রকাশকের কাছ থেকে। স্বভাবতই নিজেকে আমি বিব্রত বোধ করছি। কারণ, দ্বিতীয় সংস্করণে আরো কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করতে হলে চাই আরো অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন। অধ্যয়ন বলতে গ্রন্থাগারে বসে অধ্যয়ন নয়; প্রাচীন প্রামাণ্য পুঁথি এবং সেই সব পুঁথি কোথায় আছে তা অনুসন্ধান করে যেতে হবে যথাস্থানে। এখন বর্ষাকাল। আমি থাকি একেবারে গ্রামে। তাই এই অল্প সময়ের মধ্যে ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমি আশা করেছিলাম, আমার সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাকে কিছু নতুন তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন। তথ্যের পরিবর্তে প্রশ্নজালে আবদ্ধ করে অধিকাংশ পাঠকবর্গ আমাকে ব্যস্ত করে তুলেছেন। সে জন্য বিরক্ত বোধ করিনি। চিঠি পেতে যেমন ভালবাসি, চিঠির জবাব দিয়েও তেমনি আনন্দ পাই। তাই যাঁরা ভয় ভয় করে চিঠি লিখেছেন, উত্তর পাবেন কি পাবেন না মনে করে, সে সংকোচ করবেন না কোন মতেই।

তাই বলে কারো কাছ থেকে একেবারে সাহায্য পাইনি, একথা বললে আমি নিজেকে অকৃতজ্ঞ মনে করে হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করব। প্রথমেই মনে পড়ছে আমার একান্ত আত্মীয় ডাঃ এস. আর. জানা এম. ডি. এফ্. সি. সি পি, (U. S. A.) (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)—এর কথা। তিনি স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও একান্ত ব্যস্ত মানুষ।

তা' সত্ত্বেও সমগ্র বইটি পড়ে যে সব ত্রুটি তাঁর চোখে পড়েছে, শুধু যে সম্পূর্ণ ধরিয়ে দিয়েছেন তাই নয়, নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করে সংশোধন ও মতামত সহ লিখেও দিয়েছেন। ফলে দ্বিতীয় সংস্করণে আমার পরিশ্রম লাঘব হয়েছে আশাতীত ভাবে। তিনি ফটোও তুলে দিয়েছেন তমলুকের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের। প্রয়োজনীয় কয়েকটি বইও দিয়েছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ-এর পরিবর্তে জানাই হৃদয়ের অকুণ্ঠ ভালবাসা।

শ্রদ্ধেয় বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হরিহর মজুমদার, জ্যোতিষশাস্ত্রী, বি. এ এল এল বি. (কলি) এ. সি. আই. আই. (লণ্ডন) মহাশয় তাঁর ৮০ বৎসর বয়সেও যেভাবে অদম্য উৎসাহ নিয়ে আমাকে মহাপ্রভুর কোষ্ঠী সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং আমার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, তাতে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। ভূমিকা লেখার সময় তাঁর একটি পত্র পেয়েছি। তাতে তিনি মহাপ্রভুর কোষ্ঠী-সম্পর্কে লিখেছেন—"আমার কাছে মহাপ্রভুর যে রাশিচক্র আছে, তাতে মঙ্গলের সঙ্গে ২০ নং নক্ষত্র যুক্ত আছে। ১৯ কিংবা ২০ বা ২১ নক্ষত্রের যে কোন একটি নক্ষত্র থাকিতে পারে কিন্তু ১৮ নক্ষত্র কিছুতেই নয়—ইহাই আমার বলার বিষয়। আমি কোথা হইতে এই চক্রটি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। দাক্ষিণাত্যের ঊনবিংশ শতাব্দীর (খ্রীঃ অব্দ ১৮৪৬।৪৭ সনের) একখানা গ্রন্থে দেখিয়াছিলাম মহাপ্রভুর জন্ম শনিবারে লেখা আছে শুক্রবার নয়। আবার আমি যে চক্রটি সংগ্রহ করিয়াছি এবং যে চক্রের reference-এ আপনাকে মঙ্গল ২০ নক্ষত্রযুক্ত আছে লিখিয়াছি ঐ চক্রের উপরে লেখা আছে—শকাব্দঃ ১৪০৭/১৯ এ ফাল্গুন, শুক্রবার সন্ধ্যাকাল।··· ···

চক্রটির গ্রহ-সন্নিবেশ যে কোন জ্যোতিষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শাস্ত্রে আছে লগ্ন ও চন্দ্র সর্বগ্রহদ্বারা দৃষ্ট হইলে ঐ চক্রের জাতককে মহাপুরুষ বা ভগবানের অবতার বলা হয়। মহাপ্রভুর রাশিচক্রে ল. গ ও চন্দ্রের উপর ৬টি গ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি (রবি, বুধ, শুক্র, শনি, রাহু ও বৃহস্পতির লগ্ন ও চক্রের উপর পূর্ণ দৃষ্টি এবং মঙ্গলের অর্ধ দৃষ্টি) আছে।

এবার মহাপ্রভুর জন্মবার কি, সে সম্বন্ধে বিশিষ্ট গণিতাচার্য স্বর্গীয় এন সি লাহিড়ীর (নির্মল চন্দ্র লাহিড়ীর) মত কি তাহা বলিতেছি। লাহিড়ী মহাশয় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। জন্মবার শুক্র কি শনিবার এ সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে বা চৈতন্যভাগবতে কোন কিছু পাই না। প্রকৃত জন্মসময়ের নির্দেশও ঐ দুই গ্রন্থে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়না। নির্মলবাবু শুক্রবার বলিয়াছেন।'

কোষ্ঠী সম্পর্কে এর পরেও প্রসঙ্গ আছে। ১০ই সেপ্টেম্বর '৮৫ 'দেশ' পত্রিকায় দেখলাম প্রখ্যাত ভায়াতত্ত্ববিদ শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় বরানগর পাটবাড়ী থেকে

সংগ্রহ করে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি লগ্নহীন কোষ্ঠীর ফটোস্টাট্ কপি মুদ্রণ করেছেন। ফটোটি দেখে সহজেই বোঝা যায় কোষ্ঠীটি খুব প্রাচীন নয়। তা না হোক কিন্তু আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না; রবি কন্যা রাশিতে বা বৃহস্পতি ধনুরাশি ত্যাগ করে মকরস্থ হলো কেমন করে। একথা জানিয়ে শ্রদ্ধেয় হরিহর মজুমদার মহাশয়কে লিখেছিলাম। তিনি উত্তরে লিখেছেন—"দেশে" প্রকাশিত মহাপ্রভুর রাশিচক্রটি দেখে একটি কথাই মনে এসেছে। যে ভদ্রলোক এই রাশিচক্রটি করেছেন তাঁর Astrology সম্বন্ধে Fundamental (প্রাথমিক) জ্ঞান নাই। তার কারণ হয় রবি ও শুক্র পরস্পরের দূরত্ব ৪৮° ডিগ্রী বেশী হয় না। রবি ও বুধের দূরত্বও প্রায় তার কাছাকাছি। সুতরাং রবি কন্যায় এবং শুক্র মীনে Astronomicaly ভুল। সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতেই রাশিচক্রটি নাকচ করতে হয়। বৃহস্পতি ঐ শকাব্দে ধনুতেই ছিল। কারণ R. V. Raman ঐ শকাব্দে বৃহস্পতিকে ধনুতেই বসিয়েছেন। সুতরাং বৃহস্পতি ঐ বৎসর ধনুতেই ছিল। Sir Raman-ও একজন বিশিষ্ট জ্যোতিষী, Astronomy-তে তাঁর পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য। আপনি এই চক্রটি সরাসরি নাকচ করতে পারেন।"

এরপর ১৫।৮৫ তারিখে আর একটি পত্রে শ্রদ্ধেয় হরিহর মজুমদার জানিয়েছেন—

—"এই রাশিচক্রে আরো কয়েকটি ভুল রয়েছে। রবি কন্যায় থাকার অর্থ হল, এই চক্রানুসারে মহাপ্রভুর জন্ম দেখান হয়েছে আশ্বিন মাসে কিন্তু তাঁর জন্ম হয়েছে ফাল্গুন মাসে।

চন্দ্র সিংহে এবং রবি কন্যায় থাকায় মনে হয় কৃষ্ণাচতুর্দশী। মহাপ্রভুর জন্মদিনে চন্দ্রগ্রহণ ছিল এবং দিনটি ছিল পূর্ণিমা তিথি। তা না হলে চন্দ্রগ্রহণ হয় কি করে। তারপর রবির সপ্তমে শুক্র থাকতে পারে না। রবিও শুক্রের দূরত্ব ৪৮° ডিগ্রীর বেশী হয় না। বুধ ও রবির নিকটে থাকবে ২৭° ডিগ্রীর মধ্যে। ফাল্গুনে জন্ম বলে রবি কুম্ভে থাকবে। বৃহস্পতি ধনুতেই থাকবে।"

এখন যা দেখছি, মহাপ্রভুর কোষ্ঠীর মধ্যেও লুকিয়ে আছে আর এক রহস্য। কোষ্ঠী নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, দেখছি আধুনিক যুগে এক এক জন গ্রন্থকার চৈতন্যদেবের এক একটি কোষ্ঠী আবিষ্কার করে বলছেন বা দাবী করছেন, তাঁরটাই প্রামাণ্য। এইসব আবিষ্কারক বা দাবীদারকে নাকচ করার ক্ষমতা আমার নাই। জ্যোতিষ যাঁরা জানেন না সেই সব পাঠকদের কাছে কোষ্ঠী-বিতর্ক সম্পূর্ণ মূল্যহীন। আমার কাছে জ্যোতিষ মানেই গণিত-নির্ভর উন্নত আকাশ বিজ্ঞান। শূন্য মানেই পূর্ণ। তাই ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য সংগ্রহ করে রেখে গেলাম আমার সামান্য প্রচেষ্টার স্বাক্ষর।

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রুত সম্পাদন করতে হলেও, এর জন্য পরিশ্রম কম করিনি। এই বর্ষার মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে ছোটাছুটি করেছি। অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করে সংযোজন করেছি যথাযথ স্থানে। এই সংস্করণ দেখলেই তা বুঝতে পারবেন। শ্রীচৈতন্যের সমাধির সন্ধানে, শিক্ষাষ্টক, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের গোপীপ্রেম সম্পর্কে সুচিন্তিত ব্যাখ্যা, রামকৃষ্ণ দেবের প্রেম ও ভক্তি সম্পর্কে সহজ সরল মন্তব্য সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। শ্রীচৈতন্যদেবের কোষ্ঠী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন করে পুনরায় লিখেছি। ওড়িয়া পুঁথি থেকে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান সম্পর্কে নতুন একটি উদ্ধৃতি দিয়েছি। এই উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, তিরোধানের পর মহাপ্রভুকে ৪৩ মাইল দূরে প্রাচী নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোন কোন বাঙালী গবেষক এ-কাহিনী সত্য বলে উল্লেখ করছেন। প্রথম সংস্করণে বলেছিলাম, তমলুকের মহাপ্রভুর মূর্তিকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছিল। এই সংস্করণে তা' পরিবর্তন করে লিখেছি মূর্তিটিকে সত্যই চুরি করা হয়েছিল। শ্যামানন্দ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় তাঁর শিষ্য রসিকানন্দ গোস্বামী মূর্তিটিকে উদ্ধার করে তমলুকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে।

এই ঘটনা থেকে আর একটি নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল, উৎকালে এবং গৌড়ে বৈষ্ণব ধর্মের যে হীন অবস্থা চলছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৃন্দাবন থেকে শ্রীজীব গোস্বামী এই দুই দেশের হীন অবস্থা দেখে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে পাঠিয়েছিলেন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য। পথে বনবিষ্ণুপুরে বীর হাম্বীর কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছিল এঁদের ভক্তিগ্রন্থ রাজি। নরোত্তম বিলাস থেকে জানা যায় এইসব ইতিহাস। ডঃ দীনেশ সেন যে বলেছিলেন, চৈতন্যের তিরোধানের পর ৫০ বছর গৌড় ও উৎকলে কীর্তন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এই ঘটনা থেকে উক্ত ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ঈশাননাগর, ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে আরো বহু নতুন তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত করেছি। ফলে গ্রন্থকলেবর স্বাভাবিকভাবে বেড়েছে।

ফটো সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা দরকার। এই সংস্করণে বেশ কয়েকটি নতুন ছবি সংযুক্ত করা হলো। সাড়ে চারশত বছর পূর্বে আঁকা প্রতাপরুদ্রের চৈতন্য পার্ষদগণের ছবিটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার কন্যা স্নিগ্ধা জানা (দরবার)। সে এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। এই ছবি থেকে আমার পুত্র শ্রীমান সুস্নাত জানা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক ছাত্র) কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের পেন্‌সিল স্কেচটি বড় করে অনুরূপভাবে অঙ্কন করে দিয়েছে। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, মহিলা কবি শ্রদ্ধেয়া হেমলতা ঠাকুরের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তাই একটি পুরানো ছবি এই সংস্করণে ছাপা হলো। ছবিটি

তৎকালে আমার ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ জানার সম্পাদিত 'বেদুইন' মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। 'চৈতন্য চকোরে'র ছবিটি 'আজকাল' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত। এজন্য তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মার সম্প্রতি আবিষ্কৃত ভূর্জপত্রের এই পুঁথিটি আসল পুঁথি নয়, মূল পুঁথির অনুলিপি। ছবি থেকে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হলো না। চেষ্টা করেছিলাম, দু'একটি শব্দ অন্তত উদ্ধার করতে পারি কিনা। কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি। পরবর্তীকালে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ না হলে এ বিষয়ে আমার কোন মন্তব্য না করাই শ্রেয় বলে মনে করি। বরানগর পাটবাড়ী থেকে আবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঠিকুজিটি আবিষ্কার করেছেন শ্রদ্ধেয় ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন মহাশয়। জ্যোতিষীদের কাজে লাগবে মনে করে তারও একটি ছবি মুদ্রিত হলো।

এ পর্যন্ত যে সব চিঠি পেয়েছি, তার মধ্যে নারায়ণপুর, ২৪ পরগণা থেকে লেখা মাননীয় শ্রীযুক্ত সমরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রটি কোনরূপ বিকলাঙ্গ না করে পরিশিষ্টে অবিকল মুদ্রিত করলাম। আমার শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ অনুরূপভাবে বা অন্য কোন ভাবে যদি বিষয়টিকে নিয়ে বিশ্লেষণ করে আমাকে লিখে জানান তাহলে আমি বিশেষ উপকৃত হবো ও তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। আমি প্রশংসা চাইছিনা, চাইছি অনুসন্ধানের পথের আলোক। অন্ধকারে আছি, আলোর প্রত্যাশী আমি।

তাই বলে না পড়ে বা শুধুমাত্র পৃষ্ঠা উলটিয়ে কোন ডক্টর উপাধিধারী পণ্ডিত মুখোমুখি আমাকে যদি উলটোপালটা প্রশ্ন করে আমার মত বোকাকে বুদ্ধু বানাতে চান, (সেদিন যেমন কোলকাতায় ঘটেছিল) তাহলে আমি নাচার। যেসব পুস্তক থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি, তার নাম ও লেখকের নাম পুস্তকের শেষে 'গ্রন্থ-নির্দেশে' দিয়েছি। অনুগ্রহ করে দেখলেই বুঝতে পারবেন। না পড়ে পুস্তকের নির্দেশ বা প্রমাণ-পঞ্জী নাই—এমন কথা বললে সহজেই দুঃখ পাব।

আমার লেখা বই নিয়ে নানা বিতর্ক উঠছে। তা উঠুক। কিন্তু অযথা আক্রমণ কেন হবে বুঝতে পারছিনা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি হেয় করতে চাই না, সর্বদাই তাঁর কৃপা প্রার্থনা করি। যাঁরা অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের বিশ্বাসে আমি আঘাত দিতে চাই না। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ-পরমহংস-দেবের মত সাধক সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত হয়ে যদি ভক্তহৃদয় তাই সত্য বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে পাঁচশত বছর পূর্বের অলৌকিক কাহিনীকে বিশ্বাস করতে বাধা কোথায়! আমি শুধু বলেছি, শ্রীচৈতন্যদেব নিজে কখনো নিজেকে ঈশ্বর বা অবতার বলে প্রচার করেননি বা অলৌকিকতায় বিশ্বাসও করেননি। সেবার

বৃন্দাবনে যমুনায় রাত্রিতে কৃষ্ণ কালীয় নাগের মাথার উপরে নৃত্য করছেন আর কালীয়নাগের মাথার মণি জ্বলছে এই কাহিনী ভীষণ প্রচারিত হয়েছিল। শত শত লোক রাত্রে যমুনার ধারে গিয়ে তাই প্রত্যক্ষ করেছিল। তখন শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনে। তিনি শুনেই হেসে তাঁর পারিষদকে বলেছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ নয়, জেলে কৈবর্ত মশাল জ্বালিয়ে অন্ধকার রাত্রিতে মাছ ধরছে। তোমরা ওদেরই বলছ শ্রীকৃষ্ণ। ভ্রমে সকলে পতিত হয়েছে বলে তোমরাও কি সেই ভ্রম করবে।

এই হলো মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। তিনি 'আথাল-পাথাল' কথা কখনো সহ্য করতে পারতেন না। মিথ্যে অলৌকিক কথায় বিশ্বাস করতেন না। দাক্ষিণাত্যের সেই যে রামদাস ব্রাহ্মণ যে রাবণ সীতাকে স্পর্শ করেছে বলে দুঃখে কাঁদতেন, মহাপ্রভু ধনুতীর্থ থেকে প্রাচীন কূর্মপুরাণ পুঁথি আবিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণকে, রাবণ যে সীতা হরণ করেছিল, বা অগ্নি পরীক্ষার সীতা, আসল সীতা নয়।

যাঁরা মহাপ্রভুর পঞ্চভূতাত্মক দেহ জগন্নাথে লীন হয়ে গেছে বলে মনে করে পত্র দিয়েছেন বা মনে করেন, তাঁদের বিশ্বাস থাক তাঁদের অন্তরে। বিশ্বাসের মূলে কুঠার আঘাত করলে হৃদয়ে ত লাগবেই। জরা ব্যাধের তীরের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েও যদি তাঁর ভগবানত্বের হানি না হয়, মহাত্মা গুলি খেয়েও যদি তিনি আমাদের হৃদয়ে মহাত্মা গান্ধী হয়ে থাকেন, ইন্দিরাজীও তেমন থাকবেন। আর আমাদের প্রেমের অবতার, ভক্তির মন্দাকিনী ধারা বয়েছিল যাঁর হৃদয়ে সেই শ্রীচৈতন্যদেবকেও যদি হত্যা বা গুমখুন—যাই করা হোক না কেন, তাতে এতটুকুও কমবে না মহাপ্রভুর মহিমা। আমি একথাটাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। যথার্থ ভক্ত-হৃদয় কলুষিত হবে না কখনো।

ইচ্ছে ছিল এই গ্রন্থে আরো একটি অধ্যায় সংযুক্ত করব। পাঠকবৃন্দের কাছ থেকে যে সব পত্র পেয়েছি, সেগুলি অবলম্বন করে 'পাঠকের মুখোমুখি' নামে একটি অধ্যায় লিখব। দেখলাম তা যদি লিখতে হয় তাহলে তা হয়ে যাবে ভিন্ন একটি গ্রন্থ। শুধু তাই নয়—এজন্য সময়, অধ্যয়ন, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানও একান্ত প্রয়োজন। তাই ইচ্ছে থাকলেও উক্ত অধ্যায়টি সংযোজন করতে পারলাম না।

একজন লিখেছেন—"মহাপ্রভু যখন অপ্রকট হইলেন তখন কাশী মিশ্র, রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম উঁহারা কোথায় ছিলেন? ইঁহারা যদি তখন বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর একটি শোকবাণীও দিলেন না, গৌড়ের বৈষ্ণবেরাও তখন গৌড় দেশে আসিয়া একটি কথাও বলিলেন না। তাঁর অন্তর্ধানের পর দেখা যায় নিত্যানন্দের প্রভাব বাড়িয়া গেল। কৈ তিনি ত পুরীতে তাঁর অন্তর্ধানের পরের বৎসর আসিয়াছেন বলিয়া কোন সংবাদ জানা নাই।"

প্রশ্নগুলির মধ্যে শেষের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নটি আমার মনে

অনেকবার জেগেছে এবং প্রশ্নটির উত্তর খুঁজেছি খুব নিবিষ্ট চিত্তে। এই প্রশ্নের উত্তর তথ্যপ্রমাণ সহ দেওয়া যায়, কিন্তু আমার পক্ষে তা কোনমতেই সম্ভব নয়। শেষে হয়ত ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেনের মত আমারও অবস্থা হবে। অযথা আর এক বিপদের মধ্যে যেতে চাই না।

তা হলে প্রশ্ন উঠবে, আমি ঐতিহাসিকের ধর্ম থেকে সহজেই বিচ্যুত হলাম। সত্য প্রকাশ করার সৎ সাহস আমার নাই। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় জেনেও কেন সত্য প্রকাশ করতে পারলেন না, বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারবেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ভক্তরা শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, এমন প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়। রায় রামানন্দ, প্রতাপরুদ্রদেব, কাশী মিশ্র মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। কোন পণ্ডিত বৈষ্ণব মহান্তের কাছে শুনেছিলাম, এক সঙ্গে রায় রামানন্দ সহ অন্যান্য পার্ষদগণকেও হত্যা করা হয়েছিল।

ঈশ্বর দাসের ওড়িয়া 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যায়, রামানন্দ ভক্ত কবীরকে দীক্ষা দেওয়ার পর কটকের নিকট বারানসী বা বীরানসী নামক স্থানে অপ্রকট হন, ভক্তিরত্নাকরে দেখছি মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরও রামানন্দ অবস্থান করছেন—

হেনকালে প্রভুর অদর্শনের কথা শুনি।
অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা (প্রতাপরুদ্র) লুটায় ধরনী॥
শিরে করাঘাত করি হৈল অচেতন।
রায় রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন॥ —ভক্তিরত্নাকর

শ্রীনিবাস আচার্য চৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এসে নাকি সার্বভৌম ও রায় রামানন্দকে দেখেছিলেন।

অন্তর্ধান অর্থে ছদ্মবেশে শ্রীচৈতন্যদেব পলায়ন করেছিলেন, এই মতকেও আমি অস্বীকার করিনি। সম্ভব, অসম্ভব দুই-এর প্রতি যুক্তি দেখিয়েছি। এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ চাই। প্রমাণগুলি যেন ধোপে টেকে।

বইটিকে যতদূর সম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। দ্রুত মুদ্রণের জন্য এবং আমি কলকাতা থেকে দূরে থাকার জন্য সব প্রুফ যথাযথ ভাবে দেখতে পারিনি। তাই হয়ত কিছু বানানভুল থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠকবর্গ এ বিষয়েও যদি অবহিত করান তাহলে খুশী হবো। পুস্তক সম্পর্কে চিঠি-পত্র নিম্নঠিকানায় দেবেন।

॥ নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির জানা

প্রারম্ভে

'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' গবেষণা গ্রন্থ। এ গবেষণা কোন উপাধির জন্য নয়। পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্যও নয়। তথ্য আছে, অনুসন্ধান আছে, তত্ত্ব কথা নাই। পরিশ্রম করেছি, অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছি, নিজের জানার ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করার জন্য। কিন্তু আমার সাধ পরিপূর্ণ হয়নি। এখনো অনেক কিছু জানতে বাকি রয়ে গেছে। জীবনে হয়ত সে সাধ পরিপূর্ণ হবে না।

আমার উদ্দেশ্য পাঠককে চমকিত করা নয়, আমি চাইছি পাঠককে অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে। পাঠক যেন আমার বই পড়ে নিজেরাও এ বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তবেই আমার সকল শ্রম সার্থক হবে। বাংলা দেশের একজন বিদগ্ধ সমালোচক ডঃ আহমদ শরীফ যথার্থই বলেছেন—'বাংলাদেশে দুইবার একদেহে অসামান্য রূপগুণের সমাবেশ হয়েছিল। একবার চৈতন্য দেহে অন্যবার রবীন্দ্র-শরীরে।' সেই চৈতন্য দেহ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি চৈতন্য জীবনী, তৎ-সমসাময়িক সমাজ ও ইতিহাস মূলত অবলম্বন করেছি।

প্রেমের ঠাকুর, বিপ্লবের গুরু, ভারত আত্মার প্রতিভু, সাম্যবাদের নেতা ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবকে কোথাও হেয় করতে চেষ্টা করিনি। আমি চাইছি সত্য উদ্ঘাটন করতে। এজন্য বিজ্ঞান, যুক্তি ও ক্রিয়া যোগ-বিজ্ঞানের আশ্রয় আমাকে নিতে হয়েছে। যেখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেখানে আমি পরস্পর বিরোধী যুক্তি ও সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করে পাঠককে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন রেখেছি, আপনারাই বলুন কোনটি ঠিক হতে পারে। আমি সঙ্গী করতে চাইছি অন্ধকার পথে আমার পাঠকবৃন্দকে।

অন্তর্ধান রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করতে গিয়ে বিষয়টি যাতে নীরস না হয়ে পড়ে, সেজন্য গবেষণার বাঁধাধরা পথ ছেড়ে মাঝে মাঝে সরস করার জন্য কথা সাহিত্যের আশ্রয় নিয়েছি। এতে হয়ত গবেষক হিসেবে বা গবেষকের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছি, কিন্তু পাঠককুলকে বঞ্চিত করিনি। এমন হয়েছে গল্প বলতে বলতে সহসা গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করেছি। তাই বলে গল্পে কল্পনার আশ্রয় নিইনি।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে যে কটি স্থান উল্লেখ করেছি তা হলো—জগন্নাথ মন্দির, গুণ্ডিচাবাটী, গরুড়স্তম্ভ ও তোটা গোপীনাথের মন্দির। জগন্নাথ মন্দিরের কাছেই কাশী মিশ্রের গম্ভীরাতে বাস করতেন চৈতন্যদেব। তোটা গোপীনাথের মন্দির

জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে যমেশ্বর তোটায়। দূরত্ব সামান্যই। কিন্তু গুণ্ডিচাবাটী মূল মন্দির থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে। অতএব গম্ভীরা থেকে বেরিয়ে অতদূর প্রভুর যাওয়া সম্ভব কিনা বা গেলেও রথের সময় ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিগণ কতটা সুবিধা করতে পারবেন, অপরাধ বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী তা বিচার করা দরকার।

মনীষী রোমা রোলাঁ তাঁর রামকৃষ্ণ গ্রন্থে লিখেছেন চৈতন্যদেবের মৃত্যু হয়েছিল এপিলেপ্সিতে অর্থাৎ মৃগী রোগে। শ্রীচৈতন্যদেব তার জীবনের শেষের দিকে গম্ভীরার মধ্যে দেওয়ালে প্রায়ই মুখ ঘষতেন। এই লক্ষণ দেখে বোধ হয় তিনি মনে করেছিলেন—এ আর কিছু নয়, মৃগী রোগ। এবং শেষে তিনি এই রোগেই মারা গিয়েছেন। এই অনুমানের পিছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। নবদ্বীপেও তাঁর উন্মাদ রোগ হয়েছে মনে করে প্রিয়জনরা মহাবিষ্ণু তৈল সেবনের বিধি দিয়েছিলেন। উন্মাদ তিনি হয়েছিলেন ঠিকই, তবে সে হলো কৃষ্ণানুরাগের উন্মাদ। পরমপুরুষকে পাওয়ার জন্য ভক্ত হৃদয়ের ঐকান্তিক আকুলতা।

মহাপ্রভুর কোষ্ঠী বিচারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম এইজন্য যে, কোষ্ঠীর ফলে তাঁর আয়ু কতদিন হতে পারে। যদি তিনি দীর্ঘায়ু হন তবে তা কত বৎসর। শুক্র বা শনিবার তাঁর জন্ম হয়েছিল একথা আমার পূর্ববর্তী গবেষকগণ বলেছেন। আমি বলেছি শুক্রবার নয় চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল শনিবারে। আমার সামান্য কিছু জ্যোতিষ চর্চা আছে। আমার সিদ্ধান্ত যে ঠিক, একথা সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের আলোচনা পড়ে বিশ্বাস করলাম। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে।

সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড় বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব্বসুলক্ষণ॥

সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাঁর 'শ্রীচৈতন্যদেব' পুস্তকের পাদটীকায় লিখেছেন ঃ—৮৯২ বঙ্গাব্দ, ১৪০৭ শকাব্দ, ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫৪২ সংবত, ২৩ ফাল্গুন, শনিবার। ঐ দিন পূর্ণিমা তিথির ৪০ দণ্ড ১৩ পল অবস্থিতি ছিল; মতান্তরে উহা প্রায় ৪২ দণ্ড। পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রের মান ৫০ দণ্ড ৩৭ পল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কাল—সূর্যোদয় হইতে ২৮ দণ্ড ৪৫ পল পরে। সেই দিন দিবামান প্রায় ২৯ দণ্ড ছিল। সুতরাং সন্ধ্যার প্রাক্কালে ৫টা ৫২ মিনিটে (নবদ্বীপের সময়) শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব। ইংরেজী মতে 'জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার' অনুসারে গণনায় ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং অধুনা প্রচলিত 'গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার' অনুসারে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

প্রভুর আবির্ভাব কালে সিংহ লগ্ন ও সিংহ রাশি; রবি, বুধ ও রাহু মূল ত্রিকোণে) কুম্ভস্থ; বৃহস্পতি স্বগৃহে উচ্চ প্রায় মঙ্গল সহ ধনুতে; শনি উচ্চপ্রায়

বৃশ্চিকস্থ; শুক্র উচ্চ প্রায় মেষস্থ; চন্দ্র ও কেতু মঙ্গল ত্রিকোণে সিংহ লগ্নস্থ ছিল। ঐ লগ্ন রবির ক্ষেত্র, চন্দ্রের হোরা, মঙ্গলের দ্রেষ্কাণ; শুক্রের নবাংশ; শুক্রের দ্বাদশাংশ ও বুধের ত্রিংশাংশ—এইরূপ শুভ ষড়বর্গ যুক্ত। নবমপতি মঙ্গল, দশমপতি শুক্র ও সপ্তমপতি শনি উচ্চ প্রায়, বৃহস্পতি স্বস্থ হইয়া ধর্মস্থানগত শুক্রকে পূর্ণভাবে দৃষ্টি করিতেছেন; মঙ্গল ও বৃহস্পতির পঞ্চমে শুভ যোগ, লগ্নে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি ছিল।' (পৃষ্ঠা ৫৮)।

যার ফলে এবং কোষ্ঠীর ফলে দেখা যাচ্ছে জাতকের ৪৫ থেকে ৫৫-এর মধ্যে মারক যোগ আছে। তবে চক্রান্ত জাল ছিন্ন করার মত কৌশলও জাতকের থাকবে। কোষ্ঠীর ফল হিসেবে ঐ বয়সে তিরোভাবও হতে পারে।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব পালন সম্পর্কে পরিশিষ্টে যে প্রবন্ধটি লিখেছি, তা লিখতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের একটি প্রবন্ধের বিশেষ সাহায্য নিয়েছি। এজন্য তাঁর কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকব।

তোটা গোপীনাথের মূর্তি আবিষ্কার সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। শ্রীচৈতন্যদেব এই বিগ্রহটি বালি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছিলেন। এজন্য তাঁকে আমি প্রত্নতত্ত্ববিদ আবিষ্কারক নামেও ভূষিত করেছি। এই বিষয়ের উপরে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়। এই মূর্তিটি সম্ভবতঃ জগন্নাথ মন্দিরের গাত্রেই সন্নিবিষ্ট ছিল। বিধর্মী মুসলমান আক্রমণের ফলে ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের সৈন্যগণই মূর্তিটিকে ভেঙ্গে যমেশ্বর তোটায় নিক্ষেপ করেছিল। তারপর মূর্তিটি বালুকার মধ্যে চাপা পড়ে যায়। সেই চাপা পড়া মূর্তিটিই মহাপ্রভু আবিষ্কার করেন।

উৎকল কলা শিল্পের ইতিহাসে দেখা যায় কলিঙ্গের অধিকাংশ মন্দিরেই যে সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে, কিন্তু জগন্নাথ মন্দিরে সেই শিল্প-স্থাপত্য অনুপস্থিত। কেন? এর উত্তরে আজ থেকে একশত বৎসর পূর্বে প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন—'মন্দিরে যে বিস্তৃত কারুকার্যের অভাব চোখে পড়ে—যার জন্য একে নিরাভরণ মনে হয়—তার কারণ তৎকালে এই প্রদেশে শিল্পকলার অধঃপতন নয়। তার প্রকৃত কারণ হল পুরু আস্তরণ। যে সব সূক্ষ্ম কারুকার্য মন্দিরের সৌন্দর্য ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিল তার প্রায় সব কিছু ঢাকা ছিল চুনের পুরু আস্তরণে।'

তাঁর একথা যে কতদূর সত্য তা বুঝতে পারা গেল ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির সংস্কার করতে গিয়ে। পাঁচজন বিশেষজ্ঞের একটি দল এই কার্য পরিচালনা করছেন। এঁদের নেতা হলেন প্রত্নতত্ত্ব প্রকৌশলী শ্রীশিথিল কুমার চৌধুরী। মন্দিরটির প্রথম নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছিল ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখন মন্দিরের প্রধান স্থপতি ছিলেন ভাস্কর পণ্ডিত। এই পুস্তকে পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সৌজন্যে প্রাপ্ত দুটি ছবি মুদ্রিত

হলো। এই মূর্তিগুলি পুরু চুনের আস্তরণে ঢাকা ছিল। রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহের রাধার মস্তক ভগ্ন ছিল। এখন তা নেই। মস্তকটির ভগ্নাংশ মন্দিরের সন্নিকটে প্রোথিত ছিল। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। তাই আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দিয়েছেন স্থপতি। বুদ্ধ মূর্তিটিও চুনের আস্তরণ খসিয়ে বের করা হয়েছে। তাই এককালে মন্দিরে বৌদ্ধদের প্রভাব যে ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মন্দিরের ভূমিতল থেকে বড় অংশ পর্যন্ত সংস্কার করা হয়েছে। পুরো মন্দিরটির সংস্কার হলে দেখা যাবে শ্রীচৈতন্যদেবের আবিস্কৃত গোপীনাথের মূর্তিটিও মন্দিরের কোন অংশ থেকে ভাংগা হয়েছিল, আর তখনি বোঝা যাবে তোটা গোপীনাথ কেন নুয়ে আছেন। আর তখনি প্রমাণিত হবে আমার অনুমান কতদূর সত্য।

এই পুস্তক রচনা করতে কোন্ কোন্ গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তার একটি তালিকা গ্রন্থের শেষে দিয়েছি। এছাড়া যাঁরা গ্রন্থ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি (সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম) ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু ভক্তিশরণ নারায়ণ মহারাজ (কলিকাতা)। এঁদের কাছ থেকে বৈষ্ণব গ্রন্থ ও পাতঞ্জল ভাষ্য সংগ্রহ করেছি। এছাড়া পত্র-পত্রিকা ও জগন্নাথ মন্দিরের আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন স্বনামধন্য ডাক্তার, লেখক ও ফটোগ্রাফার, আমার আত্মীয় ডঃ এস. আর. জানা। বন্ধুবর কমল কুণ্ডুর কাছ থেকে পেয়েছি একটি ফটো। প্রকাশক শ্যামসুন্দর শাহু সংগ্রহ করে দিয়েছেন শেষ মুহূর্তে দু'টি বই। বরগোদা বাণীকুঞ্জ গ্রামীণ পাঠাগার আমাকে অকৃপণভাবে তাঁদের চৈতন্যবিষয়ক পুস্তকাবলী ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থরাজি দিয়েছেন ব্যবহার করতে। এঁদেরকে শুধু কৃতজ্ঞতা জানালে ঋণ পরিশোধ হবে না। এঁরা কৃতজ্ঞতার পাত্র নন এঁরা আমার পরম শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়, বন্ধু, গুরু ও উৎসাহদাতা।

পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি প্রথম শুনে যাঁরা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং বিবিধ পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা হলেন বন্ধুবর শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মাইতি (শ্রীগুরু প্রেস, তমলুক), দ্যোতনা পত্রিকার সম্পাদক সুনীল কুমার জানা, ডুগডুগি পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক, প্রশান্ত দাস, গবেষক ও লেখক ডঃ তারাশিস্ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত মণ্ডল, (কিউরেটর, তাম্রলিপ্ত মিউজিয়ম) সাহিত্য জীবনের প্রথম উন্মেষক গ্রন্থের সাহিত্যিক শ্রীযুত সুধীর কুমার মল্লিক (রেক্টর, শালবনী উচ্চ বিদ্যালয়) মহাশয়। এঁদের উৎসাহ, পরামর্শ আমাকে আমার দরিদ্র-জীবনে চলতে যুগিয়েছে জীবন-রস। ঋণী আমি সারা জীবন এঁদের কাছে। আমার পুত্র শ্রীমান্ সুস্নাত জানা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তার প্রচেষ্টা উদ্যোগ না থাকলে এই পুস্তক এত শীঘ্র প্রকাশ সম্ভব হতো না। সকলের কাছে প্রার্থনা করি তার ভবিষ্যৎ সুন্দর ও শুভ হোক।

পুরীতে ১৯৩৬ ও '৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয়া হেমলতা ঠাকুর (বড়মা) আমাকে যেভাবে স্নেহ ও আশীর্বাদ করে বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানে সাহায্য করেছিলেন, সে ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ, এই মহিলা কবি পুরীতে বসন্ত-কুমারী বিধবা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। শান্তিনিকেতনে এবং পুরীতে 'বড়মা' নামে সমধিক প্রসিদ্ধা। তিনি উৎকলে বিভিন্ন স্থানে পত্র লিখে না দিলে আমার অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। তিনি আর ইহজগতে নেই। আজকের দিন বেঁচে থাকল সব থেকে বেশী বোধ হয় তিনিই আনন্দিত হোতেন। তিনি যেখানেই থাকুন আমায় আশীর্বাদ করুন—এই কামনা করি আমার জীবনদেবতার কাছে।

পুস্তকটির পরিশিষ্ট অংশ বিশেষ মূল্যবান। মূল পুস্তকের মধ্যে যে সব তথ্য ব্যক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং পড়তে পড়তে যে সব প্রশ্ন পাঠক-হৃদয়ে দেখা দেবে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি এই পরিশিষ্ট অংশে।

পরিশেষে ময়না প্রকাশনীর কর্ণধার স্নেহভাজন শ্যামসুন্দর সাহু পুস্তকটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করার জন্য যে পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি বয়সে তরুণ। তাঁর অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা সফল হোক—জীবনে উত্তোরত্তর প্রতিষ্ঠা বাড়ুক—এই কামনা করি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে।

সবশেষে আমার গুরুসদৃশ পাঠকবর্গের কাছে আবেদন, পড়ে এর ত্রুটি-বিচ্যুতি বা কোন তথ্য যদি তাঁদের জানা থাকে বা কোন পুঁথি-পত্র এই বিষয়ে দিয়ে আমায় সাহায্য করেন, কিংবা নিম্ন ঠিকানায় আমায় জানান তাহলে বিশেষ উপকৃত হবো। আর কেউ যদি এবিষয়ে গবেষণা করতে চান, তাহলে আমার নিজস্ব পুঁথিশালা ও গ্রন্থাগার উন্মুক্ত থাকবে তাঁদের সহযোগিতা করতে।

আজ পাঁচশত বৎসর পরে সত্য হয়েছে কবিরাজ গোস্বামীর বাণী :

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হোক চৈতন্যের নাম॥

পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন, তাঁরা চেষ্টা করুন আরো তথ্য সংগ্রহ করতে। গবেষণা করুন শ্রীচৈতন্য-সম্পর্কে। নিষ্ফল তাঁরা হবেন না, কেন না :

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

যুধিষ্ঠির জানা

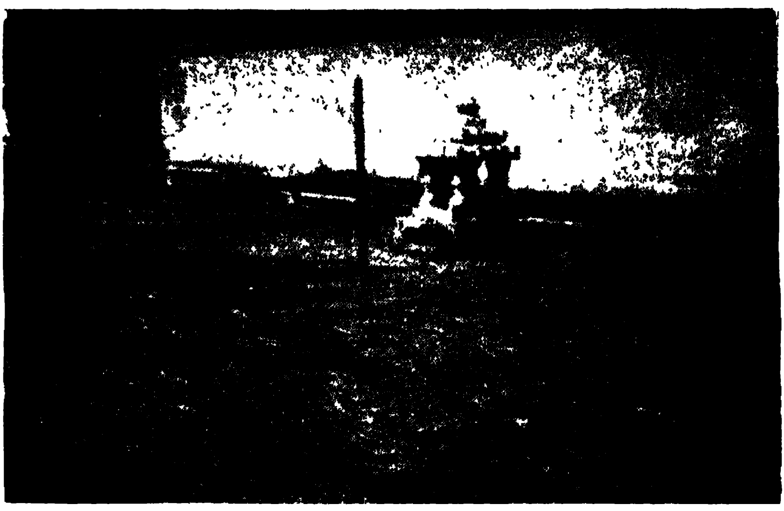




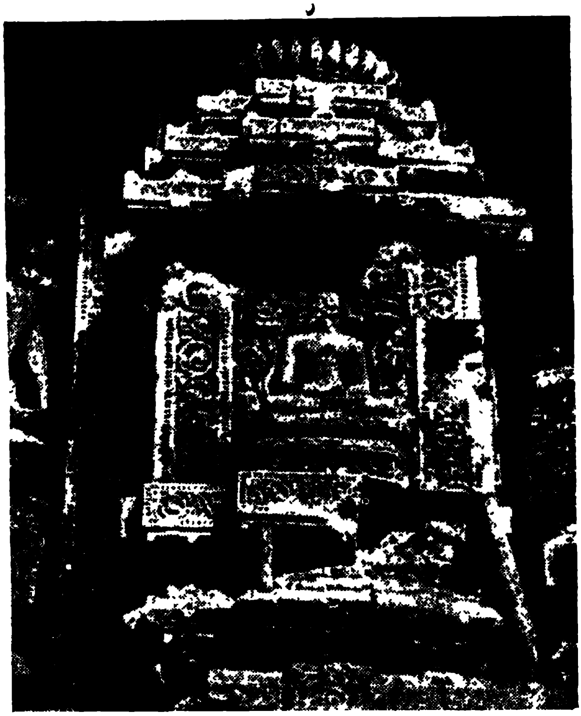
'চৈতন্যচকড়া' ব্যাখ্যা রত পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা



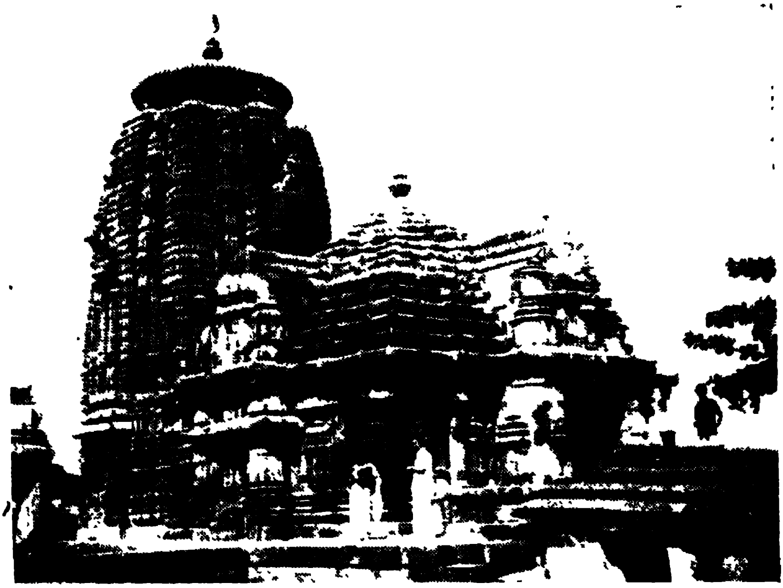
শ্রীচৈতন্য-পদচিহ্ন (জগন্নাথ মন্দির পুরী)



চৈতন্য-পদচিহ্ন (গুণ্ডিচা বাটি)



অলংকরণে বুদ্ধমূর্তি (জগন্নাথের মন্দির)



জগন্নাথের মন্দির



মহাপ্রভু (তমলুক)



চৈতন্য-চকড়া



রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি (সংস্কারের পর জগন্নাথ মন্দির, পুরী)



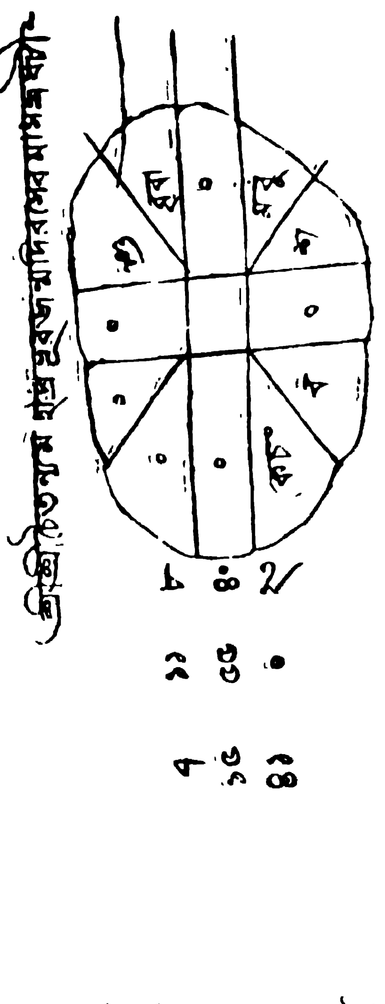
প্রতাপরুদ্রের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মন্দির



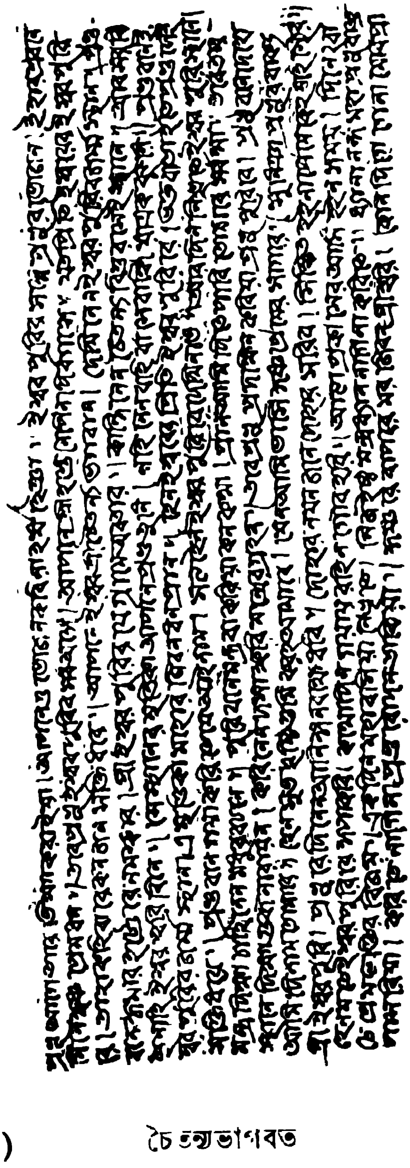
শ্রীচৈতন্যদেব (প্রাচীন চিত্র)



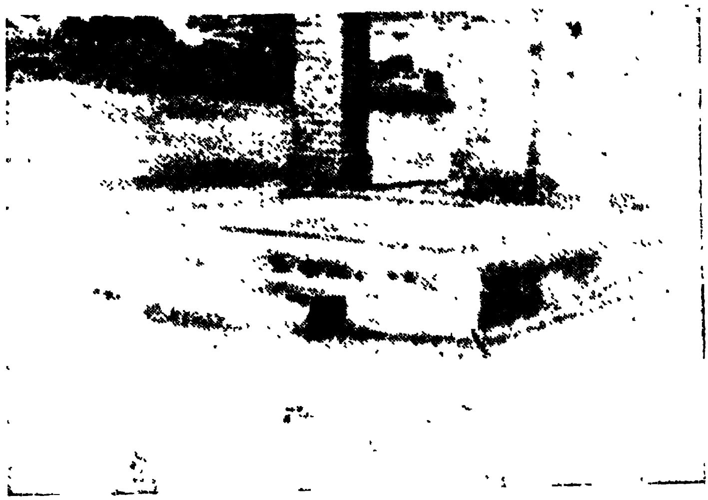
বড়মা ও লেখক (উড়িষ্যা)



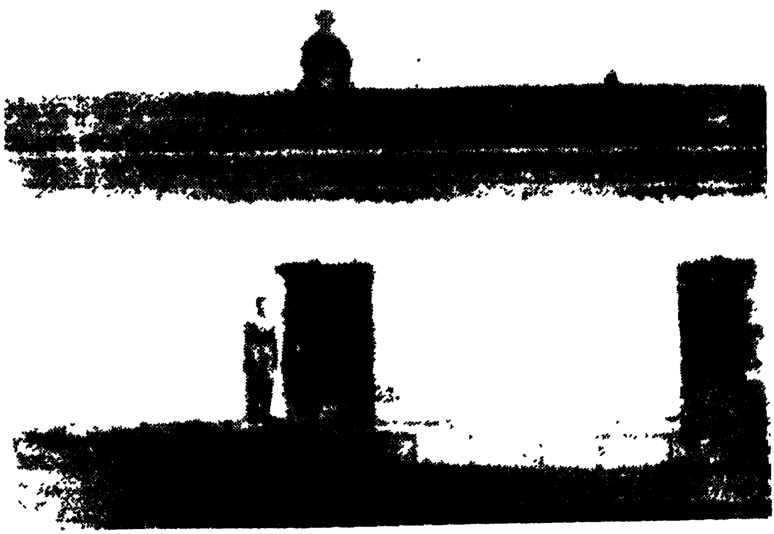
চৈতন্য ঠিকুজী (বরানগর পাঠবাড়ী)



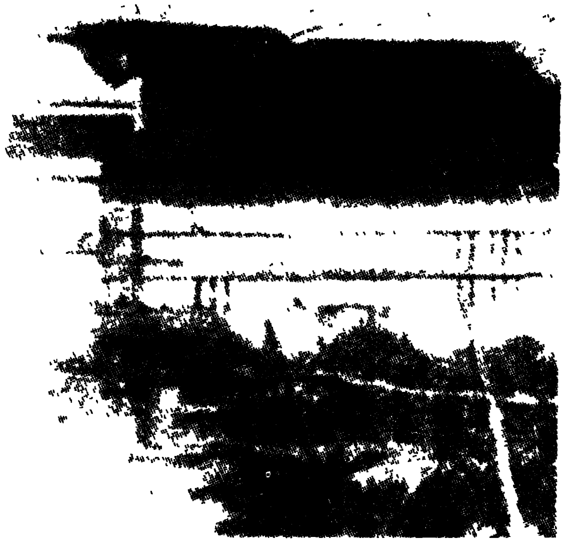
চৈতন্যভাগবত



শ্রীচৈতন্যের পাদপীঠ



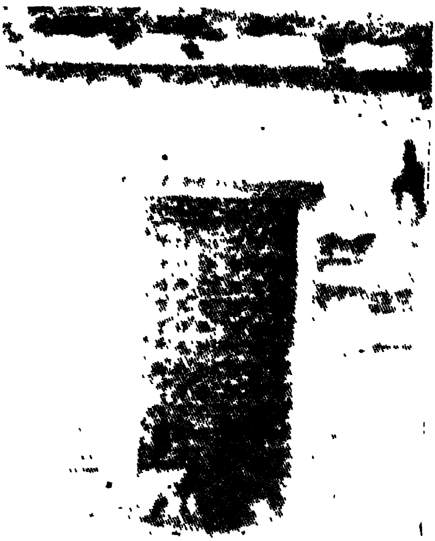
টোটা গোপীনাথের মন্দির



গুণ্ডিচাবাটির মন্দির



রামকেলির তমাল উদ্যান



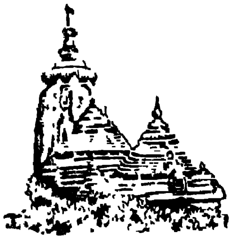
গম্ভীরা



প্রতাপরুদ্রের দুর্গ তোরণ



নরেন্দ্র সরোবর তীরে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব



শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য

॥ অন্বেষা ॥



যুগাবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর পাঁচশত বৎসর পূর্তি উৎসব পৃথিবীর নানা স্থানে বিপুল সমারোহে পালিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর জন্মস্থান নদীয়ার মায়াপুরে সাড়ম্বরে বৎসরব্যাপী এই উৎসবের পরিসমাপ্তিও ঘটেছে। কলিকাতা সহ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যে পালিত হয়েছে এই উৎসব। শুনেছি প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের এই পাঁচশত বৎসর পূর্তি উৎসব চলবে পুরো দু'বৎসর ধরে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্নস্থানে পালিত হবে শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশত বর্ষ পূর্তি মহোৎসব।

এমনি শুভ মুহূর্তে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে আমি যে অজ্ঞাত বিষয়ের আলোচনা করতে চাইছি, তা যেমন রহস্যাবৃত, তেমনি কঠিন ও দুঃসাহসিক কর্ম।

আমার মনে বার বার শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলি ভিড় করে এসেছে তা হলো—যাঁর মহান ব্যক্তিত্ব—হিন্দু-মুসলমানকে বেঁধেছিল একসূত্রে, যিনি প্রচার করেছিলেন প্রেমের ধর্ম, জাতপাত সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজাল দিয়েছিলেন ভেঙে, বইয়ে ছিলেন ভক্তির বন্যা। যিনি সকল মানুষকে ভাই বলে নিয়েছিলেন বুকে টেনে—যাঁর প্রেরণায় বঙ্গসাহিত্যে এসেছিল রেঁনেশা, যিনি প্রচার করেছিলেন মানব ধর্ম—বৈষ্ণব ধর্ম। সেই যুগন্ধর মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ কেন থাকবে এমন রহস্যাবৃত ?

শ্রীচৈতন্যের প্রথম বাংলা জীবনী লেখক কবি বৃন্দাবনদাস। যখন শ্রীচৈতন্যের বয়স বাইশ বছর তখন জন্ম হয় বৃন্দাবনদাসের। যখন তিনি অন্তর্ধান করেন, তখন বৃন্দাবনদাসের বয়স হয়েছিল ছাব্বিশ বছর। কবি অবশ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে চাক্ষুষ দর্শন করেননি। না করলেও তবু স্বীকার করতেই হয় তিনি ছিলেন চৈতন্যের সমসাময়িক। অতএব তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলী অনেকাংশে সত্য ও নির্ভরযোগ্য। তিনি ছিলেন শ্রীবাসের ভাইঝি নারায়ণী দেবীর পুত্র। এই নারায়ণীদেবী ছিলেন প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্যা। যখন বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর জীবনী রচনা করেন, তখন প্রভু নিত্যানন্দ কবিকে তথ্যাদি দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কবি শুধু যে নিত্যানন্দ-নির্ভর ছিলেন তাই নয়, নিত্যানন্দ ছাড়া তিনি অদ্বৈত আচার্য, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস প্রভৃতি অনেকের কাছ থেকেই নানা কাহিনী ও ঘটনাদি সংগ্রহ করেছিলেন।

কবি বৃন্দাবনদাসের পরবর্তী কালে যাঁরাই শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখেছেন, তাঁরা সকলেই বৃন্দাবনদাসের মূল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে নিজেদের তথ্য ও তত্ত্ব সংযোজন করেছেন। অথচ পরবর্তীকালে বৃন্দাবন দাসের রচিত ও অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর আবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান-কাহিনীটি কেহই গ্রহণ করেন নি ?

সাধারণতঃ দেখা যায় অনেক মহাপুরুষ বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্ম নিয়ে থাকে নানা মতভেদ। কিন্তু যখন সেই বিখ্যাত মহাপুরুষগণ মহাপ্রয়াণ করেন, যদি তখন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, তাহলে দেশের আপামর জনসাধারণ তাঁর মহাপ্রয়াণের যথাযথ বিবরণ জানতে পারেন। কারণ, সেই মহাপুরুষ যেমন ভাবেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁর কীর্তিরাশি মৃত্যুকে রহস্যাবৃত করতে পারে না। যেমন করেই হোক তাঁর মৃত্যুরহস্য আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের আবরণ উন্মোচন হলো না কেন ?

এসব প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাসাকে যখন করে তুলেছে উত্তাল, তখন ছুটে গিয়েছি বৈষ্ণব মহান্তগণের পদপ্রান্তে। জিজ্ঞেস করেছি, প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যটি কি—যদি অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে দেন তাহলে মেটে আমার মনের আকুল জিজ্ঞাসা।

এ বিষয়ে তাঁরা নানা জনে নানা কথা বলেছেন। তাঁদের কথা শুনে আমার মন ত তৃপ্তিলাভ করেনি, অধিকন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন একে একে এসেছে ভিড় করে, আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে প্রকৃত রহস্য জানার জন্য। আমি পড়েছি চৈতন্য সম্পর্কিত নানা পুস্তক। ছুটে গিয়েছি সুদূর উড়িষ্যায়। অনুসন্ধান করেছি পাগলের মত, যেন কতকটা নেশাগ্রস্ত হয়ে। জিজ্ঞেস করেছি পুরীর জগন্নাথ দেবের পাণ্ডাদের। তাঁদের কারো কারো মুখে শুনেছি শ্রীচৈতন্যদেবকে নাকি হত্যা করেছে পুরীর মন্দিরের পাণ্ডারা। আবার কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছেন, এসব কথা যেন কাউকে জিজ্ঞাসা না করি। জিজ্ঞেস করলে আমারই বিপদ হতে পারে।

আমি ভেবেছি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। কেন, কি আমার অপরাধ ! যাঁর প্রভাবে বাঙালীর মানসক্ষেত্রে ঘটেছিল সর্বতোমুখী বিকাশ, দেখা দিয়েছিল বাংলা সাহিত্যে প্রথম তথ্যানুসৃতি ও ইতিহাস-চেতনার উন্মেষ, আর যাঁর পরিকর-বৃন্দের জীবনচরিতই বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক চিত্রাঙ্কনের প্রথম প্রয়াস, তবে কেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের শেষ অধ্যায় এমন রহস্যাবৃত ?

সে ত খুব বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র পাঁচশত বছর পূর্বে যিনি এসেছিলেন এবং তাঁর সমসময়ে যখন তাঁর জীবনচরিত রচিত হয়েছিল, আর সেই সময়ের গ্রাম, জনপদ প্রভৃতির আজো যখন বিলুপ্তি ঘটেনি, তখন কেন জানা যাবে না তাঁর শেষ জীবনের শেষ দিনটি কিভাবে কোথায় শেষ হয়েছে।

এসব প্রশ্নের উত্তরে সর্বাধিক উত্তর যা পেয়েছি তা হলো—শ্রীচৈতন্য ছিলেন নররূপী ভগবান—জীবন্ত জগন্নাথ। অতএব তাঁর নররূপ শ্রীশ্রীজগন্নাথের দারুময় দেহেই লীন হয়ে গিয়েছে, এইটিই বোধহয় সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সত্য।

কিন্তু আমার ইতিহাস-সচেতন মন সহজে এ কথা সত্য বলে মেনে নিতে পারেনি। ইতিহাস এত সহজে সব কিছু বিশ্বাস করে নেবে না। ভগবান তিনি তাঁর হৃদয়বত্তার অন্তর-সত্তায়। যার সৃষ্টি আছে, তার ধ্বংসও আছে। যার জন্ম আছে, তার মৃত্যুও আছে। পঞ্চভূতাত্মক দেহ বিলীন হবে পঞ্চভূতেই। তাছাড়া রক্ত-মাংসের শরীর কখনো লীন হতে পারে না কোন জড় বস্তুর মধ্যে। তাই কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ লীন হয়ে গিয়েছিল জগন্নাথের দারুময় অঙ্গে।

তাছাড়া শ্রীচৈতন্য যাঁকে ভগবান বলে ভক্তিতে বিভোর হয়েছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুও হয়েছিল এবং তাঁর মৃতদেহ সৎকারও করা হয়েছিল। এসব তথ্য মহাভারতে মুষল পর্বে আছে।

ততঃ শরীরে রামস্য বাসুদেবস্য চোভয়োঃ।
আনীয় দাহয়ামাস পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ॥৩১

॥ মহাভারত, মুষল পর্ব ॥

অর্জুন বৃষ্ণি বংশের বন্ধু ও পরিজনবর্গকে নিয়ে সম্যক্‌ভাবে করলেন উদক ক্রিয়া। প্রেতকৃত্যও সম্পাদন করলেন কুলস্ত্রীদের নিয়ে। শুধু তাই নয়, রাম ও কৃষ্ণের শরীরাংশ খোঁজ করে আপ্তক্রিয়া বা দাহকার্য সম্পন্ন করলেন।

তবে কেন শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রে এমন প্রহেলিকা। যে কয়েকটি গ্রন্থে মৃত্যু-সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া গেছে, তাও এক রকমের নয়। কিন্তু তাঁর যেভাবে যেখানেই দেহত্যাগ হোক না কেন, সেই জড় পঞ্চভূতাত্মক মায়িক শরীরটা গেল কোথায়? এতবড় একজন মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গ ও উড়িষ্যাবাসীর অন্তরের অন্তরতম স্থলের প্রেমের ঠাকুর, তাঁর নরদেহটি হারিয়ে গেল কোথায়?

কই বুদ্ধ, মহাবীর, নানক, যীশু, হজরত মহম্মদ—এঁদের মৃত্যু নিয়ে ত এমন প্রহেলিকার সৃষ্টি হয়নি। এঁদের সকলকেই দাহ বা সমাধি দেওয়া হয়েছে। এঁদের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনার গল্প পল্লবিত হয়ে ভক্ত-হৃদয়কে আবেগাপ্লুত করেছে, কিন্তু মৃত্যু নিয়ে সৃষ্টি হয়নি কোন রহস্য, কোন অলৌকিক গল্প। তবে কেন সৃষ্টি হলো দারু-দেহের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের লীন হওয়ার কাহিনী!

ঐতিহাসিকের ধর্ম হলো ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যানুসন্ধান করা। তাই বলে কারো ধর্মে আঘাত হানতে আমি চাই না। যাঁরা চৈতন্য-দেহে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে আমি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন

মানুষ বলে প্রত্যাখ্যাত হবো হয়ত, কিন্তু ধর্ম বা ঈশ্বর বিশ্বাসে অলৌকিকতা নেই। শ্রীচৈতন্য নিজেও অলৌকিকতায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁকে কেউ 'ভগবান' বললে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। এসব প্রমাণ তাঁর জীবনেই বহুবার ঘটেছে। পাঠক চৈতন্য-জীবনী পাঠ করলেই একথা সত্য কিনা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আমার মধ্যে ধর্মবোধ কতখানি আছে জানি না, আমি কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, মহান বিপ্লবী, শুধু তাই নয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে ত্রিরত্ন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করে বাংলা তথা ভারতবর্ষে নবজাগরণের সূত্রপাত করেছিলেন, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন বলে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। এই ত্রিরত্নের অন্যতম দু'জন হলেন রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মার্ত রঘুনন্দন। এই দু'জনকে 'রাজা' উপাধি দেওয়া যায়। আর শ্রীচৈতন্যদেবকে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—"অল্পবয়সে সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শুষ্কপত্রের ন্যায় সেই শিক্ষা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্যঃ বিকশিত উৎকৃষ্ট মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব দেখাইয়াছিলেন। প্রথম দুইজনের সমকক্ষ আছে, কিন্তু তৃতীয় জন (শ্রীচৈতন্যদেব) তুলনারহিত, মানবজাতির তপস্যার ফলস্বরূপ।" —বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১৬৮।

আজ এই প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচশত বর্ষ পূর্তি উৎসবে তাই শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের আবরণ উন্মোচনকেই আমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য বলে মনে করে এই দুঃসাহসিক কর্মে ব্রতী হয়েছি। আজ থেকে বাইশ বছর পূর্বে আমি আমার 'বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস' রচনার সময় কবি বাসুদেব ঘোষ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলাম, কিন্তু এবারের তথ্যাদি এবং অনুসন্ধান সেই তুলনায় যেমন বিস্ময়কর, তেমনি চমকপ্রদ।

সুদীর্ঘ বাইশ বছর ধরে অধ্যয়ন, অনুসন্ধান এবং ভ্রমণ করে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাই আজ পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে চাই। আমার এই অনুসন্ধান এবং অধ্যয়ন যদি কোন ইতিহাসপ্রেমী পাঠককে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে জানতে উৎসাহী করে, তবেই মনে করব সকল শ্রম সার্থক।



॥ এক ॥

যে প্রশ্ন আজ আমার মনে জেগেছে, সেই একই প্রশ্ন আমার পূর্বে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গবেষকগণের মনেও উদয় হয়েছিল এবং তাঁরা গবেষণা করে তাঁদের গবেষণার ফলাফল তাঁদের স্বরচিত পুস্তকে প্রকাশ করেছেন।

উৎসাহী পাঠকবর্গ দীনেশবাবুর 'চৈতন্য এণ্ড হিজ এজ', ডঃ মজুমদারের 'চৈতন্য-চরিতের উপাদান' পড়লে অনেক তথ্য জানতে পারবেন। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মনে করতেন গৌরাঙ্গদেবের দেহ গুণ্ডিচা বাড়ীর কোথাও না কোথাও সমাধিস্থ আছে। ডঃ দীনেশবাবুরও ধারণা ছিল জগন্নাথের পাণ্ডাগণ তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। ডঃ নীহারবাবু নাকি প্রাণের ভয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের মৃত্যু রহস্যটি জেনেও উদ্ঘাটন করতে চাননি।

ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল উড়িষ্যায় বাস করছেন, নিজে উড়িয়া ভাষা শিখেছেন এবং বিভিন্ন উড়িয়া পুঁথি থেকে চৈতন্যসম্পর্কিত তথ্যাদি উদ্ধার করে তাঁর বই 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' (১ম খণ্ড) প্রকাশ করেছেন। বইটি উপন্যাসের কায়দায় উপন্যাসাকারে সুখপাঠ্য করে লিখেছেন। পড়তে খুব ভাল লাগে, ধরলে ছাড়া যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থটিতে তিনি শেষ কথা কিছু বলেননি। পাঠকবৃন্দকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়েছেন, যেখানে পাঠককুল সমস্যা আর ধাঁধায় নিজেরাই ধাঁধিয়ে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। এ যেন এক সাড়া জাগানো ডিটেকটিভ উপন্যাস। সূত্র অনেক পাওয়া গেল, কিন্তু শ্রীচৈতন্য হত্যার কোন আসামীকেই ধরা গেল না। তিনি অবশ্য বলেছেন, এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের আবরণ উন্মোচন করবেন।

'কাঁহা গেলে তোমা পাই' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩৮৫ সালে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়। তারপর দীর্ঘ সাত বছর অতিক্রান্ত হলো আজো ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। এবার পুরী গিয়ে জানলাম তাঁর মায়ের কাছে, অদূর ভবিষ্যতে বইটির ২য় খণ্ড প্রকাশিত হবে।

তবুও ডক্টর জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ জানাই এইজন্য যে, তিনি নিজে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। অন্যান্য পণ্ডিত গবেষকগণের মত গ্রন্থাগারে বসে কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর গবেষণার কাজ শেষ না করে 'ফিল্ড ওয়াক" করেছেন। এখানেই ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার কৃতিত্ব।

এই কৃতিত্বের সম্পূর্ণ ফলভাগী তিনি হতেন, যদি না বইটি উপন্যাসাকারে লিখতেন। বোধহয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সর্বশ্রেণীর পাঠককে চৈতন্য সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলবেন, তাই তিনি উপন্যাসের আশ্রয় নিয়েছেন। এতে অবশ্য ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভবান হওয়া যায় এবং তিনি লাভবানও হয়েছেন। কেন না, আমি নিজে উক্ত বইটি সংগ্রহ করতে গিয়ে যে কষ্ট ও অর্থব্যয় করে একটি ছেঁড়া পুস্তক সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে মনে হয় বইটি বিক্রি হয়েছে 'হট্ কেকে'র মত।

বইটি পড়তে গিয়ে আমি নিজেও কম বিপদে পড়িনি। উপন্যাসের নায়ক আনন্দ, বৈষ্ণবী মাধবীর কুঞ্জে শ্রীচৈতন্যের সমাধির সন্ধানে গিয়ে যে ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, জানি না কিভাবে ঐতিহাসিক নায়ক আনন্দ মুক্তি পাবেন, না, তিনিও হারিয়ে যাবেন তোটা গোপীনাথের মন্দিরে। তখন মাধবী বৈষ্ণবী বিরহে গেয়ে উঠবেন হয়ত—

কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি স্ফুরে।
মোর প্রভুরে হারালাম গোপীনাথের ঘরে॥

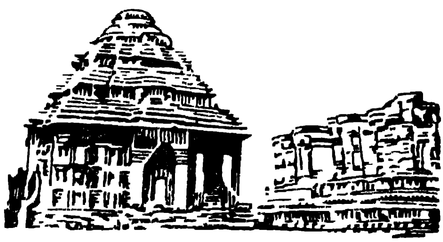
যাই হোক, আমার উদ্দেশ্য নয় আমার পূর্ববর্তী গবেষকগণের গবেষণার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে তাঁদের সিদ্ধান্তের উপর আমার সিদ্ধান্ত খাড়া করা। উৎসাহী পাঠকবর্গ ইচ্ছে করলে এই সব শ্রদ্ধেয় গবেষকগণের তথ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা-গ্রন্থ পাঠ করে নিজেদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারেন।

আমি কেবল আমার বক্তব্যের মাঝে মাঝে যেখানে প্রয়োজন হবে এঁদের মতামত ও উদ্ধৃতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করব। আমার অধ্যয়ন, অনুসন্ধিৎসা—যা আমাকে জানিয়েছে তাই আমার পাঠকবৃন্দের কাছে পরিবেশন করব।

তবে একথা সবিনয়ে জানিয়ে রাখি, আমার অনুসন্ধান আজো শেষ হয়নি। আমি নিজে এমন কতকগুলি তথ্য প্রাচীন পুঁথিপত্র অনুসন্ধান করে পেয়েছি, যেগুলি থেকে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের একটা কিনারা করা যায়। তারপরও অনেক গবেষণার বাকি থেকে যায়। সে ভার আমি আমার পরবর্তী গবেষকগণের হাতে অর্পণ করতে চাই। সে ভার যদি তাঁরা সানন্দে গ্রহণ করেন, তাহলে আমি আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করব।

পাঠকগণ নিশ্চয়ই ভাবছেন, পাঁচশত বৎসরের তমাদি মামলার রহস্য কি এত সহজে শেষ হবে। নেতাজীর শেষ জীবনের রহস্য সরকার নিজে এত কমিশন, এত অনুসন্ধান ও এত অর্থ ব্যয় করেও যদি না কোন কিনারা করতে পারেন—এই বিংশ শতাব্দীতেও ; তাহলে আমি কি করে এতদিন পরে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের আবরণ উন্মোচন করব ? একি এত সহজে সম্ভব।

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব হলেও অনুসন্ধানে বাধা কোথায় ? আসুন না পাঠকবৃন্দ আমার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে। আমরা সর্ব প্রথমে প্রাচীন পুঁথির পাতায় অনুসন্ধান করি। দেখি, কোন্ মহাজন শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান সম্পর্কে কোথায় কিভাবে কি কথা বলেছেন, পর্যালোচনা করে দেখি কোথায় কি তথ্য মিলে। তারপর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানসচেতন মন নিয়ে অগ্রসর হবো অনুসন্ধানে। দেখবেন, হয়ত আশার ক্ষীণ রশ্মি নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।



॥ দুই ॥



বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দী এক অভিনব যুগসন্ধির কাল। এই শতাব্দীকে অনেকে বাংলা সাহিত্যে 'চৈতন্য রেনেসাঁ'র কাল বলেও উল্লেখ করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, স্বর্গের দেবদেবীকে ছেড়ে বাংলা সাহিত্য মর্ত্যের মানুষের জয়গানে হয়ে উঠেছে মুখর। বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রেম, সৌন্দর্য ও আত্ম-অন্বেষণের আনন্দধামে যাত্রা করেছে এক অনাস্বাদিত দিব্যলোকে।

কোন রাজা-মহারাজার দিগ্বিজয় কাহিনী নয়, তেমন কাহিনী তো ইতিপূর্বে রাজভৃত্য কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত' কাব্যে লিখেছিলেন। এ যে সম্পূর্ণ নতুন অনাবিষ্কৃত পথে যাত্রা।

শ্রীচৈতন্যের জীবন চরিত। তিনি কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেননি। জন্মেছিলেন নবদ্বীপে দরিদ্র ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে শচীদেবীর গর্ভে। ভক্তির অমিয় ধারা একমাত্র তাঁর সম্বল, আর অস্ত্র বলতে দু'নয়নের অবিরল প্রেমাশ্রু ধারা।

এইটুকু মাত্র সম্বল করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবন-চরিত রচিত হয়েছে এক বিশেষ ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক পটভূমিকায়। তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে এ যেমন অভিনব, তেমনি বিষয় গৌরবেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

শ্রীচৈতন্য তাঁর জীবিত-কালেই অবতার বলে পূজিত হয়েছিলেন। সেবার পুরীতে রথযাত্রা উপলক্ষে অদ্বৈতাচার্য সহ এসেছেন শত শত ভক্ত। শ্রীচৈতন্যকে উদ্দেশ্য করেই অদ্বৈতাচার্য পদ রচনা করলেন। সমস্বরে ভক্তগণ মেতে উঠলেন কীর্তনানন্দে—

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর ॥

চৈ. ভা. অন্ত্য. ৮ অধ্যায়।

স্বয়ং 'নারায়ণ' বলে শ্রীচৈতন্যকে তাঁর সমক্ষেই বন্দনা করে উঠলেন ভক্তগণ। শুনে অবশ্য শ্রীচৈতন্য ব্যথিত হয়েছিলেন। শ্রীবাসকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন—

'এ তোমরা কি আরম্ভ করলে, পরিণামে এতে তোমাদের ও আমার সকলেরই সর্বনাশ হবে।'

তিনি এই ভেবেই ভয় পেয়েছিলেন—

শুভ্র বস্ত্রে মসী বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর ক্ষুদ্র ছিদ্র সর্বলোকে গায়॥

চৈ. চ. মধ্য. ১১ পরি।

সন্ন্যাসীর পথ অত্যন্ত বন্ধুর বিপদসঙ্কুল। সূক্ষ্মধার অস্ত্রের উপর দিয়ে হাঁটার মত। একটু পদচ্যুতি ঘটলেই সর্বনাশ। শুভ্র বস্ত্রে বিন্দুতম কালি পড়লে তা যেমন জ্বল্ জ্বল্ করে উঠে, তেমনি সন্ন্যাসীর সামান্যতম ত্রুটিও হয়ে উঠে গুরুতর। সেই সামান্য ভুলকেই মানুষ দেখে বৃহৎ করে।

কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই স্তবগানই এনেছিল সমৃদ্ধির জোয়ার। মঙ্গল-কাব্যের খাত পরিবর্তন করে সে সম্পূর্ণ নতুন খাত কেটে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছিল। সে খাতে প্রথমে হয়ত খানিকটা পূর্বের মঙ্গল ঘোলা জলই প্রবাহিত হয়েছিল কিন্তু ক্ষণপরে তাতে দেখা দিয়েছিল বিশুদ্ধ পবিত্র গঙ্গা জলেরই স্রোতধারা।

চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল সম্পূর্ণ নতুন সাহিত্য। সে হলো জীবনী-সাহিত্য। অবশ্য প্রথমে সব চৈতন্যজীবনই যে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল তা নয়। সংস্কৃতকেই আশ্রয় করে প্রথম লেখা হয়েছিল চৈতন্যজীবনী।

এই সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্যজীবনীর মধ্যে নাম করতে হয় মুরারি গুপ্তের। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'। মুরারি ছিলেন শ্রীহট্টের অধিবাসী। চৈতন্যদেবের সঙ্গে পণ্ডিত গঙ্গাদাসের টোলে একসঙ্গে অধ্যয়ন করতেন। চৈতন্যদেব অপেক্ষা মুরারি ছিলেন পঞ্চদশ বৎসরের বড়। প্রথম জীবনে কবি ছিলেন অধ্যাত্মবাদী। পরে তিনি চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হয়েছিলেন। পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন না করে সর্বাগ্রে শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলে মুরারি গুপ্তের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

বাল্য থেকে তিরোধান পর্যন্ত চৈতন্যজীবনের প্রায় সব ঘটনাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থটি চৈতন্যজীবনী বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে আদিতম এবং আকর গ্রন্থ। মুরারির গ্রন্থকে অবলম্বন করেই পরবর্তী চরিতকারগণ শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যলীলা লিখেছেন। এই গ্রন্থে চৈতন্য-তিরোধানের উল্লেখ থাকলেও কিভাবে কোথায় তাঁর তিরোধান হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নাই। চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে মুরারি গুপ্ত লিখেছেন—

তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠস্থো প্রসাধিতঃ।
জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহাদ্ধিমৎ॥ (প্রথম প্রক্রম)

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস লেখক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের আঠারো বৎসর পর্যন্ত বয়সের কাহিনীই লিপিবদ্ধ আছে। অবশিষ্ট ঘটনাবলী প্রক্ষিপ্ত।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন—

'আদিলীলার মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত্র।
সূত্ররূপে মুরারী গুপ্ত করিলা গ্রন্থিত।'

চৈ. চ. আদি. ১৩ অধ্যায়।

গ্রন্থটির রচনা কাল নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নানা বিতর্কের ঝড় উঠেছে। আমি সে সব বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না। আমার কথা হচেছ বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, একথা বিশ্বাসযোগ্যভাবে গ্রহণ করতে পারি, মুরারি মহাপ্রভুর অনুচব এবং তাঁর নবদ্বীপলীলার প্রধান সাক্ষী ছিলেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই জন্যই কবি কর্ণপুর, দামোদর পণ্ডিত, জয়ানন্দ, লোচন দাস, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ—এঁরা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার কথা লিখতে গিয়ে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন, এবং এই গ্রন্থ থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে চৈতন্যজীবনী রচনা করেছেন।

এর পর যিনি সংস্কৃতে চৈতন্যজীবনী রচনা করেছিলেন তার নাম কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন। তিনি মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে কবি ও নাট্যকাররূপে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত চৈতন্য-জীবনীর নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। ইহা নাটকাকারে রচিত। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই নাটকের রচনাকাল ১৫৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বলে মনে করেন। কিন্তু কবি কর্ণপুর নাটকের শেষে কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, তা' থেকে দু'টি সন পাওয়া যায়, ১৫৭২-৭৩ অথবা ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ।[১]

কবিকর্ণপুর পরমান্দ সেন 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ছাড়া 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামে একটি মহাকাব্যও রচনা করেছিলেন। এই মহাকাব্য ১৪৬৪ শকের আষাঢ় মাসে (১৫৪২ খ্রীঃ অঃ) কবি লেখা শেষ করেছিলেন। কাব্যটি নিতান্ত ছোট নয়। এই কাব্যে বিশটি সর্গ আর উনিশ শতেরও অধিক শ্লোক আছে।

কবিকর্ণপুরের এই দুটি গ্রন্থে অনেক আশা নিয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। কারণ, 'কবিকর্ণপুর' এই নামটি কবিকে প্রদান করেছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব নিজেই।

---

১ শকে চতুর্দশশতে রবিবাজিযুক্তে গৌরোহরিধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ। তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয় লীলাগ্রন্থোহয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥

কবি চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান পার্ষদ শিবানন্দ সেনের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। চৈতন্যদেব বাংলায় ফিরে এসে একবার কবির কাঁচড়াপাড়ার বাড়ীতে পদধূলিও দিয়েছিলেন। শিবানন্দ সেন প্রতি বৎসর বাংলার ভক্তগণকে সঙ্গে করে পুরীতে নিয়ে যেতেন চৈতন্যদর্শন করানোর জন্য। 'গৌরপারম্যবাদ' যাঁরা প্রচার করেন শিবানন্দ সেন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কবি গ্রন্থের মধ্যে নিজের পিতৃ-পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেনবংশপ্রদীপকং।
বন্দেঽহং পরয়া ভক্ত্যা পার্ষদগ্র্যং মহাপ্রভোঃ॥

অর্থাৎ যিনি মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি আমার পিতা, সেনবংশপ্রদীপ শ্রীশিবানন্দ সেনকে ভক্তিসহকারে বন্দনা করি।

শিবানন্দ সেনের সঙ্গে চৈতন্যজীবনের সম্পর্ক অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল বললে বোধ হয় অতিশয়োক্তি হবে না। কবির বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর তখন পিতা শিবানন্দের সঙ্গে এসেছিলেন পুরীধামে। মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে নাকি বালকের মুখ থেকে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারিত হয়েছিল। কিশোর কবির মুখ থেকে প্রথম উচ্চারিত সেই শ্লোকটি এখানে উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। কিশোর বালক মহাপ্রভুর পাদস্পর্শ মাত্রই বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে আরম্ভ করলেন—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥

এই শ্লোকের বাংলা তর্জমা করলে এমনি দাঁড়ায়—যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসী নারীদের কর্ণের কুবলয় অর্থাৎ পদ্ম, তাদের দুই চোখের কাজল, আর বক্ষের শ্রেষ্ঠ মণিদাম—অর্থাৎ সমস্ত ভূষণালংকৃত রূপ—জয় হোক তাঁর।

এমন সুন্দর কবিত্বময় শ্লোক শুনে মহাপ্রভু প্রীত হলেন। তখন তিনি বালক কবির কবিতায় ব্যবহৃত 'শ্রবসোঃ কুবলয়ম্' শব্দ দুটির অনুরূপ 'কবিকর্ণপুর' (অর্থাৎ কবিদের কর্ণের অলংকার তুল্য) উপাধিতে ভূষিত করলেন। সেই থেকেই পরমানন্দ 'কবিকর্ণপুর' নামে অধিক বিখ্যাত হলেন।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, অল্প বয়স থেকেই পরমানন্দ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন। শুধু তাই নয়, অল্প বয়সেই তিনি 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেছিলেন। এই কাব্যে তিনি নিজেকে 'শিশু' বলে উল্লেখ করেছেন। সম্পূর্ণ হতাশ হলাম, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও কোন ইঙ্গিতই পেলাম না, কেমন করে মহাপ্রভুর তিরোধান হয়েছিল।

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' রূপকনাটকের আদর্শে রচিত হলেও এই নাটক রচনার পিছনে যে

ইতিহাস আছে, তা শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের কাহিনী ব্যক্ত করার পক্ষে বিশেষ ক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল।

মহাপ্রভু উড়িষ্যায় তিরোধান করেছেন। মহাপ্রভুর শোকে গুণগ্রাহী ভক্তগণ ও রাজা প্রতাপরুদ্রদেব মুহ্যমান। চারিদিকে শোকের হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য। এই অসহনীয় শোক অপনোদনের জন্য তরুণ কবি পরিকল্পনা করলেন এই নাটকের। সঙ্গে সঙ্গে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলো এবং অভিনয়ও হলো সাফল্যের সঙ্গে।

এই হলো 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক রচনার পিছনের ইতিহাস। কিন্তু আশ্চর্য, কবি মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে কোন কথাই বললেন না। নাটকটি মোট দশটি অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম পাঁচ অঙ্কে পুরীধামে বনবাস পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে আর শেষ পাঁচটি অঙ্কে চৈতন্যদেবের শেষ কয়েক বছরের কাহিনী নাট্যাকারে পরিবেশিত হয়েছে। অথচ তিরোধানের কোন কাহিনীর উল্লেখ নাই। নাট্যকার কেমন যেন আশ্চর্যজনক-ভাবে বাকসংযম করে গিয়েছেন।

এর পর নাম করতে হয় প্রবোধানন্দ সরস্বতীর। তিনি কাশীবাসী হয়েও চৈতন্যদেবের পরমভক্ত ছিলেন। তিনি 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' নামে চৈতন্যমহিমার স্তবগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে ১৪৩টি শ্লোকে চৈতন্যভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই স্তবগুলির মধ্যে চৈতন্যতিরোধানের কোন ইঙ্গিত নাই। এই প্রবোধানন্দ চৈতন্যদেবকে 'পরমতত্ত্ব' বলে মনে করতেন এবং তিনিই প্রকাশ্যে চৈতন্যপূজার প্রচলন করেছিলেন।

এবার স্বরূপ দামোদরের প্রসঙ্গে আসা যাক। এই স্বরূপ-দামোদরের লিখিত পুস্তকের নাম 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা'। দুঃখের বিষয় এই 'কড়চা' আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। অথচ নানা গ্রন্থে এই পুস্তকের উল্লেখ ও প্রসঙ্গ আছে।

যতদূর জানা যায়, স্বরূপ-দামোদরের পূর্বনাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। বাড়ী ছিল নবদ্বীপ। কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠে জানা যায়, পুরুষোত্তম আচার্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'রসরূপতা' প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই 'স্বরূপ-দামোদর' নামে খ্যাত হন। 'রসরূপতা'র অর্থ হলো—কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হওয়া। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

> সন্ন্যাস করিলা শিখাসূত্র ত্যাগরূপ।
> যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ॥

—চৈ. চ. মধ্য। ১০ম. পরি.

সন্ন্যাস গ্রহণ করলে 'যোগপট্ট' ধারণ করতে হয়, অর্থাৎ জানুর ঊর্ধ্বে দৃঢ় করে বস্ত্র দ্বারা পিঠ এবং জানু বেড় দিয়ে ঘাড়ের কাছে বস্ত্রের দুই খুঁট বেঁধে রাখতে

হয়। এর নামই 'যোগপট্ট'। কিন্তু স্বরূপ তা করতেন না। তিনি ছিলেন স্বরূপে অর্থাৎ নিজের পূর্ব রূপেই—তাই তাঁর নাম হয়েছিল স্বরূপ দামোদর।

তিনি চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। পুরীধামে মহাপ্রভুকে প্রতি-নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। নৃত্যগীতে তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। প্রথম জীবনে স্বরূপ 'দণ্ডী' শাখাভুক্ত অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। পুরীধামে শ্রীচৈতন্যকে দেখে মুগ্ধ হন এবং মহাপ্রভুর সেবাব্রত গ্রহণ করেন। স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যপর্বে একান্ত ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন। ফলে অভিনব প্রেমধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথা তিনি যতখানি জানতেন, এত ভাল জানা আর কারো দ্বারা সম্ভব ছিল না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতের নানা স্থলে সশ্রদ্ধচিত্তে স্বরূপের কথা উল্লেখ করেছেন। এক স্থানে তিনি এই ভাবে লিখেছেন ঃ—

অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥
... ...
দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥

সংস্কৃতে লেখা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু স্বরূপ দামোদরের পুঁথির কোন খোঁজ আজো পাওয়া যায়নি। কবিরাজ কৃষ্ণদাস নিজেই তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্রে করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥

(চৈ. চ. আদি। ১৩ পরি.)

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের শেষ লীলার সেই সব সূত্র জানতে হলে 'স্বরূপ-দামোদরের কড়চা' সর্বাগ্রে আবিষ্কার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

স্বরূপ গোসাঞি ও রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার প্রধান সাক্ষী। সুতরাং এই দুজন ভক্ত মহাপ্রভুর নিগূঢ় লীলা সম্পর্কে যতখানি ওয়াকিবহাল ছিলেন, এত আর কেউ জানতেন না বা প্রত্যক্ষ করেননি। কৃষ্ণদাস বলেছেন—'স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।' অর্থাৎ স্বরূপ সংস্কৃত সূত্রাকারে যা লিখেছেন রঘুনাথ দাস সেই সূত্রের বৃত্তি বা ব্যাখ্যা রচনা করেছিলেন।

স্বরূপের কড়চার সন্ধান না পাওয়ার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন ও সাহিত্যের

যেমন অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, ঠিক তেমনি চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের অন্তরায় ও কম বাধার সৃষ্টি করেনি।

এ সম্পর্কে পাঠকদের দু' একটি কথা সাবধানে বলি—কলকাতা বটতলা থেকে সহজিয়া বৈষ্ণবপন্থার নিগূঢ় সাধনভজন সংক্রান্ত দু'একটি পুস্তক যা ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'স্বরূপ-দামোদরের কড়চা' নামে—সেগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন রচনা। কেউ যদি সেগুলিকেই আসল বই বলে মনে করেন, তা' হলে নিঃসন্দেহে প্রতারিত হবেন।

স্বরূপের এই গ্রন্থের ঠিক কি নাম ছিল তাও জানা যায়নি সঠিকভাবে। নানা তথ্যের খনি এই অমূল্য গ্রন্থখানি পরবর্তী যুগে কেন যে বিশেষ প্রচার লাভ করেনি; তারও সঠিক কোন কারণ জানা যায়নি।

কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে দেখছি কৃষ্ণদাস, স্বরূপের কাছে ঋণ স্বীকার করছেন সকৃতজ্ঞ চিত্তে—

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসার।
রামানন্দ-মিলন লীলা করিল প্রচার॥
চৈ. চ. মধ্য. ৮ম পরি.

অথচ কৃষ্ণদাস তার গ্রন্থের কোন স্থানে স্বরূপের কোন শ্লোক লিপিবদ্ধ করেননি। এর কোন যথার্থ কারণ বোঝা যাচ্ছে না। স্বরূপ শ্রীচৈতন্য শরীরকে রাধাকৃষ্ণের যুগলতনু রূপে এক অভিনব চৈতন্যতত্ত্বের পরিকল্পনা করেছিলেন। সে পরিকল্পনার রূপ কেমন ছিল স্বরূপের কড়চা অনাবিষ্কৃত থাকার জন্য তা আজ আর জানার কোন উপায় নাই।

সংস্কৃতে রচিত এই সব গ্রন্থের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কোন গ্রন্থেই শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান সম্পর্কে কোন তথ্যাদি পরিবেশিত হয় নাই।

এবার আসুন, আমরা খোঁজ করি বাংলা ভাষায় চৈতন্যদেবের যে জীবনকাহিনী-গুলি লেখা হয়েছে, তার কোথাও কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় কিনা—সেই অনুসন্ধানেই আত্মনিবেশ করি।

তিন ॥



বাংলা ভাষায় আদি চৈতন্যজীবনী লেখক হলেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যভাগবত'। এই গ্রন্থটি আদিতে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে প্রচারিত হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' লিখেছেন—

১। বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশ সর্ব্ব অমঙ্গল॥ (চৈ. চ. আদি. ৮ম. পরি.)

২। ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যমঙ্গলে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥ (চৈ. চ. আদি. ৮ম. পরি)

কবি কৃষ্ণদাসের এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় প্রথমে বৃন্দাবন দাস তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম রেখেছিলেন মঙ্গলকাব্য ধারার অনুকরণে 'চৈতন্যমঙ্গল'। অর্থাৎ তখন বাংলাদেশে যে সাহিত্যের জোয়ার প্রবল বেগে বয়ে চলেছিল, তাকে বর্তমান কালের পণ্ডিতগণ নাম দিয়েছেন 'মঙ্গলকাব্যের যুগ'। সেই ধারার শেষ সীমায় এসে পড়েছিলেন বৃন্দাবন দাস। তাই তিনি নামকরণ করেছিলেন মঙ্গলকাব্যের অনুকরণ করে। এই 'চৈতন্যমঙ্গল' সম্পর্কে বৈষ্ণবগ্রন্থ 'প্রেমবিলাস' বলেছেন সম্পূর্ণ অন্য কথা—

চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥ (প্রেমবিলাস)

প্রেমবিলাসের এই উক্তি থেকে মনে হয় তৎকালে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুমতি ছাড়া বঙ্গদেশে কোন গ্রন্থই প্রচারিত হোত না। অর্থাৎ বৈষ্ণব সাহিত্যের 'অ্যাপ্রুভ্যাল কমিটি'র 'হেড অফিস' ছিল বৃন্দাবন। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশে বৈষ্ণবদের তখন বড়ই দুর্দিন। আশঙ্কা এবং আতঙ্কের মধ্যে কাটছে তাঁদের দিন। বৈষ্ণব সমাজের সেই দুর্দিনের কথা কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাওয়া না গেলেও উড়িষ্যার তৎকালীন ইতিহাস আলোচনা করলে এই অনুমান যে অনেকাংশে সত্য, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই প্রসঙ্গে আসছি পরে।

ফিরে আসি চৈতন্যভাগবতের কথায়। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই গ্রন্থটি পাঠ করে দেখলেন, শ্রীচৈতন্যকে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক করে অঙ্কিত করেছেন কবি

বৃন্দাবন দাস। অর্থাৎ ভাগবতলীলার অনুসরণ করে কবি চৈতন্যলীলার পরিকল্পনা করেছেন। তাই বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ (বৈষ্ণবধর্মের হেড অথরিটি) চৈতন্যমঙ্গলের নাম পরিবর্তন করে নাম দিলেন 'চৈতন্যভাগবত'। 'প্রেমবিলাসের' উক্ত পদটি থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

চৈতন্যভাগবতের এই নামকরণ নিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে নানা মত প্রচলিত আছে। আমরা সে সব আলোচনায় গিয়ে মাথা গরম করতে চাই না। আমরা অনুসন্ধান করে দেখতে চাই, শ্রীচৈতন্যের আদি জীবনীকার তাঁর তিরোধান সম্পর্কে আমাদের জন্য কোন তথ্য রেখে গিয়েছেন কিনা।

তার আগে গ্রন্থটি কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল, তা আমাদের অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য জানা দরকার। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে যাঁদের সাধারণ জ্ঞান আছে, তাঁরা সহজেই অনুমান করতে পারেন কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্বে নিশ্চয়ই 'চৈতন্যভাগবত' লেখা হয় নাই। এই প্রমাণের সূত্র ধরে চৈতন্যভাগবতকে ১৫৫২ সালের পরবর্তী রচনা বলা যায়।

স্বয়ং কবি বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥

কবির এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় নিত্যানন্দের আদেশেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। আর সে গ্রন্থের সূত্রপাত তিনি করেছিলেন গুরু নিত্যানন্দের আদেশে। যখন সেই গ্রন্থ শেষ করেন তখন গুরুদেব জীবিত ছিলেন না। কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর তরুণ বয়সেই যে গ্রন্থটি লিখেছিলেন এ বিষয়ে আমরা অনেকটা নির্ভরযোগ্য-ভাবে বিশ্বাস করতে পারি। কেননা, গ্রন্থের বহু স্থলেই বৈষ্ণবসুলভ বিনয়ের অভাব দেখা গেছে। তিনি যেন কোন কোন বিষয়ে অবৈষ্ণবোচিত অবিনয় ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। যদি বার্ধক্যে এই বইটি লিখতেন, তাহলে ধৈর্য, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন।

অনুমানভিত্তিক এই প্রমাণ ইতিহাসের কষ্টি পাথরে যাচাই করার কোন উপায় থাক্ আর না থাক্; গ্রন্থটির অন্ত্যখণ্ডের বিষয়বস্তু নিয়ে নানা মতভেদ পণ্ডিত-সমাজে আজো চলছে। আমরা সেইসব পণ্ডিতী কচকচির মধ্যে না গিয়ে আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির বিষয়-সূচী নিয়ে দু'চারটি কথা উল্লেখ করে আলোচনা করতে চাই। তাতে দেখতে পাচ্ছি বিষয়-সূচী বর্ণিত কয়েকটি ব্যাপার শেষ পর্যন্ত অবর্ণিত রয়ে

গেছে। যে সব হাতে লেখা পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে রূপসনাতনের সঙ্গে মিলনের পরে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কথার পর নবম বা দশম অধ্যায়ে গ্রন্থটি শেষ হয়েছে।

অথচ বিষয়-সূচীতে দেখছি—

শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী॥
শেষ খণ্ডে পুন নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশি করিলেন হরিসংকীর্তন॥
শেষ খণ্ডে নিত্যানন্দ কতেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীর পর্যটন রস॥
অনন্ত চরিত্র কেবা বর্ণিবারে পারে।
চরণের নূপুর সর্ব মধুর বিহরে॥
শেষ খণ্ডে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
চৈতন্য আজ্ঞায় ভক্তে করিলেন দানে॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ মহামল্ল রায়।
বর্ণিক সব উদ্ধারিলা পরমন্ধ পায়॥
শেষ খণ্ডে গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টাবিংশতি বৎসর॥

আমার সংগ্রহশালায় সংগৃহীত এবং রক্ষিত চৈতন্যভাগবত থেকে অনুলিখিত। এই পুঁথি শকাব্দ সন ১২৪০ সালে শ্রীইন্দ্রনারায়ণ সামন্ত লিখিত। তারিখ ৩০ ফাল্গুন।

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় কবি যেভাবে গ্রন্থ-রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা শেষ করে যেতে পারেননি, না হলে গ্রন্থটি এরূপ আকস্মিক ভাবে শেষ হলো কেন?

এই কেন-র উত্তর দিতে গিয়ে বিভিন্ন গবেষক ভিন্ন ভিন্ন অনুমান করেছেন। সে সব আলোচনায় না গিয়ে আমরা অনুসন্ধান করি আসুন, এই গ্রন্থে চৈতন্যতিরোধান সম্পর্কে কোন তথ্য আছে কিনা।

কিছুকাল আগে চৈতন্যভাগবতের দু'খানি নতুন পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। দেনুড় শ্রীপাটের অধিকারী অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী এই দু'খানি পুঁথির অতিরিক্ত অধ্যায়গুলিকে 'চৈতন্যভাগবতের অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়' নাম দিয়ে ৪২৪ চৈতন্যাব্দে মুদ্রণ করে প্রকাশ

করেছেন। এই নতুন প্রকাশিত অতিরিক্ত অধ্যায় তিনটির শেষ চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান কাহিনী।

বৃন্দাবন ভ্রমণ শেষ করে রূপ-সনাতনকে বৃন্দাবনের অধিকারী করে প্রভু ফিরে এলেন নীলাচলে। সঙ্গে গদাধর পণ্ডিত। যে সব দেশের মধ্য দিয়া মহাপ্রভু হেঁটে হেঁটে চললেন, সর্বত্র অকাতরে বিলালেন হরিনাম। প্রেমে আর ভক্তিতে বিভোর হয়ে জনপদবাসী সকলে হরিগুণগানে মত্ত হলো। শ্রীচৈতন্যের হরিনাম প্রচারিত হলো দেশে দেশে।

নীলাচলে এসে একদিন নির্জনে পণ্ডিত গদাধরকে ডেকে বললেন মহাপ্রভু—

... ...

—আমার মানস পূর্ণ হৈল এতদিনে ॥
গৃহস্থ সন্ন্যাসী-দস্যু হিংসক যত জন।
কুলের বউহারী সুখী দুখী অকিঞ্চন ॥
সর্বজন হরিনাম বলে-শুনে-গায়।
—হরিনামে পরিণামে তরিব হেলায় ॥
—ইহা যদি বুঝিলেক সর্ব জীবগণ।
তবে আর মোর এথা নাহি প্রয়োজন ॥

—চৈ. ভা. পরিশিষ্ট, ১৪ অধ্যায়।

এইবার আমার অখণ্ড অবসর। মহাসুখে আমি দর্শন করব জগৎপ্রভু শ্রীজগন্নাথকে। এই বলে মহাপ্রভু হুঙ্কার করে প্রেমে উন্মত্ত হলেন। হারালেন বাহ্য জ্ঞান। সকলে হায় হায় করে উঠলো। একি হলো মহাপ্রভুর। কিছুক্ষণ পরে বাহ্য পেয়ে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর—

গদাধরে বোলে প্রভু—শুন গদাধর ॥
আমি আগে যাই তুমি আসিহ পশ্চাতে।
এত বলি শ্রীদেউলে প্রবেশ কৈল নাথে ॥
পরিছা বোলে—কোথা যাহ বলহ সন্ন্যাসী।
প্রভু কহে—জগন্নাথ পরশিয়া আসি ॥
রহ রহ—বোলে সভে বেত্র লয় করে।
নিষেধ না শুনি প্রভু চলিলা ভিতরে ॥
জগন্নাথ পরশিয়া হৈলা অন্তর্ধান।
দেখিতে না পায় প্রভু গেলা নিজ স্থান ॥
সর্বলোকে বোলে—ভাই! ন্যাসী নহে এই।

অনুমানে জানিলঙ চৈতন্য-গোসাঞী ॥
কেহ বোলে—সন্ন্যাসী হৈল অন্তর্ধান।
নিশ্চয় জানিল সভে প্রভু ভগবান ॥
এইরূপে গৌরচন্দ্র হৈল অন্তর্ধান।

পরিছা, অর্থাৎ জগন্নাথের প্রধান সেবকের বাধা অগ্রাহ্য করে ঢুকে পড়লেন মন্দিরে মহাপ্রভু। 'রহ রহ' বলে বেত নিয়ে ছুটে এলো সবে। প্রভু কোন নিষেধ শুনলেন না। বললেন—জগন্নাথকে স্পর্শ করেই ফিরে আসব।

তারপর, দারুময় জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করেই অন্তর্ধান করলেন শ্রীচৈতন্য। পণ্ডিত গদাধর উঠলেন হাহাকার করে। প্রভুর বিরহজ্বালা সইতে পারলেন না তিনি। প্রভুর বিরহে উন্মত্ত হয়ে—

আচম্বিতে গদাধর হৈল অন্তর্ধান।
না পায় দেখিতে কেহ বোলে—রাম রাম।
এই মতে মহাপ্রভু গদাধর লৈয়া।
নিজ স্থানে গেল প্রভু অন্তর্ধান হৈয়া ॥

চৈতন্যভাগবতের চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান কাহিনীর শেষ এখানেই নয়। তারপরও আছে।

বিস্ময়াভিভুত সকলে। তাই ত, এমন ঘটনা কি কখনো সম্ভব। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মিলিয়ে গেলেন দারুময় জগন্নাথের অঙ্গে। এ কি সত্যি, না চোখের ধাঁধা!

কবি বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

এথা সে যখন প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।
ন্যাসী রূপে গেলা মদনগোপালের স্থান ॥
অধিকারী সকল দেখিল তানে যাইতে।
পুনঃ কোথা গেল প্রভু না পারে লখিতে ॥
সেই দিন বৈশাখ পূর্ণিমা ত্রয়োদশী।
পাঠাইলা মনুষ্য পত্র লিখি সভে বসি।
আসি উত্তরিলা লোক নীলাচল স্থানে।
প্রভুর বিজয় জিজ্ঞাসিলা জনে জনে ॥
সভে বলে—মহাপ্রভু হৈলা অন্তর্ধান।
প্রবেশ করিলা মাত্র জগন্নাথ স্থান ॥

তান সঙ্গে ছিলা গদাধর মহাশয় ।
আচম্বিতে অন্তর্ধান হৈলা নিশ্চয় ॥

না, না, জগন্নাথে মিলিয়ে যাননি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। অধিকারীগণ দেখেছেন, জটাজুটাবলম্বিত সন্ন্যাসীর বেশে কে একজন চলে যাচ্ছেন মদনগোপাল মন্দিরের দিকে। সকলে দেখেছেন তাঁকে চলে যেতে। কিন্তু তারপর প্রভু যে কোথায় গেলেন —তা আর লক্ষ্য করা গেল না অর্থাৎ দেখা গেল না বা অদৃশ্য হলেন।

অধিকারীগণ এই আশ্চর্য অন্তর্ধান-বার্তা চারিদিকে জানালেন লোক মারফৎ পত্র পাঠিয়ে। সেদিনটা হলো বৈশাখী পূর্ণিমা, ত্রয়োদশী। বার্তা শুনে চারিদিক থেকে ছুটে এলেন নীলাচলে বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ। তাঁরা এসে খোঁজ-খবর করতে লাগলেন। প্রভু কোথায় গেলেন? জগন্নাথে লীন হওয়া—এ যে অবিশ্বাস্য ঘটনা। তাই কি কোন মতে সম্ভব।

অসম্ভব হলেও সকলে বললে একই কথা। জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করামাত্রই মহাপ্রভু অন্তর্ধান করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিল পণ্ডিত গদাধর। আচম্বিতে তিনিও অন্তর্ধান করেছেন।

তারপর মোহান্ত ভক্তগণ আর কিছুই করতে পারলেন না। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। পুরীতে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব যাঁর শিষ্য, রায় রামানন্দ যাঁকে সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখতেন, কেউই তাঁরা মহাপ্রভুর কোন ভাণ্ডারার ব্যবস্থাই করলেন না। যেন মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র নীলাচলের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা নিয়ে সকলেই—

আসি উত্তরিলা তারা শ্রীবৃন্দাবন ॥
নিশ্চয় বিজয় প্রভু কৈলা গৌরহরি ।
শুনি রূপ-সনাতন মূর্ছা হই পড়ি ॥
যথা যথা ছিল ভক্ত দাস অনুরক্ত ।
প্রভুর বিজয় সভাকারে হৈল ব্যক্ত ॥

—চৈ. ভা. পরি. ১৪ অধ্যায়।

বৃন্দাবন দাসের এই কাহিনীটুকু মনে রেখে আসুন লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' খুলে দেখি। এ-বিষয় লোচনদাস কোন আলোকপাত করেছেন কিনা।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন 'চৈতন্যভাগবত' আর 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রায় একই সময়ে রচিত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞগণ অর্থাৎ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র রায় ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—এঁরা স্থির করেছেন, লোচন দাসের কাব্য ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, ১৫৫০—৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে রচিত হয়েছিল।

চৈতন্যমঙ্গল চারটি খণ্ডে বিভক্ত—সূত্রখণ্ড, আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড ও শেষ খণ্ড। সমস্ত কাব্যটিতে প্রায় এগার হাজার ছত্র আছে। চৈতন্যমঙ্গল মূলতঃ গান করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে চৈতন্যজীবন-কথা প্রচারই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি নানাভাবে কাব্যটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন।

যাই হোক, চৈতন্যমঙ্গলের শেষ খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথে লীন হওয়ার কাহিনীটি পরিবেশিত হয়েছে। লোচন দাস ছিলেন চৈতন্য-পার্ষদ নরহরি ঠাকুরের শিষ্য। নরহরি ছিলেন 'গৌরনাগর' ভাবের প্রবক্তা। লোচন দাস গুরুর কাছ থেকে এই গৌরনাগর ভাবের সাধনভজনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এখানে বিস্তৃতভাবে আমাদের আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। লোচন দাস চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে কি বলেছেন আমরা সেই প্রসঙ্গেই আসি।

পুরীতে কাশী মিশ্রের ঘরে পরিষদবর্গ সহ শ্রীগৌরাঙ্গ অবস্থান করছিলেন। লোচন দাস বলেছেন—

হেনকালে মহাপ্রভু কাশী মিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে॥ চৈ. ম.

সে হলো ১৪৫৫ শকাব্দ। আষাঢ় মাস। নবদ্বীপের ভক্তগণ এসেছেন নীলাচলে। প্রভুকে বেষ্টন করে বসে আছেন সকলে। প্রভুর মনের অবস্থা ভাল নয়। ভাবে তন্ময় যেন তিনি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বৃন্দাবনের কথা বলতে বলতে কেমন যেন নীরব হয়ে গেলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এবার লোচন দাসের কথাতেই বলি—

নিশ্বাস ছাড়িয়া যে চলিল মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু।
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজ জন যত তেমনি চলিল।
সত্বরে মন্দির ভিতর উত্তরিল॥

ভক্তগণ নীরবে পিছনে পিছনে চললেন। এমন কিন্তু কখনো হতো না। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রভু যেতেন না। যাই হোক, ভক্তগণ চিন্তিত অন্তরে প্রভুকে অনুসরণ করে চলেছেন ধীরে ধীরে। মন্দির চত্বরে গিয়ে—লোচন দাস বলছেন —

নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥

প্রভু তখন প্রবেশ করলেন মন্দির মধ্যে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই—

তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট॥
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট।
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥

প্রভু জগন্নাথের কাছে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে নিবেদন করে বললেন—'সত্য ত্রেতা দ্বাপর শেষ হয়েছে। এখন কলি যুগ। এই যুগে সংকীর্তনই একমাত্র ধর্ম। তুমি কৃপা করে জীবকে তোমার কোলে আশ্রয় দাও। আমি শরণ নিচ্ছি তোমার শ্রীপাদপদ্মে।'

এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎ রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

বাইরে ভক্তবৃন্দ আকুল আগ্রহে দণ্ডায়মান। অত বড় কপাট, সে ত আপনা-আপনি বন্ধ হতে পারে না। একজন মানুষের পক্ষে বন্ধ করা সহজসাধ্যও নয়। তাহলে কি করে এই অসম্ভব সম্ভব হলো! যদি বা কোন অলৌকিক প্রভাবে তা সম্ভব হয়। তাহলে ভিতরে প্রভু এতক্ষণ কী-ই বা করছেন। এমন সময় মন্দির অভ্যন্তরে শোনা গেল গণ্ডগোল। ভক্তগণ বুঝতে পারলেন, ভিতরে কি একটা সর্বনাশ হচ্ছে।

এমন সময় 'কি কি' বলে গুঞ্জাবাড়ীর একজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডা অন্য দরজা দিয়ে ঢুকে গেলেন মন্দিরে। তাঁকে দেখে ভক্তগণ ব্যাকুল হয়ে বললেন—'ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥' ভক্তদের এই আকুল আবেদনে পড়িছা অর্থাৎ মন্দিরের প্রধান সেবক মূল দরজা না খুলে বেরিয়ে এসে—

ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন॥

(চৈ. ম. অতুল গোস্বামী সম্পাদিত। পৃঃ ১৯১)

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন অন্যভাবে। তিনি এই দুটো লাইন—

বিপ্রে দেখি ভক্তে শুন হে পড়িছা।
ঘুচাও কপাট, প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা ॥

উদ্ধার করে তারপর বলছেন—"উপবে যে 'বিপ্রে দেখি' কথা আছে, উহার অর্থ যে, বিপ্রকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন এমন নয়, কারণ, বিপ্র মন্দিরের মধ্যে। ইহার অর্থ এই যে, বিপ্রের চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া ভক্তগণ বলিলেন,—'পড়িছা ঠাকুব, শীঘ্র দ্বার উন্মোচন কর, প্রভুকে দেখিব।'

তখন পড়িছা দ্বার খুলিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

ভক্ত আর্তি দেখি কহে পড়িছা তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভু হৈলা অদর্শন ॥
সাক্ষাতে দেখিনু গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন ॥

(শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৪৭)

যাই হোক, পড়িছার মুখে এই কথা শুনে ভক্তগণ—

... ... করে হাহাকার।
শ্রীমুখ চন্দ্রিকা প্রভুর না দেখিব আর ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর দত্ত যে মুকুন্দ।
গৌরিদাস বাসু দত্ত আর শ্রীগোবিন্দ ॥
কাশী মিশ্র সনাতন আর হরিদাস।
উৎকলের সভে কাঁদি ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে।
পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে ॥
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য অনুজ সহায়।
প্রভু প্রভু বলি ডাকে শুন গৌররায ॥
অনেক রোদন কৈল সব ভক্তগণ।
ইহা বা লিখিব কত অধম লোচন ॥

(চৈ. ম. অতুল গোস্বামী সম্পা, পৃঃ ১৯৭)

এই হলো লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলের' চৈতন্য-তিরোধানের বা জগন্নাথে লীন হওয়ার কাহিনী। এই অলৌকিক কাহিনীর কথা সকলেই কমবেশী জানেন এবং ভগবত-বিশ্বাসী ভক্তগণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

এবার জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর কথায় আসি। এই কাব্য সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা প্রকাশিত হয় ১৩০৪-০৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়। তার পূর্বে এই গ্রন্থের নাম প্রায় কেউই জানতেন না। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের পরিচয় দেন। পরে কালিদাস নাথ ও নগেন বাবুর সম্পাদনায় ১৩১২ সালে সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার পরে পণ্ডিত, গবেষক ও মোহান্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে নানা তর্কবিতর্ক, আলোচনা ও বিশ্লেষণের ঝড় বয়ে গেছে। এত সব সত্ত্বেও গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য নিতান্ত কম নয়। চৈতন্য সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে অনেক নতুন কথা এই পুস্তক থেকে জানা যায়। তাই পুস্তক প্রকাশের পর এই গ্রন্থের প্রতি ঐতিহাসিক, গবেষক—সকলেরই আগ্রহ দেখা গেছে।

'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে জয়ানন্দের যেটুকু আত্ম-পরিচয় পাওয়া যায়, তা হলো কবি বর্ধমানের নিকট আমাইপুরা গ্রামে বন্দ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৩৬২) গ্রন্থটির পাদটিকায় আছে—এখন এই গ্রাম নাই। বর্ধমানের সাতগেছে থানার অন্তর্গত বাড়োয়া গ্রামের কাছে আমাইপুরা গ্রাম ছিল। যাই হোক, কবির পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতা রোদনী। পিতা চৈতন্যভক্ত হলেও খুড়া-জ্যেঠারা তা ছিলেন না। জয়ানন্দের কথামত চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বাঙলায় ফেরার পথে বর্ধমানের আমাইপুরা গ্রামে সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তখন জয়ানন্দ শিশু মাত্র। বয়স এক বছরের বেশী হবে না। কারণ, তাঁর মা তাঁকে কোলে করে চৈতন্যের জন্য রান্না করছিলেন। জয়ানন্দের শৈশবের নাম ছিল 'গুইয়া'। শ্রীচৈতন্য এই অভব্য গ্রাম্য নাম বদলিয়ে 'জয়ানন্দ' নাম রাখেন।

ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ, চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বাঙলায় ফেরার পথে পানিহাটি পর্যন্ত নৌকাযোগে এসেছিলেন। এবং কুমারহট্ট থেকে গৌড়ে, তারপর গৌড় থেকে পানিহাটি বরাহনগর পর্যন্ত স্থলপথে।

খুব সম্ভবত গৌড় থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সময় মহাপ্রভু সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, কবি তাঁর শৈশবের শোনা কথা কিছুটা হেরফের করে ফেলেছেন, এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সম্ভবত কবি গদাধরের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন।

চৈতন্যদেব আনুমানিক ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচল থেকে গৌড়ে এসেছিলেন। তখন যদি জয়ানন্দের বয়স এক বছর হয়, তাহলে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'

রচনা কালে কবির বয়স অন্ততঃ কম করে ৩৪।৩৫ বছর হবে। এরও ১০/১১ বছর পরে কবি যদি তাঁর কাব্য রচনা করেন বলে অনুমান করা যায়, তাহলে সে অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ২য় খণ্ড ৩৯৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন—"১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করিয়া থাকিবেন।' এ বিষয়ে নগেন বাবুর অভিমত হলো—অদ্বৈত আচার্যের অপ্রকট হইবার পর অর্থাৎ ১৪৮০ শকের পরে এবং ১৪৯২ শকের পূর্বে কবি জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রচার করিয়াছিলেন।'

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ৯টি খণ্ডে বিভক্ত। এ কাব্যটিও জয়ানন্দ লিখেছিলেন জনসাধারণের জন্য। তাই কাব্যটি আসরে গান গেয়ে শোনান হ'তো। কাব্যে কবি নানা-রাগিণীর উল্লেখ করেছেন। কবি তাঁর কাব্য ৯টি খণ্ডে কি ভাবে বিভক্ত করেছিলেন তা এমনি ভাবে গীত ছন্দে বলেছেন—

প্রথমে ত আদি খণ্ড যুগ ধর্ম কর্ম।
দ্বিতীয়ে নদীয়া খণ্ড গৌরাঙ্গের জন্ম॥
তৃতীয়ে বৈরাগ্য খণ্ড ছাড়ি গৃহবাস।
চতুর্থে সন্ন্যাস খণ্ড প্রভুর সন্ন্যাস॥
পঞ্চমে উৎকল খণ্ড গেল নীলাচল।
ষষ্ঠে প্রকাশ খণ্ড প্রকাশ উজ্জ্বল॥
সপ্তমে ত তীর্থ খণ্ডে নানা তীর্থ করি।
অষ্টমে বিজয় খণ্ড গেলা বৈকুণ্ঠপুরী॥
নবমে উত্তর খণ্ডে গীত সাঙ্গোপাঙ্গ।
যুগাবতার যত করিলা গৌরাঙ্গ॥

চৈতন্যমঙ্গলের অষ্টম খণ্ডে কবি জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা অলৌকিকতায় সমাচ্ছন্ন নয়। জয়ানন্দ অনেক অনৈতিহাসিক ও অলৌকিক ঘটনা পরিবেশন করেছেন বটে, কিন্তু চৈতন্য-তিরোধানকে অলৌকিকতার খপ্পর থেকে মুক্ত রেখেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব যত বড় ভগবানই হোন না কেন, তিনি মানুষ রূপেই এসেছিলেন মানুষের সংসারে। তাঁর পঞ্চভুতাত্মক দেহকে তিনি জগন্নাথের দারুময় দেহে লীন করাননি। ইষ্টকাঘাতে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাই কবি ব্যক্ত করেছেন।

জয়ানন্দ লিখেছেন—

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে ॥
অদ্বৈত চলিল গৌড় দেশে।
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে ॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পরিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে ॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে ॥
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা ॥
নানা বর্ণে দিব্য মালা আইল কোথা হইতে।
কথো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে ॥
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ।
গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহন ॥
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।

আষাঢ় মাস রথের সময়। কীর্তনানন্দে রথাগ্রে নেচে নেচে যাচ্ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। বাম পায়ে বাজল ইঁটের টুকরো। আহত হলেন তিনি। নিভৃতে অদ্বৈতকে ডেকে বললেন, কি কাজ করবেন অদ্বৈত গৌড়ে ফিরে। তারপর পারিষদবর্গ সহ নরেন্দ্র সরোবরে মহানন্দে করলেন জলক্রীড়া। এর পর ষষ্ঠী তিথিতে বাড়ল পায়ের যন্ত্রণা। আশ্রয় নিলেন টোটা গোপীনাথের মন্দিরে। গদাধর সেবায় নিযুক্ত। বললেন মহাপ্রভু গদাধরকে, কাল সপ্তমী তিথিতে রাত্রি দশ দণ্ডের সময় আমি নিত্যধামে যাত্রা করব। পরদিন সত্য সত্যই সপ্তমী তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব পঞ্চভূতাত্মক দেহ পরিত্যাগ করে জম্বুদ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেন স্বর্গে। মায়া-শরীর অর্থাৎ মৃতদেহটি পড়ে রইল মর্ত্যধামে। বাস্তবসম্মত স্বাভাবিক এ বর্ণনা।

এবার কৃষ্ণদাস গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতের কথায় আসি। বাংলা দেশের পরম সৌভাগ্য, মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত একজন দার্শনিক কবির আবির্ভাব হয়েছিল। একাধারে পাণ্ডিত্য, মনীষা, দার্শনিক, ভূয়োদর্শন, রসশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি প্রভৃতির সমন্বয় আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে। তাঁর পূর্বে অন্ততঃ তিনখানি বাংলা চৈতন্যজীবনী রচিত হয়েছিল। সংস্কৃতে কাব্য ও নাটক মিলিয়ে আরো

তিনখানি ত ছিলই। কৃষ্ণদাস এসব প্রচলিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি না করে কিভাবে নতুন ধারায় চৈতন্য-জীবনাদর্শ অঙ্কিত করা যায়, তারই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন নিতান্ত বার্ধক্যে এসে। ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়, যে বয়সে মানুষ পরকালের চিন্তায় প্রতি মুহূর্ত গুণতে থাকে, সেই বয়সে তিনি এই দুরূহ কাজে কি করে আত্মনিয়োগ করলেন। সত্যই দুঃসাহসিক তাঁর এ যাত্রা।

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটে নৈহাটী। তার নিকটেই ঝামাটপুর গ্রাম। কবির বাস ছিল এখানেই। তাঁর পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল বলা চলে। বাড়ীতে গৃহদেবী ছিলেন শ্রীমূর্তি। এই গৃহদেবীর পূজক ছিলেন গুণার্ণব মিশ্র। মাঝে মাঝে বাড়ীতে নামসঙ্কীর্তন হতো। এই সময় বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দ বিরোধী একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। গুণার্ণব মিশ্র ছিল এই গোষ্ঠীর একজন। কৃষ্ণদাস কিন্তু চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ উভয়েরই পরম ভক্ত ছিলেন। রামদাস কৃষ্ণদাসের ছোট ভাই। এই ছোটভাই রামদাস একদা নিত্যানন্দের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলে তাকে ভর্ৎসনা করলেন। সেই দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে বলছেন সান্ত্বনা দিয়ে—

অরে অরে কৃষ্ণদাস না কর তুমি ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব লভ্য হয়॥

—চৈ. চ.

এই স্বপ্নাদেশের পরেই কবি বৃন্দাবন-যাত্রা করেন। বৃন্দাবনে এসে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি গোস্বামীদের সাহচর্যে আসেন। এঁদের উপদেশেই বৈষ্ণব শাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। আজীবন তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁর প্রচুর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও হৃদয়টি ছিল শিশুর মত সরল ও নিরভিমান। এক কথায় তিনি ছিলেন আদর্শ বৈষ্ণব।

এই কাব্যটি কবে রচিত হয়েছিল তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। মুদ্রিত চৈতন্যচরিতামৃত পুস্তকে পুস্তক-সমাপ্তিসূচক একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। এই শ্লোকে সুকৌশলে শকাব্দের উল্লেখ আছে। এই শ্লোকটি সব পুঁথিতে পাওয়া যায় না। তবুও কৌতূহলী পাঠকদের জন্য শ্লোকটি সংগ্রহ করে উল্লেখ করছি—

শাকে সিন্ধ্যগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেহহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

এই শ্লোক থেকে ১৫৩৭ শক, তথা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবার দিন বৃন্দাবনে চৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থ শেষ হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে এ মত

সকল পণ্ডিত মেনে নিতে পারেন নি। আমরা সে সব বিতর্কে না গিয়ে আমাদের আসল তথ্যের অনুসন্ধান করি আসুন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছে আমাদের অনেক আশা। কেননা, শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ কয় বছরের জীবনকথা জানবার তার যে সুযোগ ছিল, এমন আর কারো ভাগ্যে হয়নি। রঘুনাথ দাস চৈতন্যের অবস্থিতিকালে নীলাচলে বাস করতেন। তিনি স্বচক্ষে অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। রঘুনাথ দাসের গুরু ছিলেন স্বরূপ দামোদর। এই গুরুর কাছে রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের পূর্ব-তথ্য অনেক জেনেছিলেন। আর কৃষ্ণদাস রঘুনাথের কাছ থেকে সে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া কৃষ্ণদাসের ছিল খাঁটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর ছিল তথ্য-নিষ্ঠা প্রবল। তিনি যখনই শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য পরিবেশন করতে গেছেন, তখনি প্রমাণ দেখাতে ভুল করেন নি। তাই একাধারে এই কাব্যটিকে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যের অপরূপ সমন্বয় বলা যায়।

কৃষ্ণদাস নিজেই বলছেন—

নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ।
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥

(আদি লীলা)

শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলা জানার উৎকণ্ঠা যে শুধু আমাদের হয়েছে তাই নয়, তৎকালে অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজের সময়েও বৃন্দাবনবাসীগণ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন।

কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনবাসীদের সেই উৎকণ্ঠা মোচনের জন্য অভিলাষী ছিলেন। তাই তিনি চৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডের ১৩ পরিচ্ছেদে এসে বলছেন—

প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥

(পৃঃ ৫৭, বসুমতী)

আদিলীলার কাহিনী বলেছেন সূত্রাকারে মুরারি গুপ্ত। আর শেষ লীলার সূত্র করি লিখেছেন স্বরূপ-দামোদর। তাইত কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥

স্বরূপ-দামোদরের সেই বিখ্যাত গ্রন্থ যে আজো আবিষ্কৃত হয়নি, সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। তাই স্বরূপ কি লিখেছিলেন, আজো জানা যায় নি। কিন্তু কৃষ্ণদাস কি তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে কিছু লিখেছিলেন। দেখছি মঙ্গলাচরণে তিনি বলছেন—

শেষ লীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ
ইহাঁ বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ু শেষ বিস্তারিব লীলা শেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥

(মধ্যলীলা, ২য় পরি, পৃঃ ৯১, বসুঃ)

কৃষ্ণদাস দেখছি আমাদের ক্রমাগত আশান্বিত করে তুলছেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের বার্ধক্যের কথা স্মরণ করে সন্দিগ্ধ মনে বলছেন—

আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এই অন্ত্যলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ ধন।

(মধ্যলীলা, ২য় পরি পৃঃ ৯১, বসু)

জরাজীর্ণ বার্ধক্যগ্রস্ত কবি কি অদ্ভুত অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সঙ্গে লিখে চলেছেন অতি নিপুণতার সঙ্গে। বড় আশা মহাপ্রভুর তিরোধানরহস্য তাঁর লেখা থেকেই হয়ত আবিষ্কৃত হবে।

কিন্তু সে আশা তিনি বৃন্দাবনবাসীদের পূরণ করতে পারেননি। অতএব আমরাও তাঁর এই অমূল্য গ্রন্থ থেকে চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে আশাহত হয়ে ফিরতে গিয়ে দেখছি মহাপ্রভু ঝাঁপ দিচ্ছেন বৃন্দাবন লীলা আস্বাদন করতে করতে পুরীর নীল লবণাম্বু নীরে। আসুন অনুসন্ধান করি।

শরতের জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনী। পার্ষদগণ সঙ্গে নীলাচলে মহাপ্রভু। কৃষ্ণ-বিরহে রাত্রি-দিন বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয় তাঁর। বিরহিনী শ্রীরাধিকার যেন জীবন্ত প্রতিচ্ছবি তিনি। ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত। ভাবাবেশে প্রলাপ বকছেন। চেতন-অচেতন

অবস্থায় কাটছে দিন রাত্রি। কখনো প্রেমাবেশে করছেন নর্তন-কীর্তন। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কথা মনে পড়ছে তাঁর। ইতিউতি ভাবোন্মাদ অবস্থায় দেখছেন—ঐ বুঝি আসছেন শ্রীকৃষ্ণ। ভাবে বিভোর শ্রীচৈতন্য মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমে পড়ছেন লুটিয়ে। ক্ষণপরেই মূর্চ্ছা ভঙ্গে পড়ছেন রাসলীলার শ্লোক। অর্থ করতে করতে হর্ষ-বিষাদে দু'নয়নে ঝরে পড়ছে প্রেমাশ্রু।

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তাহার পাইবেক অন্ত ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ ॥

—চৈ. চ. অন্ত্য. ১৮ পরি

কৃষ্ণপ্রেমের সে আস্বাদনের কথা লিখে কেমন করে বুঝাব। স্বরূপাদি পার্ষদগণ বুঝেন তার স্বরূপ। জীব হয়ে কেমনে বর্ণনা করি। রসের রসিক নাগর ছাড়া কে বুঝবে তার তত্ত্ব।

সহসা চৈতন্য পড়লেন জলকেলির এক শ্লোক। মদমত্ত হস্তী যেমন করিণীগণকে সঙ্গে করে জলক্রীড়া করে, ভগবান সেইরূপ গোপিকাবৃন্দের শ্রমবিন্দুরণের জন্য অবগাহন করলেন যমুনা সলিলে। গোপিকাগণের কুচকুংকুম রঞ্জিত কুসুমমালায় কতিপয় ভ্রমর উপবিষ্ট ছিল, তারাও ধাবিত হলো পিছনে পিছনে। গুন্ গুন্ করে মধুর সঙ্গীতে গান করতে করতে বুঝিবা গন্ধর্বরাজের মত অনুসরণ করল।

পার্ষদগণ সঙ্গে ভ্রমণ করতে করতে মহাপ্রভু এলেন আইটোটাতে। মানস নয়নে দেখলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনী, সমুদ্র বালুকাবেলা—আজ সবই তাঁর কাছে একাকার। ভাবে তন্ময় তিনি।

আইটোটা থেকে দাঁড়িয়ে আচম্বিতে দেখলেন তিনি চন্দ্রকান্তের চন্দ্রিমায় উথলে উঠছে সাগরতরঙ্গ। যেন নীল যমুনার জল ঝলমল করছে। সমুদ্রকে যমুনা বলে ভ্রম হলো তাঁর। অলক্ষিতে ঝাঁপ দিলেন সিন্ধু সলিলে। অমনি মূর্চ্ছা গেলেন তিনি। জানতে পারলেন না কিছুই।

ঢেউ-এর তালে তালে কখন ডুবছেন আর কখনো ভাসছেন। যেন শুকনো কাঠকে তরঙ্গে ডুবায় উঠায়, ঠিক সেই ভাবে ভেসে চললেন মহাপ্রভু। ঢেউ-এর তালে তালে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোনার্কের দিকে। তিনি অন্তরে উপলব্ধি করছেন, যেন যমুনাতেই গোপিগণের সঙ্গে জলকেলি করছেন।

এদিকে স্বরূপাদি ভক্তগণ চমকে উঠলেন। তাই ত, প্রভু কোথায় গেলেন, কই

কোথাও ত দেখা যাচ্ছে না! সহসা তিনি এই জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রিতে কোথায় গেলেন! কই, কোন কিছুই দেখা ত যাচ্ছে না! সংশয়াকুল হয়ে উঠলো সকলে।

তা হলে কি জগন্নাথদেব দর্শনের জন্য মন্দিরের দিকে গেলেন। কিংবা উন্মত্ত হয়ে কোন উদ্যানে প্রবেশ করলেন। হয়ত বা গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে গিয়েছেন। না হয় নরেন্দ্র সরোবরে। তাই ত, প্রভু অদৃশ্য হলেন কেমন করে? পথভ্রমে কোনার্কের দিকে যাননি ত!

স্বরূপ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ডাকাডাকি করলেন সকলকে। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল চারদিকে। এক দল চললো সমুদ্রের তীর ধরে বালুবেলায় হাঁটতে হাঁটতে। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। ভালর চেয়ে মন্দটাই ভাবল সকলে। বন্ধুগণের হৃদয়ে অনিষ্ট আশঙ্কাই প্রবল হয়। সেই আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয়ে সমুদ্রের ধারে এসে সকলে যুক্তি করল, কয়েকজন গেল চিরায়ু পর্বতের দিকে। আর স্বরূপ কয়েকজনকে নিয়ে চললেন পুরীসার দিকে। সমুদ্রের ধারে ধারে তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে অন্বেষণ করতে লাগলেন প্রভুকে। বিষাদে বিহ্বল সকলে। ভালবাসার টানে এখানে ওখানে খোঁজ করছেন সবাই। সহসা—

দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কাঁদে নাচে গায় বলে হরি হরি॥ —চৈ. চ. অন্ত. ১৮ পরি.

জেলের এমন অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন স্বরূপ। তাই ত, জেলে এমন উন্মত্তের মত 'হরি হরি' বলে নাচছে কাঁদছে কেন! জেলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

কহ জালিয়া এই দিকে দেখিলে একজন।
তোমার এই দশা কেন কহত কারণ॥ —চৈ. চ. অন্ত্য ১৮ পরি.

জেলে বললে—'জাল ফেলছিলাম সমুদ্রে। জাল টানতে টানতে বড্ড ভারী মনে হল। ভাবলাম, বুঝি বড় মাছ পড়েছে। তাই ধীরে ধীরে যত্ন করে টানলাম। জাল উঠাতেই দেখি, ওমা, মাছ কোথায়! এ যে একজন মৃত মনুষ্য এসেছি। মৃত জন দেখে বড্ড ভয় পেলাম। জাল খসাতে গিয়ে তার মৃত অঙ্গ স্পর্শ লাগল আমার দেহে।' কি বলব—

স্পর্শ মাত্র সেই ভুত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী মোর উঠিল সকল।
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভুত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্র মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥

জেলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আরো বললে—কি বিরাট শরীর তার। দৈর্ঘ্যে পাঁচ-সাত হাত। এক একটা হাত পা তার তিন তিন হাত লম্বা। অস্থিসন্ধি সব ছুটে গেছে। গায়ের চর্ম নড়বড়ে। দেখলে ধড়ে কি প্রাণ থাকে গোসাঞি ? মড়া রূপ তার, কিন্তু উত্তান তার দু-নয়ন। কখন গোঁ গোঁ করছে। আবার কখন কোন শব্দই নাই। পড়ে আছে অচেতন হয়ে।

গোঁসাঞি আমার কি হবে। আমার যে স্ত্রী-পুত্র ঘরে আছে। তাদের খাওয়াবে কে ? তাই ত আমি ওঝা ঠাঁই যাইছি গো। আমার ত এমন কখন হয়নি। একা কত রাত-বিরেতে সমুদ্রে মাছ ধরি নির্জনে। প্রভু নৃসিংহের দয়ায় কই আমার ত কখনো কিছুই হয়নি। কিন্তু আমার আজ একি হলো।

এই ভূত নৃসিংহ নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতেই ভয় লাগে মনে॥

দোহাই, তোমরা ওদিকে কেউ যেও না। গেলেই সেই ভূতে ধরবে।

জেলের কথা শুনে স্বরূপ বললে অত্যন্ত মিষ্ট করে—

'ভয় কি গো জেলে, আমিই ত বড় ওঝা। ও ভূত তোমার নামিয়ে দেব। এই দেখ।' বলে মন্ত্র পড়ে স্বরূপ জেলের মাথে দিলে হাত। তারপর তিনটে চাপড় মারলে গায়ে। মুখে বললে—এবার তোমার ভূত ছেড়ে গেছে। দেখ, তুমি ভাল হয়ে গেছ।'

কি আশ্চর্য, জেলে নিজেকে কিছুটা সুস্থির বোধ করলে। ভয় যেন অনেকটা কেটে গেছে মনে হলো। তখন স্বরূপ বললে—দেখ, যাঁকে তুমি ভূত মনে করেছ, তিনি ভূত নন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান। প্রেমাবেশে তিনি সমুদ্রের জলে পড়েছিলেন। তাঁকেই তুমি উঠিয়েছ জালে। তার স্পর্শে তাই ত তোমার এই কৃষ্ণ-প্রেমোদয়। তাঁকে কোথায় উঠিয়েছ, চল দেখি আমাদের দেখিয়ে দেবে।

জালিয়া কহে প্রভুকে দেখিয়াছি বার বার।
তেঁহো নহে এই অতি বিকৃত আকার॥

স্বরূপ বললেন—হয়, হয়। প্রেমের বিকার হলে এমনিই হয়। অস্থি সন্ধি সব ছেড়ে যায়। দেখায় অতি দীর্ঘাকৃতি।

জেলে স্বরূপ গোসাঞি-এর কথা শুনে অতি আনন্দিত হয়ে ওদের নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিল মহাপ্রভুকে।

পার্ষদ সহ স্বরূপ দেখলেন—অতি দীর্ঘকায় প্রভু পড়ে আছেন ভূমিতে। জলে সিক্ত শুভ্র অঙ্গে বালুকারাজি সংলিপ্ত। শিথিল তনু-চর্মরাজি। অতনুর তুলে

নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই সিক্ত কৌপীন উন্মোচন করে পরিয়ে দিলেন শুষ্ক কৌপীন গায়ের বহির্বাস পেতে শ্রীঅঙ্গের বালু ঝেড়ে তার উপরে শুইয়ে দিলেন মহাপ্রভুকে।

তারপর উচ্চৈস্বরে আরম্ভ করলেন সংকীর্তন। তবু কোন স্পন্দন নাই প্রভুর দেহে। তখন কানের কাছে গিয়ে আরো জোরে আরম্ভ করলেন কৃষ্ণনাম। কতক্ষণ চললো এমনি ভাবে। নাম করতে করতে কানের ভিতর দিয়ে বুঝি মরমে প্রবেশ করল।

না, না, প্রভুর তিরোধান ঘটেনি। নামের গুণে প্রভু হুঙ্কার ছেড়ে সহসা উঠে বসলেন। উঠতেই অস্থি-চর্ম সব জোড়া লেগে গেল। এখনো পুরো জ্ঞান ফেরেনি, আচ্ছন্নের মত চাইছেন ইতিউতি। কবিরাজ গোস্বামী বলছেন—

তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল।
অন্তর্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য আর॥
অন্তর্দশায় ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥
অর্দ্ধবাহ্য কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আভাসে কহেন সব শুনে ভক্তগণে॥ —চৈ. চ. অন্ত্য. ১৮ পরি.

এই অর্ধবাহ্য অবস্থায় প্রভু প্রলাপ বচনে বললেন—কালিন্দী দেখে আমি বৃন্দাবনে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, ব্রজেন্দ্রনন্দন জলক্রীড়া করছেন শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে নিয়ে। যমুনার জলে মহারঙ্গে সে কি অপূর্ব কেলি। আমি যমুনা পুলিনে দাঁড়িয়ে দেখছি এই অপূর্ব দৃশ্য। মরি মরি তা বর্ণনে না যায়।

স্বরূপ বললেন—অর্ধবাহ্য অবস্থায় যমুনা ভ্রমে প্রভু আপনি সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আমরা আপনায় কত না খুঁজছি। জেলেই আপনাকে জালে উঠিয়েছে কূলে।

মোটামুটি এই হলো মহাপ্রভুর সমুদ্র পতনের কাহিনী। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে এই কাহিনী-ই ব্যক্ত করেছেন। অতএব যাঁরা মনে করেন সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেছিলেন, তা সত্য নয়।

বাংলায় রচিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন কাহিনীগুলি থেকে আমরা মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে তাহলে কি সূত্র পেলাম ঃ

বৃন্দাবন দাসের মতে শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথের দারুময় দেহেই লীন হয়ে গিয়েছেন। কোন্ দিন কোন্ সময় তার কোন উল্লেখ নাই।

লোচন দাসেরও ঐ একই মত। তবে তিনি বলেছেন—জগন্নাথ মন্দিরে নয়, ঘটনাটি ঘটেছে গুণ্ডিচাবাটীতে। মন্দির থেকে রথযাত্রার সময় বেরিয়ে যেখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন সেই মন্দিরেই। দিনটা ছিল রবিবার, বেলা তখন তৃতীয় প্রহর।

জয়ানন্দ বলছেন—আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় রথাগ্রে নাচতে গিয়ে ইঁটের টুকরো বেধে ষষ্ঠীর দিন পায়ে বড় ব্যথা হয়। তোটা গোপীনাথের মন্দিরে মৃত্যু হয়েছিল তার। বারের উল্লেখ নাই। তিথিটা তবে সপ্তমী। রাত্রি দশ দণ্ডের সময়, লোচনের মতে বেলা তৃতীয় প্রহর নয়।

আর কবিরাজ কৃষ্ণদাস ত আমাদের কোন তথ্যই পরিবেশন করেননি মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে। তিনি বলবেন বলেও শেষ পর্যন্ত বলেননি। সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হয়নি তাঁর।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আরো দু'টি চৈতন্যজীবনীর কথা পাচ্ছি। একটি হলো পরমানন্দ গুপ্তের 'গৌরাঙ্গবিজয়' ও অপরটি হলো গোপাল বসুর 'চৈতন্যমঙ্গল'। দু'টি কাব্যই পাঁচালী আকারে লিখিত। দুঃখের বিষয় এই দু'টি কাব্য আজো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই কাব্য দু'টিতে চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে কোন তথ্য আছে কিনা জানা যায় নি।

শেষে আরো দু'টি বাংলা চৈতন্যজীবনীর উল্লেখ মাত্র করি। একটি 'গোবিন্দ-দাসের কড়চা' ও আর একটি চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'। গোবিন্দদাসের কড়চাকে আধুনিক গবেষকগণ নাকচ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন এই 'কড়চা' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন : "যুক্তিতর্কের উপরে বিশ্বাসকে স্থান না দিলে গোবিন্দদাসের কড়চাকে খাঁটি বলা অসম্ভব।…সুতরাং বর্তমান কালের বিচারক যদি সরল বিশ্বাসকে সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ না করিয়া সম্পাদক-প্রকাশক জয়গোপাল গোস্বামীকে গোবিন্দদাসের কড়চার উদ্ভাবক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তবে ন্যায়সঙ্গতই হইবে।"—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ।

গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা নিয়ে আলোচনার স্থান এ নয়। আমার বক্তব্য, এই কাব্যে যেহেতু চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে কোন তথ্য নাই, সেহেতু আমাদের কাছে এই কাব্যের সত্যাসত্য নিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ডঃ সুকুমার সেনের সম্পাদনায় চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত এর একটি মাত্র খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর দ্বারা মনে হয় কাব্যটি জনসমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। গৌরাঙ্গবিজয়ে অনেক নতুন কথা আছে; কিন্তু 'চৈতন্য-তিরোধান' সম্পর্কে

উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য নেই। তাই এ দু'টি কাব্যের নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হোলাম।

বাংলা জীবনী কাব্য ছাড়া আর একটি বৈষ্ণব গ্রন্থে চৈতন্য তিরোধান সম্পর্কে সামান্য কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। সেটি হলো নরহরি চক্রবর্তীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকর'। সম্ভবত ১৮ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নরহরি তাঁর গ্রন্থ 'ভক্তি রত্নাকর' রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে বর্ণিত চৈতন্য বিজয় সম্পর্কে যে তথ্য আছে তা পরে আলোচিত হবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা সম্বরণ সম্পর্কে সম্প্রতি আরো একটি বাংলা বইয়ের সন্ধান পেয়েছি। সেটি হলো মহামুনি ভাগুরির উক্তি। নাম 'প্রভাসখণ্ড' শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত। প্রকাশক অক্ষয় লাইব্রেরী। এই গ্রন্থের কাহিনী নিয়ে ভবতোষ দত্ত মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাসম্বরণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তা থেকে জানা যায়, পুরীতে একটি নিম্ব বৃক্ষের তলায় নাকি প্রভু নিত্যানন্দের কোলে শ্রীচৈতন্যদেব দেহত্যাগ করেছিলেন। তিনিই দাহ করেছিলেন অগ্নিকর্তা হয়ে। সে কাহিনী এই পুস্তকের শেষাংশে সংযুক্ত হয়েছে।

বাংলা চৈতন্য-জীবনী-সংক্রান্ত পুস্তক থেকে চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কিত যে সব তথ্য মিলে তার উল্লেখ করলাম। এবার আমরা ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যে কোন 'চৈতন্য-জীবনী' রচিত হয়েছিল কিনা তাই নিয়ে আলোচনা করব। আর এই সব চৈতন্য-জীবনীতে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান সম্পর্কে কোন তথ্যাদি মিলে কিনা; তাই অনুসন্ধানে সচেষ্ট হব।

।। চার ।।



দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে। শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য চরিত্র উড়িষ্যাবাসীদের আকৃষ্ট করেছিল সহজেই। ফলে বহু উড়িষ্যাবাসী ভক্ত ও সজ্জন ব্যক্তি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম প্রচারের ফলেই উড়িয়া এবং বাঙালীদের মধ্যে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা ঘুচে গিয়েছিল।

সব থেকে বড় কথা, চৈতন্যদেবের পূর্বে উড়িষ্যায় রাধাকৃষ্ণাশ্রয়ী বৈষ্ণব ভক্তি-ধর্মের প্রচার ছিল। বড় প্রমাণ রায় রামানন্দ। চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বেই রায় রামানন্দ সাধ্যসাধনতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও সখীসাধনার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। রায় রামানন্দের সখীসাধনার ধারা বাঙালীদের অধিকতর প্রভাবান্বিত করেছিল। উড়িষ্যার পঞ্চসখা বলতে জগন্নাথদাস, বলরামদাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্ত দাসকেই বোঝায়। এঁদের সঙ্গে ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। যদিও এঁরা সকলে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, তাহলেও শ্রীচৈতন্যকে শ্রদ্ধা করতেন মনেপ্রাণে। তাঁদের লেখার মধ্যে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।

এই সময়ে উড়িয়া ভাষাতেও কয়েকটি চৈতন্যজীবনী রচিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে মাধবের 'চৈতন্যবিলাস'। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এটি সম্ভবত লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ওড়িয়া ভাষান্তর। ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্যভাগবত', দিবাকরদাসের 'জগন্নাথচরিতামৃত'। এটি পুরোপুরি চৈতন্যজীবনী নয়। প্রথম সাত অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের বর্ণনা আছে। এরপর দেখা যাচ্ছে গোবিন্দদেবের 'গৌরকৃষ্ণোদয়-কাব্যম্' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলিতে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল লীলার বর্ণনাই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। ওড়িয়া ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার বিশেষ কিছু জানতেন বলে মনে হয় না।

উড়িষ্যাতে এ পর্যন্ত যতগুলি চৈতন্যজীবনী আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে 'চৈতন্য-চকড়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মূল্যবান পুঁথিটি আবিষ্কার করেছেন উড়িষ্যার বিখ্যাত গবেষক পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা। তিনি উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার শিকুলা গ্রামের শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাণ্ডার গৃহ থেকে এটি পান।

এর পর কবি অচ্যুতানন্দের নাম করতে হয়। তাঁর রচিত পুস্তকের নাম 'শূন্য-সংহিতা'। অচ্যুতানন্দের পরবর্তীকালের কবি দিবাকর দাস। দিবাকর দাসের পর যাঁর নাম পাচ্ছি, তিনি হলেন ঈশ্বর দাস। শেষোক্ত দু'জনের সন্ধান দিয়েছেন ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে।

আর একটি উড়িয়া গ্রন্থের সন্ধান পাচ্ছি শ্রীবৈষ্ণবচরণের 'চৈতন্যভাগবত'। এটি কটক থেকে ছাপা হয়েছে। প্রকাশক—ধর্মগ্রন্থ স্টোর, আমিনা বাজার, কটক-২-কবি সম্বলপুরের অধিবাসী।

কবি অচ্যুতানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। তিনি ও তাঁর পরবর্তী কবি দিবাকর দাস—এ দু'জনই বলেছেন মহাপ্রভু জগবন্ধুর শ্রীমূর্তিতেই লীন হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের মত লোচনদাসেরই মতানুগামী।

অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতায়' দেখছি—

কলারে কলা মিশিলা নোহিলা
সে বারি।

অর্থাৎ জগন্নাথের কালো অঙ্গে কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্য মিশে গেলেন, তার আর চিহ্ন পর্যন্তও রইল না কোথাও।

কবি দিবাকরও অচ্যুতানন্দের তালে তাল মিলিয়ে বলছেন ঃ

এমন্ত ভাবি শ্রীচৈতন্য।
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন॥ (জগন্নাথ চরিত্র পৃ. ২৪৭)

কিন্তু নবাবিষ্কৃত 'চৈতন্যচকড়া'র কবি জোর দিয়ে বলছেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি শ্রীচৈতন্যের শেষ অবস্থা কি হলো। তিনি বলছেন ঃ

এমন্ত প্রভু যে অন্তলীলা বাণী।
কহিলে বৈষ্ণবদাস প্রত্যক্ষ যাহা জানি॥

এই প্রত্যক্ষ তিনি কি জানতেন? না, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথে লীন হয়ে যান নি। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আদেশে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনি মায়িক শরীর ত্যাগ করেছিলেন। বৈষ্ণবদাস বলেছেন—

বুড়ো লেংকা[১] যাই বালি নবরে প্রবেশিল।
রাজা আজ্ঞা ছামুয়ে একথা নিবেদিল॥
আজ্ঞা দিলে বিলোপিনো রাজা শ্রীঅঙ্গকু।
সমাধি করলি সর্বে নাম রতন ঘোষি॥

১। মন্দিরে যত প্রকার সেবক আছেন তাঁদের যথা সময়ে সেবাকার্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য যিনি আহ্বান জানান।

এই অংশের বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় ঃ বুড়া লেংকা শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর সংবাদ বালিসাই এর রাজপ্রাসাদে রাজার কাছে গিয়ে নিবেদন করল। তখন শোকে রাজা বিলাপ করতে করতে আদেশ দিলেন প্রভুর শ্রীঅঙ্গকে নামসংকীর্তন করতে করতে যেন সমাধিস্থ করা হয়।

কি ভাবে কোথায় মহাপ্রভুর মৃত্যু হলো এবং রাজা কোথায় বা তাঁর মর-দেহ সমাধি দিতে বললেন এসবের কোন উল্লেখই নাই। তবে বৈষ্ণবদাস আর একটি চাঞ্চল্যকর খবর দিয়েছেন। তা হলো ঃ

রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয়[১] যখন হল।
তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে।
কান্দিল বৈষ্ণবগণ কুহাতো কুহাড়ে॥

বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় চন্দন বিজয়েন পর রাত্রি দশ দণ্ডের সময় গরুড় স্তম্ভের পিছনে মহাপ্রভুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। তাই দেখে চৈতন্য-পারিষদবর্গ বুক চাপড়ে হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। ভাবতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। না জানি কি নিদারুণ পৈশাচিক ভাবে প্রভুকে হত্যা করে রাত্রি দশ দণ্ডের সময় গরুড় স্তম্ভের পিছনে ফেলে দিয়েছিল। বৈষ্ণবদাস তারপর বলেছেন প্রভুর মৃত্যু হয়েছিল বটে জগন্নাথ মন্দিরে, কিন্তু পরে তাঁর মৃতদেহকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তোটায় অর্থাৎ তোটা গোপীনাথের মন্দিরে।

তিথিটা লোচন দাস আর জয়ানন্দের মতে ছিল সপ্তমী। বৈষ্ণবদাসের মতে পূর্ণিমা। লোচন দাসের কথা আর একবার স্মরণ করুন। তিনি লিখেছেন ঃ

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

এদিকে জয়ানন্দ আর বৈষ্ণবদাস-দুজনেই বলেছেন রাত্রি দশদণ্ডের কথা। অর্থাৎ তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। জয়ানন্দের সেই দুটি লাইন আবার স্মরণ করুন ঃ

পণ্ডিত গোঁসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥

লেখকগণের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় রবিবার বেলা চারটা থেকে রাত্রি ১১টার মধ্যে কোন এক সময় কোন আততায়ী কর্তৃক তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। দেহে ইটালের

১। চন্দন বিজয়—জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপন অনুষ্ঠান। রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আঘাত ছাড়া আর কোন ক্ষতের চিহ্ন দেখা যায়নি। তবে তোটা গোপীনাথের মন্দিরে তাঁর দেহ আনা হয়েছিল, একথা বাঙালী এবং উড়িয়া কবিগণ উভয়েই বলেছেন।

মৃত্যু-স্থান নিয়ে দেখা যাচ্ছে, দুজনের মধ্যে মতান্তর আছে। লোচন দাস বলছেন গুণ্ডিচাবাটীতে জগন্নাথের দারুময় অঙ্গে লীন হয়ে গিয়েছিলেন মহাপ্রভু। এদিকে বৈষ্ণব দাস বলছেন জগন্নাথ মন্দিরে তার দেহাবসান হয়েছিল। পরে মৃত দেহকে তোটায় নিয়ে যাওয়া হয়।

কথা কয়টা একবার ভেবে দেখা দরকার। কি ভীষণ কাণ্ডটা ঘটেছিল সেদিন, সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রাণকেন্দ্র জগন্নাথ মন্দিরের বড় দেউলের অভ্যন্তরে। ঠিক আজ থেকে সাড়ে চারশ বছর আগে। বিকেল চারটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত জগন্নাথ মন্দিরের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে রাখা হল। এমন কাণ্ড বোধ হয় মন্দিরের জীবনে ঘটেনি কোনদিন। এত দীর্ঘ সময় জগন্নাথ দর্শন-প্রার্থীদের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হল না।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর 'চৈতন্য এণ্ড হিজ এজ' গ্রন্থে : লোচনের কথাই যদি ঠিক হবে অর্থাৎ মহাপ্রভুর দেহ যদি জগন্নাথের দারুময় অঙ্গে লীন হয়েই যায়; তাহলে মন্দির দ্বার-রক্ষক মন্দির দ্বার খুলে রাখল না কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি নিজেই বলছেন : The answer is a simple one. The Priests would not like to show him dying of fever as an ordinary man. They buried him somewhere under the floor of the temple and would not allow any outsider to enter it until them place was thoroughly repaired and no trace left after his burial.

ডঃ সেনের এই উত্তর একটু পর্যালোচনা করে দেখা একান্ত প্রয়োজন। ডঃ সেন জয়ানন্দের বর্ণনাকে বোধ হয় সত্যি ধরে নিয়েছিলেন। দীনেশ বাবু মনে করেছেন জ্বর অবস্থায় মহাভাবগ্রস্ত হয়ে তিনি মন্দিরে গিয়েছিলেন। এরূপ চিন্তা করা কতখানি বাস্তব সম্মত, তা একবার ভেবে দেখা দরকার। প্রতি বছর রথের সময় গৌড় থেকে নীলাচলে আসতেন শত শত ভক্ত। সেবারেও এসেছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি বহু ভক্ত ও শিষ্য। আর মহাপ্রভুর লীলাসহচর রূপে পুরীতে তখন ছিলেন স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ পণ্ডিত, রঘুনাথ দাস, শংকর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সেবকগণ।

যদি জ্বর অবস্থায় চৈতন্যদেব মন্দিরে যেতেন তাহলে এইসব অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ তাঁকে সহজে যেতে দিতেন না। লোচনের বিবৃতি অনুযায়ী তাঁরা পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু এত দ্রুত গিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন যে ভক্তগণ

পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন, আর মন্দিরে ঢোকা মাত্রই কপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দারু মূর্তিতে লীন হওয়ার দৃশ্যটি বাইরে থেকে কেউই দেখতে পাননি। এই যে কপাট বন্ধ হওয়ার কথাটি—তাও ভেবে দেখা উচিত। মূল দেউলের কপাট এত বৃহৎ যে, সে কপাটকে ঝপ্ করে বন্ধ করা সহজ সাধ্য নয়। আমি নিজে দেখেছি, দু'টি কপাট-ঝালকে ঠেলে বন্ধ করতে তিন, তিন-ছ'জন পাণ্ডার প্রয়োজন হয়। অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে যদি স্বীকার করে নিই তাও সম্ভব। তাহলেও প্রশ্ন উঠে বৈষ্ণব দাস তাঁর 'চৈতন্য চকড়া'য় বলেছেন, কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন। অর্থাৎ তাহলে মনে করতে হয় তখন পর্যন্ত তিনি সুস্থ। এরপর 'চৈতন্য-চকড়া'র বিবৃতি হলো সেই সুস্থ কীর্তন-নর্তন-মত্ত মহাভাবগ্রস্থ মহাপ্রভুকে গরুড় স্তম্ভের পেছনে পড়ে থাকতে দেখা গেল মৃত অবস্থায়।

ব্যাপারটি বড় গোলমেলে ঠেকছে নাকি? লীন হয়ে গেলেন মহাপ্রভু জগন্নাথ মূর্তিতে। লোচন বলছেন, কপাট খুলে পড়িছা আকুল ভক্তদের বললেন—তিনি দেখেছেন মহাপ্রভু লীন হয়ে গিয়েছেন জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে। আবার মৃতদেহ দেখা গেল গরুড় স্তম্ভের পিছনে। তারপরের ঘটনা সেই মৃতদেহকে নিয়ে যাওয়া হলো তোটা গোপীনাথের মন্দিরে।

এসব প্রশ্ন আপনাদের মনে দানা বাঁধতে থাকুক। আমি সেই ফাঁকে আরো দু'-একটি উড়িয়া চৈতন্যচরিতামৃতের পাতায় মনোনিবেশ করি।

ওড়িয়া কবি অচ্যুতানন্দ তাঁর "শূন্য সংহিতায়" চৈতন্য তিরোধান সম্পর্কে বলছেন ঃ

এমন্তে কেতেহে দিন বহি গেলা শুনি মা অপূর্ব রস।
প্রতাপরুদ্র রাজন বিজে কলে কলারাত্রটর পাশ ॥
এমন্ত সময়ে গৌরাঙ্গচন্দ্রমা বেরা প্রদক্ষিণ করি।
দেউলে পশিলে সখাগণ সঙ্গে দণ্ড কমণ্ডুল ধরি ॥
মহাপ্রতাপদেব রাজা খেনিন পাত্র-মন্ত্রী মান সঙ্গে।
হরি ধ্বনিরে দেউল উদুলই শ্রীমুখ দর্শন রঙ্গে ॥
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎপ্রায় মিশি গলে ॥

(শূন্যসংহিতা, প্রথম অধ্যায়)

অচ্যুতানন্দ বিশেষ কোন নতুন তথ্য পরিবেশন করেন নি। লোচন, বৃন্দাবন, দিবাকর দাসের মত তিনিও বলছেন শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। এদৃশ্য পার্ষদগণ সহ মহারাজ প্রতাপরুদ্রও দেখেছিলেন। পাত্র-মিত্র সখাপার্ষদগণ সঙ্গে করে মহাপ্রভু মন্দির বেষ্টন করে কীর্তন করতে করতে প্রবেশ করলেন মন্দিরে।

তারপর জগবন্ধুর শ্রীমুখ দর্শন করে হরিধ্বনি সহকারে মহানৃত্যে মত্ত হয়ে 'রাধা রাধা' ধ্বনি করে বিদ্যুৎ চমকের মত মিশে গেলেন জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে।

এই বর্ণনা থেকে বুঝতে কোন কষ্ট হচ্ছে না জগন্নাথে লীন হওয়ার ঘটনাটি ভক্তদের অলক্ষ্যে ঘটেনি। প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই ছিলেন। এমনকি মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবও দেখেছেন।

একটা আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করে দেখুন, জগন্নাথে লীন হওয়ার কাহিনীটি বলছেন অনেকেই। কিন্তু বিভিন্ন জনের বিবৃতি বিভিন্ন ধরণের। কারো সঙ্গে কারো ঘটনার মিল দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন জন কেন ভিন্ন ভিন্ন কথা বলছেন?

দিবাকর দাসের নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তারও অভিমত চৈতন্যদেব জগন্নাথে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লেখা থেকেই কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি। তিনি লিখেছেন:

এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন।
গোপন হইলে স্বদেহে দেখি হাহাকার দৃষ্টি মোহে॥
না দেখি চৈতন্য রূপ সর্বমনরে দুখ তাপ।
রাজা হইলে মনে ছন্ন হে প্রভু হেলে অন্তর্ধান।
পূর্বে যহিরু আসিথিলে লেউটি তহিঁ প্রবেশিলে॥

দেখছি দিবাকর দাস 'গোপন' আর 'অন্তর্ধান' এ দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন 'লীন' কথাটির সঙ্গে সঙ্গে। তা না হলে তিনিও বলেছেন শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথের অঙ্গেই লীন হয়ে গিয়েছেন।

এবার কবি ঈশ্বর দাসের প্রসঙ্গে আসি। তিনি দিবাকর দাসের পরবর্তী যুগের কবি। তিনি বলেছেন—শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করতে করতে প্রতাপরুদ্রের সমক্ষে বৈশাখের তৃতীয় দিবসে জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হন।

কবি ঈশ্বর দাস আনুমানিক ষোড়শ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনি নবাক্ষরী পয়ারে লিখেছেন—

কালেক সন্ন্যাসে বিহরি। প্রবেশ যাই' নীলগিরি॥
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন। দেখন্তি সর্ব বিদুজন॥
... ...
চৈতন্য পিণ্ড সিংহাসন। দেখন্তি ত্রৈলোক্য মোহন॥
ক্ষেত্র পালঙ্কু আজ্ঞা দেই। এপিণ্ড নিঅ বেগ কই'॥
অন্তর্খে নেই গঙ্গাজল। মেলিণ দিঅ ক্ষেত্রপাল॥
শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই'। অন্তর্খে নোল শব বহি॥
গঙ্গারে মেলি দেলে শব। সে সব হোইলাক জীব॥

চৈতন্যরূপ প্রকাশিলে। গঙ্গারে লীন হোই গলে ॥
কেহু ন জানে এহু রস। ভক্তংকু মুখরে প্রকাশ ॥
লেখন নাহি শাস্ত্র পোথা। অত্যন্ত গুপ্ত এহু কথা ॥
... ...
এহিঁ কি গোপ্য কথা মুহিঁ। তো আগে প্রকাশ কলই ॥

—চৈতন্যভাগবত, ৬৫তম অধ্যায় ॥

ঈশ্বর দাসের এই লেখার মধ্য কিছু গোপন তথ্য পাচিছ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহত্যাগের পর তাঁর শবকে শ্রীশ্রীজগন্নাথের নির্দেশে অন্তরীক্ষে বহন করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল গঙ্গা নদীতে। (পুরী থেকে ৪০ মাইল দূরে প্রাচী-নদীকেই এখানে গঙ্গা নদী বলা হয়েছে।) তারপর সেই শব হয়ে উঠে জীবন্ত। পুনরায় লীন হয়ে যায় গঙ্গায়। কবি ভক্তমুখে শুনে এই গোপন সংবাদ প্রকাশ করছেন। কোন শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে কিন্তু এই অত্যন্ত গোপ্য তথ্য লেখা নাই।

'মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবধর্ম' গ্রন্থে প্রভাত মুখোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করেছেন। চৈতন্য-তিরোভাবের কাল সম্পর্কে কবির মত—অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এই ঘটনা ঘটে।

দেখছি জগন্নাথে লীন হওয়ার ঘটনাটি বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে বললেও মূলে একই আছে। শুধু চিন্তা করার বিষয়ঃ ঘটনাটি এভাবে পল্লবিত হলো কেন? এর পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল? এবং সেই উদ্দেশ্যের পিছনে কোন সত্য লুকিয়ে আছে কি?

এবার বৈষ্ণবচরণের চৈতন্যভাগবতের কথা বলি। এই পুস্তকটি সম্প্রতি কটক থেকে ছাপা হয়েছে। কবি ছিলেন সম্বলপুরের অধিবাসী। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবচরণ যে নতুন তথ্য দিয়েছেন, তাহলো শুধু স্বরূপ দামোদর নয়, শ্রীচৈতন্যের গম্ভীরা লীলার অনেক পার্ষদই একে একে অন্তর্ধান করেছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে। 'অনেক ভক্ত স্বশরীরে ততক্ষণে অন্তর্ধান হোল।' কিন্তু আরো ততোধিক আশ্চর্যের কথা এঁদের কারো সমাধি পুরীর কোথাও নাই। এ পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিকও সে সন্ধান করেননি। অথচ যবন হরিদাসের সমাধি সমুদ্রতীরে আজো আছে। সেখানে প্রতিনিয়ত সেবা পুজো হয়। বড় বড় বৈষ্ণব মহান্তগণের সমাধি থাকার কথা। গম্ভীরা লীলার ভক্তগণের সমাধি থাকবে না—এমন ত হতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য না হয় ভগবান ছিলেন, কিন্তু তাঁর পার্ষদবর্গ ত ভগবান ছিলেন না, তাঁরা মনুষ্যদেহধারী ছিলেন। তবে কি 'অন্তর্ধান' বলতে মহাপ্রয়াণ নয়, আত্মগোপন? কিন্তু কেন এই আত্মগোপন? কার ভয়ে? তবে কি চৈতন্য-বিরোধী চক্র একে একে সকলকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারিত করেছিল?



।। পাঁচ ।।

চৈতন্য-বিরোধী চক্রের অনুসন্ধান করার পূর্বে, সংগৃহীত তথ্যাবলীর পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। এপর্যন্ত যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাহলো বিভিন্ন বাংলা ও ওড়িয়া গ্রন্থ থেকে। ইতিহাসের পাতায় এখনো মনোনিবেশ করিনি। ইতিহাস খোঁজার আগে গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলীর একটা আলোচনা করে রাখলে আসল সত্য উদ্‌ঘাটন করার ভবিষ্যতে সুবিধে হবে।

তার আগে শ্রীরূপগোস্বামীর একটি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করতে চাই। শ্রীরূপ বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের কথা শুনে দুঃসহ বিরহে ব্যাকুল হয়ে নিম্নের শ্লোকটি রচনা করেছিলেন ঃ

> পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
> মুহুর্বৃন্দারণ্যে-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ ।
> ক্কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
> স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

নিরুপায় শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান শুনে নয়নাশ্রুতে দুগণ্ড প্লাবিত করে তাঁর অন্তর বেদনা ব্যক্ত করেছিলেন। শ্লোকের অর্থ ঃ সমুদ্রতীরের উপবন দেখলেই যাঁর বার বার মনে পড়ত বৃন্দাবনের অরণ্য। স্মৃতিভারে অবনত প্রেম-বিবশ হয়ে পড়তেন। আবার কখনও বা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনে যাঁর রসনা চঞ্চল হয়ে উঠত, সেই রস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেবকে কি আবার আমরা কখনও দেখতে পাব ?

শ্রীরূপ তাহলে কি সন্দেহ করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব মর্ত্যধাম ছেড়ে যান নি ? তিনি কি ভেবেছিলেন অন্তর্ধান অর্থে আত্মগোপন ? সকলের অলক্ষ্যে কোথাও পালিয়ে গিয়েছিলেন ? তা না হলে একি শুধু ভক্ত-হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস ? তবে কেন তিনি প্রশ্ন করেছেন, আবার কি তাঁকে দেখতে পাব ?

শ্রীরূপের এ মর্মবেদনার জিজ্ঞাসা আপনাদের মনেও জেগে উঠুক। এখন আসুন, আমরা তথ্যাবলী পর্যালোচনা করি।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের কাহিনীটি স্মরণ করুন। যেটি 'অম্বিকা চরণ ব্রহ্মচারী, দেনুড় শ্রীপাট থেকে আবিষ্কার করে স্বতন্ত্র-ভাবে 'চৈতন্য-ভাগবতের অপ্রকাশিত অধ্যায়' নামে ৪২৪ চৈতন্যাব্দে প্রকাশ করেছিলেন।

পণ্ডিতগণ বলেছেন এই অধ্যায় দু'টি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন সাহিত্য একাডেমি, নতুন দিল্লী থেকে বাংলা ১৩৮৮ সালে বৃন্দাবন দাসের যে 'চৈতন্য-ভাগবত' সম্পাদনা করেছেন, সেই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এপর্যন্ত যত চৈতন্য-ভাগবত পাওয়া গেছে, সেগুলির শেষ খণ্ড শেষ হয়েছে দশম অধ্যায়ে।

বৃন্দাবন দাস যে গ্রন্থ পরিকল্পনা করেছিলেন তা 'তিনি শেষ করে যান নি।' রূপ-সনাতনের মিলনের পরে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কথায় গ্রন্থ সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু বিষয়-সূচী অনুযায়ী কয়েকটি ব্যাপার অবর্ণিত রয়ে গেছে। সেগুলি হবে বারাণসী গমন, পুনরায় নীলাচলে আগমন ও নিত্যানন্দের শেষ জীবন।

কিন্তু নবাবিষ্কৃত এই তিনটি অধ্যায় হলো প্রভুর সেতুবন্ধ রামেশ্বর ভ্রমণ, সপ্ততাল বৃক্ষকে উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ, পুনরায় নীলাচলে আগমন। তারপর—

অদ্বৈতের হাতে ধরি বলেন নারায়ণ।
নবদ্বীপ দিয়া যাব শ্রীবৃন্দাবন॥

কথামত প্রভু এলেন নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ীতে। শেষ হলো অধ্যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুঃ শচীদেবীর চরণ বন্দন। খড়দহে আগমন। নিত্যানন্দকে বিবাহ করতে আদেশ। শ্রীবাম আচার্যের গৃহে অবস্থান। চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন ভ্রমণ শেষে পুনরায় নীলাচলে আগমন ও জগন্নাথ মন্দিরে বড় দেউলে প্রভুর অন্তর্ধান।

এখন কথা হচ্ছে, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী যে ৩টি অধ্যায় বৃন্দাবন দাসের দেনুড় শ্রীপাঠ থেকে আবিষ্কার করেছেন, সেই পুঁথিটি কত প্রাচীন বা সেটি কত সালে কোন্ আখুরিয়া অনুলিখন করেছিলেন, তা জানা যায় নি। ডঃ সেন এই পুঁথির বৈধতা সম্পর্কে ভূমিকায় কোন আলোচনাই করেননি।

এদিকে ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫০ পৃষ্ঠায় নিজে কোন আলোচনা বা মন্তব্য না করে ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্লা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৩২৮ পৃষ্ঠার এই পাদটীকাটি উদ্ধৃত করে দায় সেরেছেন—'তিনটি অধ্যায়ের প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দিহান—কারণ ইহার কোন বর্ণনা মূল গ্রন্থের সহিত মিলিতেছে না।'

তা না মিলুক। আমি আশা করেছিলাম ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দদাসের কড়চার অবৈধতা নিয়ে যেভাবে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, বৃন্দাবন দাসের এই নবাবিষ্কৃত ৩টি অধ্যায় সম্পর্কে ,অন্ততঃ কিছু মন্তব্য করবেন। আর কিছু না হোক, পুঁথিটি কত প্রাচীন তা যদি জানতে পারতাম তাহলে চৈতন্য-অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে আমার গবেষণার একটা বড় হিল্লে হোত। যদি মূল পুঁথিটি আজো দেনুড় শ্রীপাটে সংরক্ষিত থাকে তাহলে আমাকে নিজেই অনুসন্ধান করতে হবে। সে অনুসন্ধান হয়ত এই পুস্তক প্রকাশের আগে সম্ভব হবে না।

পুঁথির অক্ষর যদি আনুমানিক দেড় শতাধিক বছরের প্রাচীন হয়, তাহলে বলতে দ্বিধা নাই, দেড় শতাধিক বৎসর পূর্বে চৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রায় কোন গবেষক চেষ্টা করেননি। যতদূর জানি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন আলোকপাত করেছিলেন। এঁর আগে কেউ যদি এ বিষয়ে গবেষণা করতেন, তা হলে হয়ত বলা যেত, হয়ত কোন বৈষ্ণব কবি প্রাচীন তুলট কাগজে চাল-চোঁয়া কালি দিয়ে বৃন্দাবন দাসের নামে লিখে দেনুড় শ্রীপাটের গ্রন্থশালায় সংগোপনে রেখে দিয়ে জাল করেছেন।

আমার কথা হচ্ছে পুঁথিটি প্রামাণিক হোক আর না হোক, হয়ত চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান সম্পর্কে যেসব কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, তাই অবলম্বন করে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাঁর নিজের রচনা বৃন্দাবন দাসের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলো, সেই অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তি চৈতন্য-অন্তর্ধান সম্পর্কে এই কাহিনী জানল কেমন করে?

মূল কাহিনীটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে লোচনদাসের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। লোচনদাস বলেছেন গুণ্ডিচা বাটিতে প্রভু জগন্নাথের অঙ্গে লীন হয়েছেন। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—'জগন্নাথ পরশিয়া হৈলা অন্তর্ধান।' এই 'লীন' আর 'অন্তর্ধান' দু'টি শব্দের মধ্যে ব্যুৎপত্তিগত পার্থক্য আছে অনেক। অন্তর্ধান অর্থে তিরোধান, অদৃশ্য হওয়া, তিরোভাব, লুক্কায়িত হওয়া বা দর্শনাতীত স্থানে গমন। অন্তর+ধা+অনট্ ভাবে—এই করেই 'অন্তর্ধান' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। আর লীন অর্থে লয়প্রাপ্ত। মিলিত। শায়িত। সংসক্ত। (লী+ক্ত কর্তৃবা)।

লোচন দাসের কথানুযায়ী চৈতন্যদেব জগন্নাথের দারুময় অঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। আর গোবিন্দদাসের কথায় অন্তর্ধান অর্থে তিরোধান হতে পারে আবার অদৃশ্য হওয়া বা লুক্কায়িত হওয়াও হতে পারে। কেন না বৃন্দাবন দাসের ঐ জাল পুঁথিতেই আছেঃ 'সন্ন্যাসী রূপে গেলা মদনগোপালের স্থান।' অধিকারীগণ দেখেছেন চৈতন্যদেব

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়েছেন মদনগোপাল মন্দিরের দিকে, তারপর আর তাঁকে দেখা যায় নি।

এ প্রসঙ্গের শেষ না করে এখানেই লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গলের কথায় আসি। লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা। জগন্নাথ অবস্থান করছেন মূল মন্দির ছেড়ে গুণ্ডিচা বাটীর মন্দিরে। শ্রীচৈতন্য পার্ষদবর্গ সহ সপ্তমী তিথিতে গিয়েছেন জগন্নাথ প্রভুকে দর্শন করতে। সেখানেই ঘটেছে লীন হওয়ার ব্যাপার। লোচনদাস আর জয়ানন্দ বলেছেন তিথিটা সপ্তমী। বৈষ্ণবদাস বলছেন পূর্ণিমা। কিন্তু দিনটা ছিল রবিবার। এ-সম্পর্কে তিনজনই এক মত। লোচনদাস, জয়ানন্দ আর বৈষ্ণবদাস—তিন জনই বলছেন রাত্রি দশ দণ্ডের সময়। কিন্তু বৈষ্ণবদাস যে নতুন তথ্যটি পরিবেশন করেছেন তাহলো—গরুড় স্তম্ভের কাছে চন্দন বিজয়ের পরে প্রভুর মৃতদেহ পড়েছিল। এমন চাঞ্চল্যকর সংবাদ আর কারো লেখায় পাচ্ছি না। গরুড় স্তম্ভ মূল মন্দিরের সামনে নাট্য মন্দিরে অবস্থিত। কিন্তু এই সঙ্গে আরো একটি তথ্য পাচ্ছি, তাহলো তোটা গোপীনাথ মন্দিরে মৃত মহাপ্রভুকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

বৈষ্ণবদের মধ্যে একটি পদ বিশেষ প্রচলিত আছে। বৈষ্ণব অবৈষ্ণব অনেকেই যে পদটি জানেন, তাহলো—

কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি স্ফুরে।
মোর প্রভুরে হারালাম গোপীনাথের ঘরে॥

এসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তোটা গোপীনাথের মন্দিরে শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ অধ্যায়ের একটি বিশেষ অঙ্ক অভিনীত হয়েছিল। কিরূপ সে অভিনয়? সে আলোচনায় আসার পূর্বে লোচন দাসের আর একটি পদের দুছত্র উল্লেখ করি। কবি জগন্নাথ প্রভুর লীন হওয়ার কাহিনী ব্যক্ত করেও শেষে বলেছেন :

শ্রীমুরারি গুপ্ত বোঝে প্রভুর অন্তরীণ।
সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীণ॥

এই পদের দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে লোচনদাস যা বলেছেন, তাও সঠিক নয়। প্রবীণ ভক্ত, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে একই গুরুর টোলের ছাত্র মুরারি গুপ্তই জানতেন প্রভুর অন্তর্ধান-এর আসল রহস্য। ইতিপূর্বে আমরা মুরারি গুপ্তের কড়চা প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। কড়চার প্রথম উপক্রমের দ্বিতীয় সর্গেই চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন তিরোধান সম্পর্কে কাহিনীর উল্লেখ নাই।

মুরারির কড়চা এখন পাওয়া যায় না। অথচ ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার নানা আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা মনে করেন, মুরারির গ্রন্থ ১৫৩৩ হইতে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল...অনুমান হয় মহাপ্রভুর তিরোধানের দুই বৎসরের মধ্যে গ্রন্থলেখা শেষ হয়। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, মুরারির ন্যায় অন্তরঙ্গ ভক্তের পক্ষে শোক সামলাইতে এক বৎসর ও গ্রন্থ রচনা করিতে এক বৎসর লাগিতে পারে।' —শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান।

মুরারির একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, ঢাকার উথালীনিবাসী অদ্বৈত প্রভুর বংশধর মধুসূদন গোস্বামীর নিকট মুরারির গ্রন্থের একখানি পুঁথি ছিল। বাংলা ১৩০৩ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক 'শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতে'র লেখক পরমবৈষ্ণব শিশির কুমার ঘোষ উক্ত পুঁথির একখানি নকল সংগ্রহ করেন। বৃন্দাবনেও একটি পুঁথি ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু ঢাকা বা বৃন্দাবনের পুঁথি কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি। অতএব আজ আর মুরারিলিখিত চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে জানবার কোন উপায় নাই।

যদি মুরারি তাঁর গ্রন্থে কোন তথ্য না পরিবেশন করেন, তাহলে তা আমরা জানব কেমন করে। আমরা ধরে নিতে পারি হয়ত লোচন আসল তথ্য জেনেও তা প্রকাশ করেন নি, গোপন করেছেন। কেন এই সত্য গোপনের চেষ্টা ?

এবার লোচনের কথা বলি। আমার কাছে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পাদিত ১৩০৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত একখানি 'চৈতন্যমঙ্গল' আছে। অতুলকৃষ্ণ ৪ খানি সম্পূর্ণ পুঁথি, ৩ খানি হস্তলিখিত অসম্পূর্ণ পুঁথি ও আধুনিক ৩ খানি মুদ্রিত গ্রন্থ সংগ্রহ করে এই পুস্তকটি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করেন। অতএব গোস্বামী মহাশয়ের এই পুস্তককে আমি অনেকটা প্রামাণ্য বলে মনে করেছি।

দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে জানা গেল—কো-গ্রামের নিকট কাঁকড়া গ্রামের (গুস্করা ষ্টেশনের নিকট) বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গল গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে লোচনের স্বহস্তলিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে। প্রাণকৃষ্ণ বলেন—'লোচনের আখর উঠানযোড়া ক-এর মত।'—লোচন যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখেন, তাহা এখনও আছে।'—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সংস্করণ। পৃঃ ২১১।

লোচন সব সময় ইতিহাস অনুসরণ করে চলেন নি। তিনি মূর্খ ও অল্প শিক্ষিত জনসাধারণের জন্য 'চৈতন্যমঙ্গল' লিখেছিলেন। তাই অনেক ভুল ও বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন নিতান্ত জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য।

হরিদাস চৈতন্য-তিরোধানের পূর্বেই অপ্রকট হয়েছিলেন। সনাতন তখন পুরীতে

ছিলেন না। তিনি বৃন্দাবনে। লোচন বলেছেন হরিদাস, সনাতন ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের সময়। কিন্তু সনাতনকে—

দোলযাত্রা দেখি প্রভু তারে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিয়া সব শিখাইলা॥

(চৈঃ চঃ ৪র্থ পরিচ্ছেদ, বসুমতী, পৃঃ ২৯৬)

এর পরের কথা হলো রাজা প্রতাপরুদ্রদেব প্রভুর মৃত্যু সংবাদ শুনে সপরিবারে কটকে পালিয়ে গেলেন কেন? শুধু তাই নয়, চৈতন্য পারিষদবর্গ পুরী ছেড়ে সকলে পালিয়ে গেলেন সোজা বৃন্দাবন। আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো ৫০ বছর কীর্তন বন্ধ হয়ে গেল। কি কারণে? ভয়ে না শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের শোকে?

ডঃ সেন তাঁর 'চৈতন্য এণ্ড হিজ এজ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

For fifty years after the Tirodhan of the great teacher, the Vaisnab community lay exervated by the great shock. Their Kirthana music which and taken the whole country by surprise, stopped for a time after that melancholy went and was not heard for nearly half a century in the great provinces of Bengal and Orissa.—P. 259

দীনেশ বাবুর এই উদ্ধৃতির মধ্যে 'গ্রেট শক' কথাটির প্রতি বিশেষ জোর দিতে চাই। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানই যদি হয় বা জগন্নাথ অঙ্গে যদি তিনি লীনই হয়ে যান, তাহলে তাতে ত বড় রকমের আঘাত পাওয়ার কোন কারণ ঘটতে পারে না। জন্ম হলেই মৃত্যু হবে। একথা বৈষ্ণবভক্তগণ ভাল করেই জানতেন। তাছাড়া এই অলৌকিক ঘটনা যদি সত্যই সংঘটিত হতো, তাহলে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের বিপুল খ্যাতি-প্রতিপত্তি সারা ভারত—ভারত ছাড়িয়ে তৎকালে সারা পৃথিবীতেও বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ত। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রচারিত হতো দেশে দেশে। বৈষ্ণবদের নিয়ে পড়ে যেত হৈ-হৈ, রৈ-রৈ ব্যাপার। নীলাচল ছাড়া ত দূরের কথা, সেদিন নীলাচলের মাটিতে জগন্নাথকে ঘিরে আরম্ভ হতো বিশ্বমিলন মেলা। বৈষ্ণব গোস্বামীদের ছুটে পালাতে হতো না উড়িষ্যা, বাংলা ছেড়ে সুদূর বৃন্দাবনে। ৫০ বছর বাংলা আর উড়িষ্যায় বন্ধ হতো না সংকীর্তন। পরিবর্তে দেশে দেশে ঘরে ঘরে সংকীর্তনের বন্যায় প্লাবিত হতো বাংলা, উড়িষ্যা তথা সারা ভারতবর্ষ।

আসলে চৈতন্যদেবের এই আকস্মিক অন্তর্ধান তৎকালের বৈষ্ণব সমাজের কাছে যেমন ছিল অস্বাভাবিক, তেমনি অবিশ্বাস্য ভীতিপ্রদ। সারা বৈষ্ণব সমাজ ভয়ে

আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। বেলা চারটা থেকে রাত এগারটার মধ্যে জগন্নাথের দারুময় অঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব মিশে গেলেন—এরকম একটা আজগুবী ব্যাপারকে বাস্তবধর্মী মন কখনও বিশ্বাস করতে রাজী নয়।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরে ভক্তগণ সকলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ক্রমে চেতনা পেলেন সকলে। কিন্তু স্বরূপের মূর্চ্ছা ভাঙল না। দেখা গেল, তাঁর হৃদয় ফেটে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। দুঃখে হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে বলি। ফেটে যাচ্ছেও কোন কোন স্থলে ব্যবহার করি। উন্নতমার্গের যোগীদের নাক, মুখ, চক্ষু এমন কি ব্রহ্মতালু ভেদ করেও প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে পারে। নিম্নগামী লোকদের পায়ু দিয়েও প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। 'দেখা গেল স্বরূপের হৃদয় ফেটে প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।' শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়।

স্বরূপের হৃদয় দুঃখে ফেটে গিয়েছিল, না বল্লম বা কুঠারের ঘায়ে তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল? যদি তাই করা হয়, তাহলে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কারা করেছিল এবং কেন করেছিল? আজ পাঁচশত বছর পরে এ প্রশ্নের জবাব চাইব কার কাছে?

বৃন্দাবন দাস অবশ্য স্বরূপের স্থলে গদাধরের নাম উল্লেখ করেছেন। আবার স্মরণ করিয়ে দিই পূর্বে উদ্ধৃত সেই লাইন কয়টি

গদাধর জানিলেন—প্রভুর গমন।
প্রভুর বিরহে তান না রহে জীবন॥
আচম্বিতে গদাধর হৈল অন্তর্ধান।
না পায় দেখিতে কেহ বোলে রাম রাম॥

(চৈঃ ভাঃ/সাহিত্য একাদেমি পৃঃ ৩৪৪)

তবে এখানে হৃদয় ফেটে যাওয়ার কথা নাই। গদাধরও প্রভুর সঙ্গে অন্তর্ধান করেছিলেন। এই গদাধর প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। বৈষ্ণবসাহিত্যে পণ্ডিত গদাধর রাধার অবতার বলে বর্ণিত হয়েছেন। পিতার নাম মাধব মিশ্র। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তিনিও পুরীতে এসে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস অর্থাৎ পুরীতে আমরণ বাস স্বীকার করেন। গদাধরকে শ্রীচৈতন্যের শক্তি বলা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সর্বপ্রথম গৌর-গদাধর মূর্তির পূজা আরম্ভ হয়। অনেক কবি ও পণ্ডিত এঁর শিষ্য ছিলেন। পদকর্তা প্রথম যদুনন্দন (চক্রবর্তী) গৌরাঙ্গ ও গদাধরের লীলা একত্রে অঙ্কন করেছেন ঃ

গৌর-গদাধর দুহুঁ তনু সুন্দর
অপরূপ প্রেম বিথার।
দুহুঁ দুহুঁ হরষে পরশে সব বিলসয়
অমিয়া বরিখে অনিবার ॥

গদাধর বাস করতেন চৈতন্যদেবের কাছাকাছি যমেশ্বর তোটায়। জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম-কোণে সমুদ্রের বালুকা পথে যেতে হয় যমেশ্বর তোটায়। পঞ্চ শিবমূর্তির অন্যতম হলেন যমেশ্বর শিব। যমেশ্বর মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে ছিল এই তোটা বা উদ্যান। চৈতন্যদেব এখানেই গদাধরের বাস মনোনয়ন করেছিলেন ঃ

গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যারে করাইলা আবাসে ॥

আমার সংগৃহীত তথ্যাবলীর পর্যালোচনা এখানেই শেষ করতে চাই। যেসব প্রশ্ন তুলেছি, তার উত্তর পেতে হলে উড়িষ্যার তৎকালীন ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। তা যদি জানতে পারি, তাহলে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির জবাবও সহজে মিলবে। সেই সঙ্গে জানতে পারব উড়িষ্যায় সত্যি কোন চৈতন্য-বিরোধী-চক্র গড়ে উঠেছিল কিনা।

তবে উৎকলের তৎকালীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করার পূর্বে আমি শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনপঞ্জীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করতে চাই। চৈতন্য-জীবন-পঞ্জী যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের আবরণ উন্মোচন করার পথ অনেকটা সহজসাধ্য হবে। চৈতন্য সমসাময়িক উড়িষ্যার ঘটনাবহুল ইতিহাস এবং সামাজিক অবস্থা যেমন বিচিত্র তেমনি রোমাঞ্চকর।



॥ ছয় ॥



শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্ট। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আসামে মুসলমান ধর্মান্তরীকরণের একটা ঢেউ চলে। হিন্দু রাজা নীলাম্বরের রাজ্য মুসলমান দ্বারা অধিকৃত হয়। ফলে বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য স্বদেশ ত্যাগ করে তৎকালে চলে আসেন নবদ্বীপে।

চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র, জগন্নাথের শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তী, শান্তিপুরের অদ্বৈত, চৈতন্যের সহপাঠী মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস, তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর (চৈতন্যের মেসো)—এঁরা সকলেই শ্রীহট্টের অধিবাসী। এঁরা অধিকাংশই এসেছিলেন হয় ধর্মসঙ্কটে না হয়, বিদ্যালাভের আশায়। তখন নবদ্বীপ বিদ্যার পীঠস্থান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল।

জগন্নাথ মিশ্রের অপর নাম পুরন্দর মিশ্র। জগন্নাথ আর নীলাম্বর চক্রবর্তী একই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। নবদ্বীপে এসে বসবাস করার পর নীলাম্বর তার কন্যা শচীদেবীকে জগন্নাথের সঙ্গে বিয়ে দেন।

জগন্নাথ ও শচীদেবীর প্রথম সন্তান বিশ্বরূপ। তারপর আরো কয়েকটি সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু তারা বাল্যেই মারা যায়। শচীদেবীর শেষ সন্তান নিমাই। অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যুর পর নিমাই-এর জন্ম হয়েছিল বলে সেকালের বিশ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ী যাতে যমের অরুচি ধরে, সেই জন্য এই নবজাতকের নাম রাখা হয় নিমাই। নামকরণের সময় বহু পুরনারী ও পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতেরা স্থির করলেন, শিশুর জন্মের পর দেশে দুর্ভিক্ষ ঘুচেছে, বৃষ্টি হয়েছে আকাশ থেকে। মানুষের মনে ফিরে আসছে শান্তি। পূর্বে যেমন নারায়ণ পৃথিবী ধারণ করেছিলেন, সেই স্মৃতি স্মরণ করে নাম থাক বিশ্বম্ভর।

আর পুরনারীদের বিবিধ আলোচনার পর মান্য অদ্বৈত-গৃহিনী সীতাদেবী বললেন—

ইহার অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাঞি।
শেষে যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাঞি॥

চৈ. ভা. ৪র্থ অধ্যায়ে।

শিশু ছিলেন দেখতে সুগৌর বর্ণ, তাই নবদ্বীপবাসীরা ডাকত গৌরাঙ্গ বলে। আদর করে প্রিয়জনেরা বোলত গোরা বা গোরা-রায়। যখন চব্বিশ বছর বয়সে কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিলেন, গুরুদেব নাম রাখলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। পরবর্তী কালে দেশে-বিদেশে খ্যাত হলেন এই শ্রীচৈতন্য নামে।

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারী, বঙ্গাব্দ ৮৯২) ২৩শে ফাল্গুন শুক্র বা শনিবার পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে সন্ধ্যার সময়। জ্যোতিষ-আলোচনার সময় এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব।

নিমাই-এর বিদ্যারম্ভ হয়েছিল অনেক পরে। বড় ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাই বাবা জগন্নাথ মিশ্র—মূর্খ হইয়া মোর ঘরে রহুক নিমাই।' বলে পড়তে পাঠান নাই। নিমাই-এর উপনয়নের পর পুত্রের আগ্রহে বাধ্য হয়ে বাবা তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়তে পাঠান। কিশোর বয়সে ব্যাকরণের দুর্বোধ্য সূত্র-টীকা আয়ত্ত করেন অনায়াসে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যা-বুদ্ধির খ্যাতি। ইতিমধ্যে মৃত্যু হয় জগন্নাথের। নবদ্বীপের দরিদ্র মিশ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। দারিদ্রের জ্বালা তাঁর বিদ্যার পথে বাধা হলেও দমলেন না নিমাই। অধিক মনোযোগী হলেন। অধ্যায়নে। ষোল বছর বয়সেই টোল খুলে বসলেন পণ্ডিত মুকুন্দের চণ্ডীমণ্ডপে।

বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবী নিত্য যায় গঙ্গাস্নানে। একদিন পথে তাঁকে দেখলেন নিমাই। এই বালিকাকে দেখে তাঁর কিঞ্চিৎ চিত্ত চাঞ্চল্য হলো। লক্ষ্মীদেবীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন তিনি। অবশেষে এই লক্ষ্মীদেবীকেই মাত্র পঞ্চ হরিতকী দিয়ে নিমাই বিবাহ করলেন। বয়স তখন তাঁর ষোল-সতের-র অধিক হবে না। অধ্যাপনা তিনি তখনো করছেন।

তারপর নিমাই গেলেন পূর্ববঙ্গে। সেখানেও ছড়িয়ে পড়ল তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে দেখলেন লক্ষ্মীদেবী নেই। সর্প দংশনে মারা গেছেন তিনি। লক্ষ্মী-বিরহে অন্তরে অন্তরে ভেঙে পড়লেন নিমাই। অধ্যাপনা করছেন, মন কিন্তু তাঁর উদাস। শচীদেবী পুত্রকে আবার বিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। নিমাই মাতৃ ইচ্ছায় রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করলেন মহা সমারোহে। তখন নবদ্বীপে বৈষ্ণব-সমাজ কীর্তনে মত্ত হয়েছেন। অবৈষ্ণবেরা এই কীর্তন ও নর্তন-কুর্দন ভাল চোখে দেখল না, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে উঠতে লাগল।

সম্ভবতঃ তেইশ বছর বয়সে (১৫০৮) গয়া গেলেন নিমাই পিতৃ-শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করতে। গয়াধামে দেখা হলো ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে। গয়ায় বিষ্ণু-পাদপদ্মে

অঞ্জলি দেওয়ার সময় ভাবে আত্মহারা হলেন তিনি। দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র নিলেন ঈশ্বরপুরীর কাছে নিমাই।

গয়া থেকে ফিরে নিমাই কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেলেন। হৃদয় তাঁর কৃষ্ণ প্রেমে হয়ে উঠল উদ্বেল। ভক্তি-আর্তির আবির্ভাব হলো চিত্তাকাশে। পূর্বের রঙ্গ-পরিহাস, বিদ্যার দম্ভ কোথায় যেন সমস্তই তিরোহিত হলো। সংসার বৈরাগ্য দেখা দিল তাঁর হৃদয়ে। অধ্যাপনা করতে বসলেই কৃষ্ণ কথা বলেন। দেখেন কৃষ্ণময় সর্ব চরাচর। অবশেষে টোল বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্ররা গভীর দুঃখে নিমাই পণ্ডিতের টোল ছেড়ে চলে গেলো।

ভাবাবিষ্ট নিমাই। ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। কৃষ্ণপ্রেমের আবেগে তাঁকে যেন কোথায় নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে। কৃষ্ণ-নাম-কীর্তনে উন্মত্ত হলেন তিনি। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং-অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্ত, যাঁরা পাষণ্ডীদের ভয়ে ততটা প্রকটা হতে পারছিলেন না, যুবক নিমাই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করলেন। মেতে উঠলেন সংকীর্তনে। শাক্ত ও নৈয়ায়িকগণ এই ক্ষুদ্র বৈষ্ণবদলের বিরুদ্ধে কাজীর দরবারে অভিযোগ আনল। তাদের দাবী বন্ধ করতে হবে এই কীর্তন। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের অভিযোগ শুনে কাজী নগরে কীর্তন বন্ধের আদেশ দিলেন। কাজীর আদেশ শুনে ক্ষেপে উঠলেন নিমাই। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন কীর্তন যদি বন্ধ করে কাজী, তাহলে—"সর্বস্ব দণ্ডিয়া তারে জাতি যে লইমু।"

দেখতে দেখতে সারা নবদ্বীপে সাড়া পড়ে গেল। বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব জনসাধারণ যোগ দিল নিমাই-এর দলে। তিনি সমগ্র দলটিকে মোট তিনটি শাখায় ভাগ করলেন। প্রথম দলের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিলেন হরিদাস। দ্বিতীয় দলের অগ্রভাগে রইলেন অদ্বৈত। আর শেষের দলের পুরোভাগে নেতৃত্ব দিলেন স্বয়ং নিমাই ও নিত্যানন্দ।

তিন দিক থেকে তিনটি দল কীর্তনে উন্মত্ত হয়ে হরিধ্বনিতে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে চললো এগিয়ে কাজীর বাড়ীর দিকে। শাক্ত ও নৈয়ায়িকগণ মজা দেখতে লাগল আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে লুকিয়ে। ভাবতে লাগল জগন্নাথ মিশ্রের বেটার কীর্তনের আজই বুঝি শেষ দিন।

কীর্তনের তিনদল চলছে সামনে এগিয়ে। ক্রমে ক্রমে যাচ্ছে কাজীর বাড়ীর দিকে। রুদ্রমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের। হুঙ্কার ছেড়ে 'হরি' 'হরি' ধ্বনিতে নর্তন করতে করতে হাজারে হাজারে মানুষ যেন উন্মত্ত হয়ে উঠছে।

কাজী অবস্থা দেখে ভড়কে গেলেন। ভাবলেন, আজ বুঝি রেহাই নাই।

বুদ্ধি করে তিনি নিমাইয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে ফেললেন। নিমাইকে ডেকে বললেন ঃ

নীলম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার মামা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমরা ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহায়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়। —(চৈতন্যচরিতামৃত)

অতএব কাজী সখ্যতা করলেন নিমাই-এর দলের সঙ্গে। বেড়ে গেল নবদ্বীপে কীর্তনের কদর। কিন্তু অবৈষ্ণবগণের বিরোধিতা প্রচণ্ড হয়ে উঠল। নিমাই ভাবলেন, এভাবে হবে না। ভারতীয় হিন্দু ধর্মের সংস্কার, সন্ন্যাসী না হলে গৃহস্থগণ কেউ ধর্ম উপদেশ শুনবে না। তাই সঙ্কল্প করলেন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। পাষণ্ডীদের উদ্ধার করতে হলে সন্ন্যাসগ্রহণ করতেই হবে। তিনি মনে করলেন ঃ

অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসি বুদ্ধিতে মোরে প্রণত হইব॥

ভাবলেন তিনি সন্ন্যাসীর প্রথামত গেরুয়া ও দণ্ড ধারণ না করলে কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করবে না। এই সময় নবদ্বীপে এসেছিলেন কেশবভারতী। তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ করলেন গৌরাঙ্গ। জানালেন নিজ অভিপ্রায়। কেশবভারতী চলে গেলেন কাটোয়ায়।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে মাঘ (ফেব্রুয়ারী ২য় সপ্তাহ) শীতের রাত্রিতে সংসার ত্যাগ করে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, আচার্য মুকুন্দ দত্ত—এই তিনজনকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন কাটোয়ায়।

তারপর ২৯শে মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কেশব ভারতীর কাছে। একটা দিন অতিবাহিত করেন কাটোয়ায়। তারপর বৃন্দাবন যাচ্ছেন মনে করে তিন-চার দিন রাঢ় দেশে ভ্রমণ করে গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হন। নিত্যানন্দকে পাঠান নবদ্বীপে মায়ের কাছে। নিজে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়ীতে অপেক্ষা করতে থাকেন। শান্তিপুরে সম্ভবত দশ বার দিন ছিলেন। এখানে মায়ের সঙ্গে দেখা করেন।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি নাগাদ তিনি যাত্রা করেন নীলাচলের দিকে। সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ ও মুকুন্দ। ঐ মাসের শেষাশেষি তিনি পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হন। পুরীধামে আঠার দিন অবস্থান করার পর বের হলেন দক্ষিণ ভারত পর্যটনে। এই আঠার দিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। নিষ্কাম

অদ্বৈতবাদী বাসুদেব সার্বভৌম বেদান্ত ভাষ্যের অদ্বৈতবাদের অসারতা বুঝতে পেরে হয়ে উঠলেন চৈতন্যের পরম ভক্ত। বাসুদেব বললেন :

তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহদণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥

(চৈতনাচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিঃ পৃঃ ১১২)

এই ঘটনা ঘটল ঐ সালের চৈত্র মাসে। তারপর ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসের ৭ই, প্রথম ভাগে কৃষ্ণদাস নামক একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে কৌপীন দণ্ড ধারণ করে বের হন দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায়। দক্ষিণ ভারত দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের লীলাভূমি। দ্বৈতবাদী ভক্ত-সম্প্রদায় 'আলোয়ার' (আড়বার) অঞ্চলের অধিবাসী। অতএব চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। প্রচার করলেন ভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেম ধর্ম। পশ্চিম-ভারতে কেউ কেউ তাকে গুরু বলেও বরণ করলেন। মারাঠী সাধক তুকারাম তাঁকে গুরু বলে করলেন শ্রদ্ধা। দক্ষিণ-পূর্ব থেকেই 'রাগানুগা' ভক্তিবাদ প্রচারিত হয়েছিল। এখানেই চৈতন্যদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির উপাসনা প্রচার করেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেঙ্কটভট্ট ছিলেন নারায়ণের উপাসক। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণের উপাসক।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরাধা সম্পর্কে দু'একটি কথা সবিনয়ে অবতারণা করি। মহাপ্রভু যখন এলেন কৃষ্ণবেন্বা নদীতীরে, তখন সন্ধান পেলেন 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের। গ্রন্থখানি তিনি সংগ্রহ করলেন। আর একটি গ্রন্থও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তার নাম 'ব্রহ্মসংহিতা', বইটি সংরক্ষিত ছিল আদিকেশব মন্দিরে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এই দুটি বই বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। বৈষ্ণব সাধনা বিকাশের ক্ষেত্রে এই দু'টি গ্রন্থের বিশেষ মূল্য অনস্বীকার্য। পেলাম গবেষক রূপে আমরা এখানে শ্রীচৈতন্যকে।

দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন আলবার সম্প্রদায় নিজদিগকে নায়িকা এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে নায়ক মনে করে রাগমার্গে ভজনা করতেন। এই রাগমার্গের সাধনার সময় তাঁরা কৃষ্ণের একজন গোপীর উল্লেখও করেছেন। এই গোপীর নাম যে রাধা এমন উল্লেখ নাই, তামিল গানগুলিতে কৃষ্ণের প্রিয়তমা গোপীর নাম পাচ্ছি 'নাপ্পিন্নাই'। 'নাপ্পিন্নাই' একটি ফুলের নাম। এই নাপ্পিনাই গোপী, কৃষ্ণের নিকট আত্মীয়া বলে বর্ণিত হয়েছেন। কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বর্ণনার সময় প্রিয়তমা বিশেষ গোপিকার পরিকল্পনাটি ভক্তকবিগণ বিভিন্ন পুরাণাদি থেকে গ্রহণ করেছেন। রূপ গোস্বামী তন্ত্রের কথা উল্লেখ করে রাধা সম্পর্কে বলেছেন—"হ্লাদিনী যে মহাশক্তি—যিনি

সর্বশক্তি বরীয়সী—সেই রাধা হইলেন তৎসার ভাবরূপা, তন্ত্রে এই কথাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।'—উজ্জ্বলমণি, রাধাপ্রকরণ।

কৃষ্ণকর্ণামৃতের রচনাকাল অন্ততঃ দ্বাদশ শতক বলে পণ্ডিতগণ স্থির করেছেন। গ্রন্থের কবি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেম্বা নদীর তীরবর্তী দেশের অধিবাসী ছিলেন বলে প্রবাদ আছে।

কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থই মহাপ্রভুকে তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবধারার উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি রাধাভাবে ভাবিত হন এবং রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা প্রচলন করতে বিশেষ উৎসাহী হন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন ঃ

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেম্বা তীরে।
নানাতীর্থে দেখি তাহা দেবতা মন্দিরে॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লইল॥
কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥ (মধ্যম খণ্ড, ৯ম পরিঃ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান অবলম্বন ভাগবত পুরাণে রাধার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভাগবতেই রাধাকে আবিষ্কার করেছেন। ভাগবতের দশম খণ্ডে রাসলীলা বর্ণনার ভিতরে দেখতে পাই, রাসমণ্ডল থেকে কৃষ্ণ তাঁর একজন প্রিয়তমা গোপীকে নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছেন এবং অন্যান্য গোপীগণের অন্তরালে সেই প্রিয়তমা গোপীকে নিয়ে বিবিধভাবে ক্রীড়া করছেন। তখন অন্যান্য বিরহকাতরা গোপীগণ কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করতে করতে বৃন্দাবনের এক অরণ্য-প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যুক্ত পদচিহ্নের সঙ্গে অন্য একটি ব্রজবধূর পদচিহ্নও দেখতে পেলেন। তখন সেই কৃষ্ণপ্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন গোপীরা ঃ

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ (১০/৩০/২৪)

ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে' এই অংশের অনুবাদ করেছেন এইরূপ ঃ 'ইহা কর্তৃক (এই রমণী কর্তৃক) নিশ্চয়ই ভগবান্

ঈশ্বর হরি আরাধিত হইয়াছেন, যে জন্য গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীত হইয়া ইহাকে এই নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।' পৃষ্ঠা ১০০

এই 'অনয়ারাধিতঃ' শব্দটির ভিতরে তাঁরা 'রাধা' শব্দটি নাকি খুঁজে পেয়েছেন। সনাতন গোস্বামী ও জীব গোস্বামীকে অনুসরণ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন ঃ

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তি রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥ আদি, ৪ পরিচ্ছেদ

এ প্রসঙ্গ যাঁরা বিস্তৃতরূপে জানতে চান, তাঁরা শশীভূষণ দাশগুপ্তের পূর্বোক্ত পুস্তক পাঠ করলে বিশেষ উপকৃত হবেন। আমি আমার বিষয়বস্তু ছেড়ে পাঠকদের বিব্রত করলাম অযথা। যদি ক্ষমাযোগ্য মনে করেন, দয়া করে নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে এসে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন শ্রীচৈতন্যদেব। পরস্পরের মিলন হলো। দু'জনই একই পথের যাত্রী। বৈষ্ণব রসতত্ত্বে দু'জনে মগ্ন হলেন। মহারাষ্ট্রের পথে সোমনাথ, দ্বারকা, প্রভাস পরিক্রমার পর পুরী প্রত্যাবর্তনের পথে পুনরায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে (১৪৩২-৩৩) ফিরে এলেন পুরীধামে। এসে রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্রের আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। কেউ কেউ দক্ষিণ ভ্রমণে তাঁর দু'বৎসর অতিবাহিত হয়েছে বলে লিখেছেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষে তিনি পুরীতে ফিরে আসেন বৈশাখ মাসে।

দক্ষিণ থেকে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে গোড়ীয় ভক্তগণ তাঁকে দর্শনের উদ্দেশ্যে রথযাত্রার পূর্বেই নীলাচলে আগমন করেন। সেই বৎসর ভক্তগণ যখন গৌড় প্রত্যাবর্তন করেন তখন প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে বলেন ঃ

... ...
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥ —(চৈ. চ. ৩।১।৪৩)
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥
... ...
বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি॥ (চৈ. চ. ২।১।৪৪-৫)

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব ২৪ বৎসর প্রকট ছিলেন। এই ২৪ বৎসরের মধ্যে কুড়ি বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে এসেছিলেন। চার বৎসর আসেননি। যে চার বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণ আসেননি, সে চার বৎসরের সংবাদ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া

যায়। যে দু'বৎসর প্রভু দক্ষিণদেশে ছিলেন, তা হলো ১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শক। একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই দুই বৎসর গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসেননি। ১৪৩৭ শকে প্রভু গোড়ে রামকেলিতে এসেছিলেন। ১৪৩৭ শকের রথযাত্রা সম্পর্কে প্রভু নিজেই গোড়ীয় ভক্তদের বলেছিলেন ঃ

এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন ॥ (চৈ. চ. ২।১৬।২৪৫)

অতএব সেবার গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসেননি। এরপর শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৬—৪২ পদ থেকে জানা যায় শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেনের দ্বারা প্রভু রথযাত্রার পূর্বেই বলে পাঠিয়েছিলেন, গোড়ীয় ভক্তগণ কেহ যেন নীলাচলে এ বৎসর না আসেন। এ থেকে বুঝা যায় অন্ত্যলীলার ১৮ বৎসরের মধ্যেও এক বৎসর গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসেননি। তাহলে দেখা যাচ্ছে গোড়ীয় ভক্তগণ চার বৎসর নীলাচলে আসেননি। অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের ২৪ বৎসরের মধ্যে ২০ বৎসর গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে এসেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথম রথযাত্রা হয় ১৪৩২ শকে। সুতরাং ২৪শে রথযাত্রা ১৪৫৫ শকে। ১৪৫৫ শকের রথযাত্রাতেও গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে এসেছিলেন। তা না হলে বিশ বৎসর হয়না। এই ১৪৫৫ শকেই প্রভু তিরোধান বা অন্তর্ধান করেন। অতএব কেহ যদি মনে করেন তিরোধান বা অন্তর্ধানের বছরে গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে ছিলেন না, তাহলে ভুল করবেন। অর্থাৎ ১৪৫৫ শকে রথযাত্রার সময়ও প্রভু সকলের গোচর ছিলেন। পরবর্তী অর্থাৎ ১৪৫৬ শকে বৈশাখে প্রভুর তিরোধান সম্ভব নয়। কারণ পরবর্তী শকের বৈশাখে প্রভুর বয়স ৪৮ বৎসরের বেশী হয়। কিন্তু চরিতকারগণ লিখেছেন ৪৮তম বর্ষেই প্রভু অন্তর্ধান করেছিলেন। অর্থাৎ অন্তর্ধানের সময় প্রভুর বয়স ৪৭ বৎসর সাড়ে চারমাস মাত্র। ইংরাজী ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন বা জুলাই, আষাঢ় মাসে। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে ১৪৫৫ শক, ৯৪০ বঙ্গাব্দ বেলা তৃতীয় প্রহরে।

কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্টই বলেছেন ঃ

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান ॥ (চৈ. চ. ১।১৩।৮)

এই হিসাবে কেবল শকের গণনাতেই প্রকটকাল ৪৮ বৎসর হয়। অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভু ২৩ বৎসর সাড়ে চারমাস মাত্র প্রকট ছিলেন।

নীলাচলে পণ্ডিত কাশীশ্বর মিশ্রের আশ্রমে তিনি ১৮ বছর বাস করেন। শেষের দিকে মহাপ্রভু উন্মাদের মত, বিরহীর মত, নিষ্কিঞ্চনের মত রোদন করতেন আর

শ্লোক আবৃত্তি করতেন। অন্ত্যলীলার সঙ্গী ছিলেন—হরিদাস, স্বরূপ দামোদর, পরমানন্দ পুরী ও রায় রামানন্দ। এঁরা দিবারাত্র থাকতেন মহাপ্রভুর কাছে কাছে। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা পড়ে মনে হয় শেষের দিকে তাঁর বাহ্যচেতনা প্রায়ই দিব্যানুভূতিতে লুপ্ত হয়ে যেত, তখন তিনি মর্ত্যধামেই ভাব-বৃন্দাবনকে প্রত্যক্ষ করতেন। চটক পাহাড়কে মনে করতেন গিরি গোবর্ধন। কখনো পথিমধ্যেই আবেগানাভূতিতেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়তেন। কখনও বা কৃষ্ণবিরহে স্বরূপরামানন্দকে মিনতি করে বলতেন ঃ

কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
দোহে মোরে কহ সে উপায়।

এই আবেগানুভূতিতে উন্মাদ হয়ে তিনি দিবারাত্র ভেদাভেদ গিয়েছিলেন ভুলে। জীবনের শেষ বার বছর জাগরণ ও চেতনার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না তাঁর।

স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ এই অবস্থায় মহাপ্রভুকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। গান গেয়ে শোনাতেন, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের গীত-গোবিন্দ। মহাপ্রভু কেমন যেন উন্মাদের মতো, বিরহীর মত, আকুল হয়ে কাঁদতেন। মুখ দিয়ে স্ফুরিত হতো প্রলাপ বচন। পড়তেন ভাগবতের শ্লোক। অবশেষে কৃষ্ণপ্রেমে ক্ষীণতনু তাঁর আবেগার্তিতে পড়ত ভূমিতে মূর্ছিত হয়ে।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের এই সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জীর কথা স্মরণে রেখে আসুন আমরা উৎকলের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের পাতায় মনোনিবেশ করি। দেখি এই সময় উড়িষ্যার ইতিহাসের গতি কোন পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল।

।। সাত ।।



শুধু কলাভূমি কলিঙ্গ নয়। এককালে কলিঙ্গের শৌর্য-বীর্য ছিল সারা ভারতে তুঙ্গে। অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ে লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধার আত্মদানের কথা ছেড়ে দিলেও চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শকাব্দে (১৪৬৯ থেকে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ) উড়িষ্যার বিস্তৃতি নিতান্ত নগণ্য ছিল না। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের উপাধি তখন 'বীরগজপতি গৌড়েশ্বর-নবকোটি-কর্ণাটক-কলবুরিগেশ্বর-শরণাগত-জমুনাপুরাধীশ্বর হুশনসাহি-সুরত্রাণ-শরণ-রক্ষণ-শ্রীদুর্গাবিরপুত্র-পরম-পবিত্র-চরিত্র-রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর (Catalogue of Sanskrit Mss. at the India office Library in London ; Ed. by Dr. Eggelling, P. 419, No. 1404)

প্রতাপরুদ্রদেবের পিতা পুরুষোত্তমদেব ১৪৭৯—১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষোত্তমদেব উৎকলের সিংহাসনে আরোহন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে কর্ণাট দেশে কাঞ্চী বা কঞ্জিভরম্ রাজ্য জয় করেন। পুরুষোত্তমদেবের পূর্বে উৎকলের রাজা ছিলেন সূর্য বংশের কপিলেন্দ্র দেব। তাঁর মত বীর এবং সাহসী যোদ্ধা দক্ষিণ ভারতে কেউ ছিল না। তিনি ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। তখন মুসলমানদের আক্রমণে উৎকলের দুর্দশার সীমা ছিল না। কপিলেন্দ্র দেব রাজা হয়ে দেশের সামন্ত এবং প্রজাদের একত্রিত করে প্রবল বিক্রমে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। মুসলমানগণ কোনমতে কপিলেন্দ্র দেবের কাছে এঁটে উঠতে পারেন নি। ক্রমে ক্রমে তিনি সারা দক্ষিণ ভারতে একছত্রাধিপতি হয়ে উঠেন। বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য জয় করে তিনি নিজ রাজ্য সুবিস্তৃত করেন।

গজপতি রাজ প্রতাপরুদ্রদেব। শৌর্য-বীর্যে তিনিও কম যান না। মুসলমানদের আক্রমণ থেকে বার বার উড়িষ্যাকে রক্ষা করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয় একদা গৌড়বঙ্গের অধীশ্বরও হয়েছিলেন।

গৌড়ের মসনদে তখন হুসেন শাহ। হাবসী ক্রীতদাসদের মূলোৎপাটন করে রাজ্যজয়ের নেশায় উন্মত্ত তিনি। কামরূপ অভিযানে গিয়ে সর্বাগ্রে ধ্বংস করেন কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির। বাংলাদেশে তখন মাঝে মাঝে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করত। বাংলার সীমান্তবর্তী দু'টি রাজ্য আসাম আর উড়িষ্যা।

আসামের রণাঙ্গণে বার বার পরাজিত হয়ে পরাজয়ের গ্লানিতে যখন জ্বলে পুড়ে মরছেন, এমন সময় গুপ্তচর মুখে সংবাদ এলো উড়িষ্যার সীমান্ত অরক্ষিত। অমনি তিনি নবোদ্যমে জেগে উঠলেন। আসাম পরাজয়ের ক্ষোভ মেটাতে উড়িষ্যা জয়ের জন্য পাঠিয়ে দিলেন একদল বীর সাহসী সৈন্যবাহিনী। এ হলো ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

উৎকলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব তখন যুদ্ধ ব্যপদেশে অবস্থান করছেন দূর দেশে বিজয়নগরে। বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য কোন যোগ্য সেনাপতি ছিলেন না রাজধানীতে। ফলে হুসেন শাহের সৈন্যদল বিনা বাধায় পুরী পর্যন্ত হলেন অগ্রসর। পথে গ্রাম জনপদের উপর মুসলমান সৈন্যদের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেল। মুসলমান সেনাপতি বহু দেব মন্দির করল অপবিত্র।

চললো হিন্দুদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন। চৈতন্যভাগবতেই আছে ঃ

যে হুসেন শাহ সর্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষ॥ (চৈতন্যভাগবত)

ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কতমত করিল প্রমাদ॥ (চৈতন্যভাগবত)

শেষ পর্যন্ত হুসেন শাহী সৈন্যদল দখল করে নিল পুরী। জয়ের আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠলো শাহী সৈন্যরা। লুটপাট আর ধ্বংসের তাণ্ডবে মেতে উঠল তারা। শেষে স্থির করলো ধ্বংস করবে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির। জগন্নাথদেবের মন্দির ধ্বংস করতে পারলে এ অভিযান সার্থক হবে তাদের। এই ভেবে সেনাপতি ইসমাইল গাজি আনন্দে বার বার হাত বুলাতে লাগলেন দাঁড়িতে।

এমন সময় সংবাদ এলো উড়িষ্যা-বাহিনী পেঁৗছে গেছে ধননগরীর উপকণ্ঠে। ভয়ে হুসেন শাহী সৈন্যদল হয়ে উঠল আতঙ্কিত। উড়িষ্যা-বাহিনীর আক্রমণ এড়িয়ে ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে লাগল গৌড়ের দিকে।

মহারাজ এত সহজে ছেড়ে দিলেন না। তিনি পলায়মান শত্রুকে পিছনে পিছনে চললেন তাড়া করে। শাহী সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে হাজির হলেন সীমান্তবর্তী দুর্গ গড়মান্দারণে। দুর্গ অধিকার করার জন্য দুই পক্ষে চললো তুমুল

সংগ্রাম। উড়িষ্যার সৈন্যদল মাসের পর মাস মান্দারণ দুর্গ অবরোধ করে রইল। প্রতাপরুদ্রদেব সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের উপরে দুর্গ অবরোধের ভার দিয়ে ফিরে গেলেন রাজধানীতে। সেনাপতির উপর অগাধ বিশ্বাস তাঁর।

এই বিশ্বাসই কাল হলো। বিশ্বাসঘাতকতা করল ক্রূর সিংহাসনলোভী সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর। রাজার অনুপস্থিতিতে সহসা গোবিন্দ বিদ্যাধর তুলে নিলেন দুর্গ অবরোধ। ফলে গড়মান্দারণ হয়ে রইলো উভয় রাজ্যের অলিখিত সীমান্ত দুর্গ।

সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের এই যে ভূমিকা। এর থেকেই বোঝা যায় তার অন্তরের দুরভিসন্ধির কথা। গড়মান্দারণের সীমান্ত দুর্গে হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীর সঙ্গে কি গোপন পরামর্শ হয়েছিল গোবিন্দের, ইতিহাস থেকে জানতে পারিনি সে কথা। তবে ক্রমে ক্রমে গোবিন্দ বিদ্যাধর যে ষড়যন্ত্রের জালবিস্তার করে চলছিলেন সুকৌশলে—পরবর্তী ইতিহাস শুনলেই বোঝা যাবে সে কথা।

প্রতাপরুদ্রদেব এই ষড়যন্ত্রের কথা না জানতে পারলেও সেনাপতির এই কাজে কিন্তু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ক্ষমা করেছিলেন গোবিন্দ বিদ্যাধরকে। কোন শাস্তি না দিয়ে উচ্চ রাজপদে বহাল রেখেছিলেন তাঁকে। এই অনুকম্পা করে হয়ত তিনি ভুলই করেছিলেন। এই ভুলের জন্য অনেক খেসারত তাঁকে দিতে হয়েছিল। যে শর তিনি ধনুকের 'জ্যা' থেকে দিয়েছিলেন ছেড়ে, সেই শরই যে বিদ্ধ করবে তাঁকে, তখন তা তিনি বুঝতে পারেন নি। যদি বুঝতে পারতেন তাহলে হতো না এই সর্বনাশ।

এর পরের ইতিহাস সুদীর্ঘ। সে ইতিহাস জেনে আমাদের কাজ নেই। সম্ভবত ১৫১৩ খ্রীঃ গোপনে হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী সাকর মল্লিক পুরীতে লোক পাঠিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যের কাছে। বাসনা তাঁর রাজকার্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হবেন তিনি। চিঠিতে সে অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন মহাপ্রভুকে। মহাপ্রভু সেই দূতের হাতে চিঠি দিয়েছিলেন সাকর মল্লিককে। দু'ছত্রের সামান্য সে চিঠি ঃ

পরব্যসনিনী নারী ব্যাগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥[১]

—বশিষ্ঠ রামায়ণ, উপশম প্রকরণ, ৭৪/৮৩

চিঠিটি পড়ে সাকর মল্লিক নৃত্য করতে লাগলেন। নয়নদ্বয় তাঁর সিক্ত হলো অশ্রুরাশিতে। বার বার তিন পড়তে লাগলেন দু'টি ছত্র। পড়তে পড়তে মুখস্ত করে ফেললেন।

১। শ্লোকটি চৈ. চ. মধ্যলীলা। ১ পরি থেকে উদ্ধৃত। এ ছাড়া পঞ্চদশীতেও আছে। রূপ-সনাতনের শিক্ষা প্রসঙ্গে চৈতন্যদেব পরেও পঞ্চদশীর বাক্য প্রমাণ দিয়েছেন। পঞ্চদশী অদ্বৈত বেদান্তের শ্রেষ্ঠ প্রকরণ গ্রন্থ।

শোনালেন অর্থ করে ভাই সন্তোষকে। প্রভু কি লিখেছেন শুনুবি। বলেছেন—পরাধীনা নারী যেমন গৃহকর্মে নিযুক্ত থেকেও নব-সঙ্গের রস হৃদয়ে আস্বাদান করে, তেমনি বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থেকেও নিরন্তর মনকে ঈশ্বরের চরণ চিন্তায় সর্বদা ব্যাপৃত রাখবে।

অর্থ করে সাকর মল্লিক বার বার পত্রটি কপালে ছোঁয়াতে লাগলেন। হৃদয় তাঁর এক অনাস্বাদিত আনন্দে পরিপূর্ণ হলো।

১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। বৃন্দাবন যাবেন বলে চৈতন্যদেব বেরুলেন পুরী থেকে। কেউ জানতে পারল না প্রভুর উদ্দেশ্য। সঙ্গে চললেন :

নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর॥ (চৈ.চ.মধ্য. ১ম পরি)

চৈতন্য চলেছেন গঙ্গার তীর ধরে। গোবিন্দ বিদ্যাধর কি জানত প্রভুর উদ্দেশ্য! ইতিহাসে লেখা নাই সে কথা। জানতেন একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি চলেছেন যে পথ দিয়ে 'হরি', 'হরি' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছে সে পথ। ছুটে আসছে চতুর্দিক থেকে শত শত লোক। প্রভুকে দেখে কেউ ফিরে যেতে চাইছে না ঘরে। সকলে চলছে চৈতন্যদেবের পিছনে পিছনে। চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস বলছেন :

নিকটে যবনরাজ পরম দুর্বার
তথাপিও চিত্তে ভয় না জম্মে কাহার॥

বিরাট সে দল। হাজার হাজার লোকের সমারোহ। মহাপ্রভু কাউকে নিষেধ করছেন না। তাঁর ত এ-সবে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত। কখনো হুঙ্কার গর্জন করছেন, আবার কখনো বা পুলকাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তাঁর দু'গণ্ড বেয়ে। নিরবধি ভক্তগণ করছেন কীর্তন। বিশেষ 'শুনি মাত্র প্রভু হরিনাম লোক মুখে। উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ সুখে॥' (চৈতন্যভাগবত)।

অবেশেষে :

গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজ তার রামকেলি নাম॥
দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্য স্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে॥
(চৈতন্য ভাগবত, ৪র্থ, শেষ খণ্ড)

এখানে এসেই উপবিষ্ট হলেন তমাল তলে। শীতকাল। মাঘের শীত আরো ভয়ঙ্কর। প্রভুকে বেষ্টন করে নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাজনেরা সকলে উপবিষ্ট। ধ্বনি

জ্বলছে শীত নিবারণের জন্য। কীর্তন, নর্তন আর হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। প্রভু মুহুর্মুহুঃ প্রবল হুঙ্কারে শীতের নিস্তব্ধ রাত্রিকে যেন বিদীর্ণ করে তুলছেন। যবন হুসেন শাহের রাজপ্রাসাদ প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

অবশেষে কোথা থেকে আসতে লাগল প্রচুর আহার্য। কে দিচ্ছে, কোথা থেকে আসছে, বুঝতে পারছে না কেউ, লক্ষ লোকের আহার্য। অভাব হলো না কারো। সুমিষ্ট কদলী, নানারকমের মিষ্টান্ন, দধি, ক্ষীর—আসছে ভারে ভার।

বিস্মিত হলেন নিত্যানন্দ। মনে মনে তিনি ভাবছেন, প্রভু এখানে, এই মুসলমান রাজধানীতে সহসা এলেন কেন। নিশ্চয় এর কোন আছে নিগূঢ় উদ্দেশ্য। দেখতে দেখতে দু'একদিন কেটে গেল। প্রভু নিশ্চেষ্ট। অন্যত্র যাবার কোন নামই করছেন না। ব্যাপার কি ? সব সময় ভাবে বুঁদ হয়ে বসে আছেন। ভাবটি এমন, যেন কিছুই জানেন না। নিত্যানন্দ এই চতুর চূড়ামণির মতলব কোন মতেই বুঝতেই পারছেন না।

গভীর রাত্রি। কয়েক দিনের পরিশ্রমে হাজার হাজার ভক্ত তমাল তলে কুঁকড়ে নিদ্রায় নিমগ্ন। হেথায় হোথায় জ্বলছে কয়েকটি ধুনি। সহসা নিত্যানন্দ দেখলেন সেই শীতের অন্ধকার রাত্রি ভেদ করে দু'জন মনুষ্য-মূর্তি কেমন যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তমাল তলের দিকে। ধুনির অস্পষ্ট আলোকে দেখতে পেলেন তাদের নগ্ন অঙ্গ, নগ্ন পদ, পরণে একখানি সামান্য মাত্র বস্ত্র, আর ঃ

দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ (চৈ. চ. মধ্যলীলা)

নিত্যানন্দ আর হরিদাস বুঝতে পারলেন সব। তখন দু'জনে—

... ... জানাইল প্রভুর গোচরে॥
রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে॥

মহাপ্রভুর মহাভাব যেন সহসা তিরোহিত হল। তিনি চমকে উঠে বললেন—'ওঠ ওঠ, মঙ্গল হোক। তোমাদের দৈন্য দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তোমরা দু'জনেই আমার পুরাতন ভক্ত। নীলাচলে আমি পেয়েছি তোমাদের পত্রী। বুঝতে পেরেছি সব। উত্তর আমি দিয়েছি। তোমাদের হৃদয়-ইচ্ছা আমি জানি। শেষে বললেন ঃ

আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ-সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥ (চৈ, চ, মধ্য ১ম)
... ...
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রী দ্বারে জানি তোমার ব্যাভার॥ (চৈ, চ, মধ্য, ১ম প.)

নিত্যানন্দ আর হরিদাস—দু'জনে নির্বাক। একধারে বসে শুনছেন দু'জনে। যতই শুনছেন, বিস্মিত হচ্ছেন ততই। শেষে শুনলেন ধীরে ধীরে বলছেন প্রভু :

গৌড় নিকট আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহা আগমন ॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে ॥
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘর যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ (চৈ. চ মধ্য. ১ম)

রূপ-সনাতন দুজনকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদও করলেন। আনন্দে দু'জনের দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল পুলকাশ্রু। আত্মহারা হয়ে পড়লেন দু'জনে। তারপর নিজেদের সামলে নিয়ে প্রভুকে সংগোপনে বললেন—যবন রাজ, তাকে বিশ্বাস নাই। ইতিমধ্যেই তিনি আপনার আগমন সংবাদ পেয়েছেন। কতোয়ালের দ্বারা খোঁজ খবর নিচ্ছেন সুলতান। মুখে অবশ্য খুব সুখ্যাতি করে ভক্তি দেখাচ্ছেন। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি সুলতানের মনোভাব। কেশব ছত্রীর কাছে সব সংবাদ নিয়েছেন হুসেন শাহ। যার সঙ্গে লক্ষাধিক লোক চলে তীর্থযাত্রা করতে, সে কেমন সন্ন্যাসী। প্রভু বুঝতেই ত পারছেন—'তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি।' (চৈ. চ)। আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন।'

চৈতন্যদেব বুঝতে পারলেন রূপ-সনাতনের ইঙ্গিত। ইতিপূর্বেই সব জানতেন। তাই ত এত হাজার হাজার ভক্তকে আসতে নিষেধ করেন নি তিনি। রূপ-সনাতন চলে যাওয়ার পর প্রভু বললেন নিত্যনন্দকে—'এত লোক সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়া ঠিক নয়। সনাতনের মুখ থেকে কৃষ্ণের আদেশ পেলাম। চল, আমরা নীলাচলে ফিরে যাই।'

নিত্যানন্দ শুধু একটু হেসে বললেন—তা জানি, তুমি এখান থেকেই ফিরবে। বৃন্দাবন যাত্রা সে ত তোমার ছলমাত্র।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' দেখছি হুসেন শাহ কেশব খানকে বলছেন : 'কেমন কৃষ্ণ চৈতন্য গাছে নোয়ায় মাথা।' যাও তাকে আমার নিকট ধরে আন।

রাজা বলে কেশব খাঁ ধরিয়া আন এথা ॥
তাহা শুনি নিবর্ত হইলা চৈতন্য ঠাকুর।
সর্ব পার্ষদ সঙ্গে গেলা শান্তিপুর ॥ (জয়ানন্দ, চৈ, ম, বিজয়খণ্ড)

চৈতন্যদেবের রামকেলি যাত্রার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি ? না, চৈতন্য-জীবনীকাররা সে কথা ঘুণাক্ষরেও লিখেন নি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যে একান্ত

সংগোপনে—বলতে গেলে এক বিরাট সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে যদিও তাদের 'হরি' নামই একমাত্র অস্ত্র—তাই সম্বল করে তিনি এসেছিলেন রামকেলি গ্রামে। তবুও তার পিছনে একটা বিরাট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। হুসেন শাহের চরিত্র তিনি ভাল করে জানতেন। আর এও জানতেন হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুদের দেব-দেবীর মন্দিরকে রক্ষা করতে হলে রূপ-সনাতনকে তাঁর চাই। তিনি ভাল করেই জানতেন হুসেন শাহের বাম এবং দক্ষিণ হাত এই রূপ আর সনাতন। এদু'টো শক্ত-সবল হাতকে তাঁর হস্তগত করতে হবেই। তাই ত তিনি কাউকে উদ্দেশ্য ব্যক্ত না করে, তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে বৃন্দাবন যাত্রার ছল করে, এত লোকজন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন গৌড়ের উপকণ্ঠ রামকেলি গ্রামে। এর পিছনে প্রতাপরুদ্রের পরামর্শ ছিল। ইতিপূর্বে কেউ ব্যাপারটা ভাবেন নি এমন করে।

রূপ-সনাতনকে উদ্ধার করতে চান তিনি ম্লেচ্ছ যবন রাজার হাত থেকে—ধর্মের খোলস দিয়ে জীবনকাররা বিষয়টা পরিবেশন করেছেন এইভাবে। এর পিছনের ইতিহাসটা একটু খোলসা করে বলি।

ক্ষুদ্র রাজা ত্রিপুরেশ্বর ধনমাণিক্যের হাতে পরাজিত হলেন হুসেন শাহ। এই পরাজয়ের গ্লানি তিনি ভুলতে পারছেন না কিছুতেই। অন্তরে জ্বলে পুড়ে মরছেন। কিন্তু এ জ্বালা তিনি মেটাবেন কেমন করে।

দরবারে সেই কথাটা নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। সুলতানের একমাত্র প্রশ্ন হলো, আমরা হারলাম কেন ?

নানা জনে নানা মন্তব্য করলো। কেউ বললে সেনাপতি ছুটি খাঁর দোষে। আবার কেউ বললে সৈন্যাধ্যক্ষ গৌর মল্লিকের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ার জন্য। কেউ কেউ এমনও বললে—আমাদের সৈন্য ছিল কম, পরাজয় হয়েছে তাই।

কারো উত্তরে হুসেন শাহ সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি নগর কতোয়ালকে প্রশ্ন করলেন—তোমার অভিমত কতোয়াল সাহেব ?

—আমাদের কোন নৌকা ছিল না বলে জাঁহাপনা।

সুলতান সাগ্রহে বললেন—সে কি রকম। ব্যাপারটা খোলসা করে বল।

নগর-কতোয়াল বললে—ত্রিপুরা, আরকান মল্লুক পাহাড় দেশ। অনেক নদী। ঐ সব নদীতে বর্ষায় নামে ঢল। সেই ক্ষেপা ঢলের মুখে সামাল দিয়ে মোকাবিলা করতে না পারলে ওদেশ জয় করা যাবে না জাঁহাপনা।

সেনাপতি ইসমাইল গাজি তারিফ করে বললেন—নগরকতোয়াল সাচ্-বাৎ বলেছেন জাঁহাপনা।

সুলতান হুসেন শাহ গম্ভীর হয়ে বললেন—তোমার তীক্ষ্ন বুদ্ধি দেখে আমি

অবাক হোলাম। আজ থেকে তোমাকে যুদ্ধ-বিভাগের মন্ত্রী করলাম। তোমার উপাধি হলো 'সাকর মল্লিক'।

নগর কতোয়াল থেকে সনাতন যুদ্ধমন্ত্রী 'সাকর মল্লিকে' উন্নীত হলেন। এর কয়েকদিন পরেই আবার দরবার বসেছে। সুলতান তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন। বললেন তিনি উড়িষ্যা জয় করতে চান। সেনাপতি বললেন—'প্রতাপরুদ্র রাজা বড় শক্ত রাজা আছে জাঁহাপনা।'

সে সব আমি জানি। তবুও ঐ দেশটা আমি জয় করতে চাই। প্রতাপরুদ্রকে হারাতে না পারলে আমার দক্ষিণ বিজয়ের আশা স্বপ্ন থেকে যাবে।

সুলতানের কথা শুনে কেউ কোন উত্তর দিলে না। একটু পরে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন—তুমিও কি কোন উপায় বলতে পার না সাকর মল্লিক?

জাঁহাপনা, কৌশলে কার্য উদ্ধার হতে পারে।

সুলতান খাড়া হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন—সেই কৌশলটা কি?

—যখন প্রতাপরুদ্র রাজধানীতে থাকবেন না, তখনি আমরা আক্রমণ করব উড়িষ্যা। আমরা যুদ্ধ বাঁধাব দক্ষিণে। প্রতাপ রুদ্র সসৈন্যে ছুটে যাবেন সেই দিকে। আমরা তখন তাঁর অনুপস্থিতে সহসা রাজধানী অধিকার করে বসব।

সুলতান বললেন—দক্ষিণে যুদ্ধটা বাঁধাব কেমন করে?

—দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য। গজপতি রাজাদের সঙ্গে তাঁদের বহুদিনের বিরোধ। বার বার প্রতাপরুদ্রের হাতে পরাস্ত হয়ে বিজয়নগর প্রতিহিংসা নেওয়ার সুযোগ খুঁজছে। আমরা যদি তাঁকে অস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করার একটা প্রতিশ্রুতি দিই, তাহলে দক্ষিণে গোলমাল বাঁধাতে বিশেষ কোন কষ্ট হবে না।

সাকর মল্লিকের কথা শুনে খুব খুশী হলেন সুলতান। 'উজীর' পদ দিলেন তাঁকে। যুদ্ধ-আয়োজনের সব ভারও অর্পণ করলেন সাকর মল্লিকের উপর। ঠিক হলো দক্ষিণে যুদ্ধ বাঁধাবেন গিয়ে সনাতন। পরে ফিরে গড়-মান্দারণে ইসমাইল গাজির সঙ্গে মিলিত হবেন এসে। তারপর সদলবলে প্রবেশ করবেন উড়িষ্যায় একযোগে।

এ হলো ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দের হুসেন শাহের উড়িষ্যা বিজয়ের পশ্চাৎপট। সাকর মল্লিক যোগ দিয়েছিলেন এই অভিযানে। কোন কোন ঐতিহাসিক সাকর মল্লিকের পূর্ব নাম অমর বলেও উল্লেখ করেছেন। চৈতন্য প্রদত্ত নাম সনাতন। রূপের বড় দাদা তিনি। এই অভিযানে সাকর মল্লিক হিন্দুদের উপরে যে উৎপীড়ন করেছিলেন, যেভাবে মঠ মন্দির ভেংগেছিলেন—তা দেখে হুসেন শাহ খুশীই হয়েছিলেন। বলতে গেলে সমরমন্ত্রী সাকর মল্লিকের জন্যই সেবার জয়ী হয়েছিলেন হুসেন শাহ।

কিন্তু সমর-মন্ত্রী নিজে আত্ম-গ্লানিতে অহরহ দগ্ধ হয়েছিলেন। হিন্দু হয়ে তিনি কি নিষ্ঠুরভাবেই না হিন্দুর সর্বনাশ করেছিলেন। তিনি সাধারণ একটু অনুকম্পাও দেখান নি হিন্দুদের প্রতি। নির্মমভাবে হত্যা, ধর্ষণ ও ধর্মান্তরিত করা—কোনটাই বাদ দেননি হুসেন শাহ। কি ভীষণ পৈশাচিক তাণ্ডব। ভাবতে গিয়ে সাকর মল্লিক শিহরিত হয়ে উঠেন। এমন বিধর্মী রাজার দাসত্ব করছেন তিনি। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন একটা অসহনীয় জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেন হুসেন শাহের মহাবুদ্ধিমান সমর-মন্ত্রী। যেমন করেই হোক এর মূলোচ্ছেদ করতে হবে। নিজের সংকল্পে নিজে কেমন যেন দৃঢ় হয়ে উঠেন মনে মনে।

চৈতন্য চরিতামৃতেই আছে সনাতন প্রভুকে অনেকগুলি পত্র দিয়েছিলেন। সকলের অজ্ঞাতে গৌড়ের শক্তিশালী দুই মন্ত্রীর সঙ্গে প্রভুর একটা গোপন পরামর্শ চলছিল। গড়-মান্দারণ থেকে গোবিন্দ বিদ্যাধরের অবরোধ তুলে নেওয়ার পর উড়িষ্যার রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে চৈতন্যদেব দূরে ছিলেন না। তা না হলে প্রতাপরুদ্রদেব, প্রভু গৌড়দেশ হয়ে বৃন্দাবন যাবেন বলে যে আয়োজন করলেন, তা' আজ ৫০০ শত বছরের মধ্যে ২৯ বছর বয়স্ক কোন বাঙালী যুবকের ভাগ্যে ঘটেছে কি ?

মহাপ্রভুর গৌড়দেশে গমনের সংবাদ সারা উড়িষ্যায় ঘোষণা করে জানান হয়েছিল। পাঠান হয়েছিল প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীর নিকট আজ্ঞাপত্র। যে পথ দিয়ে প্রভু যাবেন সে পথে—

গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচশত নব্য গৃহে সামগ্রী ভরিবা॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রি দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা॥
দুই মহাপাত্র[১] হরিচন্দন সঙ্গরাজ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা, কর সর্বকাজ॥
এক নব্য নৌকা আনি রাখ নদী তীরে।
যাহা স্নান করি প্রভু যান নদী পারে॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপন কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, যেন মরি॥
চতুর্দ্বারে[২] করহ উত্তম নব্য বাস।

১. সীমান্ত প্রদেশের দুইজন শাসন কর্তা। ২. কটকের অপর পারে অবস্থিত চৌদুয়ার নামক গ্রাম।

রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশে ॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বু গৃহে স্ত্রীগণ চড়াল ॥
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা ॥
চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখে করয়ে প্রণাম ॥ (চৈ·চ,—মধ্য, ১৬শ পঃ)

প্রতাপরুদ্রের এই যে ব্যবস্থা, সেকি শুধু গৌর ভগবান বলে। ভগবানের জন্য রাত্রি-দিবা বেত্র হস্তে প্রহরী রাখার কোন প্রয়োজন ছিল কি? চৈতন্যদেবের সঙ্গে রাজার একটা গোপন পরামর্শ হয়েছিল। প্রতাপরুদ্রদেব বুঝতে পেরেছিলেন, রূপ-আর সাকর মল্লিককে সরাতে না পারলে হুসেন শাহের বিষদাঁত ভাঙা যাবে না।

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ' পুস্তকে লিখেছেন—

"গৌড়ে আসিবার প্রধান এবং একমাত্র কারণ—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে মন্ত্রিত্ব ছাড়াইয়া মহাপ্রভুর ধর্মান্দোলনের কার্যে তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিকে নিয়োজিত করা।'—পৃষ্ঠা ১৩৮।

শুধু এইটুকুই নয়। তীক্ষ্ন বুদ্ধি সম্পন্ন চৈতন্যদেবের দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। তখনকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে চোখ বুলালে দেখা যাবে হুসেন শাহ যখন গৌড়ের সিংহাসনে—দিল্লীর সিংহাসনে তখন সিকান্দার লোদী। স্টুয়ার্টের মতে তিনি রাজত্ব করেছিলেন ২৮ বছর। (১৪৯১—১৫২০ খ্রীঃ)। এলিফ্যানস্টোন বলেন, সিকান্দারের মৃত্যু তারিখ ১৫১৭ কিংবা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ। ভিনস্যাণ্ট স্মিথ্ বলেন—তিনি ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মারা যান। ভিনস্যাণ্ট্ স্মিথের গণনাই সত্য বলে মনে হয়। সকল ঐতিহাসিকই একমত—সিকান্দার খুব হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুদের দেব-দেবী মূর্তি ও মন্দির যা পেয়েছেন ভেঙ্গেছেন। বাধা দিয়েছেন হিন্দুদের তীর্থযাত্রায়। বিশেষ পর্বে বা তিথিতে পবিত্র নদ-নদীতে স্নান করতেও দেননি। বৃন্দাবনের অসংখ্য মঠ-মন্দির ধ্বংস করেছেন তিনি। কাশীর উপরে তাঁর অত্যাচার ছিল সর্বাধিক।

দিল্লীর সঙ্গে গৌড়ের সম্পর্ক তখন কেমন?

তখন পাঠান আমল। 'সিকান্দার বাদশা আর হুসেন শা', দুজনেই আফগান পাঠান। হিন্দুস্থানে তখন পাঠান সাম্রাজ্য বলে কিছু ছিল না। ভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজা। গৌড় তখন দিল্লীর অধীন নয়। সিকান্দার একবার বাংলা

আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু সুবিধা করতে পারেননি। 'বার' নামক স্থানে যে সন্ধি হয়, তাতে গৌড়কে স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকার করে নেন সিকান্দার।

এই ঐতিহাসিক পটভূমির কথা স্মরণ রেখে শ্রীচৈতন্যের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করুন। শ্রীচৈতন্য চেয়েছিলেন রূপ, সনাতনকে বৃন্দাবনে বসাতে। তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি মরবে। একদিকে হুসেন শাহী প্রতাপের হাত থেকে রক্ষে পাবে বাংলা আর উড়িষ্যা, অন্যদিকে বৃন্দাবনে সিকান্দারী তাণ্ডব ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হবে হিন্দু আর হিন্দুর মঠ-মন্দির ও দেব-দেবী। এই দূরদর্শিতাই তৎকালে হিন্দুদের বাঁচিয়েছিল। হয়ত প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে এই গোপন পরামর্শ করেছিলেন তিনি। রামকেলি গ্রামে এসে গৌড়ের এই প্রধান দুই মন্ত্রী, মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে তাঁর দলে যোগ দিয়ে ঈপ্সিত কাজে আত্মনিয়োগ করবেন—এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিনি হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন পুরীতে। প্রতাপরুদ্র সংবাদ শুনে খুশীই হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যে দেবত্ব আরোপ করে তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর কথা আমরা ভুলেই গিয়েছি। তাই ত ডঃ এস. কে. দে তার 'বৈষ্ণব ফেথ্ এণ্ড মুভ্‌মেণ্ট ইন বেঙ্গল' নামক পুস্তকে—লিখেছেন—"চৈতন্যচরিত্রে দেবত্ব ও তদঙ্গীয় অলৌকিকত্ব পরে পরে আরোপিত হওয়ায় বুদ্ধি, বিদ্যা, চতুরতা, সম্প্রদায় গঠনে উপযুক্ত লোক সংগ্রহের ক্ষমতা—এই সমস্ত অসাধারণ মনুষ্যোচিত গুণাবলী ও প্রতিভা, যথাযথরূপে চিত্রিত হয় নাই। তাহাতে চৈতন্যচরিত্র অলৌকিক ও কাল্পনিক হইয়া পড়িয়াছে।—সত্যি, চৈতন্যচরিত্র আবর্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।" পৃষ্ঠা—১৪২

সেদিন যদি শ্রীচৈতন্যদেব রূপ এবং সনাতনকে হুসেনের মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়ে আনার প্রতিশ্রুতি না পেতেন (অর্থাৎ তাঁর দেবতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিল বলেই) তাহলে উড়িষ্যার ভাগ্যে মুসলমানী অত্যাচার কোথায় গিয়ে দাঁড়াত আজকে লিখতে গিয়েও তা ভাবতে পারছি না। অথচ এই চৈতন্যদেবকে উড়িষ্যার আধুনিক ঐতিহাসিকগণ দায়ী করছেন এই বলে যে—চৈতন্যদেব উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলেই নাকি উড়িষ্যাবাসীরা হীনবীর্য হয়ে পড়েছিলেন। 'উড়িষ্যার প্রাচীন গৌরব' কাহিনীতে একজন ওড়িয়া ঐতিহাসিক লিখেছেন: প্রতাপরুদ্রদেবের সময় হইতেই উড়িষ্যার পতন শুরু হয়। উড়িষ্যায় এক নবযুগের সূচনা হয়। শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যায় সর্বত্র বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেন। ইহার মধ্যেই উৎকল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার বীজ নিহিত ছিল। প্রতাপরুদ্র নিজেই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিলেন। রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব সর্বযুগে সর্বদেশে সর্বনাশের কারণ হইয়াছে। ইহা ইতিহাসের শিক্ষা। ইহা বিশেষত ভারতের ন্যায় ধর্মপ্রভাবশীল দেশের পক্ষে বিশেষ ভাবে সত্য।

রাজা প্রতাপরুদ্র ও তাহার সুদক্ষ মন্ত্রী রামানন্দ রায় উড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত করেন এবং এইরূপে গজপতি রাজাদের সুপ্রতিষ্ঠিত উৎকল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেন।'[১]

ইহা যে কত দূর মিথ্যা, যাঁরা মহাবিপ্লবী শ্রীচৈতন্যদেবের সত্য ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন এবং উড়িষ্যার তৎকালীন ইতিহাস জানেন, তাঁরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

উড়িষ্যার প্রকৃত পতনের মূলে ছিলেন গোবিন্দ বিদ্যাধর। তিনিই গড় মান্দারণ দুর্গে হুসেন শা'র সেনাপতি ইসমাইল গাজির সঙ্গে গোপনে যে পরামর্শ করেছিলেন, তাই ধীরে ধীরে কার্যকর করে তুলেছিলেন অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে। তার ধূর্তামি ধরে ফেলেছিলেন শ্রীচৈতন্য। সে কাহিনীতে আসছি পরে।

ষোড়শ শতাব্দীতে উৎকলে অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। কিন্তু এই মহান ব্যক্তিত্ব কি করে ধীরে ধীরে দেশের জনসাধারণের শত্রু হয়ে উঠেছিলেন, সে কাহিনী অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। আমরা যাঁদের মহাপুরুষ বলি, দেবতা জ্ঞানে মূর্তি গড়ে পূজো করি, তাঁদের জীবনে কারুরই শত্রুর অভাব ছিল না। কি যিশুখ্রীষ্ট, কি হজরত মহম্মদ, কি বুদ্ধ, কি শ্রীকৃষ্ণ—সকলেরই মহান আদর্শের বিরোধিতা করে একদল দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন অবিবেচক লোক বরাবর যুগে যুগে শত্রুতা করে এসেছে। শ্রীচৈতন্যর বেলাও এই শত্রুতার অভাব ঘটেনি।

'উড়িয়া ভাষা এবং সাহিত্য' নামক পুস্তকে শ্রীনীলকণ্ঠ দাস লিখেছিলেন, স্মার্তদের দুর্ব্যবহারে একদা মহাপ্রভু নবদ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পুরীতে এসে মহাপ্রভু পুনরায় সেই স্মার্তদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন প্রথমেই। সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রথম তাঁকে আক্রমণ করেন শাস্ত্রযুদ্ধে। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে প্রভু পর পর সাতদিন মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণের পর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন—শংকর ভাষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্ত বিরুদ্ধ। বললেন—মায়াবাদীগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। মহাপ্রভুর প্রবল যুক্তিতর্কে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্যের অনুরক্ত হলেন বটে, কিন্তু স্মার্ত আনুগামীদের বিষ নজরে পড়লেন তিনি। একথা নীলকণ্ঠ দাসও বলেছেন। স্মার্তদের রোষের আরো কারণ ছিল। মায়াবাদী মার্তচূড়ামণি রাজপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য যে সহসা এভাবে চৈতন্য-স্তাবক হয়ে পড়েছেন, এ তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারল না।

একের পর এক ঘটতে লাগল আরো আশ্চর্যজনক ঘটনা। রাজমাহেন্দ্রীর ক্ষত্রপ মহাধনাঢ্য রায় রামানন্দ পট্টনায়ক যখন কৃষ্ণনাম কণ্ঠে নিয়ে অতবড় সম্মানিত রাজপদ

---

১. ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যা সরকারের পাবলিক রিলেসনস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। নবকলেবর স্মরনী ও উড়িষ্যা পরিচিত পুস্তিকা। পৃ. ২৭

হেলায় ত্যাগ করলেন হাসতে হাসতে। তখনি চৈতন্য-বিরোধীদের হাতে এলো মস্ত সুযোগ। তারা জনসাধারণকে বুঝাতে লাগল—এই ছিঁচ কাঁদুনে গোপী প্রেমিক ছোঁড়ার পাল্লায় পড়ে রাজ্যটা রসাতলে গেল। রায় রামানন্দের মত বিচক্ষণ প্রদেশপাল যদি গোপী প্রেমে হাবুডুবু খান, তাহলে দেশটা শাসন করবে কে? এঁদের দেখাদেখি দেশের ছোঁড়ারা যে উচ্ছন্নে যাবে। এর এখুনি একটা বিহিত করা দরকার।

এখানেই শেষ নয়। উড়িষ্যাধিপতি স্বয়ং প্রতাপরুদ্রদেবও যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলেন শ্রীচৈতন্যর শ্রীচরণকমলে। তখনি সোচ্চার হয়ে উঠল গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্র।

প্রতাপরুদ্রদেব দীক্ষা নেন নি শ্রীচৈতন্যের কাছে। তিনি একান্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন মহাপ্রভুর। তাঁর দিব্য ভাবে বিভোর কৃষ্ণার্তি, উদার ধর্মমত, মহাপুরুষোচিত বিরাট ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি প্রভৃতি ঈশ্বরীয় গুণরাশিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। তাই চৈতন্যদেবকে মহারাজ বলতেন 'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা'।

শ্রীচৈতন্য কিন্তু প্রথমে রাজাকে দীক্ষা ত দূরের কথা দর্শন দান করতেও চান নি। কিন্তু মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সেকি করুণ আর্তি। তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে এই বলে কটক থেকে পত্র লিখলেন ঃ

প্রভু কৃপা বিনা মোরে রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌর হরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী॥

(চৈ· চ· মধ্য—১২ পরি·)

তখন মহাপ্রভু বললেন—'সন্ন্যাসীর উচিত নহে রাজ দরশন।' সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজাকে জানালেন সব কথা। কিন্তু মহারাজ তখন শ্রীচৈতন্যদেবকে শুধু মাত্র একবার দেখার জন্য উম্মাদ। তাই একান্ত আত্মসমর্পণ করে বললেন—

মোর প্রতিজ্ঞা তাহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই দরশন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব আকরণ॥

(চৈ· চ· মধ্য—১২ পরি·)

মহাপ্রভু তবু রাজী হলেন না। পারিষদবর্গ কত তাঁকে বুঝালেন। নিত্যানন্দ, রায় রামানন্দ কত মিনতি করলেন। শেষে সকলে বলে কয়ে মহাপ্রভুর একখানি বস্ত্র পাঠালেন মহারাজের কাছে।

বস্ত্র পাইয়া রাজার আনন্দিত হইল মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥

এই বস্ত্র দেখেই তাঁর চিত্ত বিহ্বল হল। মহাপ্রভুর চরণ দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রায় রামানন্দকে অনুনয় করে বললেন—যেমন করে হোক আমাকে একবার মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের সুযোগ করে দাও। রামানন্দ মহাপ্রভুর সম্মতি আদায় করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। অনুনয়-বিনয় করে কতভাবে বললেন। চৈতন্যদেব সব শুনে বললেন—এতে আমার এবং রাজার দু' জনেরই ক্ষতি হবে। পরলোক দূরে থাকুক আমাকে এই লোকেই উপহাস করবে। তা হয় না রামানন্দ। তারপর বললেন ঃ

প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোক গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥

(চৈ. চ. মধ্য—১২ পরি.)

সাদা কাপড়ে যদি একবিন্দু কালির ফোঁটা পড়ে, তা যেমন জ্বলজ্বল করে তীব্র হয়ে দেখা দেয়, তেমনি সন্ন্যাসীর সামান্যতম পদচ্যুতিও বিরাট আকার ধারণ করে। সর্বলোকে তাই নিয়ে উপহাস করে। আমি ত সাধারণ মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী। তাই আমার পদচ্যুতির ভয়ও বেশি।

শেষে রাজাকে না দেখা দিয়ে 'আত্ম বৈজায়তে পুত্র' ঃ এই শাস্ত্রবাণী স্মরণ করে প্রতাপরুদ্রের কিশোর পুত্রকে দেখতে চাইলেন। এইভাবে নানা ঘটনার পর শেষে অবশ্য চৈতন্যদেব মহারাজাকে দেখা দিয়েছিলেন এবং প্রতাপরুদ্র চৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

এই যে শ্রীচৈতন্য সকাশে মহারাজের আত্ম-সমর্পণ এই ঘটনাকেই রাজ্যের উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারীরা গ্রহণ করলে অন্যভাবে। তারা প্রচার করতে লাগল, বৃদ্ধ বয়সে রাজার ভীমরতি ধরেছে। উন্মাদ হয়েছেন গোপী-প্রেমে। এবার উৎকলকে তিনি নববৃন্দাবনে পরিণত করবেন। বৃদ্ধ রাজা শেষে কি কেলেংকারীই না করছে। তারা আরো প্রচার করতে লাগল, কৃষ্ণ-ভক্তিরসে নিমজ্জিত হওয়ার জন্যই রাজ্যের একের পর এক দুর্গের ঘটছে পতন।

উদয়গিরি, কোণ্ডাভিডু, অদ্দাংকি, বেণীকোণ্ডা বেল্লামা কোণ্ডা, নাগার্জুন কোণ্ডা, কোট্টারামা প্রভৃতি দুর্গগুলি একে একে দখল করে নিল শত্রুরা। ক্রমে উড়িষ্যার বিশালত্ব হ্রাস পেতে লাগল। (**Further sources of Vijaynagar History. Vol. I. P. 201**)।

১৫১৫—১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিজয়নগর রাজ কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন কোণ্ডাপল্লী, রাজমাহেন্দ্রী এবং সিংহাচলম। এমনি ভাবে বার বার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় ঘটতে লাগল মহারাজের। পূর্বের সেই অমিত শৌর্য-বীর্য কোথায় যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল মহারাজ প্রতাপরুদ্রের। একদা যাঁর নাম শোনামাত্র সেকেন্দর নামক যবনরাজ গিরি-গহ্বরে আত্মগোপন করেছিল, গুলবার্গ দেশের রাজা মৃত্যুভয়ে কম্পিত হয়ে স্বজনবর্গের সঙ্গে অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন, যিনি গৌড়রাজকে পরাজিত করে গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেছিলেন—আজ তাঁর একী শোচনীয় পরিণতি।

এইসব কথা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল জনসাধারণকে চৈতন্যবিরোধী গোষ্ঠী। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগল, এর জন্য একমাত্র দায়ী গোপীপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীচৈতন্য। এই চৈতন্য-বিরোধী গোষ্ঠীর মূল নেতা হলেন সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর। মনে তাঁর উচ্চাশা তিনি রাজা হবেন উৎকলের।

ধীরে ধীরে চৈতন্য-বিরোধী-চক্র আরো সক্রিয় হয়ে উঠল। জগন্নাথদেবের পাণ্ডারা এবং ব্রাহ্মণেরা মনে মনে প্রভুর উপর ত অসন্তুষ্ট ছিলেনই, শুধু মহারাজের ভয়ে এই অসন্তুষ্টি বাইরে প্রকাশ করতে পারছিলেন না। চৈতন্যদেব তখন উৎকলে জীবন্ত-জগন্নাথ বলে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেছেন 'নীলাচল-বিভূষণ' বলে গৌরহরিকে। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস ত স্পষ্টই বলেছেন ঃ

মহানন্দে সর্বলোকে জয় জয় বলে।
আইলা সচল জগন্নাথ নীলাচলে॥ (চৈতন্য ভাগবত)

ফলে পাণ্ডাগণ শ্রীচৈতন্যের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন স্বাভাবিকভাবেই। আরো অঘটন ঘটতে লাগল—পুরীতে ভক্তগণ পৌঁছে আগে জগন্নাথ দর্শন না করে ছুটতেন শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করতে। তাই না দেখে সবিস্ময়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবও জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসায় আগে চলিল ধাইয়া॥

(চৈ· চ· মধ্য-১১ পরি)

সার্বভৌম ভট্টাচার্য অবশ্য মহারাজকে অন্যভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন—প্রেমের রীতিই এই। মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলবার জন্য সকলের উৎকণ্ঠা। তাঁকে নিয়েই ভক্তগণ আসবেন জগন্নাথ দর্শনে।

এর পরের ঘটনা রাজ্য-প্রশাসন নিয়ে। মহাপ্রভু নাকি মহারাজের রাজ্যপ্রশাসন ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করেছিলেন। স্মার্তসমাজের বক্তব্য—মেদিনীপুরের মালঝিট্যা দণ্ডপাটের প্রশাসক ছিলেন রায় রামানন্দের ছোট ভাই গোপীনাথ পট্টনায়ক। তিনি লক্ষ টাকা তহবিল তছরূপ করেছিলেন। ফলে তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন প্রতাপরুদ্রদেব। বধ্যভূমিতে তাঁকে 'চাঙ্গে' চড়াতে আদেশ দিয়েছিলেন মহারাজ। এমন সময় ভক্তদের অনুরোধে যেহেতু রামানন্দের গোটা পরিবার প্রভুর ভক্ত এবং মহারাজও শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুগত—তাই নাকি রাজার কাছ থেকে গোপীনাথের প্রাণদণ্ডজ্ঞা মকুব করে তাঁকে বেকসুর খালাস করেছিলেন মহাপ্রভু।

এ সম্পর্কে আসল ঘটনাটি জানা প্রয়োজন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন।' আমি সেই ঘটনাটি আমার কথায় না বলে মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের কথায় এখানে পরিবেশন করছি ঃ

"ভবানন্দের পাঁচ পুত্র সকলেই প্রভুর দাস। রামানন্দ প্রভুর বাম বাহু—বিশাখার অবতার, বাণীনাথ প্রভুর সেবায় নিযুক্ত, গোপীনাথ বিষয়কার্য করেন। ইহাদিগের দুইজন—রামানন্দ ও গোপীনাথ, প্রতাপরুদ্রের সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য শাসন করেন। ইহাদিগকে অধিকারীও বলে, রাজাও বলে। ইঁহারা রাজার যে কার্য তাহাই করিতেন, তবে মাসিক বেতন পাইতেন। এই রাজ্যের রাজা যদি অসন্তুষ্ট হইতেন, তবে চাকুরি যাইত। এইরূপ গোপীনাথ মালজ্যাঠার অধিকারী। তাঁহার নিকট মহাজনের লক্ষ কাহন পাওনা হয়। গোপীনাথ চিরদিন বড় বাবু-লোক, অপব্যয়ে সমুদয় উড়াইয়া দেন। মহারাজ সরকারের দেনার টাকা দিতে পারেন না। সেই ঋণ-শোধের প্রস্তাবে বলিলেন,—'আমার ১০।১২ টি ঘোড়া আছে, তাহাই মূল্য করিয়া লও। আর যাহা কিছু বাকি থাকে, অন্যান্য দ্রব্য বেচিয়া দিব।' প্রতাপরুদ্রের কুমার, পুরুষোত্তম জানা, সেই ঘোড়াগুলির মূল্য নির্ধারণ করিতেছেন, তাঁহার এ বিষয়ে বুৎপত্তি ছিল। তিনি অল্প মূল্য বলিতেছেন দেখিয়া গোপীনাথ ক্রোধ করিয়া বলিলেন,—'আমার ঘোড়া তোমার মতন ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক চাহে না, তবে এত কম মূল্য কেন বল ?'

সেই রাজপুত্রের রোগ ছিল, তিনি ঐরূপ ঘাড় ফিরাইতেন। কাজেই গোপীনাথের কথায় তিনি আরও চটিয়া গেলেন। গোপীনাথের ভরসা এই যে, তাহারা কয়েক ভাই রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রিয়পাত্র। সেই বলে রাজার পুত্রকে পর্যন্ত দুর্বাক্য বলিতে সাহসিক হইয়াছিলেন। রাজপুত্র কাজেই রাজার কাছে গোপীনাথের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিলেন। এইরূপে প্রতাপরুদ্রের নিকট কোনক্রমে অনুমতি

লইয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইল। চাঙ্গ মানে এই যে, নিম্নে খড়্গ পাতিয়া উপরে অপরাধীকে রাখা হয়। সেখান হইতে অপরাধীকে এরূপভাবে ফেলিয়া দেওয়া হয় যে সে দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। গোপীনাথকে যখন চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রতাপরুদ্রের নীচেই ভবানন্দ-পরিবারের মান। তাঁহার পুত্রকে চাঙ্গে চড়ান হইল, ইহাতে নগরে অবশ্য গোল হইবার কথা। কয়েকজন আসিয়া প্রভুর স্মরণ লইয়া বলিল,—'প্রভু রামানন্দের গোষ্ঠী তোমার দাস ঃ তাহাদিগকে রক্ষা কর।"

এখন রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর দাস। প্রতাপরুদ্র আপনি প্রভুর নাম রাখিয়াছেন, 'প্রতাপরুদ্র-সংস্ত্রাতা।' প্রভু একটি কথা বলিলে গোপীনাথের প্রাণ রক্ষা হয়। প্রভুর একটি কথা বলাও কর্তব্য, যেহেতু ভবানন্দ গোষ্ঠী সমেত তাঁহার অনুগত, আর রামানন্দ তাঁহার প্রাণ বলিলেও হয়। কিন্তু প্রভু কোমল হইলেন না, বলিলেন,— 'গোপীনাথ রাজার নিকট প্রকৃতই ঋণী। সে যে বেতন পায়, তাহাতে অনায়াসে সুখে কাল কাটাইতে পারে। তাহা না করিয়া সে চুরি করিবে, করিয়া কেবল কুকার্যে রাজার অর্থ ব্যয় করিবে। সেত অবশ্য রাজার নিকট দণ্ডার্হ। আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না।'

প্রভু এই কথা বলিতেছেন এমন সময় সংবাদ আসিল যে গোষ্ঠীসমেত ভবানন্দকে রাজা বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছেন। পরে জানা গেল যে, কথাটি অলীক। যাহা হউক, ভক্তগণ প্রথমে শুনিয়া ব্যথিত হইলেন, এমনকি, স্বরূপ পর্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন ; বলিলেন,—'প্রভু রামানন্দ স্ববংশে বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহারা তোমার দাস, তাঁহাদিগকে রক্ষা কর।'

মনে ভাবুন, রাজা প্রতাপরুদ্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাঁহার উপর কেহ কর্তা নেই। তিনি যদি কোন আজ্ঞা করেন, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, অবশ্য পালন করিতে হইবে। কাহারও এমন সাধ্য নাই যে তাহাতে দ্বিরুক্তি করে। প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্র অবশ্য অনেক ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু বিষয়কার্যে গুরুর পরামর্শ কি আদেশ সকল সময় শুনিলে রাজ্যশাসন চলে না। আবার কাশী মিশ্র অন্যের ন্যায় রাজার অধীন, তিনিই বা সাহস করিয়া রাজ্যসংক্রান্ত কোন অনুরোধ রাজাকে কিরূপে করিবেন ? তবে তখন পুরীতে কেবল একজন ছিলেন, যাঁহার আজ্ঞা রাজা অবহেলা করিতে পারিতেন না। তিনি আমাদিগের প্রভু। রাজার ক্ষোভ যে, প্রভু তাঁহাকে আজ্ঞা করেন না। ভবানন্দ পরিবারের বিপদ হইল, সকলে প্রভুর শরণ লইলেন। কিন্তু যখন স্বরূপ প্রভৃতি এইরূপ অনুরোধ

করিলেন, তখন প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমরা বল কি ?" আমি সন্ন্যাসী হইয়া কি আমার ব্রত ভঙ্গ করিব ? তোমরা কি বল যে, আমি এখন রাজার কাছে যাই, যাইয়া আঁচল পাতিয়া কৌড়ি ভিক্ষা করি ? আচ্ছা আচ্ছা তাহাই না হয় করিলাম ; তাহা হইলে, আমি একজন পাঁচ গণ্ডার সন্ন্যাসী, আমাকে দুই লক্ষ কাহন ভিক্ষা রাজা কেন দিবেন ?"

এই কথা হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল যে গোপীনাথকে খড়্গের উপর ফেলিতেছে। এইবার দিয়া চারিবার এইরূপে সংবাদ বধ্যস্থলে হইতে আসিল। প্রভু তবু প্রতিজ্ঞা ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, 'তোমরা যদি এত ভয় পাইয়া থাক, শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় লও, তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।' রামানন্দের ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রকৃত বিষয়ী এই গোপীনাথ। তিনি যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন বাঁদরামী করিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে, এ পর্যন্ত তিনি বিফলে কাটাইয়াছেন। তখন জগতের সমুদয় মায়া ত্যাগ করিয়া একমনে শ্রীকৃষ্ণের নাম জপিতে লাগিলেন।

যখন মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানের নিমিত্ত ভক্তগণ প্রার্থনা করিতেছেন, তখন সেখানে মহাপাত্র হরিচন্দন ছিলেন। তিনি একেবারে রাজার নিকট গমন করিলেন ; করিয়া বলিতেছেন, 'মহারাজ ! গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। তাহার নিকট টাকা পাওনা থাকে, তাহাকে বধ করিলে কি ফল হইবে ? বিশেষতঃ ভবানন্দ পরিবার কেবল তোমার কৃপাপাত্র নহে, মহাপ্রভুর কৃপাপাত্রও বটে।' এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—'সে কি ! আমি তাহাকে বধ করিতে ত বলি নাই। আমাকে সকলে বলিল, ভয় না দেখাইলে টাকা আদায় হইবে না, তাহাই করিতে বলিয়াছিলাম।' রাজা তৎপরে হরিচন্দনকে বলিলেন,—'তুমি শীঘ্র যাও, যাইয়া তাহাকে চাঙ্গ হইতে নামাও গিয়া।' ফল কথা, গোপীনাথ মহাপ্রভুর প্রিয় এই কথা মনে হওয়ায় রাজা একটু ভীত হইলেন।

ইহার পরে রাজা তাঁহার চির প্রথানুসারে, তাঁহার গুরু কাশী মিশ্রের পদসেবা করিতে আসিলেন। তখন কাশী মিশ্র বলিতেছেন,—'দেব, আর এক কথা শুনিয়াছেন। মহাপ্রভু আব এখানে থাকিবেন না। অমনি প্রতাপরুদ্রের মুখ শুকাইয়া গেল, বলিতেছেন,—'সে কি ? সব খুলিয়া বল।' তখন কাশী মিশ্র বলিলেন, গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইলে. নগর সমেত লোক যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, 'আমি রিক্ত সন্ন্যাসী, আমার নিকট বিষয়-কথা কেন ? রাজা ভয় পাইয়া বলিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। তখন কাশী মিশ্র রাজার নিকট বলিলেন.—

'আপনার উপর ঠাকুরের কোন ক্রোধ নাই। তিনি বরং গোপীনাথকে নিন্দা করিলেন, বলিলেন, যে ব্যক্তি রাজার দ্রব্য অপহরণ করে সে দণ্ডার্হ, আর তাহাকে দণ্ড করিয়া রাজা তাঁহার কর্তব্য কার্যই করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরক্তির কারণ এই যে, তাঁহার বিষয় কথা শুনিতে হয়। তাই তিনি সংকল্প করিয়াছেন যে, এস্থান হইতে আলালনাথে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন।'

রাজা বলিলেন,—'কি ভয়ঙ্কর সংবাদ! মহাপ্রভু গেলে আমরা কিরূপে বাঁচিব? আমি গোপীনাথের সমুদয় ঋণ মাপ করিলাম।'

তখন কাশী মিশ্র আবার বলিতেছেন,—'আপনি গোপীনাথের ঋণ মার্জনা করিলে যে মহাপ্রভুর সন্তোষ হইবে, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা নয় যে, আপনার ন্যায্য যাহা পাওনা, তাহা আপনি পরিত্যাগ করেন। আপনি মহাপ্রভুর জন্য আপনার পাওনা ত্যাগ করিলেন, ইহা শুনিলে মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ ভিন্ন সুখী হইবেন না।' রাজা বলিলেন,—'তবে তুমি তাঁহাকে একথা বলিও না। কথা এই যে, ভবানন্দের গোষ্ঠীকে আমি নিজ জন বলিয়া বোধ করি। তাহারা অর্থ অপহরণ করে জানি, কিন্তু আমি কিছু বলি না। তাহার পর, তাহারা গোষ্ঠীসমেত এখন মহাপ্রভুর প্রিয়, কাজেই আমার আরও প্রিয় হইয়াছে। আমি তাহাকে আবার মালজ্যাঠার অধিকারী করিয়া পাঠাইতেছি। সে যে অর্থ অপহরণ করিত, তাহার কারণ বোধ হয়, তাহার বেতন অল্প ছিল। এখন তাহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিব, তাহা হইলে আর চুরি করিবে না।'

গোপীনাথ আবার অধিকারী হইলেন। রাজা তাঁহাকে 'নেতধটি' অর্থাৎ অধিকারী সাজ পরাইলেন। তখন গোপীনাথ সেই রাজবেশে ভ্রাতাগণ ও পিতাসহ আসিয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।'—শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত। ৫ খণ্ড। পৃঃ ৯৯—১০১।

ঘটনাটি মোটামুটি এই। কিন্তু চৈতন্য-বিরোধী-গোষ্ঠী ঘটনাটিকে সাজাল অন্যভাবে। তারা প্রচার করতে আরম্ভ করল, রাজার প্রশাসন ব্যাপারেও নাক গলিয়েছে ঐ গোপীপ্রেমে মাতোয়ারা নবদ্বীপ-নন্দন। মহামন্ত্রী, অমাত্য, রাজকর্মচারী এবং দেশের তথাকথিত হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেই আক্রোশে ফেটে পড়লো। তারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হলো যেমন করেই হোক মহারাজকে ঐ কৃষ্ণ-প্রেমিক চৈতন্যের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতেই হবে। এ ব্যাপারে বলাবাহুল্য সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর ইন্ধন যোগাতে কসুর করলেন না।

ক্রমে ক্রমে উৎকলের জনসাধারণের কাছে ও উচ্চকোটি রাজকর্মচারীদের দৃষ্টিতে

যেন হেয় প্রতিপন্ন হতে লাগলেন মহাপ্রভু। কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত কাহিনী পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায়, এ ব্যাপারে শ্রীচৈতন্যের কোন হাতই ছিল না বা তিনি ব্যাপারটিকে সমর্থন করেননি। গোড়া থেকেই ছিলেন সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট এবং উদাসীন।

উড়িষ্যার আধুনিক ঐতিহাসিকগণ, এমন কি ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাবেরও অভিমত, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য পরবর্তী কালে একটা মনগড়া ভিন্ন কাহিনী সাজিয়ে সাফাই গেয়েছেন মাত্র। ডঃ মহাতাব তাঁর 'হিস্ট্রি অফ ওড়িষ্যা' গ্রন্থে সোজাসুজি বলেছেন ঃ A doctrine that preaches inaction and sentimentalism harmful to the ordinary man in his daily walk of life and it is simply fatal to an administrator who holds the destiny of millions. The attempt to make the Bhakti cult a mass religion and to influence the king and his officers by its sweet Pessimistic philosophy had no doubt been fatal to the social and political life of the country. (History of Orissa, Vol. I. P. 329)।

উচ্চকোটির বর্ণহিন্দুগণ আর তথাকথিত ব্রাহ্মণ-সমাজ ধর্মবিপ্লবী এই নেতাটিকে কিছুতেই মনে প্রাণে সহ্য করতে পারছিল না। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, যবন, অস্পৃশ্য—সকলের প্রতি তিনি উদার। সকলকেই তিনি আলিঙ্গন করেন, কোল দেন পরম প্রেম-ভরে। শূদ্রকেও বসান গুরুর পদে। তিনি বললেন ঃ

কিবা বিপ্র ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ (চৈ. চ. মধ্য—৮ম. পরি.)

রায় রামানন্দের সাথে 'সাধ্যসাধন তত্ত্ব' আলোচনা করে খুশি হয়ে যখন তাঁকে আলিঙ্গন করেন, তখন রায় রামানন্দের আশ্রিত ব্রাহ্মণগণই মনে মনে বিচার করে পরস্পর বলাবলি করছিলেন ঃ

এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন॥

(চৈ. চ. মধ্য.—৮ম. পঃ)

এ কেমন সন্ন্যাসী, যাঁর কাছে স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য বলে কোন জাত নেই। সে যুগের সমাজ ব্যবস্থার উপরে দাঁড়িয়ে এত বড় কথা বলা কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না বর্ণহিন্দুরা। তাঁরা দেখলেন—যাদের তাঁরা সমাজে নিপীড়ন ও নিষ্পেষণ করে নিজেদের উচ্চ-বর্ণত্ব জাহির করতেন, শ্রীচৈতন্য তাদেরই টেনে নিচ্ছেন

আপন কোলে পরম করুণাভরে। শুচি-অশুচির বালাই নেই। তিনি যেন বর্ণ হিন্দুদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলছেন ঃ

মুচি হয়ে শুচী হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।
শুচী হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে ॥

এত বড় গা-জ্বালা-কথা শুনে বর্ণ হিন্দুরা ক্ষোভে, রাগে যেন ফেটে পড়লেন। এই বিশ্বজনীন উদার ধর্মমতের অভ্যুদয়, সংস্কারান্ধ, স্বার্থসন্ধ ধর্মধ্বজীরা পারলো না কিছুতেই সহ্য করতে। তারাও অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল।

পঞ্চদশ, ষোড়শ শতাব্দীতে উৎকলে বৌদ্ধদের একটা বিশেষ স্থান ছিল। তাঁরা সংখ্যায় কম ছিলেন না। কবি বলরাম দাসকে প্রতাপরুদ্রদেব রাজসভা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। যদিও তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, 'পণ্ডিতেরা বলেছেন তিনি নাকি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন।' চৈতন্যদেব নীলাচলে আসার পূর্বে উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ দলাদলি চরম অবস্থায় পৌঁচেছিল। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের সময় ত্রিমন্দনগরে তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধদের পরাজিত করে তাঁদের বৈষ্ণব করেছিলেন। এই বৌদ্ধরা যে কোন মতাবলম্বী ছিলেন, তা জানা যায়নি। বৌদ্ধদের শূন্যবাদের স্থানে শঙ্করাচার্য ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—জ্ঞানমার্গে দেখিয়েছিলেন মুক্তির পথ। কিন্তু মহাপ্রভু শূন্যের স্থানে রাধা-কৃষ্ণের নিত্যবিহার করলেন প্রতিষ্ঠা। জ্ঞান কর্ম ছেড়ে কেবল রাগানুগ ভক্তিমার্গে রাধা-কৃষ্ণের বিহার চিন্তা করে মধুর রসের সখী ভাবের সাধনার প্রতিষ্ঠা করলেন। কিভাবে কোন সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করে তিনি এই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা কিন্তু কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাওয়া যায় নি।

সে যাই হোক, এসব তত্ত্বের কথা থাক। ফিরে আসি বৌদ্ধদের কথায়। একদা পুরীর জগন্নাথ মন্দির ছিল বৌদ্ধ মন্দির। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মন্দিরে। ভক্তকবি রামপ্রসাদের গানেই আছে ঃ

পূণ তা ত্যজিয়া বুদ্ধ মূর্তি হইল তিন।
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা তাহাতে চিন্ ॥

এই বুদ্ধ মন্দিরকে রাতারাতি ব্রাহ্মণেরা দখল করে হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত করেছিল। সে আর এক ইতিহাস। সে ইতিহাসের অবতারণা এখানে নিষ্প্রয়োজন। যাই হোক, মন্দির তাদের হাত ছাড়া হলেও উৎকলে বৌদ্ধদের প্রভাব তখনও প্রবল ছিল। চৈতন্যদেব বার বার বৌদ্ধদের তর্কযুদ্ধে পরাজিত করলেও তা কখনো রেষারেষির পর্যায়ে উপনীত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে 'রায় রামানন্দ কথিত বৈষ্ণব-ধর্মই বৌদ্ধ

সহজিয়া ধর্ম। কেবল রূপ বদলাইয়াছে মাত্র।'—শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁহার পার্ষদবর্গ। পৃঃ ১৩১।

কিন্তু মহারাজ প্রতাপরুদ্রের জন্য এমন একটি ঘটনা ঘটল যেজন্য বৌদ্ধরাও শেষে চৈতন্য-বিরোধী হয়ে উঠলেন। বৌদ্ধরা শেষ পর্যন্ত চৈতন্যকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন। ব্যাপারটা ঘটল প্রতাপরুদ্রের অন্যতমা মহিষীকে নিয়ে। এই মহিষীর নাম রাণী পদ্মাবতী। প্রতাপরুদ্রের দক্ষিণদেশীয় সভাপণ্ডিত লোল্ল লক্ষ্মীধর রচিত 'সরস্বতী-বিলাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায় প্রতাপরুদ্রের চারজন মহিষীর নাম। এঁরা হলেন শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা ও শ্রীমহিলা। এঁদের মধ্যে রাণী পদ্মাবতী বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট। বীরসিংহ নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রভাব রাণী পদ্মাবতীকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে। ফলে রাজ্যের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ ভীষণ রুষ্ট হয়ে উঠেন। তখন প্রতাপরুদ্রকে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ব্রাহ্মণদের চাপে এক বিচার-সভার আহ্বান করেন প্রতাপরুদ্রদেব। এই বিচার-সভায় বৌদ্ধ না সনাতন হিন্দু ধর্ম শ্রেষ্ঠ—এই নিয়ে বিতর্ক চলে। শ্রীচৈতন্যদেব এর মধ্যে কখনই ছিলেন না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিলেন শঠতার আশ্রয়। তাঁরা তান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি পাত্রে একটি সাপকে লুকিয়ে রেখে অদৃশ্য করে দিলেন। যুক্তিবাদী বৌদ্ধদের বোবা বানিয়ে তর্ক যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। চৈতন্য-বিরোধী-চক্র এর জন্য দায়ী করলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই। বৌদ্ধদের স্থির বিশ্বাস হলো চৈতন্যভক্ত উৎকলাধিপতি ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবের কূট মন্ত্রণায় ঐ বিচারসভা ডেকে ছলনা দ্বারা তাঁদের পরাভূত করেছেন। এবং চৈতন্যদেবই রাজাকে প্ররোচনা দিয়ে বৌদ্ধদের নিধন করতে চাইছেন। অতএব চৈতন্য-বিরোধী-চক্রে বৌদ্ধরাও যোগ দিলেন। এইভাবে চৈতন্যের শত্রু সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগল।

এদিকে প্রতাপরুদ্রের জীবনেও একের পর এক ঘটতে লাগল বিপর্যয়। কৃষ্ণদেব রায়ের 'মঙ্গলগিরি অনুশাসন' থেকে জানা যায় ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন, শনিবার প্রতাপরুদ্রদেবের সৈন্যদের পরাস্ত করে বিজয়নগর রাজ কৃষ্ণদেব রায় কেবল গণ্টুর জেলার অন্তর্গত কোণ্ডবীড়ু দখলই যে করলেন তা নয়, প্রতাপরুদ্রের অন্যতম পুত্র বীরভদ্রকে বন্দী করলেন অনায়াসে। বীরভদ্র ছিলেন কোণ্ডবীড়ু দণ্ডপাটের শাসক। এরপর ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে কোণ্ডপল্লী অধিকার করে প্রতাপরুদ্রের একজন মহিষী অপর এক পুত্র এবং সাতজন প্রধান কর্মচারীকে কারারুদ্ধ করলেন।

এইখানে শেষ নয়। প্রতাপরুদ্রের ঘরে-বাইরে তখন চারিদিকে শত্রু। মহারাজের প্রধান মন্ত্রী আপ্পাজীর পরামর্শে প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ মহাপাত্রকে গোপনে প্রচুর

ধনরত্ন উৎকোচ দিয়ে নিজের দলে টেনে নিলেন। এই মহাপাত্রের সাহায্যে প্রতাপ-রুদ্রের অনুপস্থিতিতে আকস্মিকভাবে রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ অধিকার করে নিলেন কৃষ্ণদেব রায়। নিরুপায় প্রতাপরুদ্রদেব শেষে কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন বাধ্য হয়ে। সন্ধি হলো। কিন্তু তার জন্য মহারাজকে মূল্য দিতে হলো অনেক। নিজের আদরিনী বিদুষী কবি কন্যা তুক্কাকে তুলে দিতে হলো কৃষ্ণদেব রায়ের হাতে। আর কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত ভু-ভাগ দিতে হলো ছেড়ে। তেলেগু গ্রন্থ 'রায়বাচকম্' পড়লে তুক্কার মর্মন্তুদ জীবন-কাহিনী জানা যায়। এই তুক্কার জীবন কি নিদারুণ দুঃসহ বেদনার মধ্যে কেটেছিল, তা পড়লে অশ্রু-সংবরণ করা যায় না। সংস্কৃতে কবি তুক্কার লেখা 'তুক্কাপঞ্চকম্' পড়লে বোঝা যায় তাঁর জীবন নির্জনে নির্বান্ধব অবস্থায় কুণ্ডাপীলার 'কম্বম্' নামক স্থানে মর্মান্তিক দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল।

এইভাবে দিগ্বিজয়ী প্রতাপরুদ্রের জীবনে একের পর এক যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল বিপর্যয়, যেন জনসাধারণ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল ঐ নদের পাগল গোপী-প্রেমে উন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে। এই শোচনীয় দুর্দিনেও মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার এতটুকু দৈন্য দেখালেন না। শ্রীচৈতন্যকে তিনি স্বয়ং ভগবান বলে বিশ্বাস করতেন।

গোবিন্দ বিদ্যাধরের ভাগ্যে তখন বৃহস্পতি। তাঁর চক্রান্তের জাল ভিতরে ভিতরে তিনি বিস্তার করে চলেছেন। তিনি যুক্তি আঁটতে লাগলেন মন্দিরের পাণ্ডাদের সঙ্গে। চৈতন্যদেবকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরাতে না পারলে সেনাপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না কোন মতেই। চৈতন্যই তাঁর রাজ্যলাভের একমাত্র অন্তরায়। কিন্তু মহাপ্রভু যেভাবে পারিষদবর্গ পরিবৃত হয়ে আছেন, একাজ করাও সহজসাধ্য নয়। কিন্তু যিনি রাজ্যের প্রধান সেনাপতি এবং যাঁর অধীনে সৈন্য সামন্ত এবং জনসাধারণ তার পক্ষে কৌশলের অভাব নাই। তিনি বদ্ধপরিকর হলেন যেমন করেই হোক ঐ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা রাধাভজা নবদ্বীপ-নন্দনকে অপসারিত করবেনই। পথের কাঁটা তাঁকে যেমন করে হোক সরাতেই হবে।

এদিকে গৌড়ে তখন হুসেন শা'র মেজাজ গেছে বিগড়ে। রূপ, সনাতন দু'জনেই পলায়িত। কারাগারে বন্দী করেও সনাতনকে বেঁধে রাখতে পারেন নি হুসেন শাহ। শ্রীরূপ ছিলেন রাজস্ব-বিভাগের মন্ত্রী আর সনাতন 'দবির খাস' অর্থাৎ হুসেন শাহের প্রাইভেট সেক্রেটারী। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। গৌড়রাজ্যের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী

ব্যক্তি 'চীফ্ মিনিষ্টার'। যাঁদের জন্য হুসেন শার এত বাড়-বাড়ন্ত। তাঁরা দু'জনেই যোগ দিয়েছেন ঐ চৈতন্যের দলে।

রূপ-সনাতন কেমন করে পালাল গৌড় থেকে ?

সে আর এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

রামকেলি থেকে শ্রীচৈতন্যদেব চলে যাওয়ার পর দু'ভাই নির্জনে পরামর্শ করলেন। কেমন করে গৌড়ের সুলতানের হাত থেকে মুক্তি পাবেন তাঁরা।

রাজকার্য করে দু'ভাই বহু উপার্জন করেছিলেন। সনাতন বললেন—

তুই এক কাজ কর ভাই, নৌকাতে ধন-রত্ন ভরে বাড়ী যা। আমার জন্য শুধু দশ হাজার মুদ্রা রেখে যা গৌড়ে।

গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে রহে মুদি ঘরে ॥

শ্রীরূপ দাদার কথা মত কাজই করলো। নৌকাভরে ধনরত্ন নিয়ে চলে গেলো বাড়ী। আর ফিরে এলো না গৌড়ে। সুলতান হুসেন শাহ অবশ্য গুপ্তচর পাঠিয়ে খোঁজ করেছিলেন। পাখি কিন্তু তখন খাঁচা-ছাড়া। কোন সন্ধানই পেলেন না তাঁর।

এদিকে সনাতন মনে মনে ভাবলেন—সুলতানের প্রীতির বন্ধন তিনি ছিন্ন করবেন কেমন করে। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি তিনি। অতএব শেষে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ভাবলেন—

কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয় ॥ (চৈ. চ. মধ্য-১৯ পরি.)

কেমন করে ক্রুদ্ধ হবেন রাজা ?

সনাতন ভাবলেন তিনি রাজকার্যে অবহেলা করবেন। লোকদ্বারা বলে পাঠালেন —স্বাস্থ্যটা আমার বড় ভাল যাচ্ছে না। রাজদ্বারে তাই যেতে পারব না। ব্যাস, এই কথা বলেই তিনি বন্ধ করে দিলেন রাজসভায় যাওয়া।

রামকেলির নিজস্ব প্রাসাদেই রইলেন তিনি। প্রত্যহ ভগবত শুনেন। শুনতে শুনতে ভাবে তন্ময় হয়ে যান। এমনি ভাবে কেটে গেল মাসাধিক কাল।

অবশেষে টনক নড়ল সুলতানের। কেশব খাঁকে ডেকে বললেন—

তুমি একবার যাও ত সাকর মল্লিকের (সাগের মালেক) বাড়ী। সে কেন আসছে না রাজসভায় ? দেখত তার কি হলো। সেও কি দরবেশ হওয়ার তালে আছে নাকি ?

সংবাদ নিয়ে এসে কেশব খাঁ সুলতানকে জানালে—সাকর মল্লিক বড় অসুস্থ। তাই আসতে পারছেন না নবাবের দরবারে।

সংবাদ শুনেই রাজবৈদ্যকে পাঠালেন মল্লিকের বাড়ী। ফিরে গিয়ে বললো বৈদ্য। মন্ত্রী মশায়কে কই তেমন কিছু অসুস্থ দেখলাম না ত।

কথাটা শুনে সন্দেহ হলো সুলতানের। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সহসা একদিন ঃ

··· ··· গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞিঞ সভাতে কৈল আগমন॥
পাতসা দেখিয়া সব সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা॥ চৈ. চ.

আসন গ্রহণ করেই গৌড়ের পাতসা বললেন—

খবর কি সাকর মল্লিক? রাজসভায় আসছ না। অসুখ শুনে বৈদ্য পাঠালাম! তাঁকে দিলে ফিরিয়ে। অথচ তুমি ভাল করে জান, তোমাকে না হলে আমার চলে না। এখন তুমি যদি কাজ কর্ম ছেড়ে বাড়ীতে বসে থাক, তাহলে আমার চলবে কেমন করে? মনে মনে তুমি কি ভেবেছ, তাই আমায় স্পষ্ট বলত সাকর মল্লিক?

কাজে আমার মন বসে না।

—কেন?

—এতদিন ত আপনার নোকরি করলাম। এবার আমাকে রেহাই দেন সুলতান। আপনি অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আমার কাজে নিয়োগ করুন।

তখন গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ ঃ

··· ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার॥

বলি তোমরা ভেবেছ কি? তোমার এক ভাই দস্যুর মত ব্যবহার করে আমার চাকলা ছারখার করে দিলে, এক ভাই আমার নকরি ছেড়ে দরবেশ হলো। এখন তুমি বলছ কাম করতে পারবে না। তা হলে আমার রাজ্য চলবে কেমন করে?

তখন সনাতন সবিনয়ে বললেন—

সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল॥

আপনি ত গৌড়ের সর্বময় কর্তা। আমি আপনার নফর। যা শাস্তি দিতে হয় দেন, আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু, রাজ-নোকরি আর করতে পারব না।

তখন সুলতান ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন ঃ তা' হয় না সাকর মল্লিক। তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে ওড়িষ্যা অভিযানে।

সনাতন দৃঢ় স্বরে বললেন—

তিঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা ভাঙিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥

—চৈ. চ. মধ্য ১৯ পরি.

এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে সুলতান সনাতনকে বন্দী করলেন কারাগারে। তারপর চললেন ওড়িষ্যা অভিযানে।

বন্দী হলেন সনাতন। কঠোর প্রহরাব মধ্যে কাটতে লাগল তাঁর দিন। এদিকে বৃন্দাবনে রূপের কাছে এ সংবাদ পোঁছল। সংবাদ শুনে রূপ বিস্মিত হলেন না। তবে তিনি এতটা আশা করেন নি। ভেবেছিলেন—সনাতনকে হয়ত তাঁর প্রাসাদেই নজরবন্দী করে রাখবেন।

গোপনে গৌড়ের বন্দীশালে রূপ সনাতনের কাছে এক পত্র পাঠালেন। কেমন করে তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হবেন—সেই নির্দেশ ছিল পত্রে। পত্র পড়ে সনাতন আনন্দিত হলেন। এই পত্র এনেছিল সনাতনের বিশ্বস্ত ভৃত্য অধর। এই ভৃত্য অধরই কারাগারের বাইরে থেকে সনাতনের পলায়নের ব্যাপারে সাহায্য করতে লাগল।

কারাগারে সনাতনকে পাহারা দিত এক যবন রক্ষী। তাকে হাত করলেন সনাতন। বললেন রক্ষীকে তিনি ঃ

দেখ রক্ষী, তুমি ত অনেক কেতাব, কোরাণ পড়েছ। তুমি মহাভাগ্যবান জিন্দপীর সদৃশ। তোমার আমি পূর্বে অনেক উপকার করেছি। এখন তুমি আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দাও। আমি তোমায় পাঁচ হাজার মুদ্রা দিচ্ছি। রক্ষী এতে তোমার ধর্ম এবং অর্থ দুই লাভ হবে।

কাররক্ষী ভয় পেয়ে বললে—তা' হয় না মন্ত্রী সাহেব। হুসেন শাহকে বড্ড ভয় করি। পাত্সা আমায় রেহাই দেবেন না।

সনাতন বললেন। তোমার ভয়ের কি আছে? তিনি ত গিয়েছেন উড়িষ্যায়। তাছাড়া আমি ত এ-রাজ্যে থাকছি না। দরবেশ হয়ে মক্কায় চলে যাব। তোমাকে যে অর্থ দিয়ে যাচ্ছি এতে তোমার পুত্র কন্যার কোন কষ্টই হবে না। তোমরা তিন পুরুষ এখন নির্বিঘ্নে জীবন ধারণ করতে পারবে।

কারারক্ষীকে নিরুত্তর দেখে সনাতন আবার বললে—কি রক্ষী, কিছু কথা বলছ না কেন? তবুও ভয় যাচ্ছে না?

তা নয় মন্ত্রী সাহেব, কি জানেন, অত সহজে সুলতান আমায় ছাড়বেন না। আমার জানটা তিনি নেবেনই।

সনাতন বললেন—অত ভয় করছ কেন? তুমি সত্যি কথাই বলবে। আমি তোমায় যা বলছি শোন। সুলতানকে তুমি বলবে ঃ

সনাতন কহে তুমি না কর রাজ ভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি লেউটি আইসয় ॥
তাহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল ॥ চৈ. চ. মধ্য. ২০প.

ব্যাস, তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না। বাহ্যে করতে গিয়ে যদি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দী পালিয়ে যায়, তাহলে তুমি আর কি করবে। সুলতান নিজে হলেও কি কিছু করতে পারতেন? তুমি-ই চিন্তা করে বলো।

এমন সময় ঈশান—সনাতনের ব্যক্তিগত বিশ্বস্ত ভৃত্য অধরের মুদি দোকান থেকে পাঁচ হাজারের স্থলে সাত হাজার মুদ্রা নিয়ে এসে ধরলে কারারক্ষীর কাছে। তখন ঃ

লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা পার হই দাঁড়ুকা কাটিয়া ॥

এমনি ভাবে সনাতন পালিয়ে গেলেন গৌড়ের কারাগার থেকে। চেনাজানা বিস্তৃত ও প্রশস্ত রাজপথ 'গরিব্দার পথ'। সে পথে গেলেন না তিনি। কেন না, যদি শাহী ফৌজ পশ্চাদ্ধাবন করে। পথেই বেশ পরিবর্তন করলেন। 'হাতে কারোয়া ছিঁড়া কান্থা নির্ভয় হৈলা'—চৈ. চ. মধ্য। ২০ পরি।

ঘুর-পথে এসে হাজির হলেন বিহারে মজঃফরপুরের কাছে হাজীপুরে ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের বাড়ীতে। বিশ্রাম করলেন না সেখানে সনাতন। রাত্রেই নদী পার হয়ে ধরলেন কাশী বা বারাণসীর পথ।

এদিকে উড়িষ্যা থেকে ফিরে এসে হুসেন শাহ নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে গুমরে ফুলতে লাগলেন ক্রোধে। না পারছেন চৈতন্য ফকীরকে জব্দ করতে, আর না পারছেন রূপ-সনাতনকে হাতের মুঠোয় আনতে। ব্যর্থ তিনি দু'দিকেই।

ঠিক এমনি সময়েই মনে পড়ল তাঁর প্রতাপরুদ্রের সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের কথা। গুরুকে বধ করলেই চ্যালা দু'টোও আসবে হাতের মুঠোয়। তা হলে গোপনে গোবিন্দ বিদ্যাধরের সঙ্গেই কি চললো হুসেন শাহের ষড়যন্ত্র?

॥ আট ॥



এই চক্রান্তের কথা শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিষদবর্গ যে একেবারে জানতেন না তা নয়। অন্ততঃ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই অভিসন্ধির সন্ধান মিলে।

প্রতি বছর শ্রীচৈতন্যদেব জগদানন্দ পণ্ডিতকে নীলাচল থেকে নবদ্বীপে মায়ের কাছে পাঠাতেন। উদ্দেশ্য, পুত্র-বিচ্ছেদে-দুঃখিতা মাতাকে সান্ত্বনা দেওয়া। আর জগদানন্দের হাতেই জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ পাঠিয়ে দিতেন মায়ের জন্য। শুধু তাই নয়, অন্যান্য ভক্তদেরও তিনি পৃথক ভাবে প্রসাদ পাঠাতেন। আর মাকে বলার জন্য জগদানন্দের হাতে বলে দিতেন ঃ

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিব সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্মনাশ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইও আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র যে তোমার ॥

(চৈ চ. অন্ত্য—১৯ পরি.)

জগদানন্দ প্রভুর এই বার্তা সহ জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে হাজির হলেন নবদ্বীপে শচীদেবীর কাছে। তারপর অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে দেখা করে মহাপ্রসাদ দিলেন জনে জনে। সকলকে জানালেন মহাপ্রভুর কুশল। তারপর তিনি এক মাস নবদ্বীপে থাকলেন শচী দেবীর আজ্ঞায়। মাসান্তে অদ্বৈত আচার্যের কাছে গেলেন বিদায় নিতে। জগদানন্দ পণ্ডিত আবার ফিরবেন নীলাচলে। অদ্বৈত আচার্য তখন বললেন—খবর আছে হে জগদানন্দ। তুমি প্রভুকে গিয়ে খবর দিও।' খবর বলতে আর কিছুই নয়। চার লাইনের একটি তর্জা। তার মধ্যই আছে খবর। সে তর্জা এমন ভাবে তৈরী শ্রীচৈতন্যদেব ছাড়া যেন আর কেউ না বুঝতে পারে। জগদানন্দকে অদ্বৈত আচার্য বললেন ঃ

প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলের কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥ (চৈ চ· অন্ত্য-১৯ পরি)

যথা আজ্ঞা, জগদানন্দ নীলাচলে এলেন নিরাপদে। চৈতন্য সকাশে গিয়ে দেখলেন সপার্ষদ বসে আছেন মহাপ্রভু। জগদানন্দ সেইখানেই তর্জাটি বললেন। শুনে প্রভু ঈষৎ হেসে বললেন ঃ 'তাঁর এই আজ্ঞা' বলি মৌন রহিলা॥ স্বরূপ দামোদর জানিয়াও প্রভুকে পুছিলা। অর্থাৎ স্বরূপ গোসাঞি জিজ্ঞেস করলেন—'প্রভু, এ তর্জার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

তখন চৈতন্যদেব বললেন, আচার্যদেব আগম শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত, একথা তোমার অজানা নয়। আবাহন এবং বিসর্জন—দুই তিনি বুঝতে পারেন। উপাসনার জন্যই দেবতার আবাহন করা হয়, আবার পুজো শেষ হলে শেষে এই দেবতাকে-ই বিসর্জন দেওয়া হয়।' এই কথা বলেই প্রভু বললেন ঃ

মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥ (চৈ· চ· অন্ত্য—১৯ পরি)

মহাপ্রভুর মুখে এই কথা শুনে ভক্তগণ বিস্মিত হলেন। কিন্তু স্বরূপ গোসাঞি-এর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন এই তর্জার মধ্যেই নিহিত আছে সর্বনাশের বীজ। আর এই তর্জা শোনার পর ঃ

সেই দিন হইতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥ (চৈ· চ· ১৯ পরি·)

কিন্তু এই তর্জা-প্রহেলিকার আসল অর্থ কি ? এ পর্যন্ত এই তর্জার ব্যাখ্যা বিভিন্ন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ বিভিন্ন ভাবে করেছেন। কিন্তু কোন ব্যাখ্যাটি-ই যথার্থভাবে গৃহীত হয় নি।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, এই তর্জার মধ্যে নিত্যানন্দের তৎকালের ব্যবহারে অদ্বৈত আচার্যের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাই এই তর্জার প্রচ্ছন্ন অর্থ নিত্যানন্দের বিরোধিতা। নিত্যানন্দ জাতপাত মানতেন না একেবারে। অদ্বৈত চৈতন্যদেবকে তাই প্রচ্ছন্নভাবে বলে পাঠিয়েছিলেন—এদেশে ভক্তিধর্ম আর পূর্বের মত নাই। ভক্তি প্রচারের কাজ বিশেষ অগ্রসর হচ্ছে না।

আবার কেউ কেউ ছত্র কয়টির সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে—চৈতন্য-প্রভাবে দেশে প্রেমধর্ম এমন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে যে, এখন আর কাহাকেও প্রেম দেবার প্রয়োজন নাই, লোক স্বতঃই কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়েছে।

মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ এই তর্জার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন ঃ

'আমার পাণ্ডিত্য নাই, তবে আমি ইহার সহজ মানে কি বুঝিয়াছি, বলিতেছি। মহাপ্রভু এক বাউল মহাজন, আর শ্রীঅদ্বৈত আর এক বাউল, উপরি-উক্ত মহাজনের অধীনে। শেষোক্ত বাউল অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত পূর্বোক্ত মহাজন অর্থাৎ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিতেছেন, 'হাটে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত চাউল আনা হইয়াছিল। লোকে চাউল পাইয়া আউল হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং আর চাউল বিক্রয় হইতেছে না। এখন ইহার বিচার করুন।'

'মহাপ্রভু মহাজন' তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গাদি লইয়া জীবের যে আহার চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি তাহাই বিক্রয় করিতে ভবের হাটে আসিযাছিলেন। তিনি কেন আসিয়াছিলেন? যে হেতু দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, লোকের গৃহে তণ্ডুল মাত্র ছিল না; জীব হাহাকার করিতেছিল। অর্থাৎ জগতে কৃষ্ণভক্তি ছিল না, সেই নিমিত্ত মহাজন, ভবের হাটে সাঙ্গোপাঙ্গাদি সহ আসিয়া অতি অল্পমূল্যে চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি বেচিতে লাগিলেন। কোথাও বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন, কোথাও বা বভুক্ষুলোক চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। লোকের গোলা পূর্ণ হইল, আর চাউল বিকাইতেছে না। তাই যিনি দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়া মহাজন-মহাপ্রভুকে জীবের হাটে আহবান করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত, মহাজনকে অর্থাৎ প্রভুকে সমাচর দিতেছেন যে, চাউল আর বিকাইতেছে না, লোকের ঘর পুরিয়া গিয়াছে, এখন যাহা কর্তব্য তাহা করুন, অর্থাৎ এখানে আমাদের থাকিবার আর প্রয়োজন নাই।'—শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত। ৫ম খণ্ড। ৯ম অধ্যায়। পৃঃ ১৩৪-৩৫। বিশ্ববাণী প্রকাশনী সং।

আমার মনে হয় মহাত্মা শিশিরকুমার শেষের দিকে অর্থটি বুঝেও বুঝতে পারেন নি। স্বরূপ দামোদর অর্থটি যথার্থই বুঝেছিলেন। একদিন অদ্বৈতের আহবানেই ভাগীরথী-তীরে নবদ্বীপে ঘটেছিল মহাপ্রভুর মহা-আবির্ভাব। তিনিই আহবান করে এনেছিলেন, আজ বিসর্জনের ইঙ্গিত দিয়ে পাঠিয়েছেন তিনিই।

ব্যাখ্যাটি একটু বিস্তারিত ভাবেই বলি। আসলে অদ্বৈতাচার্য গৌড়ে বসেও উড়িষ্যাব তৎকালীন রাজনীতি ও চৈতন্যের প্রতি উৎকলের চৈতন্য-বিরোধী-চক্রের কার্যকলাপ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি চৈতন্যকে সাবধান করে বলেছিলেন—বাউলকে অর্থাৎ গৌরাঙ্গকে বলো, তোমার ঐ কৃষ্ণ-প্রেম-রূপ চাউল উৎকলের হাটে আর বিক্রি হবে না। ওখানে ঐ কাজে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমের পসরা নিয়ে আর বসে থেকো না। ওখান থেকে পালাও। গতিক সুবিধের নয়। জগদানন্দ, তুমি বাউলকে অর্থাৎ চৈতন্যদেবকে বলো যে, এই নির্দেশ আর এক বাউল অদ্বৈতাচার্যের।

পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এই তর্জার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন—'প্রেমোন্মত্তকে (শ্রীকৃষ্ণবিরহিনী গোপীভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুকে) বলিও,—লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের আর স্থান নাই। অর্থাৎ, আর বহুলোক এই শ্রীগোপীপ্রেমের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তাঁহাকে বলিও—আউল অর্থাৎ প্রেমাতুর (অদ্বৈতাচার্য) আর সাংসারিক কার্যে নাই। প্রেমপাগলকে বলিও যে, প্রেমপাগল বা প্রেমোন্মত্ত শ্রীঅদ্বৈত এইরূপ বলিয়াছে। অর্থাৎ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের যে তাৎপর্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে; এখন প্রভু যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুণ।' (শ্রীচৈতন্যদেব পৃষ্ঠা ৪৯১)—অর্থাৎ তোমার 'গোপী প্রেমের বিরোধিতা এবার আসন্ন।

এবার বলি এই তর্জা শোনার পর চৈতন্যদেবের মনোভাব কেমন হয়েছিল। মহাপ্রভু সেদিন থেকেই হলেন খুব বিষাদাচ্ছন্ন। যেন নিজেকে অনেকখানি গুটিয়ে নিলেন। কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়ল অন্তরে। রাধাভাবাবেগে বিরহানলে দগ্ধ হতে থাকলেন। গম্ভীরার মধ্যে নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখলেন।

চৈতন্যদেব যেন সেদিন থেকেই নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। এই বিপর্যস্ত মানসিকতার কথা কবিরাজ গোস্বামী সুন্দরভাবে বলেছেন তাঁর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে। ভাবতে ভাবতে সহসা ঃ

আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা গমন।
উদঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ॥ (চৈ· চ· অন্ত্য—১৯ পরি·)

তিনি ভাবতে লাগলেন অন্তর্ধানের কথা। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মথুরায়। কেন, অক্রুর এসেছিল নিয়ে যেতে। কংসের নিমন্ত্রণ। বিরাট যজ্ঞ করছেন কংস। সেই যজ্ঞ দেখার জন্যই নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন মামা কংসরাজ। অক্রুর এসে কিন্তু গোপনে গোপন কথাটি বললেন। পিতা বসুদেবকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছেন কংস। তাঁকে বধ করতে চান। নারদের জন্য পারছেন না। ছল করে আরম্ভ করেছেন ধনুর্যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে স্থির হয়েছে তোমাকেও বধ করবে। শুনে কৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন, ঠিক আছে, মামার ধনুর্যজ্ঞে যাব আমরা।

কৃষ্ণের মথুরা গমনের বার্তা শুনে বৃন্দাবনের গোপীকুল হাহাকার করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কৃষ্ণের বিরহ বেদনায় মুহ্যমান তারা।

এই কাহিনী স্মরণ করে শ্রীচৈতন্যদেবও ভাবলেন—নীলাচল ছেড়ে তিনিও যাবেন পালিয়ে অর্থাৎ অন্তর্ধান করবেন। আর একথা ভেবেই—

রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন। ৬

স্বরূপে পুছেন জানি নিজ সখীজন॥ (চৈ চ. অন্ত্য—১৯ পরি.)

ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় শেষের পংক্তিটি কিন্তু লিখেছেন অন্যভাবে। তাঁর বই-এ দেখছি ঃ

রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন।

স্বরূপে পুছন জানি নিজ-সমাপন॥ (চৈ চ. অ. ১৯. ৩৩ শ্লোক)

আমি আমার উদ্ধৃতিটি দিয়েছি 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে'র প্রকাশিত চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ থেকে। ডঃ মুখোপাধ্যায় কোন বই থেকে বা কার সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে ব্যবহার করেছেন বুঝতে পারছি না।

যাই হোক, জয়দেব বাবুর উদ্ধৃতিটিতে দেখছি। 'নিজ-সমাপন' শব্দটির দ্বারা প্রভুর অন্তর্ধানের ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে করা হয়েছে। আমার ব্যবহৃত পংক্তিটির অর্থ হচ্ছে স্বরূপ দামোদরকে চৈতন্যদেব নীলাচল-লীলার 'সখী, বলে উল্লেখ করেছেন। দু'টো উদ্ধৃতির অর্থ যাই হোক না কেন, মূল ভাবটি কিন্তু একই।

রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর দু'জনেই তর্জার প্রকৃত অর্থ জানতেন। এবং এমতাবস্থায় প্রভু যে কি করবেন তাও তাঁরা খানিকটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তবুও মহাপ্রভু স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করলেন অর্থাৎ সম্মতি চাইলেন তিনি অন্তর্ধান করবেন ত? তারপর প্রভু—

পূর্বে যে বিশাখাকে রাধিকা পুছিল।

সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল॥ (চ.চ. অন্ত্য—১৯ প.)

তারপর তাঁর মুখ থেকে 'ললিতমাধব'-এর শ্লোক স্ফুরিত হলো। এ অধ্যায়ের এখানেই শেষ করি। আসুন আমরা সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্রান্তের খোঁজ-খবর নিই। চৈতন্য-বিধন-যজ্ঞের কত দূর কি আয়োজন করেছেন, তাই দেখি ইতিহাসের পাতায়।

॥ নয় ॥



এদিকে কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর বসে নেই। তাঁর কূটকৌশলের জাল তিনি বিস্তার করেই চলেছেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন মহাপ্রভুর মত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে সরাতে হলে শুধু পাণ্ডাদের হাত করলে কার্যসিদ্ধি হবে না। যেতে হবে আরো গভীরে। তিনি ভাবলেন শ্রীচৈতন্য যেভাবে পার্ষদগণ এবং মহারাজ ও রায় রামানন্দের দ্বারা সুরক্ষিত আছেন, এই অবস্থায় তাঁকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারিত করা অত সহজ হবে না। তাই তিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কাওকে কাওকে হাত করতে মনস্থ করলেন। সে কার্যে তিনি সফলও হলেন। অর্থাৎ যিশু-খ্রীষ্টের ১২ জন শিষ্যের মধ্যে জুডাস বা যিহুদা যেমন ধরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে; ঠিক তেমনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যেও কেউ কেউ যোগ দিলেন চৈতন্য-নিধন-চক্রে।

প্রশ্ন, কে সেই শিষ্য ?

সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর এখুনি আমি দিতে না পারলেও রায় রামানন্দ কিন্তু মহাপ্রভুকে এক পত্রে এসব কথা জানিয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। রায় রামানন্দের লেখা সেই পত্রের আসল কপি রাজমাহেন্দ্রী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করেছেন প্রভুজী। ছ' বছর ধরে তিনি এই নিয়ে গবেষণা এবং অনুসন্ধান করছেন। আমেরিকার স্টেট্‌সের অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী অধ্যাপক। বর্তমানে বাস করছেন পুরীতে পুটিয়া স্টেটের এক ভদ্রলোকের নির্মিত দু'কুঠির-ওয়ালা বাড়ীতে।

তিনি-ই উদ্ধার করেছেন রায় রামানন্দের সেই চিঠি—যে চিঠি তিনি লিখেছিলেন শ্রীচৈতন্যকে। এর পরের ঘটনা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের চেয়েও রোমহর্ষক।

এখন কথা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্র কিভাবে চৈতন্যকে হত্যা করেছিল বা যদি হত্যাই করে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ কোথায় কি-ভাবে সমাহিত করা হয়েছিল ? কিংবা তিনি যদি অন্তর্ধান অর্থাৎ ছদ্মবেশে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান, তাই বা কি করে সম্ভব হলো ?

ইতিপূর্বে কিন্তু 'চৈতন্য এ্যান্ড হিজ এজ' এর লেখক ডঃ দীনেশ সেন বলেছেন— চৈতন্যদেবের পূত দেহকে পুরীর মন্দিরের মধ্যেই কোথাও গোপনে প্রোথিত করা হয়েছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন—গুণ্ডিচা মন্দিরের মধ্যেই হত্যা করা হয়েছিল মহাভাবগ্রস্ত শ্রীচৈতন্যদেবকে। আর বাংলার ইতিহাস প্রণেতা ডঃ নীহার রঞ্জন রায় ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন—পুরীতেই গুমখুন করা হয়েছে শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে।

একমাত্র কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রজ্ঞাপ্রবীণা অধ্যাপিকা শান্তা মায়ি সাক্ষী-সাবুদ-তথ্য-প্রমাণ হাতে নিয়ে বলেছেন—

না, না, পুরীতে মহাপ্রভুর মৃত্যু হয়নি।

তিনি অন্তর্ধান করেছিলেন। অর্থাৎ সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে তোটা গোপীনাথের মন্দিরে ছদ্মবেশ ধারণ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন ঘোলাদুবলী' নামক গ্রামে।

আমরা দু'টি ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের কথা জানি। শিবাজী আওরঙ্গজেবের চোখে ধুলো দিয়ে মিষ্টির ঝুড়ির মধ্যে অন্তর্ধান হয়েছিলেন। আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে স্বগৃহ থেকে পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন ভারতের বাইরে। এ দু'টি হলো রাজনৈতিক পলায়ন।

অবতার বা ভগবানের দূতও পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কথা আমরা অনেকেই জানি না। তিনি হলেন খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রীষ্ট। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর কবর থেকে তাঁর শিষ্যগণ সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁকে নিয়ে চলে এসেছিলেন ভারতে। গাছ-গাছড়ার রস দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ ক্ষতকে ভাল করেছিলেন ভারতীয় তৎকালীন ঋষিগণ। রাশিয়ান পর্যটক ডঃ নিকোলাস নটোভিচের লেখা 'দি আননোন্ লাইফ অফ জেসাস্ ক্রাইষ্ট' গ্রন্থে এই পলায়নের বিস্ময়কর কাহিনী লেখা আছে। কাশ্মীরের খানা-ই-য়ারী নামক স্থানে এখনো আছে খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সমাধি।

কিন্তু প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য আজো উদ্ঘাটিত হয়নি। পাঁচ শত বছর পরে আমি যে কাহিনী শোনাতে বসেছি, তাই সে কাহিনী আজ অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও তার পিছনে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

অধ্যাপিকা শান্তা মায়ি বলেন—চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল এক চরম বিশৃংখলার যুগে। চারদিকে তখন অরাজকতা। দিল্লীর সিংহাসনে তখন পাঠান বহ্লোল লোদী। ১৪৮৬-তে চৈতন্যের আবির্ভাব। আর ১৪৮৯ তে বহ্লোলের পুত্র সিকান্দর লোদী আরোহণ করলেন দিল্লীর সিংহাসনে। সিংহাসনে আরোহণ করেই ফেটে পড়লেন

হিন্দু-বিদ্বেষে। মথুরার হিন্দু মন্দিরগুলি একের পর এক ধ্বংস করে চললেন। হিন্দু আর হিন্দু-মন্দির ধ্বংসের সে এক রুদ্র তাণ্ডবলীলা।

আর এদিকে বঙ্গদেশে, ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বিশ্বম্ভরের জন্মের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত ইলিয়াস শাহের বংশধররা নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও নরহত্যার মাধ্যমে শাসন করে চলেছেন বঙ্গদেশ। সুলতান রুকনুদ্দীন এরই মধ্যে আবার নিজের অবরোধ ও হারেমে পাহারা দেবার জন্য আফ্রিকা থেকে হাবসী ক্লীব ক্রীতদাসদের আমদানী করলেন। এই ক্রীতদাসরা প্রথমে চরম বিশ্বাস ভাজন হয়ে শেষে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভুহত্যা শুরু করল। এর ফলে বঙ্গদেশে তখন ষড়যন্ত্র, ব্যভিচার, নরহত্যা ধর্মবিদ্বেষ আর নরপতি হত্যা ধারণ করল রুদ্ররূপ। বাংলাদেশের তৎকালীন অবস্থার কথা ভাবতে গেলে রোমাঞ্চিত হতে হয়।

ইউরোপে চলছে তখন প্রচণ্ড সংঘর্ষ। ঐতিহাসিক ত্রিশবর্ষব্যাপী গোলাপের যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। পাশ্চাত্যে মধ্যযুগের অবসান হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেকটি দেশ, জাতি ও সমাজ ছিন্নভিন্ন। ১৪৮৫-তে সপ্তম হেনরী বসলেন ইংলণ্ডের সিংহাসনে। এর পরের বছরই ভূমিষ্ঠ হলেন আমাদের গোরাচাঁদ। ঐ সময় থেকেই পাশ্চাত্যে আরম্ভ হলো 'রেঁনেশাস' বা নবজাগরণের যুগ।

'আর ভারতের পূর্ব দিগন্তে ভাগীরথী তীরের বন্দর শহর নবদ্বীপেও অভ্যুদয় হলেন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের নব মন্ত্রোদ্গাতা যুগসূর্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু'—কাঁহা গেলে তোমা পাই। শ্রীচৈতন্যদেব—সুন্দরানন্দ।

কিন্তু যিনি শোনাবেন নবজীবনের উদ্বোধন সংগীত, তাঁর জীবনে কিন্তু ছিল না শান্তি। বুদ্ধেরও ছিল না, ছিল না যিশুরও। কিংবা হজরত মহম্মদের কপালেও কি ঘটেছিল শান্তি? তাই নবদ্বীপ আর পুরী কোথাও ছিল না গৌরহরির শত্রুর অভাব। নবদ্বীপে যেমন, সকল 'পাষাণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে।' (চৈ. ভা.) ঠিক তেমনি উৎকলেও ছিল সমাজ-বিরোধীর ছড়াছড়ি। স্বার্থান্বেষী স্মার্ত ছদ্ম বৌদ্ধ, মন্দির পাণ্ডারা, সামন্ত সর্দার ভঞ্জরাও প্রভৃতি সকলেই উঠে পড়ে লেগেছিল চৈতন্য-বিরোধিতায়। আর এদের সকলকে উৎসাহ যুগিয়ে চলেছিল প্রতাপরুদ্রের ক্রুর সিংহাসন লোভী সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর।

এই অবস্থায় যদি শ্রীচৈতন্য সবার অলক্ষ্যে অন্তর্ধান না করতেন তা হলে গোবিন্দ বিদ্যাধরের অনুচররাই শেষ করত আমাদের প্রাণের গোরাচাঁদকে। মেরেও ফেলেছিল তারা।

কাশীনাথ মিশ্রের গম্ভীরা থেকে অর্থাৎ নির্জন ছোটঘর থেকে পারিষদবর্গ সহ গুণ্ডিচাবাটীতে জগন্নাথ দর্শন করতে চললেন প্রভু। তিনি ইতিপূর্বেই জানতে পেরেছিলেন তার অনুচরের মধ্যে কে আছে গোবিন্দ বিদ্যাধরের চর। তাই সকলকে পিছনে ফেলে একাই 'আচম্বিতে' ঢুকে পড়লেন মন্দিরে। গোবিন্দ বিদ্যাধরের চররা প্রস্তুতই ছিল। তারা ঝাঁ করে লাগিয়ে দিল কপাট। প্রভু দ্রুত চলেছেন জগন্নাথের দিকে এগিয়ে।

'পরিছা বলে—কোথা যাহ বলহ সন্ন্যাসী।
প্রভু কহে—জগন্নাথ পরশিয়া আসি॥
রহ রহ বলে সবে বেত্র লয় করে।
নিষেধ না শুনি'প্রভু চলিলা ভিতরে॥'

তারপরের বিবরণ বৃন্দাবন দাস গোপন করেছেন। (এই উদ্ধৃতি দেনুড় শ্রীপাটের অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর আবিষ্কৃত পুঁথি থেকে উদ্ধৃত) ঐ যে পরিছাগণ বেত নিয়ে এগিয়ে চললো প্রভুর দিকে কিন্তু নিস্তার দিল না পাণ্ডারা। প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করে অচৈতন্য করলো। প্রভু কিন্তু তখন সমাধিস্থ। পাণ্ডারা ভাবলে প্রভুর দেহে আর প্রাণ নাই। তাই তাড়াতাড়ি ধরাধরি করে প্রভুর অচৈতন্য দেহকে গুণ্ডিচা বাটীর গোপন কক্ষে লুকিয়ে ফেলল। কিন্তু অম্বিকা ব্রহ্মচারীর আবিষ্কৃত ঐ পুঁথিতে গুণ্ডিচাবাটীর কথা নাই। আছে 'শ্রীদেউলে'—অর্থাৎ মূল মন্দিরে।

লোচনদাসের বিবৃতি অনুযায়ী—এদিকে পারিষদবর্গের করুণ আর্তিতে কপাট খুলে বললে পরিছা—মহাপ্রভু ত স্বয়ং ভগবান ছিলেন, তাই তিনি জগন্নাথের দেহেই লীন হয়ে গিয়েছেন। আমি ভিতর থেকে স্বচক্ষে দেখলাম এই দৃশ্য। তোমরা বিশ্বাস করো।

তারপর, গোবিন্দ বিদ্যাধরের অনুচরদের চললো জরুরী পরামর্শ। এখন কি করা যাবে প্রভুর দেহকে। কোথায় কি ভাবে গুম করা যাবে। গদাধর বুঝতে পারলেন প্রভু অন্তর্ধান করেছেন। তিনি সহজে বিশ্বাস করতে পারলেন না। নবাবিষ্কৃত বৃন্দাবন দাসের পুঁথিতে আছে—

'গদাধর জানিলেন প্রভুর গমন।
প্রভুর বিরহে তার না রহে জীবন॥
আচম্বিতে গদাধর হৈল অন্তর্ধান।
না পায় দেখিতে কেহ বোলে—রাম রাম॥

(চৈ. ভা. ১২ অধ্য.)

এই যে গদাধর আচম্বিতে অন্তর্ধান করলেন অর্থাৎ ঢুকে গেলেন মন্দিরে। শত্রুরা সবাই মিলে তাকেও ফেললো মেরে। বা আধমারা করে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে গেল গোপন কক্ষে। সমস্যা বাড়ল বই কমলো না। এখন দুটো মড়া নিয়ে কি করবে তারা।

লোচনদাস বলছেন অন্য কথা। প্রভু অন্তর্ধান করছেন শুনে শোকে ভক্তরা মূর্ছা গেলেন। পরে পরে সকলের মূর্ছা ভাঙলো কিন্তু স্বরূপ দামোদরের মূর্ছা আর এ জন্মে ভাঙল না। দেখা গেল, তাঁর বুক ফেটে প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর গুণ্ডিচাবাটীর মধ্যে প্রবেশ করতে গিয়েছিলেন, এমন সময় বল্লম, কিংবা কুঠারের আঘাত তাঁর বুকে মারা হয় ফলে তিনি ঘটনা স্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। তাহলে তাঁর মৃতদেহ গেল কোথায়! অন্ততঃ পারিষদবর্গ চৈতন্যের মৃতদেহ না পান, স্বরূপ দামোদরের মৃতদেহটা ত পেয়েছিলেন। স্বরূপকে তাহলে কোথায় সমাধি দেওয়া হলো? সে সমাধি আজো খুঁজে পাইনি।

এদিকে চৈতন্য-বিরোধী-চক্র শ্রীচৈতন্যের মৃতদেহ নিয়ে কি করল? রথের সময়। বিকেল ৩টাতে ঘটেছে ঘটনা। গুণ্ডিচাবাটীর দরজা বন্ধ। চলছে জরুরী পরামর্শ সভা। বিকেল ৩টা থেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত। নানা সমস্যা। মহারাজ প্রতাপরুদ্র রথের সময় পুরীতেই অবস্থান করছেন। কেমন করে গুণ্ডিচাবাটি থেকে বের করা হবে দেহ। নগরে ছড়িয়ে পড়ছে সংবাদ দ্রুতগতিতে। শত্রুচক্রের কথা ভেবে তিনিও কিছু করতে পারছেন না। গোবিন্দ বিদ্যাধরের হাতে চলে গেছে সমস্ত ক্ষমতা। উৎসবের সময় সব কিছুই তাঁর আওতায়। রাজা হয়েও আজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের মত দারু মূর্তি মাত্র। সৈন্যগণ সব কিছুই কনট্রোল করছে। রাত্রি ১০টার পর পথ-ঘাট অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল। চারিদিকে একটা চাপা আতঙ্ক। যে যার বাসায় ফিরতে পারলে বাঁচে।

রাত্রি ১১টা নাগাদ যখন সব নিস্তব্ধ হলো, তখন গোবিন্দ বিদ্যাধরের অনুচররা ভাবল এই মস্ত সুযোগ। তারা অচৈতন্য শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে ছুটল সমুদ্রের দিকে। হয় সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে না হয় বালিতে পুতে ফেলবে। কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে গড়ুর স্তম্ভের কাছে এসে শুনতে পেল দূরে কোলাহল। নগরের কিছু কিছু লোক চৈতন্য-অন্তর্ধানকে সুস্থ-চিত্তে মেনে নিতে না পেরে দল বেঁধে আসছে এগিয়ে। দুর্বৃত্তরা তখন ভয়ে অচৈতন্য প্রভুকে স্তম্ভের পিছনে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল দৌড়ে। রাত তখন প্রায় ১১টা। সেকালের সেদিনের রাত্রি। তাইত বৈষ্ণবদাস 'চৈতন্য-চকড়ায়' বলেছেন ঃ

'রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হল । ৺
তখন পাড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে ॥' (চৈতন্য চকড়া)

ঠিকই বলেছেন বৈষ্ণবদাস। চন্দন বিজয় উৎসব শেষ হওয়ার পর পথে লোকজন কমে আসে। আবার লোচনদাসের কথাও মিথো নয়। তিনি বলেছেন রবিবার বিকেল ৩টার সময় শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান করেছেন। লাইন দুটো আবার মনে করিয়ে দিই ঃ

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

রাজা প্রতাপরুদ্র জানতেন এই চক্রের কথা। কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যকে মনে মনে জানতেন স্বয়ং ভগবান বলে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শত্রুরা অন্ততঃ আর যাই করুক ভগবান শ্রীচৈতন্যের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। তিনি শ্রীচৈতন্যকে মনে করতেন 'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা' বলে।

কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপার যখন সংঘটিত হলো, তখন তাঁর মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। ভয়ে আর আতঙ্কে পুরী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন বিড়ানেসীতে অর্থাৎ কটকে। তাইত বৈষ্ণবদাস বলেছেন ঃ

রাজা শ্রাবণ পাঞ্চ দিনে বিড়ানেশী গমিলে।
নিহাঁশ হোই গহন মান পেশিলে ॥ (চৈতন্যচকড়া)

উক্ত দু'টি পংক্তিতে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজার পলায়নের কথা নাই। শ্রাবণের পাঁচ দিনে তিনি অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রদেব কটকে গমন করলেন। একথা ঠিক, রাজা চৈতন্যের ঐশ্বরিক শক্তিতে ছিলেন বিশ্বাসী। তৎকালে যত বড় শক্তিশালী রাজা হোন না কেন, ঠাকুর দেবতায় ভীষণ বিশ্বাস করতেন। তাই শত্রুরা আগেই ঐ দেব মন্দির ধ্বংস করতে চেষ্টা করতেন বা গুরুদেবকে হত্যা বা বন্দী করতেন। এতে সহজেই রাজা এবং সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ত। তাঁরা মনে করতেন, যখন কুলদেবতা চলে গেলেন তখন তার জয়ের আশা নাই। তাই হয় পালিয়ে যেতেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, নয় বন্দী হতেন। এক্ষেত্রেও সেই ঘটনা ঘটল। লোচনদাস অবশ্য পালিয়ে যাওয়ার কথা বলেননি। তিনি বলছেন—'পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে।'

যাই হোক। এই যে দেখা গেল গড়ুর স্তম্ভের কাছে প্রভুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে, সেই মৃতদেহ পরে তোটা গোপীনাথের মন্দিরে এলো কেমন করে। বৈষ্ণবদাস বলেছেন ঃ

কানাই খুঁঠিয়া শিখি মাহান্তি আবর।
ঘেনিলে অঙ্গকু তোটা গোপীনাথ পুর ॥ (চৈতন্যচকড়া)

প্রভুর ওড়িয়া ভক্ত শিখি মোহান্তি, কানাই খুঁট্যা প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁকে নিয়ে এলেন তোটা গোপীনাথ মন্দিরে। লোচন এ সম্পর্কে নীরব। কিন্তু জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্য-মঙ্গলে' বলেছেন ঃ

চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥ (উত্তর খণ্ড। পৃঃ ১৫০)

জয়ানন্দের কথা অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু হয়েছিল টোটা গোপীনাথ মন্দিরে। এ পর্যন্ত বাঙ্গালী ও ওড়িয়া কবিদের ঘটনার মধ্যে এই একটা মিল পাওয়া যায়। এবং গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্রান্তের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সম্পর্ক আছে—সহজেই বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু চৈতন্যচকড়া বলেছে রাজার অনুমতি নিয়ে শ্রীচৈতন্যের শ্রীঅঙ্গকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। সেই সমাধি কোথায় দেওয়া হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নাই। যদি বৈষ্ণবদাস প্রত্যক্ষদর্শী হন, তিনি যখন এত কথা লিখেছেন, তখন নিশ্চয়ই লিখতেন সেই সমাধি স্থানের কথা।

প্রজ্ঞাপ্রাণা অধ্যাপিকা শান্তা মায়ি এখানেই খুঁজে পেয়েছেন ফাঁক, তিনি বলেন সম্পূর্ণ অন্য কথা। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের বিভূতিপাদের ৪২ সূত্র উদ্ধৃত করেছেন। সূত্রটি হলো ঃ

'কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশ-গমনম্ ॥ ৪২ ॥

অর্থাৎ—শরীর ও আকাশ এই উভয়ের সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রযুক্ত হলে যোগীর দেহ তুলার মত লঘু হয়। এই অবস্থায় যোগী আকাশ পথে বিচরণও করতে পারে। অর্থাৎ ইথারের সঙ্গে দেহের যে সম্বন্ধ আছে, সংযম প্রক্রিয়ার ফলে সেই সম্বন্ধে অভিনব পরিবর্তন ঘটে। এই অবস্থায় দেহ তুলার মত হালকা হয়ে উঠে আর সেই কারণেই তা তখন অনায়াসে ইথারের উপরে ভেসে বেড়াতে সক্ষম হয়।'

আমরা পাতঞ্জলের এই সূত্রটি নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই। উদ্দেশ্য পাতঞ্জল যোগসূত্র বিজ্ঞানসম্মতভাবে সত্য। এই ক্রিয়া-যোগ-বিজ্ঞানের এমন অনেক সূত্র আছে, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আমরা আমাদের এ পর্যন্ত যতটুকু বিজ্ঞান-জ্ঞান এবং এই শাস্ত্র আয়ত্ব করেছি, তার থেকেও অনেক উন্নত সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের কথা যা বলা হয়েছে, এখনও তা আবিষ্কৃত হয়নি। উন্নত ক্রিয়াযোগীরা বলেন পাতঞ্জল নিয়ে গবেষণা এখনো শেষ হয়নি। এ গবেষণা পড়ে হবেনা, যোগের এক একটি ধাপ অতিক্রম করে গেলেও এক জীবনে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব।

যোগী যোগের দ্বারা উন্নত অবস্থায় উন্নীত হলে তার কতকগুলি অলৌকিক ক্ষমতা

জন্মে। এগুলিই যোগ-বিভূতি নামে প্রসিদ্ধ। তাই বলে যোগ-বিভূতি, ব্রহ্ম লাভ নয়। এখন এই ৪২ সূত্রটির যে অর্থ দিয়েছি, তা হয়ত অনেকেরই বোধগম্য হবে না। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হরিহরানন্দ আরণ্যকের 'পাতঞ্জল দর্শন' থেকে এই সূত্রটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে বিষয়টি বুঝাবার চেষ্টা করছি।

এই সূত্রের ভাষ্য দিয়েছেন॥ যত্র কায়স্তত্রাকাশং তস্যাবকাশদানাৎ কায়স্য, তেন সম্বন্ধঃ প্রাপ্তি (সম্বন্ধাবাপ্তিরিতি পাঠান্তরম্) তত্র কৃতসংযমো জিত্বা তৎসম্বন্ধং লঘুষু তুলাদিষ্বাপরমানুভ্যঃ সমাপত্তিং লব্ধা জিতসম্বন্ধো লঘুঃ, লঘুত্বাচ্চ জলে পাদাভ্যাং বিহরতি, ততস্তূর্ণনাভিতন্তুমাত্রে বিহৃত্য রশ্মিষু বিহরতি, ততো যথেষ্টমাকাশ-গতিরস্য ভবতীতি॥ ৪২॥

৪২। কায় আকাশের সম্বন্ধে সংযম হইতে এবং লঘুতুলাসমাপত্তি হইতে আকাশ গমন সিদ্ধ হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যেখানে কায় সেখানে আকাশ, কারণ আকাশ শরীরকে অবকাশ দান করে। তাহাতে আকাশ ও শরীরের ব্যাপ্তি ব্যাপনরূপ সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধে সংযমকারী সে সম্বন্ধ জয় করিয়া (আকাশ গতি লাভ করেন) অথবা লঘুতুলাদি পরমাণু পর্যন্ত দ্রব্যে সম্পত্তি লাভ করিয়া সম্বন্ধজয়ী যোগী লঘু হন। লঘু হওয়াতে জলের উপর পদের দ্বারা বিচরণ করেন। পরে উর্ণনাভি তন্তুমাত্রে বিচরণ পূর্বক, পরে রশ্মি অবলম্বন করিয়া বিচরণ করেন। তদনন্তর তাঁহার যথেচ্ছ আকাশ গতি লাভ হয়। (১)

টীকা॥ ৪২॥ (১) কায় ও আকাশের সম্বন্ধ ভাব অর্থাৎ আকাশকে অবলম্বন করিয়া শরীরের যে অবস্থান আছে, তদ্ভাবে সংযম করিলে অব্যাহতভাবে সঞ্চরণ যোগ্যতা হয়।

আকাশ শব্দগুণক। শব্দ আকারহীন ক্রিয়াপ্রবাহ মাত্র। সর্বশরীর সেইরূপে ক্রিয়াপুঞ্জ মাত্র ও আকাশের ন্যায় ফাঁক এইরূপ ভাবনাই কায়াকাশের সম্বন্ধ ভাবনা। শরীর ব্যাপী অনাহত নাদ ভাবনার দ্বারাই উহা সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রান্তরে তাই অনাহত নাদবিশেষ ভাবনার দ্বারা আকাশ গতি সিদ্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে।

আধুনিক প্রেতবাদীদের (Spiritist) শাস্ত্রে সেয়ংস (seance) কালে মিডিয়ম শূন্যে উঠিয়াছে এইরূপ ঘটনা বিবৃত আছে। D. P. Homu নামক প্রসিদ্ধ মিডিয়ম এইরূপে শূন্যে উঠিয়াছিলেন। প্রাণায়াম কালে শরীরকে অনবরত বায়ুবৎ ভাবনা করিতে হয় বলিয়াও কখন কখন শরীর লঘু হয়, এইরূপ কথা হঠযোগে পাওয়া যায়। সকলেরই মূল মানসিক ভাবনা।

ভাবনার দ্বারা শরীর লঘু হয়—ইহার মূলে এক গভীর ভাবনা নিহিত আছে। ভার অর্থে পৃথিবীর দিকে গতি। জড় দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে সেই গতি বা গতির শক্তি কোন দ্রব্যে বেশী কোন দ্রব্যে কম। শরীর বা জড় দ্রব্য কি? প্রাচীনেরা বলেন শরীর পরমাণু সমষ্টি, আর বৌদ্ধরা বলেন পরমাণু নিরংশ, অতএব শরীর শূন্য। এইরূপ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও আসিয়া পড়ে। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে পরমাণু প্রোটন ও ইলেকট্রনের আবর্তন মাত্র। ঐ সূক্ষ্ম দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে প্রভূত ফাঁক থাকে (সূর্য গ্রহণের ন্যায়)। ইলেকট্রন, প্রোটনের চতুর্দিকে এক সেকেণ্ডে বহুলক্ষ বার ঘুরিতেছে। অলাতচক্রের ন্যায় এক রূপে প্রতীত সেই সাবকাশে ইলেকট্রন ও প্রোটন এক একটি অণু। সুতরাং অণুর মধ্যে ফাঁকই প্রায় সমস্ত। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করেন যে, শরীরে যত অণু আছে তাহাদের প্রোটন ও ইলেকট্রন (ইহারাও বিদ্যুৎ বিন্দু মাত্র) সকলকে একত্র করিলে (অর্থাৎ মধ্যের ফাঁক বাদ দিলে, শরীরে ঐ উপাদানের পরিমাণ এত ক্ষুদ্র হইবে যে তাহা আণুবীক্ষণিক দ্রব্য হইবে। কিন্তু সেই দ্রব্যও বিদ্যুৎ বিন্দু হইবে। আণুবীক্ষণিক বিদুৎ বিন্দুর ভার আছে যদি ধরা যায়, তবে তাহাই শরীরের প্রকৃত ভার (কিন্তু শরীর মহাভার বলিয়া প্রতীত হয়), অবশ্য আমাদের অভিমান হইতে যে শরীরের ভার হইয়াছে তাহা নহে। আমাদের অভিমান শরীরে উপাদানের উপর কার্য করিয়া তাহাদেরকে শরীর রূপে পরিগণিত করে; শরীরোপাদানের প্রকৃত রূপ এক বিদ্যুৎ বিন্দু বা আকাশবৎ ভাব। প্রকার বিশেষ অভিমানকে সেই দিকে অর্থাৎ কায় ও আকাশের সম্বন্ধে সমাহিত ভাবে প্রয়োগ করিলে শরীরোপাদানও সেইরূপ হইতে পারিবে। অর্থাৎ শরীরের অণু সকলের যে গতি বিশেষ 'ভার' নামক ধর্ম, তাহার পরিবর্তনই শরীরের লঘুতা ও তাহা ঐরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব শরীর ফাঁক অবকাশকে ব্যপিয়া নিরেট ভারবতের মত এক অভিমান বিশেষ। মন কোনরূপ উপায়ে এই ফাঁক অণুসমষ্টির সহিত মিলিত হইয়া মনে করে, আমি নিরেট ব্যাপী ভারবৎ শরীর। সমাহিত স্থির চিত্তের দ্বারা সেই অভিধান অন্যরূপ করা কিছু অসম্ভব কথা নহে। এইরূপে ইহা বুঝিতে হইবে।

যোগ ব্যতীত অন্য অবস্থাতেও শরীর লঘু হয়। খৃষ্টানদের ৪০ জন সেণ্ট (Saint) এই লঘুত্ব বা শূন্যে উত্থানের জন্য সেণ্ট হইয়াছেন। উঁহাদের সংজ্ঞা Hethrcobat। বৌদ্ধেরা ইহাকে উদ্বেগাত্রীতি বলেন।—বিভূতিপাদ। সূত্র ৪২। পৃঃ ২৫০—২৫১। পাতঞ্জল দর্শন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।

উক্ত সূত্রের কথা উল্লেখ করে শান্তামায়ি বলেন—সমাধিস্থ শ্রীচৈতন্যের দেহকে যা দুর্বৃত্তরা মৃত বলে ভেবেছিল এবং লোকসংঘট্টে জানাজানির ভয়ে গরুড় স্তম্ভের পিছনে

ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারপর কানাই খুটিয়া ও শিখি মাহান্তি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সেই সমাধিস্থ মৃতবৎ দেহকে নিয়ে গিয়েছিলেন তোটা গোপীনাথ মন্দিরে। এই মন্দিরটিকে তারা কি নিরাপদ মনে করেছিলেন?

হয়ত সেই মুহূর্তে তাঁরা তাই মনে করেছিলেন। মন্দিরটি ছিল কাছেই। এটি চৈতন্যদেবের শক্তি গদাধরের আস্তানা। তারপর সমাধিভঙ্গ করাচ্ছিলেন কানের কাছে হরিধ্বনি করে বা যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা। এক্ষেত্রেও অনেকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ঐ বেলা ৩টা থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত কি সমাধিস্থ অবস্থায় বেঁচে থাকা সম্ভব?

হ্যাঁ, বেঁচে থাকা সম্ভব। দু'দশ ঘণ্টা নয়। দু'দশ দিনও সমাধিস্থ অবস্থায় বেঁচে থাকা যায়। এই দশকেই তা সম্ভব হয়েছে। সত্যমূর্তিজীর কথা অনেকেই শুনেছেন। বাংলা ১৩৮৪ সালের ১৩ই কার্তিক, রবিবার, যুগান্তর পত্রিকায় ১০২ বৎসর বয়স্ক স্বামী সত্যমূর্তিজীর অলৌকিক সমাধির কথা ছবি সহ প্রকাশিত হয়। ১৪ই কার্তিক সোমবার ঐ যুগান্তর পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে 'চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বিস্ময়' শিরোনামায় সম্পাদক লেখেন:

'দিল্লীতে স্বামী সত্যমূর্তির যোগসমাধি সারা দেশব্যাপী প্রচণ্ড কৌতুহলের সৃষ্টি করেছিল। ১০২ বৎসর বয়স্ক স্বামীজী মাটির নীচে ন' দিন যোগসমাধিস্থ অবস্থায় থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে বার হয়ে এসেছেন। চিকিৎসকরা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ভূগর্ভে সমাহিত স্বামীজীর দেহের অবস্থা প্রতিমুহূর্তেই জানতে পারছিলেন। তাঁদের মতে মাটির নিচে প্রবেশের পঞ্চম দিনেই যোগীবরের হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ষষ্ঠ দিনে তাঁর নাড়ীর স্পন্দন যায় থেমে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী ঐদিনই স্বামী সত্যমূর্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যারা এই সমাধি প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা এবং স্বামীজীর স্ত্রী ও পুত্র যাঁরা সর্বক্ষণ সমাধিস্থলে প্রার্থনা ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করছিলেন, তাঁরা বিচলিত হননি। স্বামীজীর দেহের তাপও যন্ত্রেতে যা ধরা পড়ে তা কোন জীবিত মানুষের নয়। তা সত্ত্বেও নবম দিনে ভূগর্ভ থেকে সংকেত আসে স্বামীজীর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে। সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা সমাধি-প্রকোষ্ঠ তখন ভেঙে ফেলা হয় এবং সুস্থ দেহে স্বামীজী সমাধি ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসেন।'

সত্যমূর্তিজীর এই সত্য কাহিনী পড়ে অবিশ্বাস করি কেমন করে যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর সমাধিস্থ অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকার কাহিনী মিথ্যা। চৈতন্য-জীবনে এমন অনেকবারই ঘটেছে। প্রথম যে দিন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পর উন্মাদের মত জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে ঢুকে জগন্নাথদর্শন করতে যান, তখন পাণ্ডারা তাঁকে এমন প্রহার

করেছিল যে তাতে তিনি মৃতবৎ পড়েছিলেন। ভাগ্যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তা নাহলে সেদিন হয়ত একটা অঘটন ঘটে যেত। ঐ অবস্থায় চৈতন্যদেবকে দেখে ঃ

শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্যের মন ॥
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য হৈল ॥

এই অবস্থায় মহাপ্রভুকে দেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বুঝতে পারলেন ঃ

বসি ভট্টাচার্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয় ॥
নিত্যসিদ্ধ ভক্ত যে সুদীপ্ত ভাব হয় ॥
অধিরূঢ় মহাভাব তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার ॥

(চ. চ. মধ্য ষষ্ঠ পরি)

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বেদান্তের পণ্ডিত। তিনি সাত্ত্বিক, নিত্যসিদ্ধ, অধিরূঢ় ভাবের কথা বেদান্ত মতেই উল্লেখ করেছেন।

যাই হোক, এই ঘটনার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর প্রায়ই সমাধি হোত। এ দিনের এই সমাধিও ভেঙ্গেছিল ঃ

উচ্চ করি করে সবে নাম সঙ্কীর্তন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥ (চৈ. চ. মধ্য ষষ্ঠ পরি)

অতএব সমাধি অবস্থায় যে দীর্ঘকাল মৃতবৎ বেঁচে থাকা যায় ; এ বিষয়ে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে মেনে নিতে বাধা কোথায় ?

অম্বিকা ব্রহ্মচারীর আবিষ্কৃত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে আছে ঃ

হেথা সে যখন প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।
ন্যাসী রূপে গেলা মদনগোপালের স্থান ॥
অধিকারী সকল দেখিল তানে যাইতে।
পুন কোথা গেলা প্রভু না পারি লখিতে ॥

(চৈ. ভা. ১২ অধ্যায়)

এই চারটি চরণে আদি চৈতন্য-জীবনীকার বৃন্দাবন দাস স্পষ্টই বলছেন—প্রভু অন্তর্ধান করার পর জটাজুট বিলম্বিত 'ন্যাসী' অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মদনগোপাল

মন্দিরের দিকে চলে যাচ্ছেন। অধিকারীগণ এদৃশ্য দেখেছেন। কিন্তু তারপর তিনি যে কোথায় গেলেন, তা আর লক্ষ্য করা গেল না।

শান্তা মায়ি বলেন—এই তোটা গোপীনাথের মন্দির থেকেই ছদ্মবেশে অর্থাৎ জটাজুট বিলম্বিত সন্ন্যাসী সেজে সকলের অজ্ঞাতে পালিয়ে গিয়েছিলেন পুরী থেকে। তারপর আনোরপুর পরগণার ঘোলাদুবলী গ্রামে গিয়ে তিনি আত্মগোপন করেন। এই ঘোলাদুবলী গ্রামে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। সেখান থেকে তিনি একদিন পালিয়ে যান। হয়ত লোক জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। পরে এসে হাজির হলেন উলাগ্রামে। দেখা করলেন মহাদেব বারুই-এর সঙ্গে তার বরোজের মধ্যে নিভৃতে একান্ত গোপনে। তখন শ্রীচৈতন্যের দেহে নেই সন্ন্যাসীর কোন চিহ্ন। সাধারণ ভবঘুরের বেশ তাঁর। মহাদেব বারুই ছিলেন পুত্রহীন। সন্তান-স্নেহ বঞ্চিত মহাদেব মহাপ্রভুকে এই অবস্থায় পেয়ে নিজ সন্তানরূপে গ্রহণ করলেন। পরম আদরে নিজ পুত্রের মত লালন-পালন করতে লাগলেন। মহাদেব-গৃহে দীর্ঘ বার বছর থাকলেন তিনি। তারপর একদিন ছল করে পালিয়ে গেলেন বারুই-গৃহ থেকে।

হাজির হলেন এক গন্ধ বণিকের বাড়ীতে। আশ্রয় নিলেন সেখানে। তথায় অল্প কিছুদিন থেকে হাজির হলেন এক জমিদারের বাড়িতে। সেখানে মহাপ্রভু কাটালেন প্রায় দেড় বছর। তারপর জমিদার বাড়ী থেকেও তিনি পাত্তাড়ি গুটোলেন। আবার পালিয়ে গেলেন ছদ্মবেশী শ্রীচৈতন্য।

এবার সোজা পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে চললো তাঁর অবিরাম পরিক্রমা। দেশের পর দেশ খাল নালা পেরিয়ে চললো এক নাগাড়ে পরিভ্রমণ। তারপর এক সময় এসে হাজির হলেন বেজড়া নামক একটি গ্রামে। এখানে এসে যেন কতকটা স্থির হলেন গোরাচাঁদ। তখন তিনি নতুন নাম নিয়েছেন 'আউলিয়া চাঁদ'। আরবী ভাষায় আউল মানে আদি। আবার আউলিয়া অর্থে সিদ্ধপুরুষও বুঝায়।

এই বেজড়া গ্রামেই তাঁর কাছে প্রথম বাইশ জন শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের নাম হলো—নয়ন, লক্ষ্মীকান্ত, হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল, নিত্যানন্দ দাস, খেলারাম উদাসীন, কৃষ্ণদাস, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, শঙ্কর, নিতাই ঘোষ, আনন্দ গোঁসাই, মনোহর দাস, বিষ্ণুদাস, কিনু, গোবিন্দ, শ্যাম কাঁসারি, ভীম রায় রাজপুত, পাঁচু রুইদাস, নিধিরাম ঘোষ আর শিশুরাম।

শান্তা মায়ি বলেন, এই আউলিয়া চাঁদ আর তাঁর বাইশ জন শিষ্যকে নিয়ে ভারি সুন্দর একটি গান আছে আমাদের সম্প্রদায়ে, তাহলো—

এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো।
এর নাইকো রোষ সদাই তোষ,
মুখে বলে সত্য বলো॥
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটি মন,
বাহু তুলে কল্লে প্রেমে ঢলাঢল॥
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়।
এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো॥

শান্তা মাঝি বলেন, এই গানের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা ফুটে উঠেছে আউলিয়া চাঁদের মধ্যেও। এই যে বাইশ জন শিষ্য, এঁরা অনেকেই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। তৎকালে সমাজ যাদের নীচে রেখেছিল তাঁদেরই তিনি দিয়েছিলেন কোল। টেনে নিয়েছিলেন বুকে। সদ্‌গোপ রুইদাস, রাজপুত, কাঁসারি, গন্ধবণিক প্রভৃতি যে সব জাতি সমাজে অবহেলা আর নিপীড়ণ সহ্য করত তাঁদেরকেই তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছিলেন।

'সাম্যবাদী সদ্যাগত ইসলাম ধর্মের প্রতি (মানুষ) যখন আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল ক্রমে ক্রমে, ঠিক সেই সময়ে কৃষ্ণ নামের জোয়ার বইয়ে অবজ্ঞাত নিষ্পেষিত তথাকথিত এই নীচু শ্রেণীকেই সর্বাগ্রে তাঁর সমদর্শী উদার বক্ষপটে জড়িয়ে ধরেছিলেন গৌরহরি। —কাঁহা গেলে তোমা পাই। পৃ. ১৩৪

সনাতন ধর্মকে নিশ্চিত অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। আউলিয়া চাঁদই যে গোরাচাঁদ তা উভয়ের ধর্মের মূল নীতি, দেখলে সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া গীতের মধ্যেই ত প্রশ্ন আছে—'আউলিয়া চাঁদ এলো কোথা থেকে?' এমন অদ্ভুত মানুষ এলো কোথা থেকে—অর্থাৎ তাঁর পূর্ব জীবনের ইতিহাস ভক্তদের কাছেও ছিল অজ্ঞাত। নীলাচল থেকে পালিয়ে তিনি ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বাসই করেছিলেন। কিন্তু সেই বাহুতুলে নৃত্য, প্রেমে ঢলাঢল করা—এ সমস্ত গুণই ত গোরাচাঁদেরই। শ্রীচৈতন্যের মত আউলিয়া চাঁদও ছিলেন দীর্ঘকায়, দুই বাহু ছিল তাঁর আজানুলম্বিত। তিনি ফল-মূল, লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন।

ঘুরীতপুর গ্রামের ঘোষপাড়া। যা আজ সারা বাংলার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থান। সেখানকার পালদের বাড়ীতে এখনও আছে আউলিয়া চাঁদের কমণ্ডলু থেকে দেওয়া সেই দৈবশক্তিসম্পন্ন গঙ্গাজল।' এই পাল আর কেউ নন, ইনি হলেন মহাভাগ্যবান রামশরণ পাল। জাতিতে সদ্‌গোপ। বাস ছিল চাকদহের কাছে জগদীশপুরে। আউলচাঁদের সেই বাইশজন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম একজন।

রামশরণের প্রথমা পত্নী এবং দুই কন্যার মৃত্যু হলে, আবার বিবাহ করেন জগদীশপুরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর নিবাসী গোবিন্দ ঘোষের কন্যা সরস্বতী দেবীকে। এই সরস্বতী দেবীই বঙ্গবাসীর কাছে 'সতীমা' নামে বিখ্যাত।

সরস্বতীর গর্ভে রামশরণের পুত্র রামদুলাল এবং দুটি মেয়ে অন্নদা আর ভবানীর জন্ম হয়। সরস্বতীকে বিয়ে করার অল্পদিন পরেই নদীয়া জেলার অন্তর্গত মুরাতিপুর গ্রামে নিয়ে নিজের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে বাস করে থাকেন রামশরণ। তারপর সেখানকার জমিদার বেনেপুরের খাঁ রাজদের বংশোদ্ভব রাও রায়ান দেওয়ান পদ্মলোচন রায় বাহাদুরের গৃহে অতিথি সেবার চাকরি পান। রামশরণের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে দেওয়ান পদ্মলোচন উখড়া পরগণার একটি মহালে নায়েব করে পাঠান। এই মহালের কাছারী বাড়িতেই একদিন ঘটল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সহসা হাজির হলেন এক আজানুলম্বিত ভুজ সুগৌর বর্ণের দীর্ঘকায় মহাপুরুষ। আর সেদিনই উঠল রামশরণের জীবনান্তকর পূর্বসঞ্চিত শূলবেদনা। অসহ্য যন্ত্রনায় মূর্চ্ছিত হলেন রামশরণ। মহাপুরুষ একথা জানতে পেরে তাঁর কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুললেন রামশরণকে। রামশরণ জীবন পেয়ে এলেন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে। নিতে চাইলেন সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা। সেই মহাপুরুষ রাজী হলেন না কিছুতেই। বললেন—'তুমি সংসার-আশ্রমে থেকেই দেশের দশ জনের সেবা কর। আর এই নাও আমার কমণ্ডলুর দৈবশক্তি-সম্পন্ন গঙ্গাজল।' এই বলে তিনি বিদায় নিলেন রামশরণের কাছ থেকে।

মহাপুরুষ চলে যাবার পর রামশরণ ছেড়ে দিলেন জমিদারের চাকরী। ফিরে এলেন মুরাতিপুরের ঘোষ পাড়ায়। এখানে এসেই সেই মহাপুরুষের আশীর্বাদে রামশরণ অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হলেন। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল রামশরণের নাম। হাজারে হাজারে মানুষ আশ্রয় নিল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সুশীতল ছায়াতলে। এই ধর্মের মূল বীজমন্ত্র হলো—গুরু সত্য।

রামশরণের ছেলে রামদুলালের সময় কর্তাভজা সম্প্রদায়ে অনেক ধনী-মানী জ্ঞানী ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ভু-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরও স্বয়ং কর্তাভজা মতাবলম্বী হয়েছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত, বিশ্বকোষ, তৃতীয় খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠায় এই সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশেষ তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে।

রামদুলাল মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁর মাতা সরস্বতী দেবী বসেন ঘোষপাড়ার গদিতে। মহিলা হয়েও তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘকাল

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেন। শিষ্যবৃন্দ অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে 'সতীমা' নামে এঁকে ভূষিতা করে রেখেছেন।

এই মহাপুরুষই হলেন আসলে গৌরাঙ্গদেব। অর্থাৎ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আউলিয়া চাঁদ। চৈতন্যদেব যেমন জাত-বেজাতের কুসংস্কারকে কখনো প্রশ্রয় দেননি, আউলিয়া চাঁদের প্রবর্তিত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যেও তেমনি জাত-বিচার বা অন্নবিচার একেবারেই নাই। সকল বর্ণের এমন কি মুসলমানগণও এই ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। তাতে কোন বাধা নেই।

শ্রীচৈতন্যদেবের যেদিন জন্মদিন অর্থাৎ ফাল্গুনের দোল পূর্ণিমাতেই আউলিয়া চাঁদের জন্মদিনও পালন করা হয়। ঘোষপাড়াতে এখনো দোল এবং রথযাত্রা একই দিনে আড়ম্বর সহকারে পালিত হয়। বিরাট মেলা বসে তখন। এই মেলা-প্রাঙ্গণে আছে এক প্রাচীন দাড়িম গাছ। লোকে বলে দাড়িমতলা। এই দাড়িমতলার পেছনে দোতলার একটি ঘরের মধ্যে আজো সযত্নে রক্ষিত আছে আউলিয়া চাঁদের আশা বাড়ি আর কন্থা ঃ রামশরণের খড়ম ঃ আর রামদুলালের অস্থি। এই ঘরেরর নাম ঠাকুর ঘর। এখানে এখনো প্রতিদিন আরতি আর হরিসংকীর্তন নিয়মিত হয়।

এই সম্প্রদায়ের সকলেই মনে করেন—যদিও কোন পুস্তকে প্রমাণ নাই, শিষ্য-পরম্পরায় শুনে এসেছেন আউলিয়া চাঁদ নাকি এসেছিলেন রামশরণের ঘোষপাড়ার বাড়ীতে। এবং অনেকদিন অবস্থানও করেছিলেন।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে জানা যায় চাকদহের কাছে পরারী গ্রামে অনেকদিন বাস করেছিলেন আউলিয়া চাঁদ। এমন কি বছরের পর বছর। তারপর ১৬৯১ শকে বোয়াল নামক গ্রামে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। সেই সময় তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন রামশরণ, হটু ঘোষ প্রভৃতি আট জন শিষ্য। এঁরা বোয়ালেই আউলিয়া চাঁদের কাঁথার সমাধি দিয়ে চলে যান দেহটি নিয়ে চাকদহের কাছে পরারী গ্রামে। সেখানেই সমাহিত করা হয় তাঁর দিব্যদেহটিকে। সেই ঐতিহাসিক মহাপবিত্র সমাধি আজো আছে পরারী গ্রামে। পরারী তাই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মহা-পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

॥ এগার ॥



প্রজ্ঞাপ্রাণা অধ্যাপিকা শান্তা মায়ির এই কাহিনীর মধ্যে সত্যমিথ্যা এমন ভাবে মেশামেশি হয়ে আছে, যা নানা বিতর্কের সৃষ্টি করে। প্রথম যে প্রশ্নটি মনে জাগে তা হলো আউলিয়া চাঁদ মানব দেহ সংবরণ করেছেন ১৬৯১ শকে। আর চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪০৭ শকে (১৪৮৬ খ্রীঃ)। তাহলে শান্তা মায়ির কথা অনুযায়ী, আউলিয়া চাঁদই যদি শ্রীচৈতন্য হন, তাহলে মহাপ্রভু বেঁচেছিলেন ২৮৪ বছর। আজ পর্যন্ত যতদূর জানি চীনে নাকি একজন লোক ১৩৬ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। কিন্তু ২৮৪ বছর বেঁচে থাকা কখনো কি সম্ভব?

অবশ্য অনেক দীর্ঘজীবী মহাপুরুষের কথা আমরা শুনেছি। তৈলঙ্গ স্বামী বেঁচেছিলেন ১৮০ বৎসর। *শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহে বর্তমান ছিলেন ১০৮ বছর। কারো কারো মতে ১১২ বছর। ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে বেশী পরমায়ু বাবাজী মহারাজের বলে জানা গেছে। আমেরিকার লস্ এ্যাঞ্জেলস্ থেকে প্রকাশিত পরমহংস যোগানন্দ কৃত 'অটোবায়োগ্রাফি অফ এ যোগী' পুস্তকে এই মহাপুরুষের কথা বিবৃত হয়েছে। বদরীনারায়ণের কাছে উত্তর হিমাচল প্রদেশের শৈলশিখরে যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু এই বাবাজী মহারাজ এখনও জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান আছেন বলে শোনা যায়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ গোবিন্দ যতির শিষ্য শঙ্করাচার্য নাকি কাশীতে বাবাজী মহারাজের কাছ থেকে যোগদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই বাবাজী মহারাজের বর্তমান বয়স নাকি হাজার বছরেরও বেশী। কিন্তু এই আয়ু মানবদেহে সম্ভব নয়। উপনিষদ কথিত 'সিদ্ধ' মহাপুরুষের জীবন্মুক্ত অবস্থায় উন্নীত হওয়ার পরে পরামুক্তি অবস্থা লাভ হয়; এই পরামুক্তি যাঁর ঘটেছে, তিনি মায়ার নাগপাশ ছেদন করে তার জন্ম মৃত্যুর হাত সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন। যোগ-বিজ্ঞান সম্মতভাবে এসব ঘটনা অনেকের স্বীকৃতি পেলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টি কোণ থেকে তবুও কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে।

অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থ থেকে জানা যায় নদীয়া জেলার উলাগ্রামের মহাদেব বারুই-এর পালিত পুত্র এই আউল চাঁদ। মহাদেব তাঁর বরোজ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন একটি শিশু পুত্র। হয়ত কেউ অবৈধ সন্তান বলে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। 'বিশ্বকোষ' বলছে শিশু পুত্র। আর অক্ষয়কুমার বলছেন

---

* শ্রীগুরু আশ্রম—ত্রৈলঙ্গ মঠ, কলিকাতা-৩৫ থেকে সেবক জীবনকৃষ্ণ এক পত্রে জানিয়েছেন—'ত্রৈলঙ্গ স্বামী দেহে ছিলেন ১০১৪—১২৯৪=২৮০ বছর।'

তখন তার বয়স আট বছর। নাম ছিল পূর্ণচন্দ্র। ২০ বছর বয়স পর্যন্ত মহাদেবের ঘরে ছিলেন তিনি। বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে নাম গ্রহণ করেন 'আউল চাঁদ'। নানা দেশ ঘুরে ২৭ বছর বয়সে বেজরা নামক গ্রামে এসে আস্তানা গাড়েন। এইখানে তাঁর বহু শিষ্য জোটে। ঘোষপাড়াবাসী রামশরণ পাল এঁর ধর্মমতকে 'কর্তাভজা' মত নামে প্রচার করেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বোয়ালে আউল চাঁদের মৃত্যু হয়। চাকদহের তিন ক্রোশ পূর্বে পরারী গ্রামে তাঁর সমাধি হয়। এই সম্প্রদায়ের গুরুকে 'মহাশয়' এবং শিষ্যকে 'বরাতি' বলে। এই ধর্মে দশটি কর্ম নিষেধ। পরস্ত্রী গমন, পরদ্রব্য হরণ এবং পরহত্যা বা পীড়ন—এই তিনটি কায়কর্ম। পর দ্রব্য হরণেচ্ছা, পরহত্যা করণেচ্ছা, পরস্ত্রী গমনেচ্ছা—এই তিনটি মনঃ কর্ম এবং মিথ্যা কথন, কটু কথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ ভাষণ—এই চারটি বাক্যকর্ম পরিহার্য। ইন্দ্রিয় সংযম এই সম্প্রদায়ের লোকদের প্রধান কর্তব্য। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে—'মেয়ে হিজড়া পুরুষ খোজা, তবে হবে কর্তা ভজা।'—জ্ঞানভারতী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২২৭।

অবশ্য 'বিশ্বকোষ' আর তার 'ভারতকোষে' আছে আউল চাঁদকে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা চৈতন্যদেব বলে মনে করেন। এদের মতে আউল চাঁদের আবির্ভাবকাল ১৬৯৪ থেকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাহলে বয়স হয় ৭৫ বছর। আর 'জ্ঞানভারতীর' মতে ১৬৮৬ থেকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই মতে ৮৩ বছরের বেশী হয় না।

'কাঁহা গেলে তোমা পাই' গ্রন্থে শান্তা মায়ির সঙ্গে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাতকারের একটি ঘটনা এখানে অবিকল উদ্ধৃত করছি।

'কতকগুলো তালপাতার ওপরে কিছু লেখা। যে মহাদেব বারুই-এর ঘরে আউলিয়া চাঁদ বার বছর ছিলেন, তারই এক বংশধর ওগুলো আমাকে দিয়েছে। ও বলেছে ঐ তালপাতাগুলো ও ওর জেঠিমার কাছ থেকে পেয়েছে। জেঠিমা ওকে বলেছিল বহুদিন আগে এক ফকির নাকি ঐ তালপাতাগুলোতে বিষহরির মন্ত্র লিখে রেখে গেছে। তা আমি ওগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে দেখি একটা পাতায় সংস্কৃতে লেখা ঃ

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।

—শ্রীপদ্যাবলী। ৭৫

চমকে উঠল আনন্দ—'আরে এত বিষহরির মন্ত্র নয়, এযে চৈতন্যদেবের স্বরচিত গীতের একটি পদ! এর অর্থ—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য নই বা শূদ্রও নই।

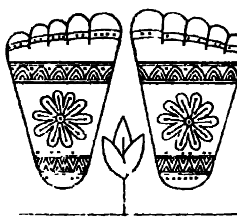
বৃদ্ধা বলেই চললেন—আর তার নীচেই প্রাচীন বাংলায় লেখা মাত্র দুইটি ছত্র।

গত ঈশান গতা মাতা গত স্বরূপ-রায়।
একেলা মুই পড়িয়া কান্দি জগন্নাথের পায়॥

এখন তোমায় ভেবে বের করতে হবে মাণিক, কে এই মুই। উত্তেজনার আধিক্যে সংযম হারিয়ে ফেলে শাণ্ডা মাসির দুই হাত চেপে ধরে প্রায় চীৎকার করে উঠল আনন্দ—কোথায় আছে মাসি? কোথায় আছে ঐ তালপাতাগুলো।

মেদিনীপুরে, আমার এক সখির বাসায়। কিন্তু অমন চঞ্চল হলে চলবে না যে মাণিক! স্থির হও, শান্ত হও। পরশুর পরের দিন যাচ্ছই যখন আমার সঙ্গে তখন আর চিন্তা কি! সব দেখিয়ে দেব আমি এক এক করে'। পৃষ্ঠা ১৪০—১৪১।

এ ঈশান হলো শ্রীচৈতন্যদেবের বৃদ্ধ গৃহভৃত্য। মাতা—শচীদেবী। আর স্বরূপ হলেন স্বরূপ দামোদর। তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবাব্রত গ্রহণ করেছিলেন। লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে দেখছি স্বরূপ-এর বুক ফেটে প্রাণ বেরিয়ে গেছে চৈতন্য-তিরোধানের পর। এই স্বরূপের কড়চার এখনো কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। ইতিহাস বলে চৈতন্য তিরোধানের পর স্বরূপ বৃন্দাবনে গিয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। এই দুই ছত্রে পাচ্ছি তিনি গত হয়েছেন। তাহলে কোনটিকে সত্য বলে গ্রহণ করব? এসব জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আসুন আমরা অন্য পথ ধরি।



।। বার ।।



কর্তাভজা সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাসের সত্যাসত্য নির্ণয়ের বিতর্ক রেখে এখন আসুন আমরা হাঁটি ইতিহাসের পথ ধরে। উৎকলের তারপরের ইতিহাস শুনুন, তাই বলি। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন বা জুলাই, আষাঢ় মাসে (১৪৫৫ শক, ৯৪০ বঙ্গাব্দ বেলা তৃতীয় প্রহারে—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে) উৎকলের ইতিহাসে বয়ে গেছে ভীষণ ঝড়। চক্রান্ত করে গোবিন্দ বিদ্যাধর পর পর মহারাজ প্রতাপরুদ্রের দুজন নাবলক পুত্র কালুআ দেব ও কখারুআ দেবকে উৎকলের সিংহাসনে বসিয়ে নিজেই তাদের হত্যা করিয়েছেন নির্মমভাবে। উৎকলের আকাশে বাতাসে তখন বইছে ঘূর্ণী ঝড়। চারিদিকে অরাজকতা। নিজের সৃষ্ট এই অস্থিরতার মাঝেই গোবিন্দ বিদ্যাধর বসলেন উৎকলের সিংহাসনে। (১৪৫৬ শক) প্রতিষ্ঠা করলেন ভোই রাজবংশ।

রাজ্যচ্যুত প্রতাপরুদ্র। কটকে তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্টে দিন যাপন করছেন। উৎকল থেকে রাধাভজা বৈষ্ণবের দল পলায়িত। নিদারুণ আতঙ্কে প্রধান প্রধান চৈতন্য-পার্ষদবৃন্দ পালিয়েছেন বৃন্দাবনে। 'হরি' বা কৃষ্ণ' বলতে উৎকলে কেউ নেই। কোন কোন বৈষ্ণবকে হত্যাও করিয়েছেন গোবিন্দ বিদ্যাধর। অতএব শ্রীচৈতন্য কোথায় গেলেন বা তাঁর মৃতদেহ কোথায় সমাধিস্থ হলো—এ বিষয়ে খোঁজ-খবর করার মত কেউ আর রইল না। চৈতন্যের নাম উচ্চারণ করলেই অবধারিত তার মৃত্যু। উৎকলের সর্বত্র এমন একটা আতঙ্ক, এমন একটা বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে কেউ আর সাহস করলো না চৈতন্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর করার। গৌড় থেকে যে সব বৈষ্ণব এসেছিলেন অনুসন্ধান করতে বা জানতে, তাঁরাও পথে উৎকলে বৈষ্ণব-নিধনের সংবাদ পেয়ে আর অগ্রসর হয় নি। এমন একজন হলেন চৈতন্য-পরিকর ও চৈতন্য-পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ। তিনি পথে তমলুকে এসে যখন শুনলেন শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-বিগ্রহে হারিয়ে গিয়েছেন, তখন দুঃখে তিনি অচেতন হয়ে এক বকুলবৃক্ষ-তলে পড়ে গেলেন। অচেতন অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নে যেন মহাপ্রভু তাঁকে বালকরূপে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—'বাসুদেব, তুমি আমার জন্য আর দুঃখ করো না। তোমার আর উৎকলে গিয়ে কাজ নাই। তুমি এখানেই আমার সেবা-পূজার বন্দোবস্ত কর। আমি প্রতিদিন তোমায় পুত্ররূপে এসে দেখা দেব।'

কিংবদন্তী অনুসারে বাসুদেব নাকি পুত্রশোকাতুর ছিলেন। তাই কীর্তনীয়া ও পদকর্তা কবি বাসুদেব ঘোষ আর অগ্রসর না হয়ে তমলুকেই শ্রীচৈতন্যের বালমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সেবা পূজো আরম্ভ করেন। নীলাচলে আর গমন করেননি। আজিও মহাপ্রভুর মন্দির তমলুকে আছে ও নিয়মিত মহাপ্রভুর সেবাপূজো হচ্ছে।

বাসুদেব ঘোষের প্রতিষ্ঠিত এই বালক-চৈতন্যের মূর্তি-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যাই কিংবদন্তী প্রচলিত থাক না কেন, এর পিছনে চৈতন্য-বিজয়ের সম্পর্ক ক্ষীণ হলেও যে আছে ; সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। তমলুকে প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর এই বাল-মূর্তির প্রকৃত ইতিহাস আজো আবিষ্কৃত হয় নাই। মূর্তিটির সন্ধান পেয়ে তৎকালে ভোই রাজের চর সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে মূর্তিটি অপহরণ করেন।[১] তখন ভগবানপুর থানার পিছলদা পর্যন্ত উৎকল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পিছলদা পেরিয়ে এসেছিল গোবিন্দ বিদ্যাধরের চৈতন্য-বিরোধী-চক্র।

পঞ্চাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত উৎকলে বৈষ্ণব বিদ্বেষ প্রবল ছিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন বৃন্দাবনে সার্বভৌম বৈষ্ণবাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি গৌড় এবং শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে বৈষ্ণবদের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তখন নিজের সুযোগ্য শিক্ষাশিষ্য শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে গৌড়মণ্ডলে আর আচার্য শ্যামানন্দকে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থাবলী সহ প্রেরণ করলেন।

শ্যামানন্দ খড়্গপুরের নিকটবর্তী নিজ জন্মভূমি ধারেন্দা গ্রামে শুদ্ধভক্তি প্রচার করে মল্লভূমির মধ্যবর্তী 'রোহিনী' গ্রাম প্রেম ভক্তিতে বিজয় করেন। তখন ঐ দেশের অধিপতি ছিলেন অচ্যুতানন্দ। রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দ আচার্য শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন রসিকানন্দ নিজ রাজধানী ছেড়ে সাধনভজনের অনুকূল স্থানে গিয়ে ভজন কুঠী নির্মাণ করেন। সেই স্থানের নাম শ্রীবিগ্রহের নামানুসারেই শ্যামানন্দ গোপীবল্লভপুর রাখেন। রসিকানন্দকে নিয়ে শ্যামানন্দ উৎকলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে বহির্গত হন। উৎকলে আবার প্রেমভক্তির বন্যা প্রবাহিত হয়। সহস্র সহস্র লোক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন।

এই আচার্য শ্যামানন্দ বাসুদেব ঘোষের বাল-শ্রীচৈতন্যের মূর্তি অপহরণের কথা শুনে শিষ্য রসিকানন্দকে প্রেরণ করেন শ্রীবিগ্রহ অনুসন্ধানের জন্য। এই অনুসন্ধান কার্যে রসিকানন্দ প্রভু সাফল্য লাভ করেন। তিনি মির্জাপুর অঞ্চল থেকে অনেক

---

১. শোনা যায়, বাসুদেব চৈতন্য-হত্যার কথা শুনে হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছিলেন ভোইরাজের বিরুদ্ধে।

কষ্টে মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে উদ্ধার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তমলুকের রাণী হরিপ্রিয়া দেবী বর্তমান মহাপ্রভুর মন্দিরটি নির্মাণ করে সেবা পূজার বন্দোবস্ত করে দেন।

এই সব ঘটনা থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয় শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের পর দেশে যে একটা বৈষ্ণব-বিদ্বেষ তৎকালে প্রবল আকার ধারণ করেছিল, সে সহজেই অনুমান করা যায়। যার ফলে বৈষ্ণবরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই মনে হয় ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ঠিকই লিখেছেন যে ৫০ বছর গৌড় আর উৎকলে কীর্তন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ যখন 'শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত' লেখেন, তাতে তিনি লিখেছেন—

'যখন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের প্রভুর অপরিসীম কৃপায়, শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইল, তখন অনেকের তাহার শরণাগত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারেন না। যাঁহারা গোস্বামী, পণ্ডিত, তাঁহারা শ্রীভাগবত পড়িয়াছেন, গোস্বামী গ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রভুর লীলা কেহ জানেন না। যিনি বড় জানেন, তিনি শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। সেও যেখানে লীলাকথা আছে সেখানে নয়, যেখানে যেখানে তত্ত্বকথা আছে সেখানে। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়া যে একখানা গ্রন্থ আছে, অনেকেই তাহার সংবাদ রাখিতেন না। সুতরাং বৈষ্ণব-ধর্ম কি, প্রভু কে, তিনি কি করিয়াছেন, ইহা প্রায় কেহই জানিতেন না।'—শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত। ৫ম খণ্ড। পৃঃ ৯৮

আর একস্থানে মহাত্মা শিশিরকুমার লিখেছেন—বিষ্ণুপ্রিয়া কে তাহাও পণ্ডিত, গোস্বামীগণ জানেন না, তাঁহার নামও শুনেন নাই। বাংলা ১৩১৮ সালের ২৬শে পৌষ শিশির কুমার নিত্যাধামে গমন করেছেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ৭৫ কি ৮০ বৎসর আগেও শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে গোস্বামী পণ্ডিতগণ কতখানি অজ্ঞ ছিলেন।

কবি বাসুদেব ঘোষেরা ছিলেন চার ভাই। বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সঙ্গে এসেছিলেন গৌড়ে। গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকতেন পুরীতে। তমলুকে বাসুদেব, দাঁইহাটে শ্রীমাধব ঘোষ আর অগ্রদ্বীপে শ্রীপাট প্রকাশ করে থাকতেন গোবিন্দ ঘোষ।

চৈতন্য চরিতামৃতে দেখতে পাচ্ছি কবিরাজ গোস্বামী বলছেন—

গোবিন্দ মাধব ঘোষ এই বাসু ঘোষ।
তিন ভাইয়ের কীর্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ॥

(চৈ. চ. ম. ১১ পরি)

চৈতন্য বিষয়ক পদকর্তা হিসাবে বাসুদেব ছিলেন নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। রথের সময় পুরীতে তিন ভাই মূল গায়করূপে সংকীর্তন মণ্ডলীতে কীর্তন করতেন।

কেউ কেউ বলেন বাসুদেব ছিলেন চৈতন্য তিরোধানের প্রত্যক্ষদর্শী। এ কাহিনীর মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত আছে বলা যায় না। কিংবদন্তী থেকে জানা যায় চৈতন্য বিজয়ের খবর শুনে তিনি তমলুক দিয়ে নীলাচলে যাবেন বলে তমলুকে এসে আর অগ্রসর হননি।

'শ্রীপদকল্পতরু'তে বাসুদেব ঘোষের একটি পদ আছে। পদটি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্যদেব আততায়ীর হাত থেকে সিংহ দরজা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন সমুদ্রের দিকে। পিছনে ছুটে যাচ্ছিলেন ভক্তগণ। কিন্তু সেই অবস্থায় সম্ভবত পিছন দিক থেকে আততায়ীরা তাঁকে আঘাত করে, ফলে তিনি পড়ে যান। উত্তান শয়ন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করছি—

সিংহদ্বার তেজি গোরা সমুদ্র-আড়ে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে সুধায়॥
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়।
মাঝে কনয়া-গিরি ধূলায় লুটায়॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমি গড়ি যায়।
দীঘল শরীর গোরা পড়ি মুরছায়॥
উত্তান-শয়ন মুখে ফেনা বাহিরায়।
বাসুদেব ঘোষের হৃদয় বিদুরিয়া যায়॥

—শ্রীপদকল্পতরু। পদ সংখ্যা ১৬৬২

আসলে এই পদটিতে পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। গম্ভীরাতে জীবনের শেষ বার বছর রাধাভাবদ্যুতিতে প্রভুর কেটেছিল দিব্যোন্মাদ অবস্থায়। কৃষ্ণদাস বলেছেন—

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্তি হয় নিরন্তর॥

তাই বাসুদেব ঘোষের এই পদটিকে বরং বলা যায় শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থার প্রত্যক্ষলীলাদর্শীর লেখা একটি বাস্তব চিত্র। কোনমতেই এই পদের দ্বারা এমন কোন ইঙ্গিতবহ শব্দ নাই যার দ্বারা অনুমান করা যায় যে শ্রীচৈতন্যদেব পুরীর সমুদ্রতীরে আততায়ীগণ কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। অন্তত আমি এ কথা বলতে পারি এই পদে চৈতন্য হত্যার কোন ইঙ্গিতই নাই।



॥ তের ॥

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম তথ্য-প্রমাণ দিয়ে এর দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অন্তর্ধান অর্থে তিরোধান করেন নি—অদৃশ্য হয়েছিলেন, বা ছদ্মবেশে তোটা গোপীনাথ মন্দির থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর একটি ঐতিহাসিকভাবে সমর্থন পাচ্ছি, তাঁকে সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্র গুম খুন করেছিল। যাঁরা জগন্নাথে লীন হয়েছিলেন বলে অর্থাৎ মিশে গিয়েছিলেন বলেছেন, এই কথার বিজ্ঞান সম্মত, এমন কি ক্রিয়াযোগ-বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তি আছে বলেও মনে হয় না। সূক্ষ্মদেহ ধারণ করা সম্ভব। যোগের দ্বারা দেহ ছেড়ে প্রাণ-সত্ত্বাকে যোগী বের করে নিতে পারেন, সে ক্ষেত্রে পড়ে থাকে নির্জীব অবস্থায়। যেমন নাকি শঙ্করাচার্যের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়ে মৃত রাজা অমরুর দেহে প্রবেশ করেছিল।

বর্তমান যুগে যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বন্ধ ঘরে নিজের দেহকে ফেলে বিলাতে আবির্ভূত হয়ে জনৈক ইংরেজ-গৃহিনীর অসুখ ভাল করেছিলেন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

ঘটনাটি অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। একটু বিস্তৃত করে বলি। বাংলা ১২৬৮ সাল শ্যামাচরণ লাহিড়ীর বয়স তখন ৩০ পেরিয়ে গেছে। হিমালয়ের পাদদেশে নৈনিতালের নিকটবর্তী রাণীখেতে এসেছেন। তিনি কাজ করতেন সামরিক বিভাগে কেরানীর পদে। রাণীখেতের সন্নিকটে হিমালয়ের নির্জন-প্রদেশের কাছেই একটি গুহাতে বাবাজী মহারাজ তাঁকে অলৌকিক ভাবে দীক্ষা দেন। ঐ গুহাটি ছিল শ্যামাচরণের পূর্ব-জন্মের সাধন-পীঠ।

বাবাজীর কাছে দীক্ষা লাভের পর বদলি হয়ে তিনি চলে আসেন দানাপুরের দিকে। কর্মস্থলে কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে কাজকর্ম করতেন। অফিসের বড় সাহেব তাঁকে 'পাগলা বাবু' বলে ডাকতেন। এই সময়ে এই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে।

একদিন শ্যামচরণ দেখলেন, অফিসের সাহেব বড় বিমর্ষ। জিজ্ঞেস করলেন সাহেবকে, তিনি এত চিন্তিত কেন ? সাহেব বললেন—বিলেতে তাঁর মেম সাহেব অত্যন্ত পীড়িত। অনেকদিন কোন সংবাদ পাচ্ছেন না।

এখন শ্যামাচরণ বললেন—সাহেব, কোন চিন্তা করবেন না। আমি আপনার মেমের সংবাদ এনে দিচ্ছি।

এই বলেই একটি নির্জন-গৃহে যোগ বলে সূক্ষ্মদেহে বেরিয়ে চলে গেলেন সোজা বিলেতে। তারপর কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সাহেবকে বললেন—সাহেব, আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই। মেম ভাল আছেন। তিনি এখন আপনাকে চিঠি লিখছেন।'

এই কথা বলে মেম চিঠি কতদূর লিখেছেন, সেই চিঠির অবিকল ভাষা তিনি হুড় হুড় করে বলে গেলেন। সাহেব পাগলা বাবুর কথায় খুসি হলেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। তবুও তখন তাঁর ভারতীয় যোগীগণের অদ্ভুত শক্তির কথা মনে পড়ল। পাগলা বাবুকে তিনি গোড়া থেকেই উচ্চ মার্গের যোগী বলে কেমন যেন সন্দেহ করতেন।

কয়েকদিন পরেই বিলেত থেকে সাহেবের কাছে চিঠি এলো তাঁর মেমের। চিঠি পড়ে সাহেব আশ্চর্য হলেন। পাগলা বাবু চিঠির প্রথমার্ধের ভাষা যেমন বলেছিলেন. অবিকল সেই ভাষাই চিঠিতে লেখা।

এর কিছুদিন পরেই ভারতে এলেন মেমসাহেব। লাহিড়ী মাহাশয় অফিসে বসে কাজ করছেন। মেমসাহেব শ্যামাচরণকে দেখে উল্লসিত হয়ে বললেন—

সাহেব, ঐ যে সেই মহাত্মা। উনি-ই আমার বিলেতে রোগশয্যাপার্শ্বে গিয়ে সেই দুরারোগ্য অসুখ ভাল করেছিলেন।

সাহেব ভারতীয় যোগীগণের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ ও আশ্চর্যান্বিত হলেন।

কাহিনীটি সেবায়তনের (ঝাড়গ্রাম) প্রতিষ্ঠাতা আচার্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের 'যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। লাহিড়ী বাবার জন্ম হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ঘূর্ণী গ্রামে। বর্তমানে লাহিড়ী বাবার বড় জীবনী যোগীরাজের পৌত্র সত্যচরণ লাহিড়ীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

যাই হোক, আমরা আমাদের পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসি। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক কতটুকু! গীতাতে শরীরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীর্ণ বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মানুষ যেমন ছেঁড়া কাপড় পরিত্যাগ করে নূতন কাপড় পরিধান করে, তেমনি আত্মাও বৃদ্ধ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নতুন শরীরে প্রবেশ করে। যার জন্ম হয়েছে, তার মৃত্যুও আছে। সৃষ্টি হলেই ধ্বংস অনিবার্য।

যাঁরা চৈতন্যকে স্বয়ং ভগবান বলে বর্ণনা করেছেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও জরা ব্যাধের হাতে মৃত্যু হয়েছিল, অতএব যাঁরা শ্রীচৈতন্যে শ্রীকৃষ্ণত্ব আরোপ করেছেন, তাঁদের কথার মধ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। তাছাড়া নিজে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কখনো নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলে জাহির করেন নি। বাসুদেব সার্বভৌম

চৈতন্যকে ঈশ্বর বলে বন্দনা করলে তাতে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন—'আতাল পাতাল কথা কেন বা বলহ।'

এমনি অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। অলৌকিকত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। পুরী বা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে কোথাও অলৌকিকত্বের স্থান নাই। তাঁর সম্পর্কে যে সব অলৌকিক কাহিনী উঠেছে সেগুলি তাঁর অবর্তমানে মৃত্যুর পরে।

আর যদি এসবে বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়—তিনি যেমন সব জেনে শুনে নিজে অবিশ্বাস করেও ভক্তদের বলেছিলেন পরম ভক্তিভরে—

আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥ মধ্য। চৈ চ ১৮ পরিচ্ছেদ

অতএব অলৌকিক জেনেও সত্য বলে স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ যুক্তি ছাড়া কোন কিছু বিশ্বাস করতে সহজে চায় না। তাই আমরা লীন হওয়া জড় বস্তু অন্য কোন জড় বস্তুর সঙ্গে মিশে যাবে—একথা বিশ্বাস করি না।

এবার জ্যোতিষের কথায় আসি। দেখি জ্যোতিষ শাস্ত্র কি বলে। জন্ম কোষ্ঠী দেখে হয়ত নির্ণয় করা সম্ভব হবে। শ্রীচৈতন্যদেব কতদিন বাঁচতে পারতেন বা কত বছর তাঁর পরমায়ু ছিল।

আমি প্রথম সংস্করণে শ্রীচৈতন্যদেবের যে জন্ম কুণ্ডলী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জ্যোতিষরত্নাকর' গ্রন্থের ১ম. খণ্ড ৩৯৭ পৃষ্ঠা থেকে অবিকল তুলে দিয়েছিলাম, সেই জন্ম কুণ্ডলীটির ভুল দর্শিয়ে আমার গ্রন্থের শ্রদ্ধেয় পাঠক হরিহর মজুমদার মহাশয় ২০, ডঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট থেকে পত্র দিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন—'আপনি খুব কষ্ট করিয়া বহু তথ্য গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন কিন্তু অনবধানতাবশত শ্রীচৈতন্যের জন্ম রাশিচক্রের ছকটায় একটু ভুল থাকিয়া গিয়াছে। নূতন সংস্করণে ঐ ভুলটা সংশোধন করিয়া দিবেন। ভুলটি কি তাহা লিখিতেছি। রাশিচক্রে ধনুরাশিতে মঙ্গল স্থাপন করিয়া ঐ মঙ্গলের (ম) সঙ্গে ১৮ নক্ষত্র যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধনুরাশিতে ১৮ নক্ষত্র হয় না। ১৮ নক্ষত্র বৃশ্চিক রাশিতে শেষ। 'ম'-এর সঙ্গে ১৯ যুক্ত হবে।' (এই সংস্করণে তা করা হয়েছে)

শ্রদ্ধেয় হরিহর বাবু এর পর তাঁর কাছে রক্ষিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্ম-পত্রিকার ছকটি অবিকল তুলে পাঠিয়েছেন। তিনি কিন্তু এই ছকটি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন, তা পত্রে উল্লেখ করেন নি।

এই পত্র পাওয়ার পরই আমার পরম আত্মীয় ডাঃ এস· আর জানা, ডাঃ সুখেন্দু-সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিত ও বাণী' নামক পুস্তকটি সংগ্রহ করে আমায় দেন এবং ঐ পুস্তকে ডঃ· গঙ্গোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম কুণ্ডলীটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তখনি আমার মনে সন্দেহ জাগে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকোষ্ঠী নিয়ে নিশ্চয়ই কোথাও গণ্ডগোল আছে। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাই তিনি কোথায় এই জন্মকুণ্ডলীটি পেলেন তাই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে পেলাম, তিনি বিনোদকিশোর গোস্বামীর কাছ থেকে তাঁর পিতৃদেব প্রাণকিশোর গোস্বামীর কৃত মহাপ্রভুর জন্মকুণ্ডলীটি সংগ্রহ করেছেন।

বিষম ধাঁধায় পড়লাম আমি। আমার বা হরিহর বাবুর কোষ্ঠীর ছকের সঙ্গে মিলছে 'না কোন মতেই। তখন দেখলাম ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছকের নীচে লিখেছেন—"শক নরপতেরতীতাব্দা ১৪০৭ ফাল্গুনস্য ত্রয়োবিংশতি বাসরে সিংহলগ্নে রাহুগ্রস্ত নিশাকরে উত্তর ফাল্গুন্যাং সিংহরাশৌ চন্দ্রে শ্রীমদ্বৃন্দাবনপুরন্দরঃপুরন্দর—শচীমন্দিরমাবীরাসীৎ ইতি।"

অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ২৩ তারিখে সিংহলগ্নে, উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে, সিংহ রাশিতে, শ্রীবৃন্দাবন পুরন্দর (কৃষ্ণ) পুরন্দর মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহে প্রকাশ পেয়েছেন।

এখন কথা হচ্ছে শচীনন্দনই যে বৃন্দাবন পুরন্দর কৃষ্ণ একথা কি নীলাম্বর চক্রবর্তী তাঁর দৌহিত্রের জন্মক্ষণেই জানতে পেরেছিলেন? না, তিনি ঐভাবে লিখে গিয়েছিলেন? যদি লিখে গিয়ে থাকেন, তাহলে সেই লেখা আজ পাঁচশত বছর কোথায় কি ভাবে রক্ষিত ছিল তার ইতিহাসও জানা দরকার। তা'জানতে গিয়ে হতাশ হলাম। খুঁটিয়ে দেখলাম জন্ম কুণ্ডলীটি কেমন সন্দেহজনক বলে মনে হলো। বোধ হয়, জন্মকুণ্ডলীটি সম্পূর্ণ জাল।

ছুটে গেলাম বন্ধুবর দৈবদর্শী শুকদেব জ্যোতিঃ সামুদ্রিকশাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে। তিনি দু'টি ছকই মিলিয়ে দেখে বললেন, শ্রদ্ধেয় হরিহর মজুমদার মহাশয় যে ছকটি পাঠিয়েছেন, সেটিই ঠিক। আমি প্রথম সংস্করণে যে ছকটি ছেপেছিলাম 'জ্যোতিষ-রত্নাকরে' অবিকল তাই আছে বটে কিন্তু মঙ্গলের স্থানে (ম) ১৯ নক্ষত্র হওয়াই গ্রহণীয়।

কিন্তু ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত জন্মকুণ্ডলীটি জ্যোতিষশাস্ত্র সম্মত ভাবে প্রস্তুত নয়। ওতে অনেক গণ্ডগোল আছে। আচার্য শিরোমণি নীলাম্বর চক্রবর্তী কখনো ঐ ভাবে মহাপ্রভুর জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করতে পারেন না।

দেখলাম শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন—'অষ্টাবিংশতি বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে ১৪০৭ অব্দে ফাল্গুন মাসে ২৩ তারিখে ২৮ দণ্ড ৫৫ পল গত হয়ে ৫ পল মাত্র সন্ধ্যার অবশেষ থাকা কালে সিংহলগ্নে, পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সিংহরাশিতে সর্বসুলক্ষণযুক্ত পূর্ণ সপ্তম বাসরে মিশ্র পত্নী শচীদেবীর গর্ভ হতে ভগবান হরি উদ্ভূত হন।'

যিনি চন্দ্রশেখরকে আবিষ্কার করেছিলেন—সেই একালের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন—"শ্রীশচীনন্দন যে দিন জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন নবদ্বীপে পূর্ণিমা ছিল প্রায় ৪০ দণ্ড, দিবানান ছিল ২৯ দণ্ড, রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল এবং গ্রাস প্রায় ১১ অঙ্গুলি হইয়াছিল।"

দেখছি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হয়েছিল শচী নন্দনের, আবার নীলাম্বর চক্রবর্তী বলছেন উত্তর ফাল্গুনীর কথা। তাহলে চন্দ্রগ্রহণের সময়ই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব এই সিদ্ধান্ত করতে হয়। মুরারি গুপ্ত সমর্থন করেছেন নীলাম্বর চক্রবর্তীকে। কবি বৃন্দাবন দাস অনুসরণ করেছেন মুরারিকে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন—

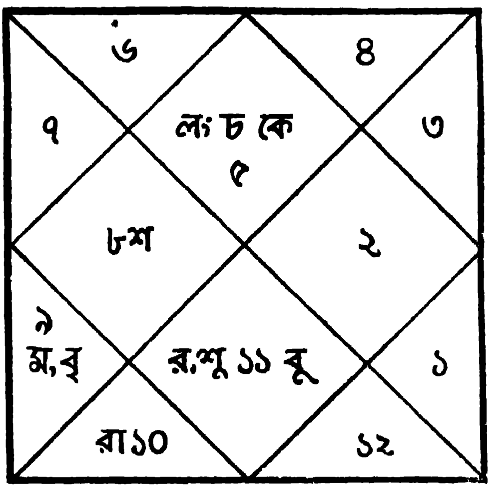
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড় বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ॥ চৈ. চ

অর্থাৎ প্রভুর আবির্ভাব কালে সিংহ লগ্ন ও সিংহ রাশি। রবি, বুধ ও রাহু (মূল ত্রিকোণে) কুম্ভস্থ; বৃহস্পতি স্বগৃহে উচ্চ প্রায় মঙ্গল সহ ধনুতে; শনি উচ্চ প্রায় বৃশ্চিকস্থ; শুক্র উচ্চ প্রায় মেষস্থ; চন্দ্র ও কেতু মূল ত্রিকোণে সিংহ লগ্নস্থ ছিল। ঐ লগ্ন রবির ক্ষেত্র, চন্দ্রের হোরা, মঙ্গলের দ্রেক্কাণ; শুক্রের নবাংশ; শুক্রের দ্বাদশাংশ ও বুধের ত্রিংশাংশ—এইরূপ শুভ ষড়বর্গ যুক্ত। নবমপতি মঙ্গল, দশম পতি শুক্র ও সপ্তমপতি শনি উচ্চ প্রায়; বৃহস্পতি স্বস্থ হয়ে ধর্মস্থানগত শুক্রকে পূর্ণভাবে দৃষ্টি করছেন। মঙ্গল ও বৃহস্পতির পঞ্চমে শুভ যোগ, লগ্নে ছিল বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি।

এখন দেখতে পাচ্ছি দুদল জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে সময়মান নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব অতীত কাল থেকেই আছে। একদল বলছেন ঐ দিন পূর্ণিমা তিথির ৪০ দণ্ড ১৩ পল অবস্থিতি ছিল, মতান্তরে উহা প্রায় ৪২ দণ্ড। পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের মান ৫০ দণ্ড ৩৭ পল। তাহলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল সূর্যোদয় হতে ২৮ দণ্ড ৪৫ পল পরে। সেদিন দিবামান প্রায় ২৯ দণ্ড ছিল। সুতরাং সন্ধ্যার প্রাক্কালে ৫টা ৫২ মিনিটে (নবদ্বীপের সময়) শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব।

তাহলে ইংরেজী 'জ্বলিয়ান ক্যালেণ্ডার' মতে গণনায় ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং অধুনা প্রচলিত 'গ্রেগ্রিয়ান ক্যালেণ্ডার' অনুসারে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারীকে শ্রীমহাপ্রভুর' জন্মদিন হিসেবে ধরতে হয়। আর জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার মতে ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার হয়।

এই বাদানুবাদের মীমাংসা করা বড়ই কষ্টকর। তবুও আমার গবেষক জ্যোতিষ বন্ধুগণের গবেষণার জন্য ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত জন্মকুণ্ডলীটি এই পুস্তকে মুদ্রিত করছি। যদি কোন জ্যোতিষশাস্ত্রের গবেষক এইটির যথার্থ জ্যোতিষ বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা করে আমার ঠিকানায় পাঠান, তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

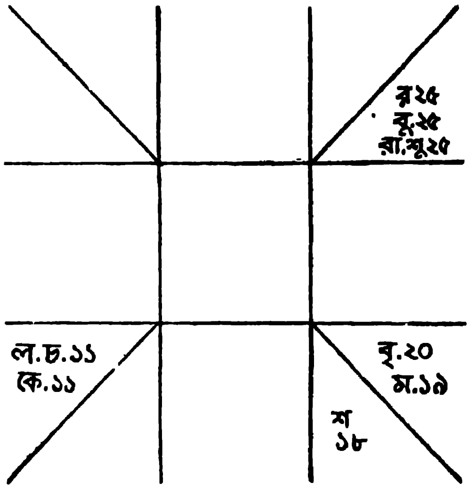


ডঃ গঙ্গোপাধ্যাযেব আবিষ্কৃত জন্মকুণ্ডলী

এখন আমরা সতীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জ্যোতিষরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লেখিত মহাপ্রভুর যে কোষ্ঠীর ছকটি আছে তাই নিয়ে আলোচনা করছি। কারণ এই ছকটি বিভিন্ন দিক থেকে অনেকখানি নির্ভরযোগ্য।

উক্ত রাশিচক্র অনুযায়ী, দৈবদর্শী শ্রীশুকদেব জ্যোতিঃ-সামুদ্রিকশাস্ত্রী বন্ধুবর নিম্নরূপ গণনা করে বলেছেন, জন্ম কুন্ডলীতে দেখা যাচ্ছে শনি তুলায়, মঙ্গল মকরে শুক্র মীনে ও বিশেষ বিশেষ শুভ গ্রহগণ পূর্ণ বলী হওয়ায় পান্ডিত্যের শীর্ষস্থানে আবির্ভূত হয়ে প্রেমাবতার রূপে পৃথিবীতে খ্যাতনামা হয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ অনুভূতির দ্বারা ইহা অনুধাবন করতে পারবেন সন্দেহ নাই।

সিংহ-লগ্ন জাতকের পাপগ্রহ বুধ এবং চন্দ্র। সিংহ রাশি পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রানুযায়ী জাতক সূর্যক্ষেত্রী, নরগণ, মানভ্রষ্ট ক্ষমতাশীল, ধৃতিমান ও কষ্ট সহিষ্ণু, ক্ষণ ক্রোধী, শঙ্কাযুক্ত, বৈরাগ্য বস্তু, দেবভক্ত, পিতৃ মাতৃ বিনয়ী, সুন্দর মুখমণ্ডল, কোমল কেশযুক্ত, স্বচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন, বহু কুটুম্বযুক্ত, দয়াশীল, ধনবন্ত বিপত্নীক, দ্বিপত্নীক অল্প শৃঙ্গার যুক্ত, নামামৃতাহারী হয়।



জাতকের বাল্য থেকে জীবনান্ত পর্যন্ত—বাল্যে ১ বছর ৩ মাস ৭দিন শুক্রারিষ্ট যুক্ত। ৪ বছর ৫ মাস ৫ দিন চন্দ্রারিষ্ট যুক্ত। ১৯ বছর ৯ মাস ১৫ দিন কটি দেশে রোগ। ৩০ বছর ৩ মাস ৩ দিন শরীরে কোন অস্ত্রাদির আঘাত। ৪৫ বছর ৩ মাস ১৩ দিন প্রবাস ও শারীরিক কষ্ট সূচিত হয়।

জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী ষড় দশা হয়ে জাতকের নির্দিষ্ট গ্রহারিষ্টানুযায়ী প্রকৃতির কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই মত জাতকের শুক্রের দশায় জন্ম, শুক্রের পর রবি, রবির পরে চন্দ্র, চন্দ্রের পরে মঙ্গল, মঙ্গলের পরে রাহু। এই রাহু লগ্নের সপ্তম পতি হয়ে স্ত্রীসুখ থেকে বঞ্চিত করেছে। লগ্নাধিপতি রবি সপ্তমে থেকে রাহুগ্রস্থ অবস্থায় বিশেষ গুরুজনদের সঙ্গে বৈরতা বা স্বেচ্ছাচারিতার কারক হয়েছে। এমতাবস্থায় শনি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বলবান হয়ে সাধকের ইচ্ছামৃত্যুর কারক দেখা যায়। তাই জাতকের রাশিচক্রে গ্রহ-সন্নিবেশ অনুযায়ী ইচ্ছামৃত্যুর হেতু দেখা যায়। তাই যথার্থ ভাবে পরমায়ু নির্ণয় করা সকল সময় জ্যোতিষীগণের পক্ষেও সম্ভব নয়।

বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েও জ্ঞান সমুদ্রের ধারে বসবাস করেও তার দূরত্ব নির্ণয় করা যেমন সম্ভব নয়, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণব্রহ্ম সমুদ্রবৎ বলে এঁর আয়ুষ্কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন পণ্ডিতের শাস্ত্র ব্যাখ্যানুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেবের কোনরূপ দেহকষ্ট নাও হতে পারে। পূর্ণব্রহ্ম হয়েও তিনি মানবরূপে কলিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্র-সম্মত ভাবে সত্য। যেরূপ আকাশে পূর্ণব্রহ্মরূপে সূর্যদেব সদা আলোক বিবিরণ করে সর্ব জীবকুলের কল্যাণ সাধন করছেন, তথাপি কালক্রমে অস্থায়ী মেঘ, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ যেমন তাঁর জ্যোতিঃপুঞ্জকেও গ্রাস করে পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছাদিত করে তদ্রূপ পূর্ণব্রহ্ম চৈতন্যদেবও দেহকষ্ট পেতে পারেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী অষ্টোত্তরী ১০৮ ও বিংশোত্তরী মতে ১২০ বছর জাতক বা জাতিকার পরমায়ু হতে পারে। ইহাই দীর্ঘায়ু সূচক। যাহা মধ্যমায়ু, তাহা ৬৫ থেকে ৭৫ বছর। স্বল্পায়ু বলা যায় যে জাতক ৪৫ বছর পর্যন্ত মাত্র বাঁচেন। সেই জন্য চৈতন্যদেবের স্বল্পায়ু নির্ধারণ রাশিচক্রের শুভাশুভ গ্রহ সন্নিবেশ উচ্চ বা ত্রিকোণ পতি ও অশুভ গ্রহের প্রভাবে স্বল্পায়ু বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

চতুর্বেদ অনুযায়ী জ্যোতিষ শাস্ত্র সামবেদের নির্মল চক্ষু স্বরূপ। গণিতজ্ঞ জ্যোতির্বিদগণ শাস্ত্র ও বিশেষ অনুভূতির দ্বারা যা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তা' সার্বিক ভাবে জনজীবনের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে বা হচ্ছে—এতে সন্দেহ নাই। আস্তিকতা, নাস্তিকতা ব্যক্তিগত জীবনে একটা নিজ অর্জিত জ্ঞানের সীমিত ধারণা মাত্র। তা ব্যক্তিগত চিন্তায় বা সমালোচনায় কখনো কলুষিত হয় না।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের অস্তিত্ব ত সূর্যেই। তাই জ্যোতিষের আড়ালে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল কখন স্থির, কখন অস্থির—ইহা ত সকলের বোধগোম্য। জ্যোতিষের অজ্ঞানতা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অস্তিত্ব নষ্ট করতে পারে কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষ শাস্ত্র, তাহা শাশ্বত চির সুন্দর এবং চির সত্য। অনুভূতিই জ্ঞানের উৎস, আর প্রকৃত জ্ঞানই হলো শক্তি। বিবেকবান উচ্চ গণিতজ্ঞ ব্যক্তিই জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রকৃত অধিকারী। তাঁরাই এর ধারক ও বাহক।

বন্ধুবর শুকদেব বাবুর এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোঝা যায়—শ্রীচৈতন্যদেবের অস্ত্রাঘাতে বা কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুও হতে পারে। সাধারণত দেখা যায় অধিকাংশ মহাপুরুষগণ দীর্ঘজীবি হন না।*

কোষ্ঠীফল ছেড়ে বারফলে কি বলে দেখি আসুন। শুক্র বা শনিবার তাঁর জন্ম হয়েছিল। শুক্রবারে যে জাতকের জন্ম হয় সে জাতকের আত্মনির্ভরতা কার্যকরী

* বরানগর পাটবাড়ী থেকে আবিষ্কৃত কোষ্ঠীর আলোচনা' ২য় সংস্করণ 'এখান থেকেই শুরু' এই অংশে আছে।

ক্ষমতা, বাস্তববুদ্ধি, প্রতিভা ও ব্যবসা-বুদ্ধি প্রখর হয়। সে প্রাচীন নীতিতে বেশী বিশ্বাসী, ধৈর্য ও স্থির বুদ্ধি অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান তার খুব বেশী হয়—তার ফলে তার সফলতা অনিবার্য।

জাতকের নানাধরণের কাজে যোগ্যতা থাকবে। বিজ্ঞান, কামশাস্ত্র, আইন, চিকিৎসা, সাহিত্য, অভিনয়, অধ্যাপনা, সঙ্গীত, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে তার যোগ্যতা থাকা স্বাভাবিক। জাতকের নিজস্ব প্রতিভা ও সৃজনী-শক্তি থাকবে—তার সঙ্গে থাকবে বাস্তববুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, ব্যবহারিক জ্ঞান ও বিচার শক্তি।

তাই যে-কোনও পথেই চলুক না কেন, জাতক সহজেই খ্যাতি ও কীর্তি অর্জন করে প্রতিষ্ঠা পেতে পারবে।

জাতকের আয়ু, কোন ফাঁড়া না থাকলে ৬৪ থেকে ৮৬ বৎসরের মধ্যে হবে।

শনিবারে জন্ম হলে যে সব কাজে তীক্ষ্ন বুদ্ধি গভীর চিন্তা ও প্রতিভা মানসিক শ্রম ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, তাতে জাতক সর্বদা সফল হবে। অভিনয়, চিকিৎসা, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, গ্রন্থরচনা, ইতিহাস, তথ্য-অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, দর্শন, মিল বা কোলিয়ারী চালানো বা অন্য কোনও পরিচালনকার্য প্রভৃতিতে জাতক দক্ষতা দেখাতে পারবে।

বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বা শত্রুর কৌশল জাল ছিন্ন করার অপূর্ব শক্তি থাকবে—যার ফলে সে সর্বদা জয়যুক্ত হবে। জাতকের বিবাহিত জীবন সুখের না হওয়াই সম্ভব। জাতকের তীক্ষ্ন বুদ্ধি থাকবে। তার কার্যকরী ক্ষমতা, ছল-চাতুরী ও কলাকৌশলের কাছে অন্যের কাজকর্ম ও কলাকৌশল হার মানবে।

যে সব কাজে পরিবর্তন বা অভিনবত্ব থাকবে, তাতে জাতক সফল হবে। তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও কর্ম করবার ক্ষমতা থাকবে অসাধারণ। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জাতকের মধ্যে দু'টো বিপরীতধর্মী গুণ থাকে ও বিশেষ ভাবে সে পরিশ্রমী ও বিলাসহীন জীবনযাপন করে।

জাতক স্বল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু-দুই-ই হতে পারে। স্বল্পায়ু হলে ৩৫—৪০ বছর ও দীর্ঘায়ু হলে ৬৫—৭০ বছর কাল পর্যন্ত জীবিত থাকবে।

এই বার ফল দেখে বুঝা যাচেছ, খুব সম্ভবত শ্রীচৈতন্যদেব (জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার মতে) শনিবারই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শনিবারের ফলের সঙ্গে চৈতন্য-চরিত্রের অনেকগুণই মেলে। কিন্তু জ্যোতিষ মতে এখানেও পাচ্ছি না তিনি দীর্ঘায়ু হবেন কিনা। জ্যোতিষ বলছে—তিনি দীর্ঘায়ু হতেও পারেন আবার অল্পায়ু হওয়াও বিচিত্র নয়। অতএব আমরা এক্ষেত্রেও বুঝতে পারছি না, তিনি দীর্ঘায়ু হবেন কিনা। অর্থাৎ তাঁর অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়াও সম্ভব।

শ্রীচৈতন্যের দেহ-লক্ষণ সামুদ্রিক গ্রন্থ মতে সবই মহাপুরুষোচিত। অর্থাৎ ঃ

পঞ্চ দীর্ঘঃ পঞ্চ সূক্ষ্মঃ সপ্ত রক্ত ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বঃ পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥

এই শ্লোক অনুসারে তাঁর শ্রীঅঙ্গে ৩২টি সুলক্ষণ ছিল—যার দ্বারায় প্রমাণিত হয় এরূপ শিশু ভবিষ্যতে মহাপুরুষরূপে পূজিত হবেন। এই ৩২ টি লক্ষণ হলো ঃ—

পঞ্চদীর্ঘ—নাসিকা, ভুজ, হনু (চোয়াল), নেত্র এবং জানু

পঞ্চ সূক্ষ্ম—ত্বক, কেশ, অঙ্গুলি পর্ব, দন্ত এবং রোম।

সপ্ত রক্তবর্ণ—নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ।

ছ'টি অঙ্গ উন্নত—বক্ষস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ ও মুখ।

তিনটি অঙ্গ হ্রস্ব অর্থাৎ ছোট—গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন।

তিনটি অঙ্গ বিস্তীর্ণ—কটি দেশ, ললাট ও বক্ষস্থল।

তিনটি গম্ভীর—নাভি, স্বর ও বুদ্ধি।

শ্রীচৈতন্যের দেহে এই ৩২টি লক্ষণই বিদ্যমান ছিল। শুধু জ্যোতিষ নীলাম্বর চক্রবর্তী নয় নীলাচলের পণ্ডিতগণও বার বার পরীক্ষা করে দেখেছেন গৌর দেহে এই সব সুলক্ষণ।

নীলাম্বর চক্রবর্তী শ্রীগৌরাঙ্গের মামাদাদু অর্থাৎ মাতামহ। তিনি তৎকালে বাংলাদেশে নামকরা জ্যোতিষী ছিলেন। এগার মাস গর্ভবাসের পরও যখন শচীদেবীর ছেলে হলো না, তখন জগন্নাথ মিশ্র শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তীকে ডেকে গণনা করতে বললেন। গণনা করে তিনি বলেছিলেন, চিন্তার কোন কারণ নাই। শচীদেবীর গর্ভে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন এবং ত্রয়োদশ মাসের প্রথমেই সন্তান ভুমিষ্ঠ হবে। সেদিন তাঁর কথা সত্যি হয়েছিল। এবং জন্ম সময়েব গ্রহ-সন্নিবেশ দেখে আর শরীরের সুলক্ষণ দেখে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন এই জাতক সত্যই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। কোষ্ঠীর ফলাফল দেখে জাতকের কত বছর পরমায়ু হবে তা তিনি বলেছিলেন কিনা এমন কোন সন্ধান কোন পুঁথি-পত্রে আজো অনুসন্ধান করে পাইনি। তাই জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাচ্ছি না, যার দ্বারা জোর করে বলতে পারি—তিনি দীর্ঘায়ু হবেনই।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে বৈষ্ণব গোস্বামীগণ খারিজ করেছেন। তাদের মতে জয়ানন্দ যা লিখেছেন, তা' তাঁর নিজের 'কল্পনাপ্রসূত'। বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ বলেন মহাপ্রভু শ্রুতিকথিত 'বিমুক্তত্ব' বরণ করেছিলেন। জয়ানন্দের কথিত—'মায়া শরীর হেথা রহিল যে পড়ি।' এই মায়া শরীর নাকি পঞ্চভুতাত্মক দেহ নয়, শরীরের

অনুরূপ 'মায়াশরীর'। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ নাকি অনুরূপ 'মায়াশরীর' রেখে দেহত্যাগ করেছিলেন। অর্জুন সেই মায়া শরীরের সৎকার করেছিলেন।

তাই যদি হয়, অর্থাৎ মায়া শরীর বলতে শরীরের অনুরূপ দেহ। তাহলে সেই মায়া শরীরকে কোথায় সমাধিস্থ করা হলো? যখন হরিদাসের সমাধি আজো যদি থাকে, তাহলে শ্রীচৈতন্যের সমাধি থাকবে না কেন? স্বভাবতই এ প্রশ্ন মনে জাগে। অধ্যাপক প্রভুজী বলেন মহাপ্রভুকে খুন করার পর তাঁর শব দেহকে সমাহিত করা হয়েছিল। প্রভুজী দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করে মহাপ্রভুর সমাধি নাকি আবিষ্কার করেছেন এবং সে সমাধি পুরীতে এখনো বিদ্যমান।

এই সমাধি স্থানটি কোথায়?

প্রভুজী কথিত এই স্থানটি কোথায় তা অনুসন্ধান করার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। নির্ভর যোগ্য সেই স্থানটি কোথাও খুঁজে পাই নি। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন স্থান নির্দেশ করেন। কেউ বলেন তোটা গ্রামে গোপীনাথ মন্দির চত্বরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে ঘনশ্যামদাস বলেছেন, শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করার জন্য আচার্য নরোত্তম ঠাকুর পুরী যাত্রা করেছিলেন। যখন তিনি নীলাচলে এলেন, শুনলেন তাঁর আসার পূর্বেই মহাপ্রভু তিরোধান করেছেন। নরোত্তম এই নিদারুণ হৃদয়-বিদারক কাহিনী শুনে শোকার্ত হৃদয়ে হাজির হলেন গদাধরের কুটীরে। গদাধর পণ্ডিত ও তখন নাই। তিনিও অন্তর্ধান করেছেন। তখন তাঁর সেবক কাঁদতে কাঁদতে নরোত্তমকে চৈতন্য সমাধি দেখিয়ে বললেন—

ওহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি।
না জানি কি পণ্ডিতে কহিলা ধীরি ধীরি॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিনে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥ —ভক্তিরত্নাকর।

গদাধর পণ্ডিতের সেবক 'এইখানে' অর্থে যে স্থানটি নির্দেশ করেছেন, তাহলো ঐ তোটা গোপীনাথের মন্দির-চত্বর। কিন্তু উক্ত দু' পংক্তির সরল বাংলা হলো—'ওহে আচার্য নরোত্তম, এইখানে (দাঁড়িয়ে) গদাধর পণ্ডিতকে গৌরহরি ধীরে ধীরে কি যেন বলছিলেন।'

কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের সেবক কি করে বুঝলেন, এইখানেই যে গৌরহরিকে সমাধিস্থ করা হয়েছে? তারপর, গদাধর পণ্ডিত আর গৌরহরি গেলেন কোথায় সে কথা তিনি বলেন নি। অথচ দু'টি কথার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সেই সময়

উৎকলে চৈতন্য-জীবনের উপর দিয়ে একটা দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে। বিপর্যয়টি যেমন শোকাবহ, তেমনি হৃদয় বিদারক। (এই সংস্করণের শেষাংশ দেখুন)

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কিন্তু মনে করেন চৈতন্যদেবের সমাধি আছে গুণ্ডিচা বাটীতে। 'বৃহৎ বঙ্গ' থেকে তাঁর অভিমতটি উদ্ধৃত করছি ঃ

"তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, একথা চৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ আছে, এই সূত্রে সমুদ্রের জলে তাঁহার তিরোধান হয়—এই সংস্কার কয়েকজন শিক্ষিত লেখক সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে কোন আস্থা দেওয়া যায় না। প্রাচীন সাহিত্যের কোথায়ও ইহার প্রমাণ নাই। স্থানীয় প্রবাদ, তিনি জগন্নাথের সঙ্গে অথবা গোপীনাথের সঙ্গে মিশিয়া গিয়েছিলেন—তাঁহার দেহ ছিল চিন্ময়, সুতরাং রক্তমাংসের দেহের ধ্বংসের মত তাঁহার বিলয় হইতে পারে না, এই সংস্কারবশতঃ প্রবাদটির সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন একটি প্রাচীন পদে 'মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।' এই ছত্রটি আছে। ইহা গোপীনাথের সঙ্গে তাঁহার মিশিয়া যাইবার ইঙ্গিত-বাণী কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোধানের যে কাহিনী দিয়েছেন, তাহাই এতৎ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও যুক্তিসঙ্গত কথা। রথযাত্রার সময়ে কীর্তনানন্দে চৈতন্য উছ্‌ট্ খাইয়া পড়িয়া যান এবং তাহাতে পায়ে ভয়ানক চোট লাগে। অনতিকাল পরে গুণ্ডিচা গৃহে তাঁহাকে আনা হয়, এবং তথায় তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। জয়ানন্দ বলেন, আষাঢ় মাসের রবিবার সপ্তমী তিথিতে (১৫৩৩ খৃঃ) বেলা তিনটার সময়ে তিনি স্বর্গধামে গমন করেন, কিন্তু লোচনদাস বলেন রাত্রি আটটায় তাঁহার বিয়োগ হয়। সেদিন অপরাপর দিনের ন্যায় বেলা তিনটার পর গুণ্ডিচা বাটীর দরজা খোলা হয় নাই। চৈতন্যের পার্শ্বচরগণ মন্দিরের দ্বারে ভিড় করিয়াছিলেন। কিন্তু আটটা রাত্রিতে দরজা খুলিয়া পাণ্ডারা বলেন—মহাপ্রভু স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন চিহ্ন নাই। বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সেই গৃহে পাণ্ডারা খিল লাগাইয়া কি করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত দুই পুস্তকের কথা এবং ঈশান বাগরের অদ্বৈত-প্রকাশের কয়েকটি ছত্র হইতে আমাদের অনুমান হয়, বেলা ৩টার সময়ে তাঁহার দেহত্যাগ হইলে মন্দিরের মধ্যেই দেববিগ্রহের প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন বৃহৎ মণ্ডপের এক কোণে তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। প্রতাপরুদ্রের অনুমতি লইয়াই সম্ভবতঃ ঐরূপ করা হইয়াছিল, যেহেতু উক্ত পুস্তকের একখানিতে লিখিত হইয়াছে, বহু পুষ্পমাল্য সেই মন্দিরের গুপ্তদ্বার দিয়া তখন লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সমাধি কার্যে ব্যয়িত হয়, তৎপরে সেই মণ্ডপের পাথরগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সমাধির চিহ্ন বিলুপ্ত

করা হইয়াছিল। যাঁহারা সঠিক অবস্থা জানিয়াছিলেন—তাঁহারা তিরোধান বেলা ৩টায় হইয়াছিলেন এরূপ লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু আটটা রাত্রে সংবাদ রাষ্ট্র হয় যে, তিনি আর ইহলোকে নাই। সেই মণ্ডপের দেবপ্রকোষ্ঠের একটি নিকটস্থ কোণে প্রস্তরনির্মিত গৌরাঙ্গের পদচিহ্ন আছে। ঐ মন্দিরে চৈতন্যর সেই পদচিহ্ন থাকার কোন কারণ নাই। জগন্নাথ মন্দির ও গোপীনাথ মন্দির এই দুইটি চৈতন্যের প্রধান লীলাস্থল। গুণ্ডিচা মন্দিরের সেই পদচিহ্ন কি লুক্কায়িত সমাধির নিদর্শন? যাহা হউক এ বিষয়ে আমি আর বেশী কথা লিখিব না। আমি আমার অনুমান মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। যাঁহারা বিগ্রহে তাঁহার চিন্ময়দেহ মিশিয়া যাইবার কথা বিশ্বাস করেন তাঁহাদের বিশ্বাসে আমি 'ঘা' দিতে ইচ্ছা করি না। পুরীর পাণ্ডাদের মধ্যে আর একটা ভীষণ প্রবাদ প্রচলিত আছে—তাহা আমি তথায় শুনিয়াছি। জগন্নাথ বিগ্রহ হইতেও চৈতন্যের প্রতিপত্তি বেশী হওয়াতে পাণ্ডারা নাকি গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল।'—বৃহৎবঙ্গ, পৃঃ ৭৩৯ ৭৪০।

দীর্ঘকাল পূর্বের ডঃ সেনের এই অভিমতের পক্ষে-বিপক্ষে আজকের অনুসন্ধানে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। নবাবিষ্কৃত চৈতন্যচকড়া'র কবি-বৈষ্ণবদাস বলেছেন—চৈতন্যদেবের মৃতদেহ রাত্রি ১০ দণ্ডের সময় গরুড় স্তম্ভের পিছনে পড়েছিল দেখেছেন। তারপর সেই মৃতদেহকে তোটা গোপীনাথের মন্দিরে কানাই খুঁটিয়া ও ও শিখি মাহান্তি এনেছিলেন। (দেখুন এই সংস্করণের শেষ অধ্যায়গুলি)

এই তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় ডঃ সেনের অনুমান ঠিক নয়। বিকেল ৩টা থেকে রাত্রি ৮টা নয়, রাত্রি ১০ দণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১১টা পর্যন্ত বন্ধ ছিল গুণ্ডিচা বাটীর দরজা। কিন্তু চন্দন বিজয়ের পর তাহলে কেমন করে দেখা গেল চৈতন্য-মৃতদেহ? কেমন যেন উলটা-পালটা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে না? অথচ যেন সমাধান হয়েও হচ্ছে না, ধরি ধরি করেও ধরা যাচ্ছে না।

অধ্যাপক প্রভুজী বলছেন, তিনি বিশ্বাসযোগ্য চৈতন্য-সমাধি আবিষ্কার করেছেন। হয়ত ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু ডঃ মুখোপাধ্যায় কোথায় সে সমাধি-ক্ষেত্রটি, তাঁর পুস্তকের প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন নি। না করুন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। (এই সংস্করণে সমাধির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।)

ধরলাম সমাধি-ক্ষেত্রটি সত্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সেই সমাধি-ক্ষেত্রটি যে একান্ত বিশ্বাসযোগ্য তাই বা স্বীকার করি কেমন করে? সমাধিক্ষেত্রটি কি কোন মন্দিরের মধ্যে, না অন্য কোথাও? (মন্দির চত্বার। পড়ুন শেষাংশ)

যেখানেই হোক, সমাধিক্ষেত্রটি সতর্ক হয়ে যথেষ্ট সাবধান সহকারে খনন করে

দেখা দরকার। সমাধির মধ্যে যে কঙ্কাল আছে সেই কঙ্কালটির দৈর্ঘ্য কত? শ্রীচৈতন্য ছিলেন দীর্ঘদেহী মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন তাঁর নিজের হাতে চার হাত লম্বা। এতাদৃশ সুদীর্ঘ যাঁর তনু, তাঁকে বলা হয়—ন্যাগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন:

দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য-গুণধাম॥

চৈ. চ. ১৷৩৷৩৩-৪

এই কথার সত্যাসত্য নির্ণয় করার জন্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন—"পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের যে পদচিহ্ন বিদ্যমান, তাহার দৈর্ঘ্য হইতেই তাহার দেহের অসাধারণ দৈর্ঘ্য অনুমিত হইতে পারে। চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি নীলাচলে (পুরীতে) গমন করেন, সন্ন্যাসের পরে তিনি চব্বিশ বছর প্রকট ছিলেন। দক্ষিণ ভারত, বাংলাদেশ এবং বৃন্দাবনাদি স্থানে গমনাগমন উপলক্ষে তিনি প্রায় তিন বৎসর নীলাচলে ছিলেন না;[1] অবশিষ্ট ২১ বৎসরের প্রতিদিনই তিনি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের জগমোহনে গরুড়স্তম্ভের উপরে বাম হাত রাখিয়া একই স্থানে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেন। দীর্ঘকাল যাবৎ এইভাবে প্রতিদিন একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকার ফলে গরুড় স্তম্ভের নিম্নস্থ ভিত্তিপ্রস্তরে তাঁহার পদদ্বয়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করেন, পাদুকাতে যেমন তাহাদের পায়ের দাগ পড়ে, তদ্রূপ। মহাপ্রভুর পদদ্বয়ের চিহ্নযুক্ত প্রস্তরখণ্ড মন্দিরপ্রাঙ্গণ মধ্যেই একস্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। সেই পদচিহ্ন প্রায় ষোল ইঞ্চি লম্বা। ফুটের মাপে লোক সাড়ে তিন হাত বা ৬৩ ইঞ্চি হয়, তাহার পদতল হয়—এক ফুট বা ১২ ইঞ্চি। পদতলের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে দেহের দীর্ঘতা ধরিলে পদচিহ্নের দৈর্ঘের অনুপাতে শ্রীমহাপ্রভুর দেহের দৈর্ঘ্য হইবে সাড়ে তিন হাত মানুষের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রায় ২১ ইঞ্চি অধিক। ইহাতে মনে হয়, বহু লোকের মধ্যে তিনি দণ্ডায়মান থাকিলে সকলের মাথার উপরেও মহাপ্রভুর দেহের ঊর্ধ্বভাগ কিঞ্চিদধিক এক হাত দৃষ্ট হইত। শ্রীল-বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর

১. ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যন্নগময়ত্তথা দৃষ্ট্বা যাত্রা ব্যনয়দখিলা বিংশতিসমাঃ॥ —মহাকাব্য॥ ২০।৪০॥

নগর-সংকীর্তন-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—অসংখ্য লোক সংকীর্তনে যোগদান করিয়াছেন; প্রভুর কলেবর তাঁহাদের 'সবা হইতে সুদীর্ঘ'।' আর, লোকসকল এত ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া অবস্থান করিতেছেন যে, তাহাদের উপরে সরিষা ফেলিয়া দিলেও সরিষা মাটিতে পড়িবে না, তথাপি সকলেই প্রভুর বদন দেখিতে পাইয়াছিলেন।

চতুর্দিকে আপন-বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
·· উন্নত নাসিকা, সিংহগ্রীব মনোহর।
সভা হইতে সুপীন সুদীর্ঘ কলেবর ॥
···এতেক লোকের যে হইল সমুচ্চয়।
সরিষা পাড়িলেও তল নাহি হয় ॥
তথাপিও হেন কৃপা হইল তখন।
সভেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন ॥—মধ্য, ২৩ অধ্যায়

এইজন্যেই বোধ হয় বলা হইয়াছে 'প্রকাণ্ড শরীর'। 'তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর'। চৈ· চ· ১।৩।৩২ ॥ গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ যখন সর্বপ্রথম প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিয়াছিলেন,—'সুবলিত প্রকাণ্ড-দেহ-কমল-লোচন। দেখিয়া তাহার মনে হইল চমৎকার। আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার। চৈ· চ· ২।৮।১৬—৭।' নানা গ্রন্থে বহুস্থলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাণ্ড শরীরের উল্লেখ পাওয়া যায়।"—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, পৃষ্ঠা, ২২২—২২৩।

এই বিষয়টিও পর্যালোচনা করা দরকার। ডঃ নাথের বক্তব্য অনুযায়ী মহাপ্রভু ছিলেন ৮৪ ইঞ্চি লম্বা। এই ৮৪ ইঞ্চি লম্বা শরীরের পা হলো ১৬ ইঞ্চি। অর্থাৎ ২ ইঞ্চি কম একহাত। ভেবে দেখুন, মহাপ্রভুর দৈহিক দৈর্ঘ্য অত বড় সম্ভব হলেও ১৬ ইঞ্চি পা বাস্তবে সম্ভব কি না!

জগন্নাথ মন্দিরে সংরক্ষিত মহাপ্রভুর এই যে পদচিহ্নের কথা উল্লিখিত হয়েছে, এখনো যে কেউ গিয়ে পয়সা দিয়ে দেখতে চাইলে দেখতে পাবেন। আমার বক্তব্য সেখানে নয়। আমি বলতে চাইছি ১৬ ইঞ্চি পায়ের দৈর্ঘ্য সম্ভব কিনা, তাই যুক্তি সহ বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বিচার করে দেখা দরকার।

আজকের দিনে ১২ ইঞ্চি পা-ওয়ালা লোক চোখেই পড়ে না। সাধারণ মানুষের পায়ের মাপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হলেন তাঁরা, যাঁরা জুতো তৈরি করেন, কারণ এর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সংখ্যক জুতো বিভিন্ন মাপে তৈরি করেন। বারো ইঞ্চি বা এক ফুট মাপে কোনো চর্মকার যদি জুতো তৈরী করেন, সে জুতো বিক্রি করতে তাঁকে

সারা জীবন অপেক্ষা করতে হবে। জুতো ব্যবসায়ের সংগে দীর্ঘকাল জড়িত থেকে বাটা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মাপের জুতো তৈরি করে থাকেন। ৫ থেকে ১৬ নম্বরের বাঁধা মাপে এই জুতোগুলো তৈরী। পরপর দুটি নম্বরের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ⅓ ইঞ্চি। ৫ নম্বর জুতোর পায়ের দৈর্ঘ্য ৯.২৫ ইঞ্চি। শতকরা বিক্রীর হার ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নম্বরের যথাক্রমে ৫, ২০, ৪০, ২০, ১০ ও ২ ভাগ। ১১, ১২ ও ১৩ নম্বর মিলিয়ে বিক্রী হয় মোট বিক্রির শতকরা ৩ ভাগ মাত্র। তাও আবার সবচেয়ে বড় ১৩ নম্বর জুতোর দৈর্ঘ্য হল ১১.৯১ ইঞ্চি—১ ফুটের একটু কম। সাধারণ মানুষের পায়ের গড় দৈর্ঘ্য এই হিসেব অনুযায়ী আরও অনেক কম—মাত্র ১০.০২ ইঞ্চি। এটি অবশ্য ভারতীয় হিসেব। তাহলেও দেখা যাচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত ফুটকাঠির সঙ্গে মানুষের পায়ের মাপের তেমন সম্পর্ক নেই।" মাপজোকের ইতিহাস—শৈলেশ দাশগুপ্ত। দেশ। ৪ঠা মে, ১৯৯৩।

শৈলেশ দাশগুপ্তের এই বিবরণ অনুযায়ী হিসেব করে দেখলে শ্রীচৈতন্যদেবের ১৬ ইঞ্চি পা হওয়া একান্ত অসম্ভব। একবার অবশ্য খড়্গপুর থেকে একজন দীর্ঘদেহী মানুষের কথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। বাটা কোম্পানী তার পায়ের মাপের জুতো দিতে পারেনি। শেষে রাতারাতি অর্ডার নিয়ে স্পেশাল ভাবে তৈরি করে দিয়েছিল। সেক্ষেত্রেও সাড়ে এগার ইঞ্চির বেশি ঐ দীর্ঘদেহী ভদ্রলোকের পা ছিল না।

১৬ ইঞ্চি পা বিষ্ণুরও ছিল কিনা সন্দেহ। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।১১-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হয়েছে, ভগবানের বিগ্রহ নিজের হাতে সাড়ে চারি হাত। কোন স্থানে চার হাতের কথাও লেখা আছে। তাহলে ভগবানের পদও কি ১৬ ইঞ্চি ছিল? গয়াতে বিষ্ণুপদ চিহ্ন অনেকেই দেখেছেন। তার দৈর্ঘ্যও ১৬ ইঞ্চি নয়। যদিও গয়াধামের বিষ্ণুপদ চিহ্ন বুদ্ধদেবের। আদিতে তাই ছিল। গয়াধামে পিণ্ডদানের পূর্বে বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করার রীতি বা বিধি এখনও প্রচলিত আছে। শ্রীবিষ্ণু ও বৌদ্ধ দেবায়তনের অন্যতম বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরকে পদ্মপাণি বিষ্ণুর সংগে তুলনা করা যায়।

যাই হোক বুদ্ধ এবং বিষ্ণু যেমনভাবেই এক হোন না কেন, আমাদের কথা হচ্ছিল ১৬ ইঞ্চি চৈতন্য-পদ-চিহ্ন নিয়ে। আমার কথা হচ্ছে জগন্নাথ মন্দিরে রক্ষিত যে প্রস্তর খণ্ডের উপর চৈতন্যের পায়ের ছাপ পড়েছে বলে দেখিয়ে পাণ্ডারা পয়সা রোজগার করেন, ঐটি সত্য সত্যই চৈতন্য-পদ-লাঞ্ছিত নয়। পরবর্তীকালে পাণ্ডারা সম্ভবত পয়সা রোজগারের জন্য খোদাই করে ঐ পদচিহ্ন অঙ্কিত করেছেন।[১]

১. দ্রষ্টব্য এই পুস্তকের 'অনুসন্ধান: মন্দিরে মন্দিরে'।

একই স্থানে একই ভাবে ১৮ বছর কেন সারা জীবন পাথরের উপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেও পাথর ক্ষয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। খড়মে চিহ্ন পড়ে অনবরত কাঠে এবং পায়ের ঘর্ষণের ফলে। যদি ঐ চিহ্নকে সত্য বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে বুঝতে হবে শ্রীচৈতন্যদেব ঐ প্রস্তরের উপরে ১৮ বছর অনবরত নৃত্য করেছেন। তাই তাঁর পদাঘাতে প্রস্তর ক্ষয়ে পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু তিনি ত দাঁড়িয়ে থাকতেন ঠায়। একেবারে স্থির ধ্যানমগ্ন সমাধিস্থের মত।

মহাপুরুষ ও দেবতাদের পায়ের মাপ একক হিসাবে প্রাচীন সভ্যতায় প্রচলিত ছিল এবং অতিরঞ্জন ও স্থানকাল ভেদে এর প্রচুর হেরফের ঘটত। মোটের উপর প্রাচীনকালে একটা রীতিই ছিল, যাঁরা মহাপুরুষ হবেন, তাদের পদযুগল বড় করে অঙ্কিত করতে হবে। চীন বা জাপানে এই প্রথা ছিল উল্টো। কারণ, সেখানে ছোট পা ছিল সম্ভ্রান্ততা ও সৌন্দর্যের লক্ষণ।

শ্রীচৈতন্যদেবের আসল পা কতখানি দীর্ঘ ছিল, তার বিশ্বাসযোগ্য মাপ অনেকটা পাওয়া যেতে পারে পুরীর কাশী মিশ্রের বাড়িতে। এই কাশী মিশ্রের বাড়ীর গম্ভীরাতে তিনি শেষ জীবনে অবস্থায় করেছিলেন। সেই গম্ভীরায় বিষ্ণুপ্রিয়া প্রদত্ত মহাপ্রভুর খড়ম এখনো সুরক্ষিত আছে।[1] বর্তমান নাম রাধাকান্ত মঠ। আর একটি চৈতন্য-পদ চিহ্নের সন্ধান মিলেছে কানাই-এর নাটশালায়। স্থানীয় লোকের নিকট স্থানটি 'কানাইয়ার স্থান' নামে পরিচিত। কলিকাতা-হাওড়া-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বারওহাওরা লাইনে 'তালঝরি' স্টেশনে নেমে মাঠের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে পূর্বোত্তর দিকে দু' মাইল অথবা পাকা রাস্তায় স্টেশনের পূর্বদিকে মঙ্গলহাট গ্রাম হতে প্রায় দু'মাইল উত্তরে 'কানাইয়ের নাটশালা' অবস্থিত।

এই স্থানটির চতুর্দিকেই বন জঙ্গল। একটি ছোট পাহাড়ের উপর একটি বড় মন্দিরের ভিতর শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীকানাইয়ালালজি এবং বহু শালগ্রাম শিলা প্রাচীনকাল থেকে পূজিত হচ্ছে। তার পাশেই আর একটি প্রস্তর মঞ্চের উপর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত দুই জোড়া শ্রীচরণ-চিহ্ন বহুকাল থেকে স্থাপিত আছে বলে প্রবাদ। কোন বিরক্ত পূজারী তাহা অর্চন করেন। উভয়ে মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে ৪৪৩ গৌরাব্দে একটি গৌরপাদপীঠ মন্দির নির্মিত হয়েছে। এক মাইল পূর্বদিকে গঙ্গা।"—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী সংস্করণ। পৃষ্ঠা—৪৭১।

দেখে এসেছি বরানগর পাঠবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যদেবের একজোড়া পাদুকা সংরক্ষিত আছে। এই পাদুকাটি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

---

১. এ পুস্তকের 'চৈতন্য জীবনের অজ্ঞাত কাহিনী' দ্রষ্টব্য।

উপরিউক্ত সূত্রগুলি ধরেই গবেষণা করলে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। খড়মটির দৈর্ঘ্য, মাপলেই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ মিলবে। এমন দীর্ঘদেহী মহাপুরুষের কংকাল কত বড় হতে পারে, তা' থেকেই প্রমাণিত হবে এই সমাধিটির মহাপ্রভুর সমাধি কিনা।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কথিত গুণ্ডিচাবাটির অভ্যন্তরে অঙ্কিত পদচিহ্নদ্বয় আমি এবার দেখে এলাম। এই পদচিহ্নটি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ 'অনুসন্ধান ঃ মন্দিরে মন্দিরে' অধ্যায়ে দিয়েছি।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে যদি ধারাবাহিক ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয়নি, তবুও জয়ানন্দ এমন কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন, যা হয়ত পরবর্তীকালে কিংবদন্তী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যদিও তথ্যাবলী কিংবদন্তী থেকে আহরিত, তবুও জয়ানন্দের কাহিনী পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন এই জন্য যে, এর মধ্যেও সত্য কিছু আছে।

জয়ানন্দ বলেছেন—মহাপ্রভু যে অন্তর্ধান করবেন, সে কথা তিনি গদাধর পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে পূর্বেই বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, নিতাই অদ্বৈতাচার্যও সে কথা জানতেন। প্রভু তাঁদের বলেছিলেন। জয়ানন্দের ভাষাতেই বলি—

অদ্বৈত চলিলা গৌড়দেশ।
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষ॥

* *　　* *　　**

আটাইশ বৎসর আমি নীলাচলে রহি।
স্থানান্তরে যাব আমি নিষ্কপটে কহি॥

* *　　* *　　* *

পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥

চৈতন্যমঙ্গল। পৃষ্ঠা ১৫০

ইতিপূর্বে অদ্বৈতাচার্যের তর্জার উল্লেখ করেছি। সেই অদ্বৈতাচার্যকেই মহাপ্রভু তাঁর গোপন সংকল্পের কথা বলেছেন নিভৃতে ডেকে। ১৪৫৫ শকে রথযাত্রার সময় অদ্বৈতাচার্য পুরীতে এসেছিলেন কি? লোচনের বর্ণনায় পাচ্ছি শ্রীবাস পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, গৌরিদাস, বাসু দত্ত, শ্রীগোবিন্দ, কাশী মিশ্র সনাতন, হরিদাস প্রভৃতি এঁরা ছিলেন। অদ্বৈতাচার্যের নামের কোন উল্লেখ নাই।

জয়ানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী দেখছি অদ্বৈতাচার্য এসেছিলেন সম্ভবত রথের আগেই, রথ যাত্রা না দেখে তিনি গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। যাত্রার আগের দিন নিভৃতে

অন্তরঙ্গ পার্ষদদের ডেকে চৈতন্যদেব তাঁর পলায়নের কথা বলেছিলেন। ২৮ বছর তিনি নীলাচলে আছেন এরপর তিনি স্থানান্তরে যাবেন একথা (নিষ্কপটে) অকপটে বলছেন। এই স্থানান্তরে কোথায়? স্বর্গে কি? তার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে রাত্রি দশ দণ্ডের সময় যে যাবেন একথা স্পষ্ট করে বলেছেন। তারপর তাঁর মায়া শরীর পড়ে থাকল, তিনি স্বর্গে চলে গেলেন। এতে অবশ্য মৃত্যুই বোঝাচ্ছে।

কিন্তু নিভৃতে ডেকে বলছেন অদ্বৈতাচার্যকে। এই কথার দ্বারা তৎকালের ওড়িষ্যার রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমরা যে আলোচনা করেছি তাতে তাঁকে যে হত্যার চেষ্টা চলছে এ কথা কি প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত করছে না?

বৃন্দাবন দাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথিতে আছে ন্যাসীরূপে তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন মদনগোপাল মন্দিরের দিকে। যদিও এই নবাবিষ্কৃত পুঁথিটি প্রামাণ্য নয় অর্থাৎ খুব প্রাচীন নয় হয়ত কবি বৃন্দাবন দাসের লেখাও নয়—তাহলেও স্থানান্তরে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এবং শান্তা মায়ির কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি আছে। তাই কাহিনীটি যুক্তি গ্রাহ্য না হলেও একেবারে নস্যাৎ করতে পারছি না।

পণ্ডিত গোসাঞিও অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিতকেও তাঁর সংকল্পের কথা বললেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে গদাধর শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তি বলে কথিত। তিনি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। প্রভুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে গদাধরও অন্তর্ধান করেছিলেন—একথা নবাবিষ্কৃত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে আছে। যদি গদাধরও চৈতন্যদেবের সঙ্গে পলায়ন করেন, তাহলে তাঁর কথা শান্তা মায়ির কাহিনীতে নাই কেন? আর যদি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে গদাধরকে হত্যা করা হয়, তাহলে তাঁর কথা কোন ওড়িয়া কবি উল্লেখ করলেন না? এদিকে ইতিহাসে পাচ্ছি গদাধর নাকি চৈতন্য-বিজয়ের পর কিছুদিন বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করেছিলেন। কিন্তু তিনি কেমন করে কোথায় সমাধিস্থ হলেন বা তাঁর সমাধিক্ষেত্র কোথায় তা আজও জানা যায়নি। ভক্তিরত্নাকরে'র মতে গদাধরকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল তোটা গোপীনাথের মন্দির চত্তরেই।

অনুসন্ধানের দ্বারা এটুকু প্রমাণিত হয়, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য খুব কম করে হলেও তিন-চার জন চৈতন্য-অন্তরঙ্গ পার্ষদ জানতেন। তার মধ্যে অদ্বৈতাচার্য, প্রভু নিত্যানন্দ, গদাধর পণ্ডিত ও স্বরূপ গোস্বামী। স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা আজো অনাবিষ্কৃত। এছাড়া অন্য তিনজন তৎকালে কিছু বলেননি।

কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন তাঁর সংস্কৃত 'মহাকাব্য' গ্রন্থে চৈতন্য তিরোধান সম্পর্কে কোন কাহিনী না দিলেও বলেছেন ঃ

স্থিত্বা তত্র দিনানি হন্ত কতিচিদ্‌ভুয়োঽসিতাদ্রৌ প্রভুঃ শ্রীমানেত্য
ননন্দ নন্দয়তি চ স্মৈতানজস্রং জনান্‌ ।
এবং বিংশতিহায়নান্তরভবাং যাত্রাং বিলোক্যাখিলাং
স্বংধামাথ জগাম কৈশ্চিদপি তৈঃ সার্ধং কৃপাসাগরঃ ॥

—মহাকাব্য ॥ ২০।৪৭

এই শ্লোকের সরল বঙ্গার্থ—প্রভু সেই স্থানে (নীলাচলের বাইরে) কয়েকদিন অবস্থান করে ফিরে এলেন নীলাচলে এবং সেখানের ভক্তবৃন্দকে করলেন আনন্দিত। তাদের মধ্যে কিছু ভক্তের সঙ্গে বিশ বৎসর যে সকল যাত্রা (রথযাত্রা) হয়েছিল তা দর্শন করে (অথবা যে-সমস্ত ভক্তের মধ্যে কতিপয় ভক্তের সঙ্গে) নিজ ধামে গমন করেছিলেন।

কবি কর্ণপুর আরো লিখেছেন :

ইত্থং চত্বারিংশতা সংতভাজা শ্রীগৌরাঙ্গো হায়নানাং ক্রমেণ ।
নানা-লীলালাস্যমাসাদ্য ভুমৌ ক্রীড়ন্‌ ধাম স্বং

ততোঽসৌ জগাম ॥ মহাকাব্য ॥ ২০।৪১ ॥

সরল বঙ্গার্থ—ভুমণ্ডলে সাতচল্লিশ বছর শ্রীগৌরাঙ্গদেব নানারূপে লীলা-নৃত্যক্রীড়া করে তারপর তিনি স্বধামে গমন করলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে কবি কর্ণপুর এই দু'টি শ্লোক মাত্র লিখেছেন। এর মধ্যে কোন ঘটনার ইঙ্গিত নাই। তবে কয়েকজন পার্ষদ সহ যে তিনি স্বধামে গমন করেছিলেন একথা কবিকর্ণপুরও বলছেন, অর্থাৎ চৈতন্যদেব একাই আততায়ী কর্তৃক নিহত হননি, অন্তরঙ্গ পার্ষদগণও কেউ কেউ নিহত হয়েছিলেন।

আমার মনে হয় তৎকালে সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের চৈতন্য-বিরোধী চক্র এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, চৈতন্য-নিধন সম্পর্কে কেউ সামান্যতম কথা বলতেও সাহসী ছিলেন না—কি উৎকলে, কি গৌড়ে।

যে সকল দুঃসাহসী বৈষ্ণব মহাজন সামান্যতম প্রতিবাদ করতে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই প্রাণ হারিয়েছেন এই চৈতন্য-বিরোধী-চক্রের হাতে। জয়ানন্দ লিখেছেন—'অনেক সেবক সর্প দংশইঞা মৈল।' এ সর্প গোবিন্দ বিদ্যাধর রূপ সর্প। অর্থাৎ গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন বৈষ্ণব গোস্বামীগণ গোবিন্দ বিদ্যাধর বৈষ্ণব নিধন যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। উড়িয়া চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেব ছাড়া আরো অনেক বৈষ্ণব মহান্তগণের অন্তর্ধানের কথা পাচ্ছি। এই অন্তর্ধান পলায়ন নয়,

নিধন অর্থাৎ নির্মমভাবে হত্যা। অর্থাৎ এই চক্র পূর্বে থেকেই ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করে রেখেছিল কাকে কাকে তারা হত্যা করবে।

ডঃ সেন, ডঃ মজুমদার প্রভৃতির ধারণা মহাপ্রভুকে পুরীর পাণ্ডারা হত্যা করেছিলেন। ডঃ মজুমদার লিখেছেন ঃ

"নির্দিষ্ট সময়ের সামান্য বিরোধ থাকিলেও জয়ানন্দ ও লোচনের মধ্যে তিথি ও তারিখে মিল আছে। কিন্তু তিরোভাব স্থানের মিল নাই। লোচনের মতে গুণ্ডিচাবাড়ীতে তিরোভাব, জয়ানন্দের মতে টোটাগোপীনাথের মন্দিরে। শ্রীচৈতন্য যে সমুদ্রে তিরোহিত হন নাই, তাহা ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিয়াছেন।"[১] শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যু যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ গদাধরের নিকট গোপীনাথে তিনি শেষ সময়ে ছিলেন ইহাই অধিকতর সম্ভব।'—চৈ. চ. উপাদান, পৃঃ ২৭৭

ডঃ মজুমদার অনুমানের উপর এই সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর এই অনুমান জয়ানন্দ ও লোচনকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে। নবাবিষ্কৃত তথ্য যা বৈষ্ণবদাস দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে কানাই খুঁটিয়া ও শিখি মাহান্তি গরুড় স্তম্ভের পিছন থেকে শ্রীচৈতন্যের মৃতদেহ তুলে নিয়ে হাজির হয়েছেন গোপীনাথ মন্দিরে। তখন কি তিনি মৃত? সম্ভবত তখন তাঁর দেহে প্রাণ ছিল না। গোবিন্দ বিদ্যাধরের অনুচররা তাঁকে মেরে গুণ্ডিচাবাটিতে রেখেছিল। চিন্তা করে দেখা উচিত গরুড় স্তম্ভ থেকে গুণ্ডিচাবাটি কিন্তু প্রায় দু'মাইল পূর্বোত্তর দিকে অবস্থিত। রাত্রি আন্দাজ ১১টার সময় যখন পথে লোক ছিল না, তখন গরুড় স্তম্ভের নিকটে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। তবে গুণ্ডিচাবাটিতে যে পদচিহ্ন তাহলো পাণ্ডাদের উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্টি। পয়সা আয়ের ফন্দী মাত্র।

তোটা গোপীনাথ মন্দির-সংলগ্ন প্রান্তরে কোথাও তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। সেই সমাধি হয়ত এখনো অনাবিষ্কৃত। আউল চাঁদ আর গোরাচাঁদ একই ব্যক্তি নয়। চাকদহের কাছে পরারী গ্রামে সমাধিটি চৈতন্যদেবের বলে কর্তাভজা সম্প্রদায় মনে করেন, আসলে সে সমাধিটি আউল চাঁদের।

যদি চৈতন্যদেব গোপীনাথের মন্দির থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, তাহলে আরো চার বছর তিনি কোথাও ছদ্মবেশে ছিলেন সে কথাও

---

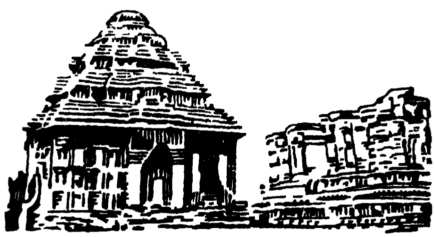
১. ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৫ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসানে' প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন (ডঃ মজুমদারের গ্রন্থের ২৭৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা)।

প্রমাণ করতে হবে যথাযথ তথ্য দিয়ে। ২৮ বছরের কথা জয়ানন্দ বলেছেন। এই তথ্য সত্য নয়। কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে লোচন লিখেছেন।

বৈষ্ণব মহান্তগণ বেশী ঝোঁক দিয়েছেন তত্ত্বের দিকে। ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্ব তাঁদের কাছে প্রাধান্য লাভ করেনি। তাই এঁদের বই বৈষ্ণবগণ খারিজ করে দিয়েছেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, আরো কিছু ওড়িয়া পুঁথি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। উড়িষ্যা এবং সীমান্ত বাংলায় পরিভ্রমণ করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, ঐ সময়ে ওড়িয়াতে আরো কিছু চৈতন্য-বিষয়ক পুস্তক লেখা হয়েছিল, যা আজো আবিষ্কৃত হয়নি। সেইসব অজ্ঞাত পুঁথি আবিষ্কৃত হলে চৈতন্যদেবের শেষ অধ্যায় সম্পর্কে আরো নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে। তখন গোবিন্দ বিদ্যাধরের গোপন চক্রান্তের পুরো ইতিহাস উদ্ঘাটিত হবে। অর্থাৎ শহর ছেড়ে আমার পরবর্তী তরুণ গবেষকগণকে উড়িষ্যার নিভৃততম প্রাচীন পল্লীতে পল্লীতে অনুসন্ধান করতে হবে। শ্রীচৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বাভাবিক মৃত্যু তাঁর হয়নি।*

আজকে তরুণ গবেষকগণকে এই চৈতন্যব্রত গ্রহণ করতে হবে, যেমন করেই হোক শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য আবিষ্কার করতে হবেই। এজন্য তাঁদের ওড়িয়া ভাষাও শিখতে হবে। তবেই সার্থক হবে শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচশত বৎসর পূর্তি উৎসব।



* এবারের অনুসন্ধানে যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকের শেষের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হয়েছে।

।। চৌদ্দ ।।



শ্রীচৈতন্যের সমাধির সন্ধানে

গুজবটা ছড়িয়েছে কোলকাতাতেই। এই ত সেদিন ১২।৭।৮৫ তারিখে গিয়েছিলাম কোলকাতায়। কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করছি একটা প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করতে, পারছিনা কিছুতেই, তাম্রশাসনটি আবিষ্কার করেছেন 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র'। অক্ষরগুলি হাতুড়ির ঘায়ে এমন ভাবে থেতলে বিকৃত হয়ে গেছে, তার আর কোন দিন কেউ পাঠোদ্ধার করতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে। এমন মন্তব্য করেছেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত লিপিতত্ত্ববিদ স্বর্গীয় ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়। তাম্রলিপিটি দেখেছেন তিনি। বৃদ্ধ বয়সে পাঠোদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন কয়েক দিন নিরলসভাবে। কথা প্রসংগে বলেছিলেন, কয়েক রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে তাঁর। হরপের ছাঁদ দেখে অনুমান করেন, সম্ভবত এটি মহারাজ শশাঙ্কের তাম্রশাসন হতে পারে।

আমিও দেখেছি তাম্রশাসনটি। হরপগুলোর অনুলিপি করতে চেষ্টা করেছি। সেখানে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মত পণ্ডিত মানুষ হার স্বীকার করেছেন, সেখানে আমার মত গোবর গণেশের দ্বারা সে সম্ভব হবে না, সে তো আমি ভাল করেই জানি। তবু পুরানো লিপি দেখলে আমার কেমন যেন নেশা ধরে যায়। ঘুম আসে না চোখে। লিপির দিকে তাকিয়ে ভাবি—ঐ শত শত বছরের পুরানো লিপিগুলো যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়—লিপিগুলি বোবা নয়, আমিই বোবা হয়ে গেছি, তাই ওদের সংগে কথা বলতে পারি না। লিপিগুলো কেমন যেন অব্যক্ত যন্ত্রনায় আমার চোখের সামনে নীল হয়ে উঠে। আমি ওদের সংগে কথা বলতে চাই, কিন্তু পারি না কিছুতেই।

অমনি সব পাগলের মত ভাবি আর নির্জন রাত্রিতে আমার গ্রন্থগারে বসে নিজের সংগে নিজেই কথা বলি। বাড়ীর সকলে তখন নিদ্রায় অচেতন।

কোলকাতা যেতে বড্ড ভয় করি। রাস্তায় যা ভিড়। তারপর ট্রামে বাসে যা ঝুলন, আর 'রাস', তা দেখে মনে হয়েছে যদি শ্রীরাধা আর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাতেন এ যুগে, কলকাতাতেই আসতেন রাস লীলা করতে।

তা থাকগে। ঐ তাম্রশাসনের কথাটা ভাবতে ভাবতেই ঢুকে পড়েছি কলেজ স্ট্রীটের কাছে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের গলিতে। কিনতে চাই ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের 'শিখালেখ—তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ' বইটা। হয়ত লিপি সম্পর্কে ঐ পুস্তকে লেখক লিখে গেছেন নতুন কোন কথা।

উঠে পড়লাম 'দে বুক স্টোরে'ই। ভিড় একটা খুব ছিল না। স্বত্বাধিকারী ভগবানবাবুর ছেলে পরেশবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—

'আসুন, ভাল আছেন ত? আপনার 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' বেশ বিক্রি করলাম। প্রোডাকশন্ ভাল হয়েছে। তবে কি জানেন, এখানে আপনাকে নিয়ে কত কথাই না শুনছি। এক ভদ্রলোক ত এসে বললেন—'

'মালীবুড়ো'কে আমি ভাল ভাবেই চিনি। বিরাট পণ্ডিত আর বৈষ্ণব মানুষ। গলায় আছে মোটা তুলসীর মালা। থাকেন পুরীতে। অনেক দিন থেকেই এই সব তথ্যাদি সংগ্রহ করছিলেন…

আরো কি সব যেন বলতে চাইছিলেন, দেখলাম দু'চার জন ক্রেতা এসে গেছেন। আমি প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বললাম, আমার পূর্বোক্ত বইটা আছে কিনা। উনি ভিতরে খোঁজ করে দেখতে লোক পাঠালেন।

অন্য একজন বললেন—তা' দাদা, আপনি ঐ ভদ্রলোকের উত্তরে কি বললেন? কি আর বলব। চুপ করে সব শুনছি। আমরা ত ও'কে ভালভাবেই চিনি। হেসে বললাম আমি—মেদনীপুরীয়া। খোদ গেঁয়ো। তাই না?

আমার বই 'শিলালেখ—তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ' তখনো আসেনি। দেখতে দেখতে ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। আলোচনাও চলছে। এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে বললেন—কি, ঐ 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যে'র কথা বলছেন ত?

একজন দেখিয়ে দিলেন আমাকে। ইনিই সেই লেখক।

আগন্তুক ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—

ও, আপনি। আপনাকে আমি চিনি। এখন যাবেন না মশায় পুরীতে। আমি রথের সময় গিয়েছিলাম। পাণ্ডারা ভীষণ গিয়েছে ক্ষেপে। আপনি যাতা কি সব লিখেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পাদুকার ছবি তুলতে চাইছিলেন, কি সত্য বলছি কি না?

আমি বললাম—তা' আমার বইটা এত শীঘ্র পুরী পেঁছাল কেমন করে?

পেঁচিয়েছে মশায়। এতদিনে কি আর পেঁছতে বাকি আছে। পুরীর বাঙালী হোটেলেই দেখে এসেছি বইটা। তাছাড়া, আমিও ত আমার বইটা সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলাম।

তা' শুনুন মশায়, আপনি এখন কিন্তু যাবেননা পুরীতে। রাধাকান্ত মঠে ভীষণ গণ্ডগোল। গণ্ডগোল করছে হাজার হাজার লোক। মহাপ্রভুর পাঁচশত বছর পূর্তি-উৎসবে পদব্রজে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার বন্দোবস্ত হয়েছে তা'ত জানেন। পুরী থেকেই সে পরিক্রমা আরম্ভ হবে। সব আয়োজন প্রস্তুত। খড়্গপুর থেকেও লোক গিয়েছে। গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডি কে ভক্তিকুসুম মহারাজ, এমনি কি যেন একটা নাম—তিনিই ত দিচ্ছেন নেতৃত্ব। তা শেষ পর্যন্ত কি হলো জানেন ?

আমি মাথা নেড়ে আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। দেখলাম, সকলে তাকিয়ে আছে ঐ আগন্তুক সদ্য পুরী-ফেরৎ ভদ্রলোকের দিকে।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললেন—তাহলে এখবর আপনি জানেননা ! ঐ রাধাকান্ত মঠকেই ত আপনি বলেছেন গম্ভীরা। পুরীর মধ্যে সব থেকে অর্থশালী হলো ঐ মঠ। প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি আর অর্থ আছে ওদের। কথা ছিল, রাধাকান্ত মঠই এই দক্ষিণ ভারত পাদ-পরিক্রমার সব ব্যয়ভার বহন করবে। প্রায় চার পাঁচ হাজার লোক বিভিন্ন দেশ থেকে এসে হাজির হয়েছে। সে এক বিরাট হৈহৈ-রৈরৈ ব্যাপার। সব আয়োজন চলছে। সবই প্রস্তুত। সকলের মধ্যে সে এক অপূর্ব উন্মাদনা। না দেখলে বুঝতে পারবেন না। রথের পরেই পুরী থেকে যাত্রা হবে শুরু। এমন সময় রাধাকান্ত মঠের কর্তৃপক্ষ বসলেন বেঁকে। তারা বললেন, দক্ষিণ ভারতে পাদপরিক্রমার খরচ তাঁরা দেবেন না। বুঝুন অবস্থা।

বললাম—শেষে মুহূর্তে কেন তাঁরা বেঁকে বসলেন ?

তা' জানব কেমন করে। নানা জনে নানা কথা বলছে। বাঙালীরাই নাকি যত গণ্ডগোলের ওস্তাদ। তাঁরা দেবেন অর্থ আর নাম কিনবেন আপনারা। তারপর লিখবেন ঐসব কথা। তাঁরা আপনার উপরেও ক্ষেপেছেন। তাই বলছিলাম, এখন আপনি যাবেন না মশায়।

আমি বললাম—তারপর কি হলো বলুন। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারত পাদ-পরিক্রমা কি হবে না ?

তা' কেমন করে জানব বলুন। অভিযাত্রীদের মধ্যে ভীষণ গণ্ডলোল হচ্ছে। ভক্তিকুসুম মহারাজ ত বলছেন পাদপরিক্রমা হবেই। ৪।৫ হাজার লোক সকলেই আছে। আমি ত মশাই চলে এসেছি। শেষ পর্যন্ত কি হয় কি জানি।

ততক্ষণে বই আমার এসে গেছে। বইটি নিয়ে কাটতে পারলে বাঁচি। ভদ্রলোককে বললাম—আমি ত মশায় ওড়িয়াদের তেমন কিছু দোষারোপ করিনি। তথ্য-প্রমাণ যা পেয়েছি, তাই নির্ভর করে লিখেছি। আমার উপরে ও'রা রাগবেন কেন।

বলেই চলে এলাম।

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের গলি থেকে বেরিয়ে আসছি। এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ডাকল—ও মশায়, দাঁড়ান।

পিছন ফিরে দেখি সেই প্রুরী-ফেরৎ আগন্তুক ভদ্রলোক। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। কাছে এসে বললেন—চলুন একটু চা খাই।

আমি সবিনয়ে বললাম—দেখুন, বড্ড ব্যস্ত আছি। বাড়ী ফিরতে হবে। চা এখন খাব না। এই ত এখুনি খেয়ে এসেছি।

আমার কথা শুনে তিনি বললেন—একটু খেলে এমন কিছু ক্ষতি হতো না। আমিও ট্রেনে ঐ হাওড়াতেই চাপব। বই গস্ত করা আমার শেষ।

আমার আরো একটা জায়গায় যেতে হবে। আপনি কি আরো কিছু বলতে চাইছেন?

হ্যাঁ, আমার একটু জানার ছিল। না বসলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন করে বলি বলুন, চলুন না, চা খেতে খেতেই বলব।

এইখানেই বলুন না। তবে আমার হাতে সময় কম।

বইটা আপনার পড়েছি, অনেক তথ্য-প্রমাণ, অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ আপনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। পাঠককেও আপনার চিন্তায় চিন্তিত করতে চাইছেন। সোজা কথায় এত কষ্ট করে যা সংগ্রহ করেছেন, তার ফলটা ঝট্ করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে চাইছেন না। পাঠকরাও একটু কষ্ট করে ভেবেচিন্তে দেখুক না প্রকৃত কোনটা হতে পারে, আর কোনটা না হতে পারে। তথ্য-প্রমাণ ত সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম—কিন্তু কি জানতে ছাইছেন, তাই আমায় সোজা সুজি বলুন।

ভদ্রলোক একটু যেন দমে গিয়ে বললেন—মহাপ্রভুকে হত্যা করা হয়েছে এ কথা আপনি বলেছেন। কিন্তু সত্যি সত্যি তাঁকে কোথায় সমাধি দেওয়া হয়েছে, এটা আপনি যতই 'না' বলুন, আমার বিশ্বাস আপনি জানেন। সেইটে একটু দয়া করে যদি বলেন, তাহলে আমার অনেক দিনের ইচ্ছেটা পূরণ হয়। দেখা যখন আপনার পেয়েছি, এ কথাটা বলতেই হবে।

আমি বললাম—দেখুন, অহেতুক আপনি আমায় বিপদে ফেলছেন। আমি ত ঐ বইতেই লিখেছি, সমাধি আমি খুঁজে পাইনি। আর খুঁজে পেলেও সহজে বিশ্বাস করতে পারব না। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।

সেদিন বিকেলে। গিয়েছি 'ময়নার' শ্যামসুন্দর পুস্তকালয়ে। সহসা এসে

হাজির হলেন শিক্ষক অনিল প্রধান। আমাকে দেখেই বললেন,—এই যে বুড়োদা, আপনাকেই খুঁজছি। চকচাঁদপোতায় আমাদের 'মণ্ডলী' হয়েছিল। ও'রা সব ধরে আমাকেই সভাপতি করলেন।

বলেই পকেট থেকে সভাপতির মালা বের করে কথার সত্যতার প্রমাণ দিলেন। আমি বললাম—আসুন, বসে বলুন, কি বলতে চাইছেন।

আপনার বিরুদ্ধেই আমাদের একজন পণ্ডিত বৈষ্ণব বক্তা বললেন—আপনার নাকি কি বই মহাপ্রভুর সম্পর্কে বেরিয়েছে। আপনি তাতে লিখেছেন, চৈতন্যদেবকে মেরে জগন্নাথ মন্দিরে মণিবেদীর তলে সমাধি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে এর প্রমাণ দিতে হবে। ও'র কথা শুনে সকলেই বেশ উত্তেজিত। সভা চ্যালেঞ্জ করেছে আপনাকে।

শেষে অবশ্য অনেক কষ্টে তাঁদের আমি থামিয়েছি। বলেছি—তাঁকে ত আমি ভালভাবেই চিনি। আপনারা অত উতলা হবেন না, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে আসল ব্যাপারটা কি জেনে পরবর্তী মণ্ডলীতে যা হয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

আমি বললাম—আপনি কি আমার বইটা পড়ে দেখেছেন?

উত্তরে তিনি জানালেন, "না। আমি ত বইটাই দেখিনি। পড়ব আবার কখন।"

তাহলে কি আর বলব বলুন আপনাকে। বই না পড়লে আলোচনা হবে কেমন করে। আমি ঠিক ঐ কথা বলিনি। বলেছি কোন গবেষক মনে করেন, তাঁকে জগন্নাথের মণিবেদীর তলে হয়ত সমাধি দেওয়া হয়েছে। সেটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমি তথ্যটির উল্লেখ করেছি মাত্র। বইটা কি তিনি আসলে পড়েছেন, না কারও মুখে শুনে বললেন?

অনিলবাবু বললেন—হ্যাঁ। তিনি নিজে পড়েছেন।

বইটা পেলেন কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

তাঁর ছেলে কি কোলকাতায় কোন প্রেসে চাকরী করেন। তিনিই বইটা কিনে এনেছেন কলকাতা থেকে। তাছাড়া ভীষণ পণ্ডিত মানুষ তিনি। মিথ্যে ত বলবেন না। আমি বললাম—তাহলে তাঁকে আর একবার বইটা ভাল করে মনযোগ দিয়ে পড়তে বলবেন। আর আপনিও একবার নিজে পড়ে দেখুন। তা হলেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

তা' আমি না হয় একবার পড়ে দেখব। কিন্তু ও'দের কি বলব বলুন।

আমি বললাম—আপনার কথায় তিনি কি বলেছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

চ্যালেঞ্জ যখন তাঁরা বা তিনি করেছেন, আমাকে লিখিত ভাবে তা' জানাতে বলবেন বা আমাকে যদি আপনাদের মণ্ডলীতে ডাকেন, তাহলে গিয়ে তাঁদের প্রশ্ন শুনে আমার জবাব দেব। সেইটাই সব থেকে ভাল হবে। তাই নয় কি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ভাল। আমি তাহলে ওঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

আমি বললাম—তাই বলুন। তবে সময় থেকে আমায় জানাবেন। কেন না আমি ত সব সময় বাড়ীতে থাকি না।

না-না, সময় থেকেই আপনাকে বলব। এই কথা থাকল। আমি তা' হলে এখন আসছি।

এই বলেই নমস্কার করে চলে গেলেন শিক্ষক অনিলবাবু।

** ** **

আমি ভাবলাম, আলোচনা যখন হচ্ছে, তখন আরো নানা মতামত আসবে এবং আমাকে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আমিও তাই চেয়েছিলাম, শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বাড়ুক। তবেই ত জনসাধারণ মহাপ্রভুকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

কিন্তু সমাধিটা কোথায় তা' আমায় বলতেই হবে। এত যুক্তিতর্ক দেখানর পরও যদি সকলে সেই একই প্রশ্ন করেন, তাহলে আমি যাই কোথায়। ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন করতে হলে জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হাতের কাছে আসা চাই। তা না হলে অনুমান করে কোন কিছু বলি কেমন করে।

সেদিন তমলুকে সেই কথাটাই বললেন মন্ত্রী কিরণময় নন্দের ভাই, অধ্যাপক ব্রহ্মময় নন্দ। বইটা পেয়েই তিনি পড়েছেন দু'টো আড়াইটে পর্যন্ত রাত জেগে। গুণগ্রাহী পণ্ডিত মানুষ। বিরাট পণ্ডিতের বংশে জন্ম তাঁর। বিখ্যাত পণ্ডিত জ্যোতির্ময়নন্দ তাঁর পিতৃদেব। তাঁকে আমি বিলক্ষণ চিনি। গিয়েছি তাঁর বাড়ীতে।

সেই ব্রহ্মময় বাবু বললেন—অনেক খেটেছেন। অনেক অনুসন্ধান করেছেন। ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও পুরীতে আমার আলাপ হয়েছিল। মহাপ্রভুর সমাধির সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, তা কোনদিনই সম্ভব নয়। শরীরের যে মাপের কথা আপনি সাক্ষী সাবুদ আর তথ্য প্রমাণ দিয়ে উল্লেখ করেছেন, তা প্রমাণ করতে হলে সমাধি খুঁড়তে হবে। তা' করা কোনদিনই সম্ভব নয়। অতএব শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু রহস্যও, রহস্যই থেকে যাবে। ও রহস্যের আবরণ উন্মোচন হবে না কোনদিনই।

তারপর আরো অতিরিক্ত সংযোজন করে বললেন—জয়দেববাবুর দ্বিতীয় খণ্ড

আর কোনদিনই বের্বে না। সেবার পুরীতেই ওঁকে নিয়ে সেকি ভীষণ গণ্ডগোল। শেষে পুরী ছেড়ে পালালেন।

আপনি অনেক কথাই লিখেছেন। কিন্তু শুধু চৈতন্যদেব ত নয়, মহাপ্রভুর পঞ্চতত্ত্ব বলে যাঁরা খ্যাত, তাঁদের কারো ত সমাধি পাওয়া যায়নি। তাঁদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত করবেন আপনি? নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, আচার্য শ্রীবাস—এঁদের সমাধি কোথায়? কিভাবে এঁরা দেহরক্ষা করলেন। এসব কথা চিন্তা করুন।

এত যখন ঘুরেছেন, বরানগর পাঠবাড়ীতে গিয়েছেন কি?

আমি বললাম—না।

তাহলে চলে যান। একবার ঘুরে আসুন। কলেজ স্ট্রীট থেকেই ৩৪নং বাসে চেপে পড়বেন। গিয়ে নামবেন তাঁতী পাড়া স্টপেজে। ওখানে নেমেই রিক্সোয় সোজা চলে যাবেন বরানগর পাঠবাড়ীতে। ওঁদের গ্রন্থ-মন্দিরে বহু পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত আছে। অমূল্য সংগ্রহশালা। দেখলেই আপনি বিস্মিত হবেন। ওখান থেকে অনেকেই গবেষণা করেছেন। ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার —এঁরা সকলেই যেতেন ঐ বরানগর পাঠবাড়ীতে।

হ্যাঁ, একটা ভাল কথা মনে পড়ছে। ওখানেও শ্রীচৈতন্যদেবের একজোড়া পাদুকা সংরক্ষিত আছে। গিয়ে মেপে দেখুন। লম্বায় কত ইঞ্চি হয়। পুরীর মহাপ্রভুর পদচিহ্ন আমি দেখছি। গুড়ুর স্তম্ভের কাছ থেকে তুলে নিয়ে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত পদ্মের মাঝে কালো প্রস্তরের পদচিহ্ন সেট করা আছে। ওটি হলো রাধারমণদাস বাবাজীর কীর্তি। তিনিই ঐ মহৎ কাজটি করেছেন।

ব্রহ্মময় বাবুর সঙ্গে কথা বলে শান্তি পেলাম। ভদ্রলোক শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে অনেক খোঁজ খবর রাখেন। বুঝলাম বইটা পড়েছেন খুঁটিয়ে। আলাপ ওঁর সঙ্গে আগে থেকেই ছিল। এখন অন্তরের যোগাযোগ স্থাপিত হলো। এমন মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পেরে নিজেকে ভারি ভাগ্যবান বলে মনে হলো।

উনি খুশি হয়ে বললেন—আমাদের কলেজের প্রদর্শনীতে আপনার অমূল্য সংগ্রহ কিছু দেখেছিলাম। একবার আপনার সংগ্রহশালা দেখতে যাব।

আমি খুশি হয়ে বললাম—নিশ্চয়ই আসবেন। তবে এখন ত বর্ষাকাল। না যাওয়াই ভাল। বর্ষাটা যাক।

উনি বললেন—সেই ভাল। কিন্তু তাঁর আগে আপনাকে একদিন আমার বাসায় আসতে হবে। এই ত সামনেই আমার বাসা। চলুন না এখন যাবেন?

আজকে যেতে পারছি না। শীঘ্রই একদিন আসছি।

কয়েকদিন ধরেই ভাবছি। এখন কি করি। আবার একবার পুরী ত যেতেই হয়। আরো একটু খোঁজ খবর করে দেখা যাক। নতুন কোন তথ্য মিলে কি না। সমাধি সম্পর্কে অনেক খোঁজ খবরই ত করেছি। নিজে জানিও। কোথায় শায়িত আছে মহাপ্রভুর পূত-পবিত্র দেহ। সে কথা হয়ত বলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেইটাই যে সত্য সত্যই সমাধি তাই বা বলি কেমন করে।

এদিকে অধ্যাপক ব্রহ্মময় বাবুর প্রশ্ন—নিত্যানন্দের সমাধি, গদাধরের সমাধি—এ সবেরই বা কি অনুসন্ধান করব। এসব খুঁজে পেতে দেখতে হলে আবার এই বয়সে নামতে হবে গবেষণায়। তাহলে কেটে যাবে কয়েক বছর। সে ত আমার জীবনে সম্ভব নয়।

ভাবছি এখন কি করি। এমন সময় একটা খাম এলো ডাকে। হাতে নিয়ে দেখি—ঝাড়গ্রাম থেকে পাঠিয়েছেন সেবায়তনের আচার্যদেব শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরিজীউ মহারাজ।

লিখেছেন পুরীর স্বর্গদ্বার কড়ার আশ্রমের আচার্য শ্রীমৎ স্বামী যোগেশ্বরানন্দ গিরি মহারাজকে।

শ্রীমৎ স্বামী যোগেশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ ৫.৭.৮৫

নারায়ণেষু,

প্রিয় স্বামীজী, আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। স্বামী হরিহরানন্দজী মহারাজ এখন কোথায় আছেন?

পত্রবাহক শ্রীযুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো) শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্য। আমাদের আশ্রমের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন। ইনি একজন নামকরা সাহিত্যিক। অনেক বই লিখেছেন। সম্প্রতি 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' নামে একটি গবেষণাপূর্ণ বই লিখেছেন। ইনি কড়ার আশ্রমে কিছুদিন থাকতে চান। আশা করি আশ্রমে স্থান দিবে। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে আরও গবেষণা (research) করতে চান। তোমরা আশ্রমে স্থান দিলে তাঁর পক্ষে গবেষণা করার সুবিধা হবে। তোমাদের সাহায্য প্রয়োজন। অধিক কি, তোমাদের কুশল প্রার্থনা করি, প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং ওঁ নমোনারায়ণায় গ্রহণ করবে। ইতি

স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি

খামের মধ্যে অন্য একটি পত্রে আমায় লিখেছেন স্বামীজী। 'তীর্থ স্থান' প্রায়ই অতিথি ভর্তি থাকে। স্থান পাওয়া মুস্কিল হয়। আমি স্বামী যোগেশ্বরানন্দজীর নামে একটা চিঠি দিলাম। তাতে কাজ হবে কিনা জানি না। স্বামী যোগেশ্বরানন্দ উড়িষ্যাবাসী। আগে নাম ছিল ব্রহ্মচারী শান্তানন্দ। বাংলা জানে।'

কয়েকদিন আগে আমিই মহারাজকে চিঠি লিখেছিলাম। স্বর্গদ্বার কড়ার আশ্রমে থাকতে চাই। উনি যেন আমায় ওখানের আশ্রমের অধ্যক্ষকে আমার একটি পরিচয়-লিপি লিখে দেন। এ পত্রটি তারই উত্তর।

পত্রটি পেয়ে ভাবলাম, কড়ার আশ্রমে যদি আমার স্থান না হয়। তায় আবার উনি উড়িষ্যাবাসী। আমি গিয়ে এইসব অনুসন্ধান করব যদি কোন রকম জানাজানি হয়ে যায়। তাহলে ত বড্ড ঝামেলায় পড়তে হবে। কলকাতায় 'দে বুক স্টোস'' এর ঐ আগন্তুক ভদ্রলোকের কথাই যদি সত্যি হয়। তাহলে ত নির্ঘাৎ বাধার সম্মুখীন হতেই হবে। তাহলে এখন কি করব।

*   *   *

এইটাই সেই যমেশ্বর তোটা। জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। 'তোটা বা 'টোটা' শব্দের মানে হলো উদ্যান। যমেশ্বর হলেন জগন্নাথের দ্বারপাল। পঞ্চ শিবমূর্তির এটি হলো অন্যতম। শিবের নাম যমেশ্বর দেব।

এখানেই তোটা গোপীনাথ-মঠ। মঠের চত্বরে সেই বিরাট বটবৃক্ষ আজ আর নাই। সারা চত্বরটাতেই অনেকগুলো পলাং গাছ আছে। গাছগুলো দেখতে অনেকটা কাঁঠাল গাছের মত। এদেশের ভাষায় পলাং গাছই বলে।

আমি এই পলাং গাছেরই একটার গোড়ায় বসে পড়লাম। শ্রান্ত-ক্লান্ত সারাদিন ঘুরে ঘুরে। কত কিছু কথাই ত মনে পড়েছে। আজ থেকে সাড়ে চারশত বছর আগে এই তোটার কোমল বালুকার বুকে পা রেখে কতবারই না এসেছেন আমার গৌরহরি। মুখে 'হরে কৃষ্ণ' নাম। রাধা ভাব দ্যুতিতে সুবলিত তনু তাঁর। সামনের চটক পর্বত দেখে হৃদয়ে জেগে উঠত তাঁর শ্রীগোবর্ধনের স্মৃতি। আর তোটার সম্মুখস্থ বিশাল বটবৃক্ষ দর্শনে মনে পড়ত তাঁর বংশীবটের স্মৃতি। আকুল হয়ে উঠত ভক্ত-হৃদয়।

এ স্থান গৌরহরির স্মৃতিতে ভরপুর। প্রিয় পার্ষদ তাঁর গদাধর। তাঁর কাছেই আসতেন তিনি প্রত্যহ। গদাধরের মুখে শুনতেন শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা। 'কৃষ্ণ কথায়' কোথা দিয়ে কেটে যেত সময়। সে খেয়ালই থাকত না দু'জনের।

সেদিন নিত্যানন্দ এলেন অকস্মাৎ যমেশ্বর তোটায়। গদাধর তখন গোপীনাথের সামনে বসে ভাগবত পাঠ করছিলেন। নিত্যানন্দের আগমন বার্তা শুনে পাঠ বন্ধ রেখে উঠে এলেন। দু'জন দু'জনকে দেখে আবদ্ধ হলেন প্রেমালিঙ্গনে। দেহে দেখা দিল প্রেমবিকার। প্রেমে দুঁহে হাসে কাঁদে। ভক্তগণ দেখে আনন্দে চতুর্দিক বেষ্টন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। তাই দেখে দুই প্রভু কিছু স্থির হয়ে পাশাপাশি উপবেশন করলেন। তারপর চৈতন্যমঙ্গল-সংকীর্তন আরম্ভ করলেন।

সকলেই হলেন প্রেমে বিভোর। এক সময় যেন সকলে ভাবে বিভোর হয়ে স্থির হয়ে গেলেন।

তখন গদাধর নিত্যানন্দ প্রভুকে ভিক্ষার্থ জানালেন আমন্ত্রণ। নিত্যানন্দ এনেছিলেন এক মান সরু চাল, আর একটি রাঙা কাপড় গোপীনাথের জন্য। তাই দিলেন গদাধরকে। সাদরে ভক্তিভাবে গ্রহণ করলেন গদাধর। সেই সরু চাল দিয়ে ভোগ রাঁধলেন গোপীনাথের। আর তোটার শাক তুলে সুকোমল তেঁতুল বেটে সমুদ্রের লোনা জল দিয়ে রাঁধলেন অম্বল। তাই দিয়ে ভোগ দিলেন গোপীনাথকে।

ঠিক সেই সময় কোথায় ছিলেন গৌরহরি 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলতে বলতে এসে হাজির হলেন তোটায়। ডাক দিলেন—বলি ও গদাধর!

ডাক শুনে বেরিয়ে এলেন গদাধর। এ যে বিনা নিমন্ত্রণে স্বয়ং প্রভু দ্বারে উপস্থিত। প্রেমাবিষ্ট গদাধর নিয়ে গেলেন গৌরহরিকে। পরম প্রীতিভরে বসালেন ভোজনে। প্রভু, গদাধরের পাকের প্রশংসা করে বললেন, গোপীনাথের প্রসাদান্ন, তায় গদাধর তোমার পাক। এ যে আমার কাছে অমৃত সদৃশ। তোটা গোপীনাথের প্রাঙ্গণে ভক্ত ও ভগবানের একি মহিমময় লীলা।

প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতুহলী॥
গদাধর, গদাধর ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে গদাধর বন্দে পদদ্বন্দ্ব॥
হাসিয়া বলেন প্রভু—কোন গদাধর।
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর॥
আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা বলতে আমি লই॥
নিত্যানন্দ দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ॥

—চৈ. ভা. অ. ৭।১৪২-৪৬

বলি ও গোঁসাই, পলাং তলায় বসি নিদ যাউছন্তি নাকি!

আচমকা তন্দ্রা গেল টুটে। সামনে তাকিয়ে দেখি দাঁড়িয়ে ব্রহ্মচারী। স্বাভাবিক ভাবেই বললে—প্রসাদ পাউছন্তি তো.মু সঙ্গরে আউচ্ছন্তি।

মোহাবিষ্ট আমি। উঠে পিছনে পিছনে চললাম গোপীনাথের প্রসাদ ভক্ষণের জন্য। হৃদয়টা ভরে উঠল পরম পরিতৃপ্তিতে।

*　　　*　　　*

শেষ পর্যন্ত চারটে স্থানের সন্ধান পেলাম। ইতিপূর্বে বিভিন্ন গবেষকগণ এই চারটে স্থানের কথাই বলেছেন। ১। গুণ্ডিচা বাটী ২। জগন্নাথের মন্দির ৩। কৈবল্য-বৈকুণ্ঠ ৪। তোটা গোপীনাথের মন্দির।

এই চার জায়গার কোন না কোন স্থানে শায়িত আছে মহাপ্রভুর পূত দেহ। কিন্তু কথা হচ্ছে এই চারটি কোনটি হলো সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য। বুঝব কেমন করে। কোন স্থানটি বিশ্বাসযোগ্য, কি প্রমাণ দেব আপনাদের সামনে।

এটুকু বলতে পারি গুণ্ডিচা বাটীতে প্রভুকে কখনোই কোন মতে সমাধিস্থ করা হয় নি। কারণ গম্ভীরা থেকে অতদূরে রথের ঐ ভিড়ের মধ্যে ওখানে অকুস্থল নির্ধারণ করেনি আততায়ীগণ। যদিও স্থানটি ছিল অনেকটা নির্জন।

জগন্নাথের মন্দিরেই শ্বাসরুদ্ধ করে পাণ্ডাদের সহযোগিতায় প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবকে, তারপর স্বরূপ দামোদর ও গদাধরকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে জগন্নাথের মণিবেদীতলে তাঁদের সমাধিস্থ করা সম্ভব ছিল না। কারণ আছে অনেক, প্রথমত মন্দিরের মধ্যেই হিন্দু ধর্মমতে সমাধি দেওয়ার প্রথা নেই। এমন কি বৈষ্ণব ধর্মেও তা সম্ভব নয়। সমাধি দিতে হলে দিতে হবে মন্দিরের পাশে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট স্থানে। জগন্নাথের সেবক পাণ্ডারা তা কোন মতেই সমর্থন করবেন না। অকুস্থল মূল মন্দিরের গর্ভস্থল হলেও, জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি। পূর্ব থেকে পরিকল্পনা মাফিক সব কাজ করা হয়েছিল।

ভাবে বিভোর হয়েও শ্রীচৈতন্যদেব মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেননি। যখন শ্রীচৈতন্যদেব মন্দিরে আসেন, তখন জগন্নাথদেব কি তাহলে মন্দিরেই ছিলেন, ঘটনার বিবরণ তাই বলছে বটে। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠে, তাহলে সেবার কি রথে জগন্নাথদেব আরোহণ করেন নি ? রথ কি চলে নি ?

তিনটা থেকে রাত্রি দশ দণ্ড পর্যন্ত জগন্নাথের কপাট যদি বন্ধ থাকে, তাহলে জগন্নাথ রথে উঠলেন কখন, রথ চললোই বা কখন ?

এসব কথাই ভাবছিলাম পুরীর সমুদ্রের ধারে বসে বসে। তাহলে ঘটনাটা ঘটল কেমন করে। অনেক খুঁজলাম অনেক পুঁথি-পাতা আড়ি হাতড়ালাম। কিন্তু কোন সূত্রই পেলাম না—যা ধরে একটা লাগসই যুক্তি খাড়া করি।

দুটো সূত্র খুব স্বাভাবিক ভাবে মনে আসছে। জয়ানন্দ বলেছেন—রথের আগে

নৃত্য করতে করতে প্রভুর পায়ে ইঁটের আঘাত বাজে। তারপর—'চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।' টোটাতে গদাধরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রভুকে। সেইখানেই দেহরক্ষা করেন প্রভু।

আর এদিকে 'চৈতন্য-চকড়োয় পাচ্ছি, রাত্রি দশ দণ্ডে চন্দন বিজয়ের পর প্রভুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল গরুড় স্তম্ভের পিছনে।

ঝাঁ করে প্রশ্ন করল মন। জগন্নাথদেব ত রথের পর অবস্থান করেন গুণ্ডিচা-বাটীতেই। কিন্তু বৈষ্ণবদাসের বিবরণ থেকে মনে হচ্ছে না কি, সেদিন মূল মন্দিরেই ছিলেন জগন্নাথদেব। তা ত কোন মতেই সম্ভব নয়। জগন্নাথদেবের রথ প্রায় সন্ধ্যার সময় গিয়ে হাজির হয় গুণ্ডিচা বাটীতে। পূর্বেই বলেছি সে প্রায় দু' মাইল দূরে অবস্থিত। এই গুণ্ডিচা বাটীতেই অবস্থান করেন সাতদিন জগন্নাথদেব। পুনর্যাত্রার দিন ফেরেন মূল মন্দিরে। ফিরেই যে জগন্নাথদেবেরা মূল মন্দিরে প্রবেশ করেন তাও নয়। রথেই তিন দিন অতিবাহিত করেন। তারপর 'পহণ্ডি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বাদশীর দিন মন্দির অভ্যন্তরে রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

তাহলে ত, কি গুণ্ডিচা বাটী, কি জগন্নাথ মন্দির—কোনটিতেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল এই যুক্তি ধোপে টেকে না। ভাবতে মাথাটা টনটন করে উঠে। তাহলে আমার ইতিপূর্বে যারা গবেষণা করেছিলেন, তাঁদের মাথায় কি এ প্রশ্নগুলো দেখা দেয়নি। ভেবে কোন থই পাই না।

অথচ ইতিহাস থেকে জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ পাচ্ছি মহামন্ত্রী বা সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর হত্যা করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবকে। ভারি বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি। একই সঙ্গে শুধু শ্রীচৈতন্যদেব নন অন্যান্য প্রধান পারিষদবর্গকেও তিনি হত্যা করেছিলেন।

ইতিহাস একথাও বলছে—অর্থাৎ 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের' হিষ্ট্রি অফ ওড়িষ্যাতে আছে—কালুআ খাঁয়ের পর কখাড়ুআ খাঁয়ের সঙ্গে রাজা প্রতাপরুদ্রদেবকেও একই সঙ্গে গোবিন্দ বিদ্যাধর হত্যা করেন অত্যন্ত সুকৌশলে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজা হননি। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উৎকলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন 'ভোই রাজবংশে'র। ভোই অর্থাৎ লেখক-কুলসম্ভূত। উড়িষ্যায় এই রাজবংশ ১৮ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

তাহলে কি রথের সময় সংঘটিত হয়নি এই হত্যা লীলা। লোচন দাস বা জয়ানন্দের কাহিনীর মধ্যে কি সত্য এতটুকু নাই। এঁরা দুজনেই ত চৈতন্য বিজয়ের কথা রথের সময়েই বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয় শ্রীচৈতন্যদেব যখন অন্তর্ধান করেন, লোচনের বয়স ছিল তখন কম, কিন্তু জয়ানন্দের বয়স তখন কুড়ি বছর। অতএব

দু'জনকেই চৈতন্য সাময়িক কবি বলা যায়। তবে যখন তাঁরা তাঁদের কাব্য রচনা করেন, তখন হয়ত চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদগণ সম্পর্কে নানা গালগল্প প্রচলিত হয়েছিল। আর কবি দু'জনই যেহেতু বৈষ্ণব ছিলেন, তাই এইসব অলৌকিক কাহিনীগুলি বিশ্বাস করে লিখেছেন তাঁদের গ্রন্থে। এমন হওয়া অসম্ভব নয়।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে 'শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে' দেখছি ঘটনার কোন নির্দিষ্ট সময়ের কথা লেখা নাই। তাতে আছে—

একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া।
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিলা হা-নাথ বলিয়া॥
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল॥
কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং কপাট খুলিল।
গৌরাঙ্গ প্রকট সভে অনুমান কৈলা।

—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ। ২১ অধ্যায়।

কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' সংস্কৃত নাটকের বর্ণনানুযায়ী মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করেছিলেন ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন মহাপ্রভুর বয়স ৪৮ বৎসর নয়, প্রকৃত পক্ষে বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। কৃষ্ণদাস কবিরাজের হিসাব ১৪৫৫ শকাব্দ ঠিক নয়।

ইশান নাগর অদ্বৈতপ্রকাশে যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে একদিন চৈতন্যদেব জগন্নাথকে দেখে হয়ত ভাবাবেশে মন্দিরে প্রবেশ করেন। তখনি ঘটে এই অঘটন। গোবিন্দ বিদ্যাধরের নিয়োজিত পাণ্ডারাই শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেন মহাপ্রভুকে। ঘটনাটি ঘটে মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের অন্য একটি প্রকোষ্ঠে।

সহসা চিন্তাজাল ছিন্ন হলো। দেখি অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সমুদ্রতীরে সান্ধ্য-ভ্রমণকারীরা দল বেঁধে ঘোরাঘুরি করেছেন। আমি উঠে পড়লাম। ধীরে ধীরে মন্থর চরণে ফিরতে লাগলাম বাসার দিকে। হেঁটে চলেছি স্বর্গদ্বারের পথ ধরে।

বাসায় এসে যখন পেঁছিলাম আমার ঘরে আর একটা তালা ঝুলছে। দেখে ভারি আশ্চর্য হোলাম। আমার তালাও লাগান রয়েছে। খোঁজাখুঁজি করলাম মুকুন্দ পাণ্ডাকে। সহজে তাকে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক রকম তাকে ধরেই আনলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আমার ঘরে তুমি আবার তালা লাগালে কেন ?

সে যা বললে তার সারমর্ম হলো। দোষটা আমারই। সারাদিন আমি ছিলাম কোথায়। গতকাল থেকে কথা হয়েছিল সে আমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। দেখিয়ে

দেখে পুরীর দর্শনীয় স্থান। সারাদিনের পারিশ্রমিক বাও দর্শনী চেয়েছিল মাত্র ১০ টাকা। আর যেখানে যে মন্দিরে যা দর্শনী লাগবে তা দিতে হবে আমাকে। পরিবর্তে সে আমাকে খাওয়াবে মহাপ্রভু জগন্নাথের দুপুরের 'ছত্রভোগ'।

জিজ্ঞেস করেছিলাম মুকুন্দ পাণ্ডাকে, ছত্রভোগটা কি জিনিস পণ্ডা ঠাকুর-অ। তা' মুকুন্দ আমায় বলেছিল। সাধারণের পক্ষ থেকে এ ভোগের ব্যবস্থা। বিভিন্ন মঠের প্রদত্ত ভোগও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এতে থাকে অন্ন, ডাল (অড়হর, বিউলি, মুগ, খেসারি, ছোলা। জগন্নাথ কখনো মটর ডাল খান না) মহুরা, বেসর, শাক, অম্বল, মধুরুচি, দহিকড়ি, শাকর, রাইচা, পিতা (তিতো), কমারু সন্তোরা, গোটাবেগুন মরিচ পানি, গাটাকচু-মরিচপানি, বলিবামন-মুগ, খুর্দাপিতা, ফড়ি-শুক্তা ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনের নাম শুনতে শুনতে আমার জিহ্বায় জল এসে গিয়েছিল। বাধা দিয়ে বলেছিলাম, পণ্ডা ঠাকুর, তুমি যে সব ব্যঞ্জনের নাম বলছ, এসবের অনেকগুলোর নাম মু ত বাপের জম্মেও শুনিনি, বলি এগুলোর সোয়াদ কেমন।

না খইলু তু বুঝুবি ক্যা-মনে।

আমি আর কথা বাড়াইনি। আমি শুধু বলেছিলাম, আচ্ছা, সে তখন কালকে দেখা যাবে।

তা আমার অপরাধ হয়েছে, সকাল না হতে হতেই একা একা আমি বেরিয়ে গিয়েছি। তা গিয়েছি ত গিয়েছি। সারা দিনটা আর ফেরারই নাম করিনি। এদিকে মুকুন্দ আমার জন্য বসে রয়েছে ঠায়। গোটা রোজটা নষ্ট হলো তার। 'না' বলে গেলে অন্য যাত্রী ধরত সে। আর না হোক, যেমন তেমন করে ৫০ টা টংকা রোজগার ত করত। এ গুণাগার দিতে হবে আমাকেই।

তারপর আমার অপরাধ শুধু কি এখানেই শেষ। সে নাকি আবিষ্কার করেছে, আমি খোঁজ করছি নদের চৈতন্য ঠাকুর-র সমাজটা কুন্‌ঠি-থানে রউছি। ভীষণ অপরাধ করুছি মু। শ্রীক্ষেত্রর দরশনে আসুছি, জগন্নাথ দরশন করিবুকি চালি যিমু। এতসব তাল্লাসের কিবা দরকার।

এখুনি ঘর ভাড়া আর তার মজুরী মিলে একশ টংকা মিটিকিরি মু চালি যিমু। মুকুন্দের কথা শুনে বললাম আমি। একি কউছি পণ্ডা ঠাকুর। এই রাতে আমি গিয়ে উঠব কোথায়। এ বাড়ি ত তোমার নয়। মহান্তের যাত্রী-নিবাস। অনেকটা ধর্মশালার মত। যা দেওয়ার সে আমি কাল সকালে মহান্তজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকেই দেব। তিনি ত আমায় তিন দিন থাকার অনুমতি দিয়েছেন। এখন তুমি আমায় এমন জবরদস্তি করছ কেন, তা ত বুঝতে পারছি না।

তা মুকুন্দ কোন কথাই শুনতে চায় না। চৈতন্যের সমাধি খুঁজছে যে মানুষ, তাকে কোন মতেই ঠাঁই দেবে না সে এখানে। মহান্তের কানে নাকি গিয়েছে এ সংবাদ। তিনি গিয়েছেন চটে। তাঁর নির্দেশেই ঘরে তালা লাগিয়েছে আমার। এখন কোন কথাই নয়। এখান থেকে আমাকে চলে যেতেই হবে।

এখন বুঝুন ঠেলা। ক্যামনে সামলাই মুকুন্দ পাণ্ডাকে।

এ স্বর্গদ্বার কড়ার আশ্রম নয়। সেখানে আমি যাইনি। উঠেছি মন্দিরের কাছাকাছি একটা সাধারণ যাত্রীশালায়।

অনেক ধস্তাধস্তির পর মুকুন্দকে ২৫ টাকা কবুল করে শান্ত করলাম। তাই বলে মুকুন্দ আমায় রাতের মতও ঠাঁই দিল না ধর্মশালায়। বের করে দিল বাইরে। রাত তখন প্রায় ১০টা। বেরিয়ে এলাম ধর্মশালা থেকে।

পরের দিন অনুসন্ধানের পথ পরিবর্তন করলাম। নিতান্ত সাধারণ ভাবে সাধারণ যাত্রীর মত উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। মনে পড়ল ডাঃ রাও-এর কথা। যিনি দীর্ঘকাল বড়মার প্রতিষ্ঠিত বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন, সে ত ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

আজকে যদি তাঁকে পেতাম, অনেক সুবিধে হোত অনুসন্ধানের। আর একজনের কথাও মনে পড়ছে বিশেষ করে। অসীম কুমার লাহা। তখন সে তরুণ ছিল। অনেক ঘুরেছিল আমার সঙ্গে। পথে পথে বড় মার কবিতা শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখত পথশ্রম। বার বার কানে বাজছে তার কণ্ঠস্বর—

যে ধূলিতে পদধূলি দিলেন চৈতন্য,
কবীর নানক আসি করিলেন বাস,
যে মাটি স্পর্শিলে হয় জাতি কুল ধন্য
মুহূর্তে ঘটায়ে তুলি ভেদ বুদ্ধি নাশ।

হাঁটতে হাঁটতে কখন পৌঁছে গেছি মন্দিরের উত্তর পাশে সে খেয়ালই ছিল না। এইটাইত সেই 'কৈবল্য-বৈকুণ্ঠ'। এখানেই প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর জগন্নাথ বিগ্রহের পূর্ববিগ্রহগণকে দাহ করা হয়। লোকাচার সম্মত হয় সে দাহ। বিশ্বাবসু বংশীয় দয়িতাসেবকগণ সম্পন্ন করেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। জগন্নাথের জন্য দ্বাদশদিন ধারণ করেন অশৌচ। ভোজন করেন স্বপাক হবিষ্যান্ন।

এই কৈবল্য-বৈকুণ্ঠ-ক্ষেত্রেই নাকি শ্রীচৈতন্যদেবকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। শুনেছিলাম ঈশ্বর পাণ্ডার কাছে। ঈশ্বর পাণ্ডা যেতেন আমার বাড়ীতে রথযাত্রার

পূর্বে। কালো লম্বা মাথা কামান। তার মধ্যে একগুচ্ছ টিকি। তার ভাই-এর নাম মুকুন্দ পণ্ডা।

নারকেল ছাড়ানর সূত্র ধরেই গল্পটার আরম্ভ। একটা খোসাশুদ্ধো আস্ত ঝুনো নারকেলকে হাতের কনুইয়ের গুতো মেরেই ছাড়িয়ে ফেলেছিলে ঈশ্বর পণ্ডা। না, কনুই তাতে ছড়ে যায়নি। আমরা সকলেই বাড়ীশুদ্ধো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম—পণ্ডা ঠাকুর, তোমার গায়ে ত অদ্ভুত শক্তি।

ফোকলা দাঁতে হেসে বলেছিল সে—শুধু কি একলা আমার। জগন্নাথর সেবকর সকলের মধ্যে এমুন শক্তি ধরুছি। তা নাহলে তোদের চৈতন্যঠাকুর নিহত হইলু কমনে।

কথাটা শুনে চমকে উঠে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরাই শ্রীচৈতন্যদেবকে মেরেছিলে! কই এমন কথা ত কখনো শুনিনি। ও বলেছিল, বায়া তোরা ওসব বুঝিবু নি। সে কম্ম করেছিল মু পূর্ব পুরুষেরা।

ধমক দিয়ে বলেছিল ঈশ্বর পণ্ডা—এ বায়া বড্ড নেওটা দেখিচ্ছন্তি। সব কথাতে জ্যাঠামো করে। নদীয়া চাঁন্দকু মু কি মারিচ্ছন্তি কউছি। শুনেছি তেনু অঙ্গকু কৈবল্য-বৈকুণ্ঠ অছি, দেওয়া হয়েছে সেখানে সমাধি।

আজকে এখানে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল সেই কথাটাই। খোঁজ করে জেনেছিলাম, এই বৈকুণ্ঠ ক্ষেত্রের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত খনন করা হয়, তারপর আর কোন মতেই নীচে খুঁড়তে দেওয়া হয় না। অনেকের ধারণা, খুঁড়তে গেলেই নাকি বেরিয়ে পড়বে মহাপ্রভুর সমাধি। সব জানাজানি হয়ে যাবে।

আজকে এই মাটিতে দাঁড়িয়ে কি জানি কেন, হৃদয়টা বড়ই হাহাকার করে উঠছে। সত্যই কি সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর পণ্ডারা গোপনে এখানেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে প্রোথিত করে রেখেছে। কেউ জানতে পারল না সে কথা। কোথায়, কোনখানে সেই দীর্ঘবপু ক্ষমাসুন্দর প্রেমের মুরতি আমার শুয়ে আছেন সকলের অজ্ঞাতে।

সহসা কেটে যায় ভাবের ঘোর। মন বলে উঠ—না,—না, এখানে নেই তিনি। তুমি যাকে খুঁজছ, এখানে সমাধি দেওয়া হয় নি তাঁকে। এযে কৈবল্য-বৈকুণ্ঠ ক্ষেত্র। জগন্নাথ মহাপ্রভুর নিজস্ব শ্মশানভূমি। এ ভূমিতে তিনি নেই।

পরক্ষণে অন্য যুক্তি সতেজে ঘা মারে মগজে। কেন সম্ভব নয়। জগন্নাথও দারুময়, শ্রীচৈতন্যও ছিলেন জীবন্ত-জগন্নাথ। দারুময় জগন্নাথের শ্মশানেই সমাধি দেওয়া হয়েছে জীবন্ত-জগন্নাথকে। তার মধ্যে অসম্ভবের কি আছে।

তার্কিক মনটা কোমর বেঁধে তর্ক করতে এগিয়ে আসে। সরবে দৃঢ় প্রতিবাদ

করে বলে—জীবন্ত জগন্নাথ, সে কথা বলেছে কারা। যারা চৈতন্যভক্ত, যারা তাঁকে মনে করত পূর্ণ ব্রহ্ম বলে। তারাই দিয়েছিল 'সচল জগন্নাথ' আখ্যা। তাই বলে গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্র, আর জগন্নাথের পাণ্ডারা কোন দিন মেনে নেয়নি জীবন্ত জগন্নাথ বলে! তাদের কাছে চৈতন্যদেব ছিলেন গোপী প্রেমে মাতোয়ারা, যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত একটা আস্ত উম্মাদ। নিজের বৌকে ছেড়ে মত্ত হয়েছিল পরকীয়া প্রেমে।

গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী তাঁর "বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য" পুস্তকে লিখেছেন—"প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে প্রতাপরুদ্র শেষ জীবনে রাজকার্যে অমনোযোগী হইয়া মহাপ্রভুর সহিত ধর্মচর্চা করাতে তাঁহার রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব ইহাতে রাজ-অমাত্যেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এদিকে জগন্নাথ দেবের পাণ্ডারা দেখিল যে, রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ (অচল) অপেক্ষা মহাপ্রভুকে (সচল জগন্নাথ) অধিকতর সম্মান দিতেছেন এবং মহাপ্রভুর প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং রাজঅমাত্য ও পাণ্ডারা স্থির করিল যে, মহাপ্রভুকে গোপনে হত্যা করিলেই রাজ্যও রক্ষা পায় আর জগন্নাথের প্রতি প্রতাপরুদ্রের ভক্তি ও আকর্ষণ ফিরিয়া আইসে। গুপ্ত হত্যার কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক।'—বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য। পৃষ্ঠা ৩৩৩—৩৪৪।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অতীতে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার প্রতিধ্বনি শুনেছিলাম সেদিন ঈশ্বর পাণ্ডার কাছে। আজ পাণ্ডারা যত বড় চৈতন্যভক্ত হোন না কেন, অতীতে কিন্তু মহাপ্রভুকে ভাল চোখে দেখতে পারেননি কোনদিনই। সেই পাণ্ডারা তাই গুপ্ত হত্যা করে কখনই 'কৈবল্য-বৈকুণ্ঠে' সমাধি দেয়নি।

তাহলে কোথায়, কোন স্থানে শায়িত আছে মহাপ্রভুর পূতদেহ? বার বার প্রশ্ন জাগে মনে। কোথায় গেলে পাব তাঁরে। উদ্দেশ্য বিহীনভাবে মন্থর চরণে এগিয়ে চলি যমেশ্বর তোটার দিকে। পলাং গাছের ছায়া ঘেরা যমেশ্বর তোটা।

তোটা গোপীনাথের মন্দির ত এখানেই। সহসা মনে পড়ল 'ভক্তিরত্নাকরের' দুটি লাইন—

প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাইরে॥ —ভক্তিরত্নাকর

একথা বলেছিলেন গদাধর পণ্ডিতের সেবক অশ্রুপূর্ণ লোচনে আচার্য নরোত্তমকে। আচার্য নরোত্তম এসেছিলেন গৌড় থেকে নীলাচলে। তিনি শুনেছিলেন গৌরাঙ্গ বিজয়ের কথা। তোটা গোপীনাথের মন্দিরে গোপীনাথ বিগ্রহের পাশে তাঁর

পবিত্র দেহকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। এই ইঙ্গিতই করেছিলেন সেদিন গদাধর পণ্ডিতের সেবক।

মন্দিরে গোপীনাথকে দর্শন করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম মহান্তকে : সত্যি কি এখানেই শায়িত আছেন প্রেমাবতার গৌরহরি? মহান্ত বললে—তা ত জানি না। তবে গোপীনাথের জানুতে যে ছিদ্র কাপড় চাপা রয়েছে দেখছেন, ওখান দিয়েই প্রভু অন্তর্ধান করেছেন।

বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম গোপীনাথ বিগ্রহের দিকে। এই বিগ্রহের চূড়া জেগে ছিল বালির মধ্যে যমেশ্বর তোটায়। শ্রীচৈতন্যদেব বালি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছিলেন এই মূর্তি। আর ছিদ্র, ওত মনে হচ্ছে বল্লমের খোঁচা। মূল মূর্তিটি ছিল সম্ভবত জগন্নাথ মন্দিরের অলংকরণ মূর্তি হিসেবে। যবনরাই বল্লমের খোঁচা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছিল। বালির মধ্যে পড়েছিল মূর্তি। সেই মূর্তিকেই পরবর্তীকালে আবিষ্কার করে, দিয়েছিলেন গদাধরের হাতে। সেবা-পূজার দায়িত্ব নিয়েছিলেন গদাধর।

গোপীনাথ বিগ্রহে লীন হওয়ার কাহিনীটি পরবর্তী কালের সংযোজন। সকলেই বলছেন তোটা গোপীনাথে শেষ সময়ে আনা হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবকে। ঈশ্বর দাস ত স্পষ্টই লিখেছেন, কানাঞি খুট্যা আর শিখি মহান্তি গড়ুর স্তম্ভের পিছন থেকে প্রভুর মৃতদেহকে এনেছিলেন তোটায়। তাহলে তোটাতেই সমাধি দেওয়া হয়েছিল সেদিন সকলের অজ্ঞাতে। তা হলে সে কথা কেউ জানলো না কেন?

কিন্তু চৈতন্যের শক্তি গদাধর। গৌরহরির প্রিয় পার্ষদ, তাঁর অবস্থা কি হয়েছিল। নরোত্তম যখন এলেন তোটায়। সে ত চৈতন্য হত্যার কয়েকদিন পরেই। তখন ত ছিলেন না গদাধর। পণ্ডিত গদাধরকেও হত্যা করেছিল আততায়ীরা। তাঁকে তাহলে সমাধি দেওয়া হলো কোথায়?

পণ্ডিত গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ। তখন উপস্থিত ছিলেন শ্রীক্ষেত্রে। তিনিই দিয়েছিলেন গদাধরকে মহাপ্রভুর পাশেই স্থান। প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবের শক্তি প্রিয় পার্ষদ পণ্ডিত গদাধর—দু'জনেই শায়িত আছেন তোটা গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহের পাশেই।

নয়নানন্দ জেঠু গদাধরকে সমাধি দিয়ে চলে এসেছিলেন গৌড়ে। সঙ্গে এনেছিলেন গদাধর পণ্ডিতের স্বহস্ত লিখিত গীতাগ্রন্থ। এই গ্রন্থেরই একটি শ্লোক লিখেছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বহতে। গ্রন্থটি পণ্ডিত গদাধর সর্বদা গলদেশে রাখতেন ঝুলিয়ে। আর সেই সঙ্গে থাকত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ।

আমার পাঠকবৃন্দ হয়ত ভাবছেন, বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখছি। গল্প করে লিখলেও মিথ্যে বলিনি। পুঁথির প্রমাণ দিয়ে লাইন কটি তুলে দিচ্ছি—

পণ্ডিত গোঁসাই প্রভুর অপ্রকট সময়।
নয়নানন্দেরে ডাকি এই কথা কয়॥
মোর গলদেশে থাকিত এই কৃষ্ণ মূর্তি।
সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি॥
তোমায় অর্পিলা এ শ্রীগোপীনাথের সেবা।
ভক্তিভাবে সেবিবে না পূজিবে অন্য দেবী দেবা॥
স্বহস্তে লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা।
মহাপ্রভু এক শ্লোক ইহাতে লিখিলা॥
ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন।
এত কহি পণ্ডিত গোঁসাঞি হৈলা অদর্শন॥

* * * *

নয়ন পণ্ডিত গোঁসাঞির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি।
রাঢ়দেশে ভরতপুরে করিলেন বাড়ী॥

—শ্রীপ্রেমবিলাস। ২২ বিলাস।

সেই গীতা গ্রন্থ—যাতে লেখা আছে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীহস্ত লিখিত একটি শ্লোক, আর পণ্ডিত গদাধরের মুক্তার হস্তাক্ষর। তা এই দীর্ঘ সাড়ে চারশ বছর ধরে রক্ষিত আছে ভরতপুরে। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমায় ভরতপুরে। নয়নানন্দের শ্রীপাট নামে খ্যাত। এস্থানে যেতে হলে ব্যাণ্ডেল—বারহারওয়া রেলপথে নামতে হবে সালার স্টেশনে। ওখান থেকে আট মাইল দূরে 'নয়নানন্দের শ্রীপাট।' গদাধরের স্বহস্ত লিখিত গীতার একটি আলোকচিত্র বরানগর পাঠবাড়ীতেও আছে।

এরপর কি প্রশ্ন করবেন,—তাহলে কি তোটা গোপীনাথেই শায়িত আছেন শ্রীচৈতন্যদেব আর তাঁর শক্তি গদাধর?

আমি কিন্তু বলব, বিশ্বাস করি না। করতে পারি না। সমাধি স্থানের রহস্য ভেদ করতে হলে চাই উৎখনন। কিন্তু ভক্তের পক্ষে সে কার্য করা কি কখনো সম্ভব। অতএব ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ তথ্যানুসন্ধান সেখানে হার মানতে বাধ্য। আর শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের মত তাঁর সমাধির রহস্যও রইল আজো রহস্যাবৃত।*

*এই সংস্করণে শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধি-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রমাণাদি সং শেষের নতুন অধ্যায়গুলিতে যুক্ত হয়েছে।

॥ পনের ॥



তিরোভাব

যাঁরা মহাপ্রভুর তিরোধানে বিশ্বাসী নন অর্থাৎ যাঁরা বলেন তিনি তোটা গোপী-নাথের মন্দির থেকে সমাধিভঙ্গের পর ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন নীলাচল থেকে —তাঁরা যে সব তথ্য-প্রমাণ হাজির করেছেন, তাছাড়াও আর একটি প্রশ্ন আমার কাছে রেখেছেন। প্রশ্নটি গুরুতর না হলেও বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

প্রশ্নটি হলো গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাব-তিথি পালন করেন না কেন? যদি বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করেই থাকেন মহাপ্রভু জগন্নাথের দারুময় অঙ্গে লীন হয়ে গিয়েছেন, তাহলে সেই লীন হওয়ার তারিখ বা সময় সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য জীবনী-গ্রন্থে কেন উল্লেখ নাই।

অতএব যখন কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি, তখন একথাই কি প্রমাণ করে না যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাও বিশ্বাস করেন না তিনি অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব কবে কোথায় কিভাবে তিরোহিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা উল্লেখ না করলেও একথা মনে জানতেন। সত্যি সত্যি তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং এই পলায়নের পর মহাপ্রভু এমনভাবে আত্মগোপন করেছিলেন সে কথা তৎকালের বৈষ্ণব বা শুদ্ধ চৈতন্য-পার্ষদগণ কেন— কেউই জানতেন না তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন।

অতএব তৎকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করেও সহজেই অনুমান করা যায়, উৎকলে তাঁর শত্রু ছিল। একথা জানতে পেরেই তিনি সকলের অজ্ঞাতে নিশ্চয়ই কোথাও পালিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মহাপ্রভুর তিরোধান তিথি পালন করেন না কেন? সাধারণত প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে জয়ন্তী উৎসব পালন করার রীতি। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমীই পালিত হয়। তিরোধান তিথি পালনের বৈধতা স্বীকৃত হয়নি। কারণ, একজন অবতার বা মহাপুরুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশ্বাস করি নব যুগের সূচনা হয়। অতএব সেই শুভ যুগারম্ভের দিনটিই আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু মহাপ্রয়াণ সেই তুলনায় ততখানি শুভ কাল-জ্ঞাপক নয়। বরং হয় যুগের অবসান। তাই আমরা তিরোধান তিথি পালন করি না।

তবে এই বিংশ শতাব্দীতে তিরোভাব তিথি পালন করার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন যেমন পালন করা হয় মৃত্যুদিনও তেমন পালন করা হচ্ছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, অন্যান্য মহাপুরুষগণের মৃত্যুদিনও পালিত হয়। ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে পূর্বপুরুষগণের তর্পণ-বিধি প্রচলিত আছে হিন্দুগণ অবশ্য এখনো পার্বণী শ্রাদ্ধ করেন।

অনুরূপ ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অবশ্য শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব-তিথি পালন করেন না। তিরোভাব সম্পর্কে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্ট বলেছেন ১৪৫৫ শকাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি অন্তর্ধান করেছেন। এত স্পষ্ট করে আর কোন চরিতকার উল্লেখ করেন নি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই শকাব্দ ও বয়স সম্পর্কে গুরুতর সংশয়ের অবকাশ আছে। মহাপ্রভুর তিরোভাব তিথি পরিপালিত না হলেও তিরোভাবের কাল—

তথা দৃষ্টবা যাত্রা ব্যনয়দখিলং বিংশতিসমাঃ ॥

ইত্থং চত্বারিংশতা সপ্তভাজা শ্রীগৌরাঙ্গো হায়নানাং ক্রমেণ।

নানালীলানাস্যমসাদ্য ভুমৌ ক্রীড়ন্ ধাম স্বং ততোঽসৌ জগাম ॥

(২০ সর্গ, ৪০—৪১ শ্লোক)

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার এই বিরোধের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন তাঁর চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থে। (পৃষ্ঠা ২৩)। তাঁর মতে সূক্ষ্ম-হিসাবে মহাপ্রভুর জীবন কাল ৪৭ বৎসর ১৩০ দিন। এই সময়কে কবিকর্ণপুর ৪৭ এবং কৃষ্ণদাস ৪৮ বৎসর ধরিয়াছেন।'

এই গণনা ডঃ মজুমদার মহাশয় সৌরমানে করেছেন। কিন্তু বয়স গণনা সৌরমানে বিচার করা হয় না। 'সাবন' মানে গণনা করা বিধেয়! অর্থাৎ ৩০ দিনে মাস ধরে গণনা করতে হয়। এ সম্পর্কে রঘুনন্দন সম্পাদিত গার্গ্যের একটি বচন ঃ

আয়ুর্দায়বিভাগশ্চ প্রায়শ্চিত্তক্রিয়াস্তথা।

সাবনেন তু কর্তব্যা মন্ত্রণমপ্যুপাসনা ॥

এই সাবন মতানুসারে ১৪৫৫ শকাব্দের ৩১ আষাঢ় মহাপ্রভুর বয়স হয় ৪৮ বৎসর পূর্ণ হয়ে ১৬—১৭ দিন। এই হিসাব অনুসারে কোন মতেই ৪৭ বৎসর ধরা যায় না। সুতরাং কবিকর্ণপুরের মতে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান হয় এক বৎসর পূর্বে ১৪৫৪ শকাব্দে। কিন্তু গণনায় পাওয়া যাচ্ছে ১৪৫৪ শকাব্দের ১৩ই আষাঢ় (৯ই জুন ১৫৩২ খ্রীঃ) শুক্লা সপ্তমী ৫২।২ পল পর্যন্ত ছিল এবং সেদিন রবিবার ছিল। তাহলে সাবন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৎকালে মহাপ্রভুর বয়স ছিল ৭ দিন কম ৪৭ বৎসর।

এই গণনা অনুসারে দেখা যাচ্ছে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের গণনায় ভুল আছে। মহাপ্রভু যে ঠিক ঐদিনই অন্তর্ধান করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ। কারণ, কবিকর্ণপুরের পক্ষে শকাব্দটি ভুল হওয়া অসম্ভব। যে বৎসর শ্রীচৈতন্যদেব অন্তর্ধান করে, সেই বৎসরই কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুকে প্রথম দেখেন এবং কবিকর্ণপুর প্রভুর উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ ভক্ষণ করে অপূর্ব কবিত্বশক্তি লাভ করে 'আর্যাশতক' রচনা করেন। সে কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই অপূর্ব কবিত্বশক্তির তুলনা জগতের সারস্বত ইতিহাসে দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

কবিকর্ণপুর বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। এই নাটকের শেষে মহাপ্রভুর এই অলৌকিক শক্তিসঞ্চারের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন :

'যস্যোচ্ছিষ্টপ্রসাদাদয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী।'

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শেষ দশম অঙ্কে মহাপ্রভুর জীবনের সর্বশেষ বৎসরের ঘটনাবলীই চিত্রিত হয়েছে ধরে নিতে হবে এই জন্য যে—সমাপ্তিতে অদ্বৈতাচার্যের প্রার্থনাদ্বয় তা হলেই সঙ্গত ও সার্থক হয়।

তাঁর প্রথম প্রার্থনা :

সম্যক্‌ভাবে নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ বিচার করে দেখা দরকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই স্পষ্ট উক্তি কতখানি ধোপে টেকে।

সুবিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণদাস ছাড়া এই শকাব্দের উল্লেখ আর কেউ করেননি। লোচন দাসের মতে 'আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে—রবিবার দিনে' মহাপ্রভুর অন্তর্ধান হয়। এদিকে জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে দেখছি :

'আশাঢ় শপ্তমী শুক্লা আঙ্গীরা করি।'

*   *   *   *

আশাঢ় বঞ্চিতা রথ বিজয় নাচেতে।
ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে॥

*   *   *   *

'চরনে বেদনা বড় শষ্ঠী দিবসে।'

—এসিয়াটিক সোসাইটির ১০৯৬ বঙ্গাব্দের পুঁথি, ১৪৬ পত্র।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি, এখনো বলছি তিথি সম্পর্কে লোচন ও জয়ানন্দ একমত। আমার পূর্ববর্তী গবেষকগণ এতে কোন সংশয় প্রকাশ করেন না। প্রচলিত মতানুসারে ১৪৫৫ শকাব্দে ৩১ শে আষাঢ় শুক্লাসপ্তমী রবিবার; ইংরাজী ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ ২৯শে জুন মহাপ্রভুর তিরোভাব হয়। (ফণিভূষণ দত্ত রচিত 'চৈতন্যজাতক', পৃ ১৮)

কিন্তু ঐদিন তিথি সপ্তমী ছিল না—ছিল অষ্টমী। না দেখলেও শুনেছি পুরাতন 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় গণনা করে নির্ণয় করা হয়েছিল অষ্টমী তিথি বলে। এ ছাড়া স্বর্গীয় অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় 'পল্লীবাসী' পত্রিকায় এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অষ্টমী তিথিতেই মহাপ্রভুর অন্তর্ধান নির্ণয় করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর মতে একজনের পরিত্যাগ গণনার ফলে আবশ্যক হওয়ায় লোচন ও জয়ানন্দ উভয়ের সম্মত তিথি পরিত্যাগ করে একক লোচনের প্রদত্ত বারই গ্রহণীয়।

আমাদের গণনানুসারে ১৪৫৫ শকাব্দ ৩০শে আষাঢ় শনিবার শুক্লা সপ্তমী ৫১।৪৮ পল পর্যন্ত ছিল (২৮ জুন, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)

এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আর একটি সম্ভাবিত কল্প সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তা এতদিন বোধ হয় কারো নজরে পড়েনি। বার ও তিথি যে নির্ভুল এই গণনা ঠিক কি না তা গণনা করতে গিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গণনায় এক বৎসরের ভুল হয়েছে কিনা তাহাও ভালভাবে বিচার করা আবশ্যক। কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার ৭০ বছর পূর্বে ১৪৬৪ শকাব্দে (১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে) রচনা করেছিলেন 'কবিকর্ণপুর' চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য। এই মহাকাব্যে কবিকর্ণপুর স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন, ৪৭ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করেন। যথা :

চতুর্বিংশে তাবৎ প্রকটিত নিজ প্রেমবিবশঃ
প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত নবদ্বীপতলতঃ।
ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো ইতো যন্নগময়ৎ

'এভিঃ সমস্তৈস্তব দেব লোকৈঃ, লোকান্তরেঽপ্যস্তু সহৈব বাসঃ।'

অর্থাৎ লোকান্তরেও যেন এই সমস্ত পরিকর সহ আমাদের একত্র বাস হয়। আর অদ্বৈতচার্যের দ্বিতীয় প্রার্থনা হলো :

'নিজেচ্ছয়া প্রাপয় যদ্যদেব,
স্থলান্তরং বা বপুরন্তরং বা।
তবৈদাশ্চর্য চরিত্রমেব
জাতিস্মরা এব চিরং স্মরাম॥'

অর্থাৎ—তোমার ইচ্ছাতে আমাদের যে কোন ধাম বা শরীর প্রাপ্তি হউক না কেন, আমরা জাতিস্মর হইয়া যেন তোমার এই আশ্চর্য লীলা স্মরণ করি।

নাটকের দশমাঙ্কে বর্ণিত ঘটনাবলী যে ঠিক ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দেই ঘটেছিল, তার পূর্বেও নয় পরেও নয়, তার একটি অকাট্য প্রমাণ কবিকর্ণপুর অজ্ঞাতসারে লিপিবদ্ধ করেছেন, এতদিন বোধহয় সেদিকে কারো দৃষ্টি পড়েনি। রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের

একটি উক্তি থেকে জানা যায়, ঐ বৎসর 'মহাজ্যৈষ্ঠী' নামক অতিদুর্লভ এক পুণ্যযোগ সংঘটিত হয়েছিল। নাটক থেকে প্রতাপরুদ্রের উক্তিটি যথা-যথ উদ্ধৃত করছি ঃ

রাজা—পশ্য, পশ্য মহদিদমাশ্চর্যং,
মহাজ্যৈষ্ঠীযোগে ভবতি ভগবদ্দেবকুলগা,
পতাকোদঞ্চন্তীত্যতিস্থবিদিতোঽয়ং জনরবঃ।

পুণ্যতিথি 'মহাজৈষ্ঠী' যোগে পুরীর মন্দিরের পতাকা উড্ডীয়মান হয়। স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে এই পুণ্যতিথি কেবলমাত্র পুরীধামেই পুরুষোত্তমের মন্দিরেই পালন করা হয়।

মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের কৃত্যচিন্তামণি গ্রন্থ থেকে একটি শ্লোক বা বচন উদ্ধৃত করছি ঃ

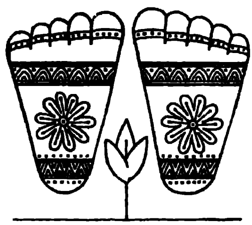
মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং নরো দৃষ্টবা
প্রযতঃ পুরুষোত্তমঃ।
উর্দ্ধধ্বজাংশুকং সর্ব্বান্
পিতৃংস্তারয়তে ধ্রুবম্ ॥

তিথিতত্ত্বে মহাজ্যৈষ্ঠীপদের পাঁচ রকম ব্যাখ্যা রঘুনন্দন করেছেন। এই পঞ্চ-ব্যাখ্যার অন্যতম ব্যাখ্যা গ্রহণ করে দেখা যাচ্ছে মহাপ্রভু যে কয়েক বছর নীলাচলে অবস্থান করেছিলেন তার মধ্যে দু'বার মাত্র এই যোগ সংঘটিত হয়েছিল বলে গণনায় পাওয়া যায়—

১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে ২১ মে (২৪ জ্যৈষ্ঠ, পূর্ণিমা ২৬।৩০ পল, জ্যেষ্ঠা অহোরাত্র, রবি রোহিনীনক্ষত্রে এবং বৃহস্পতি মূলানক্ষত্রে-তিথিতত্ত্বের সর্বশেষ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ মে (২১ জ্যৈষ্ঠ, পূর্ণিমা ৪।২৯ পলের পর অহোরাত্র, অনুরাধা ৪৫।১ পল, রবি রোহিনীতে, বৃহস্পতি অনুরাধায়—তিথিতত্ত্বর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য, দশমাঙ্কে ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দের নিশ্চিতই বর্ণিত হয়নি। সুতরাং ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দেই মহাপ্রভুর অন্তর্ধান প্রমাণিত হচ্ছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিত-বৎসরের এক বৎসর পূর্বে। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক দশমাঙ্কের সর্বশেষ ঘটনা মহাপ্রভুর মৃত্যু। জয়ানন্দের মতে, ঠিক পরদিন ষষ্ঠী-দিবসে 'চরণে বেদনা বড়' এবং সপ্তমীতে অন্তর্ধান। কৃষ্ণদাস লিখিত শকাব্দ ঠিক হলে এক বৎসর পূর্বের হোরাপঞ্চমীতে সমাপ্তিরেখা অঙ্কিত করার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয়

না। অতএব দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে স্পষ্ট করে যা লিখেছেন, সেই ১৪৫৫ শকাব্দ ঠিক নয়। এতেও ভুল আছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'কে আমরা যে প্রামান্য বলে মনে করি তাতেও গোলযোগ আছে। যেখানে এত সমস্যা সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোভাব দিবস পালন করা সম্ভব নয়। যাঁরা মহাপ্রভুর তিরোধান দিবস পালন করতে চান, তাঁরা কিভাবে পালন করবেন নিজেরাই স্থির করুন।



দ্বিতীয় খণ্ড

॥এক॥



তথ্যানুসন্ধানে আবার পুরী

পুরীতে এলাম আবার। এবার এসে উঠেছি ভারত সেবাশ্রম সংঘে। স্বর্গদ্বারে। একেবারে সমুদ্রের কাছেই। তখনো চলছে দেশে দুর্যোগ। একটানা ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে যা আরম্ভ হয়েছে, থামছে না কিছুতেই।

১লা অক্টোবর, বুধবার। যখন নাবলাম পুরী স্টেশনে, রাত তখন সাড়ে আটটা। নীলাচল এক্সপ্রেস লেট করে এসেছিল খড়্গপুরে প্রায় তিন ঘণ্টা। তাই এই ভোগান্তি। সারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি পড়ছে টিপ্‌টিপ্‌ করে। বেশ বুঝতে পারলাম, দুর্যোগ চলছে পুরীতেও। ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না কোথায় গিয়ে উঠব। পথের সাথী। ট্রেনেই আলাপ। নাম কিশোর কুমার পাণ্ডা। ও বললে—চলুন এক রিক্সাতেই উঠি। যা থাকে কপালে। যাব ভারত সেবাশ্রম সংঘে।

আমি আর দ্বিরুক্তি করিনি। পরিস্থিতি যা ঘটে ঘটুক। অত ভাবনা চিন্তা করে কি আর হবে। তা স্থান পেলাম ভারত সেবাশ্রম সংঘেই। তাও এক রাতের জন্য। এখন যা পেয়েছি সেই ভাল। এই দুর্যোগের মধ্যে এত রাতে কোথায় আর যাব। মহারাজ বললেন—আপনারা ব্যাগগুলো রেখে খেয়ে আসুন হোটেলে। থাকার বন্দোবস্ত আমি করছি।

হোটেল থেকে ফিরে আসতেই আশ্রমের এক 'দাঁড়ি বাবা' আমাদের নিয়ে চললেন সোজা তিন তলায়। আলো, পায়খানা, বাতরুম সবই কাছে। দেখলাম, যা জুটেছে কপালে নিতান্ত মন্দ নয়। রাতটা অন্ততঃ আরাম করে থাকা যাবে। তারপর কালকে তখন যা হোক একটা আস্তানা খুঁজে পেতে নিলেই চলবে। একটা পুরো ঘর দু'জনের দখলে। দু'টো বিছানা করে শুয়ে পড়লাম দু'জনে।

একটু পরেই শুনতে পেলাম কিশোর কুমারের নাসিকা ধ্বনি। শব্দ শুনেই বুঝতে পারলাম, পরিশ্রান্ত কিশোর গভীর ঘুমে অভিভূত। আমার চোখে ঘুম কিন্তু আসছে না কিছুতেই। চিন্তাগুলো একের পর এক আসছে যেন ভিড় করে। মনের আঙিনায়

চিৎকার আর হৈ-হুল্লোড় তুলে তারা যেন বিরক্ত করছে অসম্ভব রকমে। শুধু পাশ ফিরছি। এপাশ আর ওপাশ। কিছুতেই পারছি না স্থির থাকতে।

এ দুর্যোগ বুঝি থামবে না কিছুতেই। কাল থেকে কাজ আরম্ভ করব কেমন করে। সঙ্গে ছাতাও নাই। রিক্সো করে এত ঘোরাঘুরি করা সম্ভবই নয়। তাছাড়া সব জায়গায় রিক্সাকে ভরসা করলে কোন কাজই হবে না। বনে জঙ্গলে হেথায় হোথায় খুঁজে খুঁজে চালাতে হবে আমায় অনুসন্ধান। তাছাড়া বালিয়াড়ির উপর দিয়ে রিক্সা চলবেই বা কেমন করে।

কিন্তু কোথায় যাব আগে। স্টেট্সের সেই বৃদ্ধ অধ্যাপক প্রভুজী। যিনি নাকি আবিষ্কার করেছেন রায়রামানন্দের সেই চিঠি রাজমাহেন্দ্রীর পুরানো মহাফেজখানা থেকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে লিখেছিলেন রায়রামানন্দ। নাকি হুঁসিয়ার করে দিয়েছিলেন মহাপ্রভুকে। সাবধান, আপনার অন্তরঙ্গ পার্ষদই যোগ দিয়েছে গোবিন্দ বিদ্যাধরের দলে।

কে সে অন্তরঙ্গ পার্ষদ? কি তার নাম? কি লিখেছিলেন রামানন্দ? বার বার প্রশ্নগুলো যেন তোলপাড় করে উঠছে। ইচ্ছে করছে এই রাতের অন্ধকারেই ছুটে যাই প্রভুজীর কাছে।

ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়। তিনি ত রয়েছেন দীর্ঘদিন পুরীতে। বলতে গেলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন পুরীতেই। তাঁর মায়ের কাছে। আনন্দময়ীর আশ্রমে। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে গবেষণা করছেন দীর্ঘদিন ধরে। কাল সকালে খুঁজে বের করব তাঁকেই। জিজ্ঞেস করব, 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বেরুবে কবে?

মন যেন বলে উঠল, তার চেয়ে আগে যাও জগন্নাথ মন্দিরে। খুঁজে দেখ মহাপ্রভুর পদচিহ্ন। মাপ নাও, সত্যি ষোল ইঞ্চি কিনা পায়ের মাপ। কিংবা যাও না গুণ্ডিচাবাটীতে। সেখানে অঙ্কিত আছে প্রভুর পদচিহ্ন। হয়ত পেয়ে যাবে মহাপ্রভুর সমাধি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ওখানেই ত মহাপ্রভুর গুপ্ত সমাধি আছে বলে সন্দেহ করেছিলেন। বৃষ্টি হলেও ওখানে ত যাওয়া যাবে রিক্সো করে।

কিংবা খোঁজ বিখ্যাত গবেষক পদ্মশ্রী পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মাকে। তিনিই ত আবিষ্কার করেছিলেন দীন বৈষ্ণব দাসের 'চৈতন্য চক্ড়া।' এ খবর ত তুমি পেয়েছ ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বই থেকে। দেখো না পণ্ডিতজীকে হয়ত এখন পেয়ে যেতে পার পুরীতেই। তাঁর কাছে গেলেই অন্যান্য অনেক খবরই তুমি পাবে।

পরক্ষণে মন বলে উঠে তোটা গোপীনাথের মন্দিরে গিয়ে দর্শন করো গোপীনাথের শ্রীমূর্তি। দেখো ভাল করে শ্রীবিগ্রহ। মূর্তিটির গঠন দেখলেই ত তুমি বুঝতে পারবে, মূর্তিটি কতদিন আগে নির্মিত হয়েছিল। অলংকরণ স্থাপত্য-শৈলী, করমুদ্রা, দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা সবই ত দেখতে পারবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তুমি সিদ্ধান্ত করেছিলে আসলে মূর্তিটি এক কালে ছিল জগন্নাথ মন্দিরের বড় দেউলের গাত্রে। যবন আক্রমণের ফলে মন্দির গাত্র থেকে হয়েছিল বিচ্যুত। দীর্ঘকাল পড়েছিল বালিচাপা হয়ে। বালি খুঁড়ে উদ্ধার করেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। পণ্ডিত গদাধরকে দিয়েছিলেন শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজার ভার। দ্যাখো না, সব কিছু যাচাই করে।

খুঁজে পেতে দ্যাখো ভাল করে, মন্দিরে কোন প্রাচীন পুঁথিপত্র আছে কিনা। হয়ত তাতেই পেয়ে যাবে তোমার শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের সন্ধান। কিংবা তুমি যে বলেছিলে, তোটা গোপীনাথেই সমাধিস্থ করা হয়েছে মহাপ্রভুকে। সেই সমাধির সত্যি আজো কোন চিহ্ন আছে কিনা—দ্যাখো না খুঁজে পেতে। কর না অনুসন্ধান —পুরীতে বৈষ্ণব মহান্তদের সমাধি মন্দিরগুলি। কেমনভাবে দেওয়া হতো সমাধি। দেখবে, ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, কেমন সমাধির গঠন। তা' হলেই ত অনেকটা উপলব্ধি করতে পারবে। তখন হয়ত তোমার খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না, তোটা গোপীনাথে কোথায় আছে মহাপ্রভুর সমাধি। হয়ত একান্ত অজ্ঞাত, অখ্যাত সে সমাধি আজো নিতান্ত অবহেলিত হয়ে কোথাও নিশ্চয়ই টিকে আছে। কেউ না জানলেও নিশ্চয় তোমার মন বলে দেবে, দেখিয়ে দেবে চোখকে। তুমি যে উন্মাদ হয়ে উঠেছ, চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান করতে। তোমার অন্তরের ব্যাকুলতাই দেখিয়ে দেবে তোমাকে পথ।

'ভক্তিরত্নাকরে'র ইঙ্গিত ত তুমি প্রায় ধরে ফেলেছ। গদাধরের সেবক নরোত্তমকে দেখিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন না—

ওহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি।
না জানি কি পণ্ডিতে কহিলা ধীরি ধীরি॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥' —ভক্তিরত্নাকর।

এই 'পদ' থেকে কি বুঝতে পারছ না, মহাপ্রভুর সমাধি তোটা গোপীনাথের সন্নিকটে কোথাও রয়েছে। বার বার ত তুমি ছুটে আসছ এখানে। ফিরে যাচ্ছ হতাশ হয়ে। অধ্যবসায়ী তুমি। ধৈর্য্য ধরে অনুসন্ধান কর। হয়ত এবার তোমায় নিরাশ হতে হবে না।

এখানে নানা মানসিক যন্ত্রনায় মাথা যেন কেমন টন্‌টন্ করে উঠে। চোখে ঘুম আসে না কিছুতেই। বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব চলে বেড়েই। সমুদ্রের গর্জন বন্ধ কপাট ভেদ করে কানের পর্দায় এসে ধাক্কা মারে। কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠি। কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারি না শয্যায়।

উঠে বসি বিছানায়। বসি পদ্মাসন করে ধ্যানে। প্রাণায়ামে মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করি। অবাধ্য মন বাঁধ মানে না কিছুতেই। চিন্তাগুলো কেমন যেন কুরে কুরে ক্ষত-বিক্ষত করে আমাকে। বার বার মনে হয়, এই দেশে ওড়িয়া কোন না কোন পুঁথিতে নিশ্চয়ই কেউ নয় কেউ লিখে রেখে গিয়েছেন মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্যের কথা। এখনো ঠিক ঠিক খুঁজে যেতে পারিনি আমি যথাস্থানে। হয়ত নিশ্চয়ই এই উৎকলেরই কোথাও না কোথাও লোকচক্ষুর অন্তরালে কারো মন্দিরে কিংবা কোন বিগ্রহের পাশে আজো পূজিত হচ্ছে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের সেই বিস্ময়কর সাড়া জাগানো অজ্ঞাত কাহিনী।

হয়ত সারা জীবন আমার খুঁজে খুঁজে সারা হবে। আমি যেতে পারব না সেই সুদুর্গম নিভৃত পল্লীতে। কিংবা কাটদষ্ট হয়ে ভুর্জপত্রের সেই পুঁথির অবস্থা এখন জীর্ণ। কোন মতেই পাঠোদ্ধার করা যাবে না তার। এমন অনেক পুঁথিই ত আমি পেয়েছি। কাটদষ্ট, সম্পূর্ণ দুষ্পাঠ্য। প্রাচীন ওড়িয়া করণী লিপি। পাঠ করা যায় না কিছুতেই।

ভাবতে ভাবতে কেমন যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়ি। প্রাণায়াম আর হয় না। শুয়ে পড়ি শয্যায়। চোখ দুটো বন্ধ করে কুটস্থচৈতন্যে চেষ্টা করি মনকে স্থির করতে।

॥ দুই ॥



অনুসন্ধানঃ মন্দিরে মন্দিরে

ভোর রাতে একটু যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ধড়মড় করে উঠে পড়লাম কিশোরের ডাকে। 'চলুন ঘুরে আসি সমুদ্র-সৈকতে।' কপাট খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম আকাশের মুখ তখনো যেন কেমন গোমরা হয়ে আছে। বৃষ্টি তবে পড়ছে না। উঠে পড়লাম।

দুজনে এলাম সমুদ্রের সান্নিধ্যে। অসীম, অনন্ত জলধি রাশি। ছুটে আসছে ভীম গর্জনে। ফেঁপে ফুঁলে আছড়ে পড়ছে সিকতাময় সৈকতে। অবাধ্য অশ্রান্ত। বিরাম বিহীন। অবিরাম এই যে গর্জন, তীরভূমিতে এই যে ভীম চপেটাঘাত, সমুদ্রের এই আক্রোশ কার উপরে, কিসের জন্য!

ভাবতে ভাবতে কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। অগণিত নর-নারী, তরুণ, কিশোর করছে সমুদ্র-স্নান। ঢেউ-এর মাথায় চেপে দোল খাচ্ছে ভারী আনন্দে। আবার অনেকে ভয়ে নামতেই চাইছে না। নুলিয়াদের সাহায্যে করছে স্নান। আমরা চলেছি হেঁটে হেঁটে। সমুদ্রের তীরে তীরে সোজা পশ্চিমে। যেখানে বাতাসে ঘুরছে বিরাট বিরাট দৈত্যাকৃতি হুইলগুলো—সে পর্যন্ত।

আশ্রমে যখন ফিরলাম, অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছে। স্মরণাপন্ন হোলাম স্বামীজীর। কোথায় আর যাব। তিন দিনের মত আশ্রয় দেন আপনার আশ্রমে। সহজেই মঞ্জুর করলেন আমাদের আবেদন। মনে মনে ভারী খুসি হোলাম। আপাততঃ তিন দিনের জন্য নিশ্চিন্ত। এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা ঠাঁই করে নেব কোথাও; কিংবা যদি দুর্যোগ চলতে থাকে সমানে তাহলে ত অগত্যা ফিরতেই হবে।

আশ্রমের খাতায় নাম ধাম লিখে নিলেন অন্য একজন ব্রহ্মচারী। আমি সই করলাম খাতায়। 'আইডেন্টিটি কার্ড' পেলাম। নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য পেলাম একটা বালতি। যাওয়ার সময় এগুলি জমা দিয়ে যেতে হবে।

নিশ্চিন্ত এবারে। দেখলাম অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে আকাশ। দেখে মনে হল হয়ত রোদ উঠবে। আনন্দে দু'জনে চললাম সমুদ্র-স্নানে।

যখন ফিরে এলাম, রোদ বেশ উঠে পড়েছে। মনটা ভরে উঠল আনন্দে। তর যেন আর সইছিল না। কোন রকমে বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়। কিশোরের পথ আর আমার পথ এক নয়। ও এসেছে বেড়াতে। স্নান করে কোথায় যেন যাবে। আমি একা একা বেরিয়ে পড়ব আমার কাজে।

তাই বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ডবল চাবি ছিল আমার কাছেই। ওকে একটা দিয়ে সাইড ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি, অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম মহারাজকে। আনন্দময়ীর আশ্রমটা কোন দিকে।

মহারাজ বললেন—ওইত সমুদ্রের দিকে। শ্মশানের পরেই।

আনন্দময়ীর আশ্রম খুঁজে পেলাম সহজেই। ঢুকে পড়লাম গেটের ভিতরে। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের খোঁজ করতেই বেরিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধা। প্রণাম জানিয়ে বললাম আমার আগমনের উদ্দেশ্য।

উনি বেশ মিষ্টি করে বললেন—'জয়দেব আশ্রমেই আছে। তবে বাবা, তার সঙ্গে ত তোমার দেখা হবে না। আর দেখা করলেও সে ত ও সম্পর্কে কিছু বলবেই না। দু'মাস হলো মৌনব্রত অবলম্বন করে আছে সে। অনেকেই মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে পত্র দিয়েছে ওকে। ও কাউকেই কিছু বলছে না।'

ও'র 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' বই-এর দ্বিতীয় খণ্ড কি ছাপা হচ্ছে ?

না-না-বাবা। ছাপা হবে কেমন করে। বই লেখা ওর এখন শেষই হয়নি। তবে ও লিখছে। বইও বেরুবে। তুমি যা জানতে চাইছ, তখনই সব জানতে পারবে। এখন ত ও কোনমতেই মুখ খুলবে না। কাউকে কিছু বলবেও না।

আমি হতাশ হয়ে বললাম, তাহলে ও'র সঙ্গে দেখা করা যাবে না ?

তুমি দুঃখ করো না বাবা। আমি ত ওর মা। ওর ব্রত আমি মা হয়ে ভাঙ্গতে বলি কেমন করে। বুঝতে পারছি, তুমি এসেছ অনেক দূর থেকে। কিন্তু কি করব, ওযে দেখা করছে না কারো সঙ্গে।

বললাম—কবে বেরুবে ও'র দ্বিতীয় খণ্ড ?

উনি মৃদু হেসে শান্তভাবে বললেন—তাও ত বলতে পারব না বাবা। তবে এইটুকু বলতে পারি বই ওর বেরুবে। ও আরো তথ্য সংগ্রহ করছে। আমার ছেলে, যা তা তো সে লিখতে পারবে না।

পুত্র গর্বে গর্বিত মাতা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাকিয়ে রইলেন আমার

দিকে। আমি ভাবলাম, এখানে বৃথা সময় নষ্ট করে কি আর হবে। আবার প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম গেট দিয়ে।

এখন কি করি। কোন দিকে যাই।

ভেবে কিছু যেন ঠিক করতে পারছি না। পায়ে পায়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ধরলাম জগন্নাথ মন্দিরের পথ। চলছি হেঁটে হেঁটেই। বেশ কিছুটা হাঁটার পর, ডাইনে চোখে পড়ল সিদ্ধ বকুল মঠে যাওয়ার পথ নির্দেশ। ঢুকে পড়লাম গলিপথে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোথায় সিদ্ধ বকুল। শুধিয়ে শুধিয়ে অবশেষে খুঁজে পেলাম সিদ্ধ বকুল মঠের গেট। ঢুকে পড়লাম। বামে একটা ছোট মন্দির। সামনে বকুল গাছ।

এখানেই থাকতেন ঠাকুর হরিদাস।

গৌড়দেশ থেকে গৌর পার্ষদবর্গ সকলেই উপনীত হয়েছেন মহাপ্রভুর সকাশে। কাশী মিশ্রের ভবনে। শ্রীচৈতন্যদেব দেখলেন হরিদাস নাই। জিগ্গেস করলেন প্রভু তাঁর কথা। দৈন্য-বিগ্রহ হরিদাস পথেই রয়েছেন বসে। ছুটে গেলেন পার্ষদবর্গ। জানালেন হরিদাসকে প্রভু খুঁজছেন। তখন—

হরিদাস কহে আমি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥
নিভৃতে টোটা মধ্যে স্থান যদি পাও।
তাঁহা পড়ি রহোঁ, একলে কাল গোঙাও ॥
জগন্নাথ সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥ চৈ.চ. ম.—১১

প্রভু কাশী মিশ্রের কাছে চেয়ে নিলেন তাঁর পুষ্পোদ্যানের একটি নিভৃত গৃহ। তাতেই বাস করতেন সাধক হরিদাস। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন হরিদাসকে—

'এই স্থানে রহি কর নাম সংকীর্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন ॥'

কথামত প্রভু প্রতিদিনই আসতেন হরিদাসের কাছে। এই পুষ্পোদ্যানে থেকেই হরিদাস দেখতেন জগন্নাথ মন্দিরের নীলচক্র। এখন আর দেখা যায় না। চারিদিকে ঘর বাড়ি। প্রাচীরাদিতে সমাকীর্ণ।

পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল 'মুদ্রা মঠ।' এখন 'সিদ্ধ বকুল' নামে পরিচিত।

কিংবদন্তী আছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবও প্রতিদিন প্রাতঃকালে করেন দন্তমর্জ্জন।

প্রতিদিন প্রয়োজন তিনটি কাঁঠির। তিনটি কেন। জগন্নাথ, বলরাম, আর সুভদ্রা—তিন জন আছেন না, তাই। এ কাঁঠি পূর্বদিন থেকেই সংগ্রহ করা হয়। 'কৃষ্ণভাটুয়া' নামক বৃক্ষ থেকেই তা সংগৃহীত হোত। পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের প্রসাদী এই দন্তকাষ্ঠ দান করেন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে। সে বার দন্তকাষ্ঠটি দান করলেন শ্রীগৌরসুন্দরকে। কাষ্ঠটি পেয়ে প্রেমাবিষ্ঠ হলেন গৌরসুন্দর। এলেন ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলে। রোপন করলেন নিজ হস্তে প্রভু অত্যন্ত ভক্তিভরে। হরিদাস সেই দন্তকাষ্ঠের গোড়ায় করেন প্রতিদিন জল-সেচন। ফলে নব কিশলয়ে কাঠিটি হয়ে উঠলো সঞ্জীবিত। ক্রমে ক্রমে পরিণত হোল ছায়াদানকারী বৃক্ষে। হরিদাস সেই বৃক্ষতলে বসে করতেন ভজন।

ঠাকুর হরিদাস করলেন নির্বাণ লাভ। তাঁর অনুগত সিদ্ধ জগন্নাথ দাস রক্ষণাবেক্ষণ করতেন বৃক্ষের। তাঁরই সময়ে পুরীর রাজকর্মচারীগণ রথচক্র নির্মাণের জন্য কাটতে আসেন বকুল গাছটি। এতে আপত্তি করেন জগন্নাথ দাস গোস্বামী।

বলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর রোপিত এ বৃক্ষ। ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থল। পূজার্হ এ বৃক্ষ। একে অনুগ্রহ করে আপনারা ছেদন করবেন না। কিন্তু জগন্নাথ গোস্বামীর এ আবেদন শুনল না রাজকর্মচারীবৃন্দ। তারা বৃক্ষ-ছেদনের দিনক্ষণ ঠিক করে ফিরে গেল গৃহে। কি আশ্চর্য, বৃক্ষ-ছেদনের দিন দেখা গেল, বৃক্ষটি হয়েছে অন্তঃসারশূন্য। আশ্চর্য হলেন রাজকর্মচারীগণ তা দর্শন করে। তাঁরা কাটবেন কি, ফিরে গেলেন নিরাশ হয়ে। রাজাকে জানালেন এই আশ্চর্য সংবাদ। সেদিন থেকেই এই বৃক্ষ খ্যাতিলাভ করল 'সিদ্ধবকুল' নামে। এই দন্তকাষ্ঠটি নাকি শ্রীমন্মহাপ্রভু রোপণ করেছিলেন চৈত্র-সংক্রান্তি বা মহাবিষুব সংক্রান্তিতে। এখনও প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে দন্তকাষ্ঠ-রোপণ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন ১০৮ ঘড়া জল ঢেলে সিদ্ধ বকুলের হয় অভিষেক।

সিদ্ধ জগন্নাথ দাসের মাহাত্ম্য দর্শন করে পুরীর রাজা দান করতে চান ভু-সম্পত্তি। কিন্তু জগন্নাথ দাস তা গ্রহণ করেননি। তিনি ভিক্ষার দ্বারাই করতেন সেবা-নির্বাহ। পুরাতন কাগজপত্র থেকে জানা যায় গোপীচরণদাস মহান্তের সময় থেকেই ভু-সম্পত্তিলাভের পরিচয়।

সংক্ষেপে এই হোল 'সিদ্ধ বকুলে'র ইতিহাস। দেখলাম সেই প্রাচীন অন্তঃসার শূন্য বৃক্ষের গুঁড়িটি মাত্র আজো বর্তমান আছে। তার পাশ দিয়ে গজিয়েছে ৩টি শাখা কাণ্ড। কাণ্ড তিনটিই সতেজ ও সমৃদ্ধ। ছবি তোলা নিষেধ। ৫ টাকা দিলে তবেই তোলা যাবে ছবি। আমি চুরি করে হরিদাস ঠাকুরের মন্দিরের পাশ থেকে তুললাম ফটো। সে ফটো উঠবে কিনা জানি না।

এবার আমার যাত্রা গুণ্ডিচা মন্দিরের পথে। এখান থেকে প্রায় তিন মাইল। জগন্নাথ মন্দির থেকে পূর্বোত্তরে দু'মাইল। চললাম হেঁটে হেঁটেই। মাঝে মাঝে উঠছে রোদ্র। আবার তা কখনো কখনো হয়ে যাচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন। চলতে চলতে কখনো কখনো নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ভাবছি খুঁজে বের করবই গুণ্ডিচা বাটীতে শ্রীমম্মহাপ্রভুর সেই পদচিহ্ন। গবেষক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেছিলেন এখানেই সমাধি দিয়েছিল পাণ্ডারা শ্রীচৈতন্যদেবকে। তা না হলে এখানে কেন থাকবে প্রভুর পদচিহ্ন। জগন্নাথ মন্দিরই প্রভুর লীলাক্ষেত্র। গুণ্ডিচামন্দির মার্জন ছাড়া চৈতন্যদেবের অন্য কোন স্মৃতির কথা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে কই তেমন পাচ্ছি না ত।

এমনি সব ভাবতে ভাবতে চলছি পথ। যত কাছাকাছি হচ্ছি দেখছি পথ জলমগ্ন। প্রবল বৃষ্টিতে ডুবে গেছে পিচের রাস্তা। রিক্সা চলছে তারি উপর দিয়ে। দূরে থেকে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের চূড়ো।

এক সময় এলাম মন্দিরের দরজায়। ৪০ পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে তবেই ঢুকলাম, বিরাট মন্দিরের এলাখা। প্রশস্থ মন্দির প্রাঙ্গণ। কিছু দূরেই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। প্রকাণ্ড এই দীঘি। জনশ্রুতি ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের মহিষীর নাম অনুসারে নাকি এ মন্দিরের নাম হয়েছে গুণ্ডিচামন্দির। এ হলো জগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ী। রথযাত্রার দিনে এখানে এসেই বাস করেন জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রাদেবী। এ হলো মাধুর্যের লীলাভূমি। ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীজগন্নাথ আসেন ঐশ্চর্যের লীলাভূমি শ্রীক্ষেত্র থেকে এখানে। এ কাহিনী জানেন অনেকেই।

আমি ভাবছি না এসব কথা। পুরাণের কাহিনী আচ্ছন্ন করছে না আমার মনকে। আমি খুঁজছি শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন। কোথায়, কোন প্রস্তর ফলকে তা হয়ে আছে অঙ্কিত। হেথায় হোথায় খুঁজলাম চারিদিকে। মন্দিরের মধ্যে পেলাম না কোথাও খুঁজে। শেষে জিজ্ঞাসা করলাম পাণ্ডাদের। তারা বললে মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের গায়ে ঐ যে ছোট্ট সমাধি-মন্দিরের মত দেখা যাচ্ছে, ওখানেই আছে শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন।

উত্তর-পশ্চিমের প্রাচীরের ধারে গিয়ে দেখলাম একটি ছোট্ট মন্দির। তার মধ্যেই কৃষ্ণ প্রস্তরে অঙ্কিত পাশাপাশি দু'টি পদচিহ্ন। খোদাই করা। পায়ে অঙ্কিত আছে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বেশ বড়, মেপে দেখলাম প্রায় এগার ইঞ্চি। ভাল করে দেখলাম মন্দিরটি। নেই কোন কারুকার্য। সাদামাঠা চারটি থাম দিয়ে নির্মিত। মহান্তদের সমাধির মতই এর গঠন। তাহলে এই মন্দির দেখেই কি ডঃ সেন অনুমান

করেছিলেন এটিই শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধি। আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। এই পদচিহ্ন অঙ্কিত প্রস্তরটি হয়ত আদিতে ছিল না এখানে। হয়ত পরে এখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পাণ্ডারা কেউ বলতে পারল না কেন এই পদচিহ্ন এখানে স্থাপিত হয়েছে। যাইহোক, আমি এই ছোট মন্দিরেরও তুললাম একটি ছবি। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

যখন বেরিয়ে এলাম গুণ্ডিচাবাটী থেকে, তখন মনে হলো আমি বেশ শ্রান্ত। আর পারছি না চলতে। চেপে বসলাম রিক্সায়। রিক্সাওলা আমায় নামিয়ে দিল জগন্নাথ মন্দিরের সামনে সিংহ দরজায়। গেটের সামনে ডান পাশে জুতো রাখার গ্যারেজ। চামড়ার কোনকিছু নিয়ে যাওয়া চলবে না মন্দিরে। জুতো রাখার ভাড়া দশ পয়সা। কোন দামী জিনিস রাখতে হলে তার ভাড়া আরো বেশী। আমি জুতা রাখলাম। কিন্তু আমার ক্যামেরা রইল সাইডব্যাগের ভিতরে। আমি জানতাম মন্দিরের ভিতরে ছবি তোলা নিষেধ। ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া তাই বেআইনী।

'বাইশ পাহাচ' দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করলাম মন্দিরে। পাহাচ' অর্থে সোপান। সিংহদ্বার থেকে শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় বেষ্টনে প্রবেশ করতে হলে অতিক্রম করতে হবে বাইশটি সোপান। ওড়িয়া ভাষায় একেই বলে 'বাইশ পাহাচ'। উপনীত হোলাম বাইশটি সিঁড়ি অতিক্রম করে শ্রীমন্দিরের চত্বরে। আবার কতকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করলে নাটমন্দির। এই মন্দিরে প্রবেশের দক্ষিণ ও উত্তর দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে হয় জগমোহনে। যাঁরা বৈষ্ণব তাঁরা দ্বিতীয় প্রাকার অতিক্রম করে ছত্রভোগ মন্দিরের নিম্নে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়ে আসেন প্রতাপরুদ্রদেব স্থাপিত শ্রীচৈতন্য মূর্তি ও শ্রীচৈতন্য শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন করতে। তারপর নাটমন্দিরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেন শ্রীমন্দিরে। সোজা চলে আসেন গরুড় স্তম্ভের পিছনে, দাঁড়িয়ে কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করেন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে। শ্রীচৈতন্যদেব এই গরুড়স্তম্ভের গায়ে হাত দিয়েই দর্শন করতেন জগৎ-নাথকে। তিনি শ্রীমন্দিরে প্রবেশের সময় প্রত্যহ 'বাইশ পাহাচে'র তলে গর্তমধ্যে পাদ প্রক্ষালন করে তবেই আসতেন গরুড় স্তম্ভের কাছে।

সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
'বাইশ পাহাচ' তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে॥
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদ-প্রক্ষালনে।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর-দরশনে॥ —চৈ. চ. অ ১৬।৪১-৪২

জগন্নাথদেবকে দর্শন নয়, আমি খুঁজছি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের চরণচিহ্ন। যা

নাকি দৈর্ঘ্যে ১৬ ইঞ্চি। ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ তাঁর 'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ' পুস্তকে অন্ততঃ তাই লিখেছেন।

কিন্তু কোথায় সেই পদচিহ্ন। পাণ্ডাদের জিগ্যেস করে অবশেষে পেলাম খুঁজে। মন্দিরের উত্তর-পূর্বদিকে একটি নাতি-উচ্চ মন্দির। অত্যন্ত ছোট। গুম্ফচা-বাটির মতই। সবুজ রঙের। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। অনেকটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে খোদাই করা। পদচিহ্নে চন্দন সংলিপ্ত। চন্দনের উপরে সারি সারি ফুল দিয়ে সাজান। জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে মেপে দেখলাম। ও হরি, এত ১৬ ইঞ্চি নয়। সাকুল্যে সাড়ে এগার ইঞ্চি। মনের ভ্রম কিছুতেই কাটতে চায় না। বাব বার বিভিন্ন ভাবে মাপ নিলাম। না, সেই সাড়ে এগার। কোনমতেই কোন দিকে ১৬ ইঞ্চি আর হলো না।

দেখলাম মন্দিরের ভিতরে দেওয়ালে একটি সংস্কৃত শ্লোক। তুলতে আরম্ভ করলাম খাতায়।

'পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতি মরুপ্রেমনিবহৈঃ।
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপতিনিজদীর্ঘোজ্জ্বল তনুঃ॥
সদাতিষ্ঠন্ দেশে প্রণয় গুরুড়স্তম্ভচরমে শচীসুনঃ
কিং মে নয়নসরনীং যাস্যাতি পুনঃ
জয়তি নিজপদাব্জপ্রেমদানাবতীর্ণঃ
বিবিধ মধুরিসাব্ধি কোঽপি কৈ…
গতপরমদশান্তং যস্য চৈতন্যরূপদনুভব
পদমাপ্তং প্রেমগোপীষু নি… ॥"

এই স্তবটি কার রচিত জানি না। পশ্চিম পাশের দেওয়ালে রাধারমণ দাস বাবাজীর নাম বাংলায় লেখা আছে। উত্তর-পূর্বদিকের দেওয়ালে লিখিত আছে স্তবটি। দু'টি পংক্তির শেষাংশ পড়া যায়নি। বৈদ্যুতিক বাতির গোল কাঠের ফ্রেম আঁটা। যতদূর জানি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী শ্রীগৌরপাদপদ্ম যুগল সম্বন্ধে একটি স্তোত্র রচনা করেছিলেন। এই স্তবটি তাঁর রচিত কিনা বলতে পারি না। এই পাদপদ্ম মন্দিরের উত্তর দিকে ছত্রভোগ মণ্ডপের সংলগ্ন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির। এই বিগ্রহেরও ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস এখানে নাই বা বললাম।

এইবার আমার মাথায় কেমন যেন দেখা দিল দুষ্ট বুদ্ধি। মনকে কিছুতেই বশে রাখতে পারলাম না। বেলা তখন প্রায় দেড়টা। দেখলাম মন্দিরচত্বরে জন

সমাগম কমে গেছে অনেকটা। সাইড ব্যাগের মধ্যেই ক্যামেরা। মন্দিরের প্লাসটার ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বের করা হয়েছে আসল মন্দির। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। ফটো তুলতে ভারী ইচ্ছে করছে। বিভিন্ন কোণে গিয়ে দেখছি কোনদিক থেকে কিভাবে তুললে উঠবে সুন্দর ফটো। মাঝে মাঝে হাত কেমন যেন নিস্‌পিস্‌ করে। ইচ্ছে করে ক্যামেরাটা বের করি। কিন্তু সাহস হয় না। দেখি দু'একজন পাণ্ডা মাঝে মাঝে আসছে আমার দিকেই। কেমন যেন তাকায় সন্দিগ্ধ চোখে। না, কোন মতেই ফটো তোলা যাবে না। শেষে ভাবলাম, যদি কোন রকমে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম মন্দিরের অন্ততঃ একটা ফটো তুলতে পারতাম। মনে মনে স্মরণ করছি মহাপ্রভুকে যদি তুমি কৃপা কর। করুণা কর আমার প্রতি। তাহলে হয়ত সম্ভব হলেও হতে পারে।

দেখলাম এক বুড়ি বসে আছে মন্দির চত্তরে। সামনে তার প্রদীপ আর সলতের দোকান। বেশ বয়স হয়েছে বুড়ির। ভাবলাম, বুড়ি হয়ত অত-শত বুঝবে না। বুড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে এক চোখ বন্ধ করে দেখতে লাগলাম ছোট মন্দিরটিকে। তারপর বেশ নির্জন দেখে সাইড ব্যাগ থেকে বের করলাম ক্যামেরা। চোখের কাছে ধরে দিলাম সাটার টিপে, ঝট্‌পট্‌ পুরে ফেললাম ব্যাগের মধ্যে ক্যামেরাটা।

ও হরি, বুড়ি কিন্তু ঠিক দেখেছে। বললে শান্ত ভাবেই—কতগুলো ছবি তুললি? বললাম ঝট্‌ করে—কই না ত। ফটো আবার তুললুম কখন। ব্যস্তভাবে বুড়ির কাছ থেকে সরে পড়তে চাই।

কাঠের বোঝা নিয়ে যাচ্ছিল এক মুটে। জগন্নাথের রন্ধনশালার দিকেই। বুড়ি তাকেই দিলে বলে। সে ছুটে গিয়ে বললে এক পাণ্ডাকে। আমি কিন্তু ছুট্‌ছি না। চলছি ধীরে ধীরে। মনে মনে স্মরণ করছি মহাপ্রভুকে। ভাবছি কপালে যা আছে তাই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে ছুটে এল চারজন পাণ্ডা। দু'হাতের বাহুতে দু'জন, দু'জন চারজন ধরলে জাপ্‌টে, নিয়ে যাবে অফিসে। দেবে পুলিসে, ফটো তুলেছি বেআইনী ভাবে। অতএব সাজা আমায় পেতেই হবে। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম ঠায়। বুঝলাম, এদের হাতে যখন পড়েছি ছাড়বে না সহজে। হয় কিছু দিতে হবে উৎকোচ। না হয় ছাড়িয়ে নেবে ক্যামেরা। বেশী বাড়াবাড়ি করলে নির্ঘাৎ দেবে পুলিশে। এখন কি করব তাই ভাবছি।

কোনরূপ অস্থিরতা প্রকাশ না করে বললাম—চল তোমাদের অফিসে। বলেই আরম্ভ করলাম চলতে। কি জানি কেন, ওরা আমার হাত দু'টো ছেড়ে দিলে।

চলতে আরম্ভ করল আগে আগে। আমি চলছি পিছনে। বেশ কড়া রৌদ্র। তে'তে আগুন হয়েছে পাথরের মেঝে। খালি পায়ে চলতে পারছি না কিছুতেই। হাঁটছি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ওরা তখন বেশ এগিয়ে গ্যাছে।

আমি দেখলাম এই সুযোগ। দিলাম পিছন ফিরে চোচা দৌড়। চশমা আর উড়নী খুলে ঝাঁ করে ঢুকিয়ে দিলাম সাইড ব্যাগে। ততক্ষণে পে'ছে গেছি 'বাইশ পাহাচে,' মিশে গেছি জনসমুদ্রে। ধীরে ধীরে নামছি সি'ড়ি ভেঙ্গে। পাণ্ডারা আসছে ছুটে। শুনতে পাচ্ছি বলছে 'পাকাড়কে লেও। পাকাড়কে লেও।'

আমি তখন বেরিয়ে পড়েছি সিংহ দরজার বাইরে। সাধারণ পথচারীর মত চলতে চলতে গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছি পান দোকানির গুম্‌টির মধ্যে। অর্ডার দিয়েছি দোক্তা পানের। মাঝে মঝে তাকিয়ে দেখছি সিংহ দরজার দিকে। দেখলাম ওদের একজন এল সিংহ দরজার বাইরে। তাকাল এদিক ওদিক। তারপর ঢুকে গেল সিংহ দরজার ভিড়ের মধ্যে। আমি তখন দোক্তা পান পুরে দিয়েছি মুখের ভিতরে।

ধরলাম স্বর্গদ্বারের পথ। পা যেন আর চলছে না। রিক্সা করলে হোত, কিন্তু মন যেন কেমন কৃপণতা করল। সায় দিল না কিছুতেই। কি জানি এখন কতদিন থাকতে হবে। পুঁজি ত অল্প। এত তাড়াতাড়ি শেষ করলে চলবে না। তাই ক্লান্তপদে ধীরে ধীরে চললাম এগিয়ে।

সহসা অনুভব করলাম সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ। ছাতি নেই। পা যেন আর চলছে না। অথচ এখনো যেতে হবে অনেকটা পথ। কাছাকাছি শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত রাধাকান্ত মঠ। যার পূর্ব পরিচয় কাশী মিশ্রের বাড়ী। এ'র গম্ভীরাতেই থাকতেন শ্রীচৈতন্যদেব। ঢুকে গেলাম দরজায়। দ্বিতীয় গেট বন্ধ। বাইরে থেকে তুললাম একটি ছবি। প্রখর সূর্যের আলোকে হয়ত ছবি ভাল উঠবে না।

বাইরে বেরিয়ে এসে ক্লান্ত চরণে চললাম হে'টে। অবশেষে এলাম স্বর্গদ্বারে। একটা দোকানে দেখলাম গরম গরম খাজা মেঠাই। জল খেলাম ঢক ঢক করে দু'গ্লাস। মাথাটা কেমন যেন টন্‌টন্‌ করে উঠল। আর চলতে পারব না কিছুতেই। এসে শুয়ে পড়লাম বাসায়। ঘুম এল না। পড়ে রইলাম চোখ বুজে।



॥ তিন ॥

প্রভুজীর সন্ধানে

যন্ত্রণায় মাথা টন্‌টন্‌ করছিল। তাই চোখ বুজে চেষ্টা করছিলুম ঘুমাতে। ঘুম কিন্তু আসছিল না কিছুতেই। ভাবছিলাম, আজকের মত দিনটা যদি কালকে না আসে। আকাশের যা অবস্থা। হয় ত আবার নামবে বৃষ্টি। সমানে চলতে থাকবে দুর্যোগ। তখন কেমন করে চালাব অনুসন্ধান। বার বার ইচ্ছে করছিল এবার উঠে পড়ি। কিন্তু শরীর সায় দিচ্ছে না কিছুতেই। অগত্যা ব্যাগ থেকে বের করলাম ডঃ মুখোপাধ্যায়ের 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' বইটি। এনেছিলাম সঙ্গে করেই। চোখ বুঁজেই খুললাম দু' হাতে বইয়ের পৃষ্ঠা। চেয়ে দেখি খুলে ফেলেছি ৮০-র পৃষ্ঠা। আরম্ভ করলাম পড়তে—

"ঠিকই বলছি গোবর্ধন বাবু। সব ত শোনাতেই হবে তোমাকে। না শোনালে আমি ছুটি পাব কেমন করে? কিন্তু আজ নয়। আমি ফিরে আসি রাজমহেন্দ্রী থেকে মহাপ্রভুর কাছে লেখা রায় রামানন্দের সেই পত্রটি নিয়ে। যে পত্রে মহাপ্রভুর কয়েকজন ভক্তের নাম উল্লেখ করে মহাপ্রভুকে তাদের সম্পর্কে সাবধান হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন রায় রামানন্দ। লিখেছিলেন—ঐ ভক্তরা আসলে ভক্তই নয়, ওরা গোবিন্দ বিদ্যাধরের ঐ পাপচক্রের চর।"

বইটি বন্ধ করে উঠে পড়লাম তড়াক্‌ করে। না, কোন মতেই আর শুয়ে থাকা যায় না। খুঁজে বের করতেই হবে এই প্রভুজীকে। কোথায় থাকেন এই প্রভুজী। তা ঠিক আমি জানি না। পুরীর অনেক বিশিষ্ট লোককে জিগ্‌গেস করেছি। তাঁরা কেউই দিতে পারেননি এঁর সন্ধান। ভেবেছিলাম জেনে নেব জয়দেব বাবুর কাছে। কিন্তু তিনি ত রয়েছেন মৌনব্রতী হয়ে। যে ক্ষীণ আশাটুকু হৃদয়ে পোষণ করে রেখেছিলাম, তাও হয়েছে নির্মূল।

এমনি সব ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়লাম আশ্রম থেকে। দেখলাম হাতের ঘড়ির

দিকে। তিনটা বেজে গেছে। হাঁটতে আরম্ভ করলাম সমুদ্রতীরের পথ ধরে, সোজা পশ্চিম দিকে। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় চলে এলাম দেড়-দু'মাইল পথ।

দত্ত ভিলার কাছেই যেন দেখা হয়েছিল আনন্দর সঙ্গে মাধবীর। এঁরা দু'জন জয়দেববাবুর গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা। এখান থেকেই মাধবী নিয়ে গিয়েছিল আনন্দকে প্রভুজীর ডেরায়। আমার কেমন মনে হল, হয়ত এদিকেই কোথাও থাকেন প্রভুজী। মনে পড়ছে বইয়ের বর্ণনা—'আজ রাত দশটার পর একা রওনা হবে সমুদ্রের তীর ধরে পশ্চিম মুখে। দত্ত ভিলার কাছে আমার লোক অপেক্ষা করবে। সেই নিয়ে আসবে তোমাকে আমার কাছে।'

সমুদ্রের দিকে বাঁয়ে এই ত সেই 'দত্ত ভিলা'। ডাইনে দেখছি কতকগুলো সরকারী নির্মীয়মান বাড়ী। এখনো শেষ হয়নি নির্মাণ কার্য চলছে। তারপর বিস্তৃত বালুকা রাশি। দূরে, বহু দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট বড় বালির টিলা। তার ওপাশে ছোট্ট একটা সবুজের রেখা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম চারটে প্রায় বাজে। একটা দারুণ মানসিক উত্তেজনায় চলে এসেছি এতখানি পথ। সঙ্গে টর্চ লাইটটা নিতে ও ভুলে গেছি।

যেমন করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে প্রভুজীকে। তাঁর কাছেই আছে রায়রামানন্দের চৈতন্যদেবকে লেখা সেই চিঠি। তাতেই আছে অন্তরঙ্গ পারিষদের নাম। যে যোগ দিয়েছিল গোবিন্দ বিদ্যাধরের চৈতন্য-নিধন-চক্রে। এই বৃদ্ধ, স্টেট্সের অধ্যাপক প্রভুজী। তিনি নাকি চৈতন্যব্রত গ্রহণ করেছেন। যেমন করেই হোক চৈতন্য খুনীকে বের করবেনই। আজ ছ'বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন সমানে অনুসন্ধান আর গবেষণা।

ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে চল্‌ছিলাম পথ। সহসা তাকিয়ে দেখি সামনে একটা ঝুপড়ি। ঝাউ পাতায় ছাওয়া। একটা চায়ের ডেরা। দোকান ঠিক বলা যাবে না। নড়বড়ে একটা বেঞ্চ। তাতেই ২।৩ জন বসে। চা খাচ্ছে! ভাবলাম এখানেই এই চা দোকানিকে জিগ্‌গেস করলে হয়ত সন্ধান দিতে পারে প্রভুজীর। ঢুকে পড়লাম চায়ের দোকানে। প্রাণটাও যেন 'চা' 'চা' করছিল। অর্ডার দিলাম চা আর বিস্কুটের।

চায়ে চুমুখ দিয়েই শুধালাম প্রভুজীর কথা, শুনেছে কি না এমন নাম। বোললাম, উনি থাকেন পুঁটিয়া স্টেটের এক ভদ্রলোকের তৈরী একতলা একটা নড়বড়ে বাড়ীতে। সে বাড়ীটা আবার জঙ্গলের মধ্যে। 'ভজন কুঠি' নাম তার।

চা দোকানি বললে—তা ত ঠিক বলতে পারব না বাবু। প্রভুজী বলে ধারে কাছে থাকেন এমন নাম ত কই কারো জানি না বা শুনিও না। তবে ঐ যে দূরে বালিয়াড়ি

পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা সবুজের রেখা, ওটা একটা জঙ্গল। ঐ জঙ্গলের মধ্যে চারপাশে গোলাকৃতি বালির প্রাচীর। সেই প্রাচীরের মধ্যে নিবিড় জঙ্গলে শুনেছি এক বৃদ্ধ সাধক আছেন বহু দিন থেকে। থাকেন একা একা। কিন্তু কই তাঁর কাছে ত কেউ যায় না। আর তাঁর নাম প্রভুজী কিনা তা ত জানি না। দেখুন উনিই কিনা।

আমি আর তিলার্ধও অপেক্ষা করলাম না। আবার মানসিক উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠল। আরম্ভ করলাম চলতে। কিন্তু পথ কোথায়। এ যে শুধু বালি আর বালি। যেন বালির সমুদ্র। সন্ধ্যে হতেও আর বেশী দেরী নেই। ঐ বিস্তৃত বালির দরিয়ার মধ্য দিয়ে হাঁটব কেমন করে। যদি মাঝ পথেই নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। তাহলে ত ঠাহুর করতে পারব না কোন দিকই। আর ঐ বালির টিলার ওপাশে জঙ্গলের রেখাও যাবে না দেখা। তখন পড়ব ভীষণ বিপদে।

এমনি সব ভাবছি বটে, কিন্তু হেঁটে চলেছি বালির উপর দিয়েই। ঐ সবুজ রেখার দিকে চোখ রেখেই। উত্তেজনায় যেন ফিরে পেয়েছি মনের বল। চাইছি দ্রুত হাঁটতে। কিন্তু বালির মধ্যে দেবে যাচ্ছে পা। দ্রুত চলতে গেলেও চলা যাচ্ছে না কিছুতেই।

সত্যি সত্যি মাঝ পথেই নেমে এল সন্ধ্যা। ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। সহসা পশ্চিমের আকাশটা ঢেকে গেল কালো মেঘে। যেটুকু আলো ছিল তাও যেন গেল নিভে। এবার সত্যি একটু ভয় ভয় করতে লাগল। কি জানি যদি কোন দস্যু-তস্কর কিংবা অন্ধকারে বালির মধ্যে কোন সাপ বা সেই বিষাক্ত মাকড়সা আমায় দেয় কামড়ে। সেবার পড়ো মন্দিরে পুঁথির সন্ধান করতে গিয়ে এই জাতীয় মাকড়সার কামড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম পুরো দুটি ঘণ্টা। (দ্র. বঙ্গসাহিত্যে অজানা কাহিনী)

বুক দুরু দুরু করলেও বন্ধ করিনি হাঁটা। সহসা মনে হল উঠছি একটা উচ্চ বালির টিলার উপরে। দেখছি বাঁয়ে জমাট অন্ধকার। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, বেশ নীচে জল চক্‌চক্‌ করছে। মনে হল স্বচ্ছ জল। সমুদ্র উপকূলে বালিয়াড়িতে এমন মাঝে মাঝে দেখা যায়।

আমি যতদূর সম্ভব সাবধানে চলতে আরম্ভ করলাম। হাটু দুটো ভীষণ কন্‌কন্‌ করছে। উঠছি খাড়া। হাঁটু দুটোতে দুহাতে ভর দিয়ে। অনেক কষ্টে উঠলাম বালির টিলার উপরে। দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিলাম প্রাণ ভরে। তারপর তাকালাম সামনে।

দেখি বেশ ঘন জঙ্গল। ভাবলাম, এইটাই বুঝি সেই সবুজের রেখা, যা দেখা

গিয়েছিল সমুদ্রের ধার থেকে। তাহলে এই জঙ্গলের মধ্যেই কি থাকেন সেই বৃদ্ধ সাধক। কিন্তু কোন পথ দেখছি না। চললাম বালির পাহাঁড়ের মাথার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে। প্রায় চারপাশই প্রদক্ষিণ করে ফেললাম। কিন্তু কোন পথের সন্ধানই পেলাম না। জঙ্গলের পশ্চিম পাশে দেখলাম, ভিতরে যেন একটা ছোট পাকার বাড়ী আছে বলে মনে হল। যাই কেমন করে। ততক্ষণে পোঁছে গেছি উত্তর পশ্চিম কোণে।

অন্ধকারের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে, চোখ আর মাথা বাঁচিয়ে ঢুকে পড়লাম জঙ্গলে। যতদূর মনে হল অধিকাংশ কাজু বাদামের গাছ। বেশ কিছুটা হামা দিয়ে একটা ফরসা মত সাদা সরু পথ দেখা গেল। কিন্তু লতাগুল্ম ঝুলে পড়েছে দুধারে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাকালাম এদিক ওদিক। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে বটে একটা সাদা বাড়ী। কিন্তু মানুষজন আছে বলে মনে হয় না। দেখছি না কোন আলোক রশ্মিও। একবার ভাবলাম, হাঁক দিয়ে দেখি কারো সাড়াশব্দ মিলে কিনা। আবার মনে হল, না এতটা সাহস করে এসেছি যখন এগিয়েই যাই বাড়ীর সামনে। গেলেই ত বোঝা যাবে সব।

একটা ছোট্ট বাড়ীকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল তুলসীতলা। তারপরেই ভাঙ্গা নড়বড়ে একটা বাড়ী। সিমেণ্টের ছাল ওঠা, গোঁজ তোলা একটা মেঝে।

দেখলাম, কে যেন সামনে এসে দাঁড়ালেন। পরিহিত কৌপীণ বাস। নিরাভরণ সর্ব অবয়ব। শ্মশ্রু মণ্ডিত মুখশ্রী।

না, আমি ভয় পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—এটাই কি পুঁটিয়াস্টেটের তৈরী এক ভদ্রলোকের সাধন কুঠি?

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন বাবাজী।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে আপনিই কি প্রভুজী?

আবার মাথা নাড়লেন। পূর্বের সেই সম্মতিসূচক ভঙ্গিতেই।

আমার হৃদয়টা এক অবর্ণণীয় আনন্দে কেমন যেন নেচে উঠল। পেয়েছি। এবার প্রভুজীকে পেয়েছি। যেমন করেই হোক, এঁর কাছেই মিলবে সব সন্ধি-সুলুক। এবার হয়ত পেয়ে যাব রায়রামানন্দের সেই চিঠি।

সহসা আমি যেন কেমন বোবা হয়ে গেলাম। বলতে পারছি না কোন কথাই। শুধু তাকিয়ে আছি প্রভুজীর মুখের দিকে। অপলক দৃষ্টিতে। দেখছি, পরখ করছি ইনিই সেই স্টেটসের বৃদ্ধ অধ্যাপক কিনা। কিন্তু এঁর গায় ত কই দেখছি না

আলখাল্লা। মাথায় টুপি। এ যে সাধনজীর্ণ এক বৃদ্ধ তপস্বী। অনেকটা বার্ধক্যের ভারে যেন নুয়ে পড়েছেন। এই আধো অন্ধকারের মধ্যেও শরীরের অস্থিগুলো দাঁড়িয়ে আছে খাড়া হয়ে। কোটরাগত চক্ষু। কিন্তু কি আশ্চর্য, চোখ দুটো যেন অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল। জ্বলছে সার্চ লাইটের মত। তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। চোখে চোখ রাখলাম আমি। না, কোন কথা নাই। প্রায় আধ মিনিট। সহসা দেখলাম শ্মশ্রুরাশির মধ্যে একটা হাসির আভা। অনুমতি চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—প্রভুজী, একটু কি বসতে পারি।

এবার বললেন—বস।

আমি নির্দ্বিধায় বসে পড়লাম সেই ছাল তোলা, গোঁজ ওঠা মেঝেতেই। প্রভুজীও বসে পড়লেন বিনা আসনেই। এবার বোললাম—আমি দীর্ঘদিন ধরে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে গবেষণা করছি। ঘুরছি বাংলা আর উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে। জানতে চাই মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্যের প্রকৃত তাৎপর্য। তাই অনেক খুঁজে খুঁজে এসেছি আপনার কাছে। শুনেছি আপনি মহাপ্রভুকে লেখা রায় রামানন্দের চিঠির আসল কপি উদ্ধার করে এনেছেন রাজমহেন্দ্রী থেকে। জানতে চাই সেই চিঠিতে রায়রামানন্দ কি লিখেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবকে? অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে কে যোগ দিয়েছিল গোবিন্দ বিদ্যাধরের দলে? যদি দয়া করে আমায় দেখান সেই পত্রটি, তাহলে আমি যে সব তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি তার থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে পারব মহাপ্রভুকে নির্ঘাৎ হত্যা বা গুমখুন করেছিল পুরীর তৎকালীন পাণ্ডারা।

প্রভুজী বললেন—তুমি চৈতন্যচরিতামৃত পড়ছ?

বললাম—সে এমন কিছু নয়। যতটুকু পড়েছি নিজের মত করেই পড়েছি। আপনি যদি দয়া করে বলেন তাহলে আমার জীবন সার্থক হয়।

না-না, আমি ও পড়ার কথা বলছি না। পড়া মানে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব দর্শন বুঝা নয়। রূপ সনাতন আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যে বৈষ্ণব দর্শন সৃষ্টি করেছিলেন তা জানলে প্রকৃতপক্ষে জননায়ক চৈতন্যদেবকে বোঝা হলো না। তোমাকে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে হলে জানতে হবে জননায়ক চৈতন্যদেবকে।

আর তা যদি জানতে হয় জানতে হবে চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্য সমসাময়িক গৌড় ও উৎকলের প্রকৃত ইতিহাস। তবেই ত চৈতন্য-হত্যা রহস্যের আসল তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

বললাম—ইতিপূর্বে আমার লেখা 'চৈতন্য আবির্ভাবের পটভূমি' বই প্রকাশিত

হয়েছে। আর উৎকলের ইতিহাসের কথা বলছেন, তাও লিখেছি আমার 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' পুস্তকে।

সে ইতিহাস তোমার লেখা হয়নি যথাযথভাবে।

তবে কি আপনি আমার 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' পড়েছেন ?

না, পড়িনি। তবে বুঝতে পেরেছি। তুমি হয়ত পড়েছ তোমাদের বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উড়িষ্যার হিস্ট্রি, প্রভাত মুখার্জীর 'দি হিস্ট্রি অফ মিডিয়াভ্যাল বৈষ্ণভিজম ইন উড়িষ্যা', ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের 'হিস্ট্রি অফ উড়িষ্যা'র কয়েক খণ্ড বা দেশী-বিদেশী লেখকদের লেখা এই জাতীয় কিছু পুস্তক। আর হয়ত পড়েছ চক্রধর মহাপাত্রের 'উড়িষ্যা ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায়'। এই পুস্তকে তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের সঙ্গে লিখেছেন, প্রমাণ করেছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে হ্রাস পেয়েছিল উড়িষ্যার সামরিক শৌর্য-বীর্য। কিংবা শুনে থাকবে কে. পি. দুরাগুলের কথা। তিনি লিখেছেন উর্দুতে 'নিমাইচাঁদ' পুস্তক। শুধু এঁদের পুস্তক পড়লেই হবে না।

তোমরা যেমন বল 'চৈতন্য রেণেসাঁ'র ফলে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল, ঠিক তেমনি সমসাময়িক মধ্যযুগের উড়িয়া সাহিত্যে, কাব্যে, সংগীতে, পদাবলীতে, শিল্পে, চিত্রকলা, স্থাপত্যে, চারুকলায় চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব কম পড়েনি। বলতে গেলে উড়িষ্যার জনজীবনে চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এসব নিয়ে আজো যথাযথভাবে উড়িষ্যার পণ্ডিত সমাজ তথা গবেষকগণ কোন গবেষণাই করেননি।

'শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্যে'র কিনারা করতে গিয়ে তুমি কতটুকুই বা অনুসন্ধান করেছ। পড়েছ সংস্কৃত আর বাংলা কতকগুলো চৈতন্যজীবনী। এ গুলোতে কি আছে ? বৈষ্ণব ভক্ত কবিগণ লিখেছেন কঠিন বৈষ্ণব দর্শনের কথা আর মহাপ্রভুর জীবনী, সে জীবনী ত রূপক আর অলৌকিকতায় ঠাসা। সেই রূপককে ঝেড়ে বের করতে হবে চৈতন্যদেবের প্রকৃত জীবনী। কিন্তু তাতে কি হবে জান, উদ্ধার করা যাবে মহাপ্রভুর অর্ধেক জীবনী। তিনি ত তাঁর জীবনের ১৭।১৮ বছর কাটিয়েছিলেন এই পুরীতেই। সেই জীবনের কথা কতটুকু জানতেন তোমার ঐ গৌড়ীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ। কতটুকুই বা তারা লিখেছিলেন এখানের জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। এখানের উড়িয়া ভক্তকবিগণ অনেকেই লিখেছিলেন মহাপ্রভুর এখানের জীবনের প্রকৃত কাহিনী। যা এখনো অনাবিষ্কৃত। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকখানি চৈতন্যবিষয়ক পুঁথি ওড়িয়া কবিদের আবিষ্কৃত হয়েছে। এখনো অনেক

পুঁথি রয়েছে অনাবিষ্কৃত। তা 'আবিষ্কার' করতে হবে তোমাদের বাঙালী গবেষক-দেরই। উড়িষ্যার ইতিহাসচর্চা যতটুকু জানি এখনো তা বেশ রুগ্ন ও দরিদ্র। শুনেছি তোমাদের বাঙালী ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার নাকি মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করতে কাটিয়েছিলেন জীবনের অমূল্য ১৭।১৮ বছর মহারাষ্ট্র দেশের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান করে। তবেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন মহারাষ্ট্রের ইতিহাস। তোমাকেও তেমনি ঘুরতে হবে উড়িষ্যার দূর দূরান্তে গ্রামে গঞ্জে। অনুসন্ধান করতে হবে প্রাচীন মঠ-মন্দিরে। পাণ্ডাদের ডেরায় ডেরায়। তবেই হয়ত একদিন আবিষ্কার করতে পারবে মহাপ্রভুর জীবনের শেষদিন কিভাবে হয়েছিল শেষ।

একটানা বেশ কিছুক্ষণ বলার পর সহসা প্রভুজী বললেন, যাও রাত হয়ে গেছে। এখন ফিরে যাও। আছ কোথায় ?

বললাম—ভারত সেবাশ্রম সংঘে।

বেশ বেশ। ভাল জায়গাতেই রয়েছ। কাল আবার এসো। ৯টার মধ্যেই আসবে। এখানে তবেই প্রসাদ পাবে। তারপর আলোচনা করা যাবে।

আমি শুনছিলাম মন্ত্রমুগ্ধের মত। প্রভুজীর কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম। উঠে পড়ে বললাম—প্রভুজী পথে কোন ভয় নেই ত ? আপনার এই ভজন কুঠি থেকে বেরুব কেমন করে। কোনদিকে এর পথ ?

—'না না, ভয়ের কিছুই নেই। চল, তোমায় দেখিয়ে দেই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ।'

প্রভুজী যে পথ আমায় দেখিয়ে চললেন, তাকে পথ বললে পথের অপমান হয়। কাজু বাদামের শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে নুয়ে গলে গলে চলছেন আগে আগে। আমি চলছি পিছনে। শেষে প্রভুজী নিয়ে এলেন সেই বালির টিলার উপর। হাত বাড়িয়ে বললেন—ঐ দূরে যে 'ওয়াটার সাপ্লাই'য়ের লাইট জ্বলছে মিট্ মিট্ করে, ওটা দিশে করেই চলে যাও নাক বরাবর। বাঁয়ে যাবে না মোটেই। তাহলে পড়ে যাবে খাদে। দূষিত জল। তাই যাবে সোজা। যাও আর বিলম্ব করো না।

আমি একটা প্রণাম করে, চলতে লাগলাম। কয়েক পদ এগিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম, অন্ধকারে ঢাকা একটা ছায়া মূর্তির মত প্রভুজী তখনো রয়েছেন দাঁড়িয়ে। আমি চলতে লাগলাম দূরের আলোটাকে লক্ষ্য করে।

* *　　* *　　* *

চলতে চলতে ভাবছি। কে এই প্রভুজী। ইনি ত জয়দেববাবু কথিত স্টেটসের সেই প্রবীণ অধ্যাপক বলে মনে হয় না। কথার মধ্যে রয়েছে পুরো ওড়িয়ার টান।

ধীরে ধীরে কথা বলেন। বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। রায়রামানন্দের সেই চিঠির কথা উল্লেখ করতে কোন জবাবই দিলেন না। দেখালেন না কোন উৎসাহই। উল্টে আমায় যা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কে হাড়হদ্দ ত সব জানেনই, অধিকন্তু গৌড় উৎকলের প্রকৃত ইতিহাসও মনে হচ্ছে আছে এঁর নখদর্পণে। অথচ দেখলে বা কথা শুনে কিছুতেই মনে হয় না এঁর মধ্যে আছে এত পাণ্ডিত্য। ধরা পড়ে না দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছ প্রসারতা। যেন নিতান্ত সাদাসিধে একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। বাস করেন শহরের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন জঙ্গলে। কোন যোগাযোগই নেই শহরের শিক্ষিত সভ্যতার সঙ্গে। কেউ কখনো কাছে যায় বলে মনেও হয় না। নিজেও বুঝি বড় একটা আসেন না শহরে। একেবারে সেই সুপ্রাচীন যুগের ঋষি যেন। সঙ্গ করে মনে হল এতক্ষণ বুঝি ছিলাম প্রাচীন যুগের কোন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ সাহচর্য। আমি যে বর্তমান যুগের মানুষ, তা মনেই হচ্ছিল না।

অথচ জয়দেববাবু যে প্রভুজীর কথা বলেছেন, তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতির কথা যে ভাবে লিখেছেন তাঁর বই-এ, এ যেন কিছুতেই মিলছে না তাঁর সঙ্গে। এঁকে আর যাই মনে হোক, অন্ততঃ বাঙালী বলা চলে না। প্রভুজীর ভাইঝির নাম মাধবী, সে উচ্চ শিক্ষিতা। ইনি যদি প্রভুজী হন, তাহলে মাধবী কই। প্রভুজীর বুকে একটা ব্যথা আছে। কিন্তু এঁকে দেখে এর বুকে তেমন কোন ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। শুভ্র দাঁড়ির মধ্যে লুকিয়ে আছে সৌম্য প্রশান্তি। যেন সর্বদা বিরাজ করছেন আত্মসমাহিত অবস্থাতে। সুখে দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন। যেন গীতাবিগ্রহ এক মহামুনি।

পরম ভক্ত, পরম যোগী, এই মানুষটি কোন অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। অথচ ভক্ত ত কখনো যুক্তিবাদী হয় বলে আমার মনে হয় না। হয়ত তথাকথিত আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত নন, কিন্তু যতটুকু শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে বললেন, তা শুনে মনে হল অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত গবেষকগণের চেয়ে অনেক বেশী খোঁজ খবর রাখেন।

আমায় কালকে ডাকলেন। যথা সময়ে গেলে আমি প্রসাদ পাব। কিন্তু সেই প্রসাদ কি কোথাও থেকে আসবে, না উনি নিজেই ভোগ রান্না করবেন। সেবক কেউ আছে বলে মনে ত হয় না। কতদিন উনি এইভাবে, এই নির্জন বনানীতে বসবাস করে সাধন ভজন করছেন। দেখছি পরম বৈষ্ণব মানুষ। মনে হয় জীবিকার

জন্য মাধুকরীও করেন না। তবে চলে কেমন করে। কোথা থেকে কিভাবে আসে ও°র সেবার উপকরণ।

রাত্রির অন্ধকারে বালির উপর দিয়ে চলতে চলতে এমনি নানান প্রশ্ন জাগে আমার মধ্যে। আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠি প্রভুজীর সম্পর্কে। অন্ধকার দীর্ঘ নির্জন পথ। না, একটুও ভয় করে না আমার। হৃদয়ে ভয় নামক আতঙ্ক বুঝি প্রবেশ করার কোন অবসরই পায় না। আমি চলেছি প্রভুজীর কথা ভাবতে ভাবতেই।

মনে মনে স্থির করি, কালকে ভোরে উঠেই করব সমুদ্র স্নান। তারপর একটু জলযোগ করেই চলে আসব প্রভুজীর ডেরায়। বসে বসে শুনব মহাপ্রভু সম্পর্কে কি ও°র ধ্যান-ধারণা। কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেছেন উনি শ্রীচৈতন্যদেবকে। একবার বলছিলেন 'জন নায়ক' চৈতন্যদেবের কথা। ভক্ত মানুষ, কেন বলছেন আবার জননায়ক মহাপ্রভুর কথা। উড়িষ্যাবাসীর অন্তরে কিভাবে চৈতন্য-প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল, তা ঠিক ঠিক আমরা জানি না। যতটুকু যা জানি কৃষ্ণপ্রেমে মতোয়ারা নবদ্বীপনন্দন, শচীর দুলাল নিমাই ভক্তি আর প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করেছিলেন গৌড় আর উৎকলের আপামর জনগণকে। তাঁর রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত তনু দর্শনে অতি কঠোর হৃদয় ব্যক্তিও হতেন প্রেমে বিভোর। তিন দশায় প্রভু থাকতেন সর্বক্ষণ। যমুনার কেলিকদম্ব, বৃন্দাবনের নৈসর্গিক শোভা সর্বদা প্রতিভাত ছিল তাঁর মানস নেত্রে। যোগীদের কথায় তুরীয়ানন্দ বা ব্রহ্মানন্দে তিনি থাকতেন সর্বদা বিভোর হয়ে।

এমনি সব ভাবতে ভাবতে কখন চলে এসেছি স্বর্গদ্বারে, সে খেয়ালই ছিল না আমার। দৈহিক ক্লেশ বা মানসিক ভীতি কোনকিছুই রেখাপাত করেনি আমার হৃদয়ে।

॥ চার ॥



চৈতন্য জীবনের অভিনব ব্যাখ্যা

আরম্ভ হলো রাত থেকেই ভীষণ দুর্যোগ। চলছে সমানে ঝড় আর বৃষ্টি। সমুদ্র বুঝি হয়ে উঠেছে উত্তাল। ঘরে শুয়ে শুয়ে শোনা যাচ্ছে ভীমগর্জন। মাঝ রাতেই ঘুম ভেংগে গেছে। গায়ে বেশ শীত অনুভব করছি। উড়ানীটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপা দিতে গিয়েই ভেংগে গেল ঘুম। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে আসছে বৃষ্টির ছাট্। মশারি, পাতনি ভিজে একাকার। উঠে পড়লাম ধড়মড় করে। বিছানায় বসে বসে বাইরে শুনছি প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য। সঙ্গী কিশোর কিন্তু অঘোর নিদ্রায় অভিভূত। মহাসুখে ঘুমোচ্ছে সে। আমি উঠে বন্ধ করলাম জানালা। বেশ কিছুক্ষণ রইলাম বসে।

ভাবতে লাগলাম। এমন দুর্যোগ যদি কাল সারাদিন চলতে থাকে, তাহলে কাজ করব কেমন করে। কেমন করেই বা যাব প্রভুজীর ভজন কুঠিতে। সে যে অনেক পথ। বালিয়াড়ি মাড়িয়ে রিক্সাও যাবে না। ছাতা নাই। কি করে কি করব, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছি না। একবার মনে হলো একটা ছাতাই না হয় কিনে নেব। কিন্তু একথা ত ভেবেছি অনেক আগেই। খুঁজেছি ছাতার দোকান। কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইনি তার। এমনি নানান্ কথা ভাবতে ভাবতে আবার শুয়ে পড়লাম বিছানায়। মনে পড়ল আমার দেশের কথা। না জানি মেদিনীপুরে কি প্রচণ্ড দুর্যোগই না চলছে। অমনিতেই ত আগের বৃষ্টিতে সব ভেসে গেছে। এবার নিশ্চয়ই ঘটেছে প্রলয়ঙ্করী কাণ্ড।

এমনি নানান্ সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। ঘুম ভাঙ্গল একেবারে সকালেই। কিশোরের ডাকে। ও বললে—চলুন, সমুদ্র স্নান করে আসি। বৃষ্টি পড়ছে। সমুদ্র স্নানে খুব আনন্দ করা যাবে।

আমি উঠে পড়লাম। দু'জনেই এক সাথে চললাম সমুদ্র স্নানে। পথে নেমেই অনুভব করলাম, শুধু বৃষ্টি নয়, তখনো বাতাস বইছে। বেশ শীত শীত করছে। কিশোর বললে আমি আগে স্নান করি। আপনি চাবি নিয়ে দাঁড়ান।

ওর স্নান আর শেষ হয় না। আমি শীতে কাঁপতে থাকি থর্‌থর্‌ করে। পর্বত প্রমাণ কালো মেঘ তাল পাকিয়ে উপকূলের দিকে ছুটে আসছে দৈত্যের মত বাহু মেলে। বিরাট বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ছে সমুদ্র তটে। যেন বিরাট অজগরের মত হাজার হাজার ফণা তুলে ছুটে আসছে ভীষণ আক্রোশে। গামছা গায়ে দেখছি আর জলে ভিজে কাঁপছি জবুথবু হয়ে। ও তখনো ঢেউয়ের ঝুঁটি জাপ্‌টে ধরে ডুবছে আর উঠ্‌ছে। সমুদ্রের ধারে আজ আর বেশী লোক নাই। প্রাতে সমুদ্র-ভ্রমণে ত আসেই না, স্নানার্থীও কম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ও উঠে এল। আমি সমুদ্রে নেমেই অনুভব করলাম, জল বেশ গরম। বুঝতে পারলাম ও এতক্ষণ কি করে স্নান করছিল। আমি পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই সেরে নিলাম স্নান।

** ** **

বৃষ্টি আর থামছে না কিছুতেই। কি করব তাই ভাবছি। এই দুর্যোগের মধ্যে বাইরে বের হই কেমন করে। অথচ মনটা কিছুতে ঘরে বসে থাকতে চাইছে না। যেমন করে হোক যেতে হবে প্রভুজীর কাছে। শেষে সবকিছু অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়লাম।

রিক্সাওয়ালাকে বললাম, আমায় নিয়ে চল তোটা গোপীনাথের মন্দিরে। এবটা উঁচু-নীচু এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পথে রিক্সা টেনে টেনে সে আমায় নিয়ে এলো জলের ট্যাঙ্কের কাছে। আর বুঝি রিক্সা যাবে না। আমি নেমে পড়লাম। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জলে ভিজে হাজির হোলাম গোপীনাথের দরজার সামনে। দরজা খোলাই ছিল। ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। বেশ নির্জন। পলাং গাছের অরণ্যে ঢাকা। বাইরের থেকে মন্দিরের চূড়া দেখাই যায় না। চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

প্রবেশ পথে দেখা হলো দু'জন সাহেব বৈষ্ণবের সঙ্গে। 'হরেকৃষ্ণ' বলে তারা আমায় নমস্কার করল। 'হরেকৃষ্ণ' বলে আমিও জানালাম প্রতি নমস্কার। গিয়ে প্রবেশ করলাম মন্দিরে। দর্শন করলাম গোপীনাথ বিগ্রহ। হাতে মোহন বাঁশী। মাথায় শিখিপুচ্ছ। বেশ বড় বিগ্রহ। কটিদেশে পরিহিত বস্ত্র। জানুদেশের ফুটো দেখার কোন উপায় নাই। পূজারীকে অনুরোধ করলাম, বস্ত্র উন্মোচন করে দয়া করে যদি দেখান সেই স্থানটুকু। কিছুতেই রাজী হলো না পূজারী। বড় হতাশ হলাম মনে মনে। ভাল করে দেখতে লাগলাম বিগ্রহের গঠন।

পণ্ডিত গদাধর সেবিত এই শ্রীবিগ্রহ। শ্রীচৈতন্যদেব বালু খুঁড়ে করেছিলেন

যাঁকে আবিষ্কার। আজ থেকে সাড়ে চারশত বছর পূর্বে। সত্যি, ভারি অপরূপ এ মূর্তি। কলাভূমি কলিঙ্গের শিল্প ভাস্কর্য এর সর্ব অবয়বে। শিল্প সাধনার এ এক সার্থক নিদর্শন।

আমার পাঠকবর্গ যাঁরা এখন পুরী যাবেন, দেখে আসতে ভুলবেন না এ মূর্তি। সেই সঙ্গে তাঁদের অনুরোধ করব জগন্নাথের বড় দেউল দেখতে। বড় দেউলের পুরু প্লাসটার খসিয়ে বের করা হচ্ছে আসল মন্দিরের ভাস্কর্য। উত্তর পাশে মন্দির গাত্রে দ্বিতীয় পোতালে বেরিয়েছে বামন অবতার। আর পশ্চিম পার্শ্বে দ্বিতীয় পোতালে বেরিয়েছে নৃসিংহ অবতারের প্রতিমূর্তি। দুটি মূর্তিই কালো পাথরে খোদিত হয়েছে অপূর্ব স্থাপত্য দক্ষতার সঙ্গে। বর্তমানে মূর্তি দু'টি দর্শনের জন্য নির্মিত হয়েছে পাথরের সিঁড়ি। উঠে দেখা যায় সহজেই।

এই দু'টি মূর্তির উচ্চতা শিল্প সৌন্দর্য দেখবেন ভাল করে। তারপর গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহ দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন, এককালে এই মূর্তিটি সম্ভবত ছিল জগন্নাথ মন্দিরের পোতালের কোন এক অংশ সুশোভিত করে। পরবর্তীকালে মন্দির ধ্বংসকারী কোন যবন দলের ধ্বংসোম্মত্ততার শিকার হয়ে পতিত হয়েছিল বালুকারাশির মধ্যে। চাপা পড়ে গিয়েছিল। দেখা যাচ্ছিল চূড়ার সামান্য অংশ মাত্র। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেব এঁকেই আবিষ্কার করেছিলন বালি খুঁড়ে। এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে পুরো মন্দিরের প্লাসটার উন্মোচন করা পর্যন্ত। তা না হলে বোঝা যাবে না কোথায় কোন প্যানেলে ছিল এই বিগ্রহের অবস্থান। জানুতে যে ছিদ্র রয়েছে তার কারণ আমি ত মূল পুস্তকে পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এই মন্দিরের বাম পাশের প্রোকোষ্ঠে আছে গদাধরের দারুনির্মিত বিগ্রহ। এই বিগ্রহের ডানপাশে একটি বেদীর উপরে আছে কতকগুলি পুঁথি বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে। পূজারীকে জিগ্গেস করে জানলাম, পুঁথিগুলি আজ আর খোলা হয় না। জীর্ণ কীট দষ্ট অবস্থায় পূজিত হচ্ছে মাত্র। কিসের পুঁথি পূজারী বলতে পারল না কিছুই। দেখতে দেওয়ার অনুমতি নাই। পণ্ডিত গদাধর ছিলেন প্রসিদ্ধ ভাগবত পাঠক। জানি না ঐ দপ্তরের মধ্যে কোন ভাগবত গ্রন্থ আছে কিনা।

গোপীনাথ মূর্তিটি কিঞ্চিত ন্যুব্জ। এ সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা আমার পাঠকবর্গ সকলেরই জানা। পণ্ডিত গদাধর বৃদ্ধকালে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের মস্তক ও মুখমণ্ডল পর্যন্ত পারতেন না শৃঙ্গারসেবা করতে। তাই তিনি সেবাহীন প্রাণ পরিত্যাগের সংকল্প করেন। ফলে ভক্তবৎসল গোপীনাথ নাকি গদাধরের সেবা গ্রহণ করার জন্য পদদ্বয় কিঞ্চিৎ সংকুচিত করে অবস্থান করেন।

বর্তমান গোপীনাথ আছেন সেইরূপ অবস্থাতেই। আসলে মূর্তিটি ঐরূপভাবে গোড়াতেই নির্মিত হয়েছিল।

এই কিংবদন্তী অনুসরণ করে পরবর্তীকালে দাক্ষিণদেশীয় কোন এক অজ্ঞাত কবি একটি নাটক রচনা করেন। সেই নাটকের একটি শ্লোক স্থানীয় কোন ব্যক্তির নিকট সংগ্রহ করেছেন পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। পাঠকদের অবগতির জন্য শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

'আবাল্যাদ্ভুষয়ংস্ত্বদাং সুখমহমনয়ং বৎসরাণামশীতিং
নাদ্য স্থানে সমর্থস্তব শিরসি বিভো! মল্লিকাদাম দাতুম্।
তেনায়ুর্মে যথেদং ন ভবতি চ বৃথা তচ্চ স্বামিন্! বিধেয়ং
ভক্তেনোক্তং প্রগৃহ্নংস্তদবধি ভগবান্ ভক্তবন্ধুর্নিবিষ্টঃ॥'

শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের বামে ও দক্ষিণে আরো দুটি মূর্তি আছে। এ দুটি মূর্তি পরবর্তীকালে স্থাপিত হয়েছে। বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জুরী। আবার কেউ কেউ বলেন না, উনি শ্রীলালিতা দেবী। মধ্য প্রকোষ্ঠে এই মূর্তিত্রয় বিরাজমান। দক্ষিণ দিকে অন্য প্রকোষ্ঠে শ্রীবলদেব শ্রীরেবতী রয়েছেন শ্রীবারুণীর সহিত বিরাজিত। আর উত্তর দিকের প্রকোষ্ঠে যেখানে পুঁথি পূজিত হচ্ছে সেখানে রয়েছেন মামু-ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন বিগ্রহ।

গোপীনাথের প্রত্যহ প্রাতে বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নে অন্ন ও পায়সান্নভোগ, বৈকালে উত্থাপনভোগ ও রাত্রিতেও অন্নভোগ হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট আছে পাঁচসের চাল এই অন্নভোগের জন্য।

এই মন্দিরে যে সব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে শ্রীজন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী, গোবর্ধন উৎসব (অন্নকুট), গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মোৎসব।

এবার বলি মন্দির চত্বরের কথা। দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে বাম দিকে দেখুন একটু দূরে একটি তুলসীমঞ্চ। এই তুলসী মঞ্চের সম্মুখেই একটি ছোট মন্দির। এই মন্দিরটিই দেখতে হবে বিশেষ মনযোগ দিয়ে। তোটা গোপীনাথের বাইরে যেখানে জলের ট্যাঙ্ক, সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখা যাবে বিস্তৃত বালিয়াড়ির মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির। এর সবগুলিই সমাধি। এই সমাধি মন্দিরগুলির সঙ্গে পূর্বোক্ত তুলসীমঞ্চের সামনের মন্দিরটি মিলিয়ে বেশ ভাল করে দেখুন। দেখবেন গঠন প্রায় একই রকমের।

এই মন্দিরটিই হলো শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধি মন্দির। এখানেই শায়িত আছেন

প্রেমের ঠাকুর, মহান বিপ্লবী শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। আমি একথা কতদূর বিশ্বাস করি তা বড় নয়, কিন্তু এমন একটি প্রাচীন ওড়িয়া পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে যাতে লেখা আছে এই স্থানের কথা। এই পুস্তকে 'চৈতন্য সমাধির সন্ধানে, অধ্যায়টিতে আমি পূর্ববর্তী সংস্করণে (২য় সংস্করণ) যে সব প্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলাম তাকেই সমর্থন করছে। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা ও নবাবিস্কৃত ওড়িয়া পুঁথি থেকে পংক্তিগুলি উদ্ধার করে প্রমাণের চেষ্টা করব পরবর্তী অধ্যায়ে। সেই সঙ্গে ভারতবিখ্যাত গবেষক পদ্মশ্রী পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মার সঙ্গে সাক্ষাতকার প্রসঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিপূর্ণ মতামতের কথাও আলোচিত হবে।

এখন আসুন আমার সঙ্গে এই দুর্যোগের মধ্যে ভিজে ভিজে যাই প্রভুজীর কাছে।

** * ** **

তোটা গোপীনাথ মন্দিরের পাশ দিয়ে জলের ট্যাঙ্ককে বামে রেখে হাঁটতে আরম্ভ করলাম সোজা পশ্চিমদিকে। ছোট ছোট বালির টিলা। টিলার পাশ দিয়ে ইলেকট্রিকের পোস্ট। আমি চলেছি আনমনে। প্রভুজীর কথা ভাবতে ভাবতে। বৃষ্টি পড়ছে গুঁড়ি গুঁড়ি। কখনো জোরে আবার কখনো বা মৃদু মৃদু। গায়ের উড়ানী ভিজে জাউ। সেই ভেজা উড়ানীটা মাথায় দিলাম চাপিয়ে। বুঝতে পারছিলাম এই জলে ভিজে সর্দি, জ্বর, কাশি হবেই। তবু ভ্রূক্ষেপ নাই আমার। সহসা একটা চীৎকার এলো কানে। সাবধান, ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে পড়েছে। দেখে যান।

সতর্ক হয়ে তাকালাম। দেখলাম, চারটে জোয়ান গরু ইলেকট্রিক তারের শক্ লেগে তারের উপরেই জিব বের করে ঘাড়মুড়ে মরে পড়ে আছে। কি সুন্দর হৃস্ট-পুষ্ট। তিনটে সুন্দর গাভী আর একটা বাছুর। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বড় দুঃখ হলো। বেদনায় মনটা টন্‌টন্ করে উঠল। ওখানের সব গরুই দেখছি ছাড়া। বনে বনে খাচ্ছে চরে চরে। কারো গলায় নাই কোন বন্ধন। দেখে মনে হল তিনটে গাভীই দুধ দিত। তখনো গাভীর মালিক বোধহয় জানতে পারেনি। তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছে দু'তিনটে ছেলে।

এবার আমি চলতে আরম্ভ করলাম সতর্ক হয়ে। দূরে তাকিয়ে দেখলাম এখনো অনেক দূর। ছোট বড় দু'তিনটে টিলে না পেরোতে পারলে পৌঁছান যাবে না প্রভুজীর ভজন কুঠিতে। ভিজে সপ্‌সপ্ করছে কাপড়। গেঞ্জী লেপ্‌টে গেছে গায়ে। হাঁটু, কোমর বেদনায় টন্‌টন্ করছে। যখন গিয়ে পৌঁছলুম, বেলা

সাড়ে বার। বেশ বুঝতে পারলাম, আজকে ভাগ্যে অন্ন আর জুটবে না। ভাঙ্গা বাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই বেরিয়ে এলেন প্রভুজী। বললেন—বস।

আমি সেই ভেজা কাপড়েই বসে পড়লাম মেঝেতে। প্রভুজী তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। কিছুই বললেন না। আমি নিজেই অপরাধ স্বীকার করে সবিনয়ে বললাম—প্রভুজী আমার আসতে বড় দেরী হয়ে গেল। যা দুর্যোগ, কিছুতেই পারলাম না সকাল সকাল বেরুতে। উনি সহজভাবে বললেন—প্রকৃতিকে নিষেধ করবে কেমন করে।

আমি প্রকৃতিকে কি আর দোষ দেব। ও প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে বললাম—আমি আপনাকে কাল যে রায়রামানন্দের লেখা চিঠির কথা বলেছিলাম, কই তার ত কোন জবাব দিলেন না।

উনি বললেন—তুমি কি বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কেন, আপনি জয়দেব বাবুকে চেনেন না? আপনি তাঁকে বলেন নি এসব কথা। তিনি ত আপনার নামই উল্লেখ করেছেন।

কে জয়দেববাবু আর তিনি কার নাম উল্লেখ করেছেন তা আমি বলতে পারব না। তবে আমি মহাপ্রভু সম্পর্কে যা জানি তা তোমায় বলতে পারি। যদি শুনতে চাও শোন।

আমি কথা না বাড়িয়ে ব্যাগের মধ্য থেকে খাতা কলম বের করে শোনার জন্য কান আর মন খাড়া করে বসলাম।

কালকে তোমায় বলছিলাম শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জীবনী জানার কথা। আমি সারা জীবনই মহাপ্রভুকে আমার একমাত্র উপাস্য দেবতা বলে জানি। এই নির্জন কুঠিতে বাস করছি আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। আমি তোমাদের মত গবেষক নই। সাধারণ চৈতন্য ভক্ত মাত্র। তাই আমার চিন্তাধারা বা মহাপ্রভুর জীবন বিশ্লেষণ আমি যে ভাবে করেছি তাই তোমায় বলছি। এ বিশ্লেষণ তোমার কোন কাজেই লাগবে না। তবুও একজনে সাধারণ ওড়িয়া ভক্তের চিন্তা-ভাবনার কথা অন্ততঃ তুমি জানতে পারবে।

কাল বলছিলাম চক্রধর মহাপাত্রের কথা। তাঁর মতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম উড়িষ্যাবাসী গ্রহণ করার ফলেই নাকি আমরা হীনবীর্য জাতিতে পরিণত হয়েছি।

গীতায় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই ধর্মরাজ্য। সে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কি প্রেমের দ্বারা? ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে ধরতে এবং ধরাতে হয়েছিল অস্ত্র। বলবান পুরুষই পারে ধর্মরক্ষা করতে।

শ্রীচৈতন্যদেবের দেহে ছিল অমিত শক্তি। তিনি ছিলেন বলবীর্য সম্পন্ন একজন সার্থক জননেতা। যদি তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ণয় করতে হয়, তাহলে স্মরণ করতে হবে, তিনি শুধু শচী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেননি, জন্মগ্রহণ করেছিলেন সমসাময়িক সমাজের গর্ভেও। তখন তাঁর জন্ম হয়নি। অবস্থান করছেন মাতৃ গর্ভে। সেই ১৪৮৫ সালে গৌড়-বঙ্গের তুর্কী (পাঠান) সুলতান জালালুদ্দীন ফতে শাহ (১৪৮১—১৪৮৭) হুকুমনামা জারি করলেন, দাও নবদ্বীপ উচ্ছন্ন করে। বিশেষ করে নাশ কর ব্রাহ্মণ অধিবাসীদের জাতি ধর্ম। কেননা গৌড়-বঙ্গের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলতে তখন বোঝাত নবদ্বীপকেই। হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তখন ব্রাহ্মণরাই।

পাঠান সুলতানের কেন এই ব্রাহ্মণ বিরোধিতা, তা কি চিন্তা করে দেখেছ কখনো। এর মূলে ছিল স্থানীয় এক দৈবজ্ঞের ভবিষ্যবাণী—'নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হবে।' কয়েক বছর পূর্বে ভিটুরিয়ার হিন্দু জমিদার গণেশ পাঠান রাজত্ব উৎখাত করে সাময়িকভাবে হয়েছিলেন গৌড়ের রাজা। তাঁর রাজত্বকাল ছিল খুব স্বল্পস্থায়ী (১৩৮৫-১৩৯২)। মাত্র সাত বছর। সুলতান ফতে শাহের রাজত্ব কালেও বাংলা দেশের বাইরে দিকে দিকে মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে সুরু হয়ে গিয়েছিল হিন্দুদের অভ্যুত্থান। কাজেই গৌড়ে হিন্দু রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা আশংকা পাঠান সুলতানের মনে জেগেছিল। এই সময়ে নবদ্বীপে নব্য ন্যায়, স্মৃতিশাস্ত্র, তন্ত্রসাধনা প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল পুনর্জন্মের। এইসব নতুন বিদ্যা শেখার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্রাহ্মণ যুবকরা দলে দলে এসে ভিড় করছিল। ফলে পাঠান সুলতানদের আশংকা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এ ছাড়া, স্থানীয় হিন্দুরা যদিও সংখ্যাধিক্য ছিল, এ কথা বাদ দিলেও সামরিক দক্ষতার দিক দিয়েও একেবারে হীনবল ছিল না। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল' প্রভৃতি জীবনী-গ্রন্থগুলিতে দেখছি, সমকালে নদীয়াবাসীরা তীর চালনা ও লাঠিখেলা প্রভৃতিতে হয়ে উঠেছিলেন দক্ষ। দৈবজ্ঞের ভবিষ্যবাণীতে বিশ্বাস করে হিন্দুরাও তখন ক্ষমতা দখলের জন্য দিকে দিকে শুরু করে দিয়েছিল প্রস্তুতি।—চৈতন্য এণ্ড হিজ এজ। পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪।

নবদ্বীপের কাছাকাছি একটি গ্রাম আছে। পিরালী তার নাম। জানো কি, এই গ্রামের হিন্দু অধিবাসীদের প্রায় সকলেই দীক্ষিত হয়েছিল ইসলাম ধর্মে। তাই তাদের মধ্যে ছিল হিন্দু বিদ্বেষ প্রচণ্ড রকমের। এরাই ছিল প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের গুপ্তচর। এই ধর্মান্তরিত মুসলমানরাই হিন্দু সংগঠন সম্পর্কিত রিপোর্ট সত্য-

মিথ্যায় জড়িয়ে পেঁাছে দিত সুলতানদের দরবারে। তাই তৎপর হয়ে উঠেছিলেন সুলতান ফতে শাহ বিদ্রোহী প্রজাদের দমনের জন্য। তিনি পিরালী গ্রামে একটা সৈন্য শিবিরও স্থাপন করেছিলেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য, স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মনোবল ক্ষুন্ন করা। জয়ানন্দ এই অত্যাচারের বর্ণনাই দিয়েছেন—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজ ভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥

—চৈতন্যমঙ্গল, নদীয়াকাণ্ড, পৃষ্ঠা-১১।

এই সময় তুর্কীদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নবদ্বীপের অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবার গৌড় থেকে চলে এলেন আমাদের উৎকলে। বাসুদেব সার্বভৌম এঁদের অন্যতম।

নিমাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। নবজাতকের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী দেখে বলেন—'এই জাতকের দেহে দেখছি রাজলক্ষণ।' এই শিশুই দৈবজ্ঞ-কথিত নবদ্বীপের ভাবী রাজা কিনা তা অপেক্ষা করে দেখতে হবে।'—বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, পৃষ্ঠা-৪।

আর জগন্নাথ মিশ্রের আত্মীয় বন্ধুবর্গ বললেন—'মহারাজ রাজাধিক লক্ষণ বিরাজে।'

আর একটা কথা নিশ্চয়ই জান, চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও প্রথম জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। বরং অনেকটা বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলেন। এসব ত চৈতন্য ভাগবতেই লেখা আছে। নিমাই-এর জন্মের পূর্ব থেকেই নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কমলাক্ষ ভট্টাচার্য ওরফে অদ্বৈত আচার্য। ইনি এসেছিলেন শ্রীহট্ট থেকে। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণ। চৈতন্যদেবের চেয়ে প্রায় ৫২ বছরের বড় ছিলেন। এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল নিমাইয়ের।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে অর্থাৎ চৈতন্য জীবনীতে লেখা আছে, নাকি অদ্বৈতাচার্যের আহ্বানে স্বয়ং ভগবান স্বর্গ থেকে এসে শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এসব হলো কবি কল্পনা। তাই বলে এর পিছনে সত্য যে কিছু নাই তা নয়। এই কমলাক্ষ ভট্টাচার্যের বংশ পরিচয় ঠিক ঠিক তোমার জানা আছে কি? নৃসিংহ নড়িয়াল ছিলেন এঁর পূর্বপুরুষ। আর এই নৃসিংহই ছিলেন রাজা গণেশের প্রধান উজীর। তোমাদের গৌড়ে সুলতানী রাজত্ব চলেছিল প্রায় দু'শত বছর। এই দু'শত বছরের মধ্যে একমাত্র হিন্দু রাজা হয়েছিলেন গণেশ, মাত্র সাত বছরের মত। এ কথা পূর্বেই বলেছি। তাছাড়া 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে—

সেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাহ মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥

অতএব বুঝতেই পারছ, নৃসিংহের মন্ত্রণা বলেই রাজা হতে পেরেছিলেন গণেশ। কমলাক্ষ ছিলেন এই বংশের সুযোগ্য সন্তান। তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধীশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি যেই শুনলেন নিমাইয়ের দেহে দেখা গেছে 'রাজকীয়' লক্ষণাদি, অমনি হয়ে উঠলেন সচেষ্ট। তিনি চাইলেন নিমাইকে বৈষ্ণব শিবিরের নেতৃত্ব দিতে। তাই গড়ে তুলতে চাইলেন নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী নিমাইকে। বলতে গেলে বলতে হয়, অদ্বৈত আচার্য নিজের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে নিমাইকে এক শাণিত অস্ত্র রূপে ব্যবহার করলেন।

পরবর্তী কালে কিছু বৈষ্ণব নেতা নিমাইয়ের দেহে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তির স্ফুরণ দেখতে পেলেও প্রকৃত পক্ষে নিমাইয়ের দেহে ছিল অমিত শক্তি, তাঁর দীর্ঘ ঋজুদেহ, আজানুলম্বিত ভুজযুগল—এ সবই পরিচয় দেয় দৈহিক শক্তি ও বীর্যবত্তার। তিনি শান্তিপুরে যেতেন অদ্বৈতাচার্যের বাড়ীতে হেঁটে নয়, গঙ্গায় সাঁতার কেটে।[১] তিনি লাঠি খেলায়ও ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর কি অধাধারণ শক্তি ছিল সে কথা তোমায় বলছি একটু পরেই। তার বিকাশ ঘটেছিল এই পুরীতেই। ঐশী শক্তির কথা শুনে নয়, দৈহিক শক্তির কথা শুনেই মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রথমে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে কাহিনী আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। আগে শোন নবদ্বীপের কথা।

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা একটা ভীষণ রাষ্ট্রবিরোধী সড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেও তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না তুর্কী রাজশক্তির মোকাবিলা করা। এর জন্য হিন্দু-সমাজের অন্যান্য শ্রেণী বিশেষ করে দৈহিক-শক্তিতে বলবান ও সংখ্যায় অধিক তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বর্ণাশ্রম ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণদের সহযোগিতা পাওয়ার কোন আশাই ছিল না। তাঁদের সংঘবদ্ধ করাও ছিল না সহজসাধ্য। কারণ তাঁরা টুনকো কৌলিন্যের বেড়াজালে নিজেদের করে ফেলেছিল ছিন্নভিন্ন। তাই একমাত্র বর্ণাশ্রম বিরোধী বৈষ্ণবমতাবলম্বী ব্রাহ্মণদের পক্ষেই তা ছিল সম্ভব। সর্ব ধর্ম ও সর্ব সম্প্রদায়ের লোকেরাই যোগ দিতে পারতেন সংকীর্তনের দলে।

---

১. দুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাপ দিয়া।
চলিলা আচার্য গৃহে গঙ্গাযে ভাসিয়া॥—চৈ. ভা. মধ্য. ১৯ অধ্যায়।

এ কথা খুব অপ্রিয় শোনালেও বলছি, চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার ছাড়া আর কোন তত্ত্ব প্রচার করেন নি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তাঁর নাকি সে যোগ্যতা ছিল না। তিনি টোলে মাত্র ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন। দর্শন বা অলংকার শাস্ত্রে তাঁর কোন ব্যুৎপত্তি ছিল না। এ কথাটা হয় ত একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে, শ্রীচৈতন্যদেবের পক্ষে কোন দার্শনিক মতবাদ বা রসতত্ত্ব প্রচারের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে 'যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চন্ডাল' সবাইকে এক করতে। তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল শুধু 'হরেকৃষ্ণ' নামের। বিশেষ কোন তত্ত্বের নয়। প্রকৃতপক্ষে নিয়মিত সংকীর্তনের দল বার করেই নবদ্বীপ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন এক অভূতপূর্ব সাড়া।

আমি সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলাম—প্রভুজী, আপনি বলছেন নিমাই শুধু টোলে ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন। তাহলে তিনি দিগ্বিজয়ী পন্ডিত কেশব কাশ্মীরিকে পরাজিত করলেন কেমন করে?

এ প্রশ্নটি কিন্তু ঠিক তোমার গবেষকের মত হলো না। কেশব কাশ্মীরির কথা কোথায় পেলে তুমি। বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যভাগবতে শুধু দিগ্বিজয়ী পন্ডিতের কথা বলেছেন। তিনি কোন নাম উল্লেখ করেননি। তারপর কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতেও কারো নাম নাই। শুধু বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের সূচিপত্রে আদ্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে লেখা আছে 'কাশীর পরাভব'। ঐ পরিচ্ছেদ ভাল করে পড়ে দেখো, তাতেও কোন পন্ডিতের নাম নাই। তাছাড়া কেশব কাশ্মীরি একাদশ শতাব্দীর মানুষ। তাঁর সঙ্গে নিমাই-এর জয়-পরাজয়ের কোন কথাই উঠতে পারে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নিমাইয়ের কাছে পরাজিত হওয়ার কোন দূর সম্ভাবনাও নাই।

তবে শুনেছি, পরবর্তী কালে কোন কোন গৌড়ীয় লেখক ঢুকিয়ে দিয়েছেন কেশব কাশ্মীরির নাম। এতে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। তাছাড়া কৃষ্ণদাস দিগ্বিজয়ীর যে শ্লোকের উল্লেখ করেছেন এবং নিমাই সেই শ্লোকের যে ভুল ধরেছেন, তাতে তাঁর ব্যাকরণ জ্ঞানেরই প্রকাশ ঘটেছে। আমি ত তাই বললাম, তিনি টোলে ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন। এখন শোন যা বলছিলাম।

নবদ্বীপের এই নতুন পরিস্থিতির কথা অচিরেই উঠল সুলতানের কানে। ইতিমধ্যে গৌড়ের রাজশক্তিতে ঘটে গেছে একটা গুণগত পরিবর্তন। জালালুদ্দীন ফতেশাহের পরে ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান বসেছেন গৌড়ের মসনদে। সুলতানরা সকলেই

ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির। ফলে আবিসিনিয়া থেকে আমদানি করেছিলেন প্রাসাদ রক্ষক হাবসীদের। এই প্রহরীরাই হয়ে উঠল বিশেষ প্রভাবশালী। অবিলম্বে এরাই দখল করে নিল মসনদ। দেশে চালু হলো হাবসী শাসন। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হাবসী শাসনের অবসান ঘটিয়ে দৃঢ়চেতা সৈয়দ হুসেন শাহ বসলেন গৌড়বঙ্গের মসনদে। তিনি সুলতান হয়েই নবদ্বীপের পরিস্থিতির চাইলেন মোকাবিলা করতে।

মসনদে বসেই লুট করলেন নবদ্বীপ শহর। ফতেশাহের লক্ষ্যস্থল ছিল শুধু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উপর। অত্যাচার করতেন তাঁদের উপরেই। হুসেন শাহ কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশেষ করে চৈতন্য অনুগামী বৈষ্ণবদের উপরই হয়ে উঠলেন রুষ্ট। ফতেশাহ ব্রাহ্মণদের উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু হুসেন শাহ তুলসীর মালা ধারণ করার উপরও করলেন নিষেধাজ্ঞা জারী। এমন কি আদেশ দিলেন তুলসী গাছ দেখলেই তা উপড়ে ফেলো। নিষিদ্ধ হল হরি সংকীর্তনও। স্নানের সময় গঙ্গার ঘাটে জমায়েত হত বৈষ্ণবরা, তাই বৈষ্ণবদের নিষিদ্ধ করেছিলেন গঙ্গা স্নান। এক কথায় বৈষ্ণব আন্দোলন যাতে দানা বাঁধতে না পারে, তার সব রকম ব্যবস্থাই নিলেন সুলতান হুসেন শাহ।—চৈতন্য এণ্ড হিজ এজ। দীনেশ চন্দ্র সেন।

এবার আর স্থির থাকতে পারলেন না চৈতন্যদেব। এবার তিনি নিজেই নেতৃত্ব দিলেন বৈষ্ণবদের। নামলেন আইন অমান্য আন্দোলনে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমাদের চোখে ধরা পড়ল চৈতন্যদেবের বীরমূর্তি। শ্রীবাস আচার্যের বাসগৃহই ছিল স্থানীয় বৈষ্ণবদের মিলন স্থল। এখানেই প্রতিনিয়ত মুখরিত ছিল কীর্তন গানে। কিন্তু বৈষ্ণবরা থাকতেন সদা শঙ্কিত। কখন না জানি সুলতানী ফৌজ আসবে তাঁদের ধরতে। একদিন দেখা গেল গঙ্গার বুকে ভেসে আসছে দুটি বড় বজরা। অমনি গুজব রটে গেল, ঐ দুই বজরা ভর্তি হয়ে আসছে সুলতানী ফৌজ বৈষ্ণবদের ধরতে। দেখা দিল স্থানীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে আতঙ্ক। স্বয়ং শ্রীবাস স্বগৃহে দরজায় খিল দিয়ে রইলেন ভিতরে বসে। একমাত্র নিমাই এলেন তখন এগিয়ে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন খিল খুলতে। বললেন দম্ভভরে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি একাই যাবেন সুলতানের দরবারে জবাবদিহি করতে।—চৈতন্য ভাগবত —বৃন্দাবন দাস। পৃষ্ঠা—১১১—১১৪।

শেষে এই গুজব প্রমাণিত হল মিথ্যা। তাই আর নিমাইকে যেতে হলো না সুলতানের দরবারে। কিন্তু সংঘর্ষ ঘনিয়ে এল অচিরেই। স্থানীয় ফৌজদার চাঁদ কাজীর সঙ্গে বাঁধল বিরোধ। একদিন কাজী সাহেব যাচ্ছেন পথ দিয়ে, এমন সময় তার কানে গেল খোল-করতাল সহযোগে কীর্তনের শব্দ। অমনি এই 'হিন্দুয়ানির

জোয়ার' বন্ধ করতে ব্যবস্থা নিলেন। কীর্তনরত লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন, তাদের খোল-করতাল ভেঙ্গে। নবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় ব্যবস্থা করলেন পাহারার। প্রকাশ্যে যেন কেউ আর কীর্তন না করতে পারে।

যখন নিমাইয়ের কাছে এসে পেঁছাল এই সংবাদ, তিনি সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তৎপর হলেন কাজী দলনে। তারপরের ঘটনা ত তোমরা সকলেই জান। কাজী নতি স্বীকার করলেন।

কিন্তু নিমাইয়ের মনে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিল। রাজশক্তির সঙ্গে এই প্রকাশ্য সংঘর্ষের পর তিনি ভাবলেন, এই সংবাদ যখন পেঁছবে সুলতানের কানে, তখন সুলতান তাঁকে ছেড়ে কথা কইবেন না। নিতে তৎপর হবেন এর প্রতিশোধ। ওদিকে ব্রাহ্মণ আর শাক্তরা ত তাঁর উপরে ক্ষেপেই ছিলেন। এমন কি প্রাণনাশের জন্য শলাপরামর্শও করেছিলেন। সে সংবাদও পেঁছেছিল নিমাইয়ের কাছে। তাই তিনি নবদ্বীপ ছাড়তে মনস্থ করলেন। (দেখুন এই লেখকের 'উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া')

এবার তোমাকে নিমাইয়ের চারিত্রিক শৈথিল্য সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতে চাই। আমি চৈতন্যভক্ত, তাই নিজ আরাধ্য দেবতার দোষগুণ বিচার করার আমার একান্ত অধিকার আছে। কারণ আমি কায়মনে চৈতন্য ভজনা করি। বিচার করি দোষগুণ নিয়েই। তার মধ্যে গ্রহণ করি, গুণটাই এবং সেই গুণ, যার জন্য তাঁর স্থান ভগবানের আসনে। যদিও তিনি নিজেকে কখনো ভগবান মনে করতেন না। এমন কি সন্ন্যাসী বলতেও দ্বিধা বোধ করতেন। সে প্রসঙ্গে আসছি পরে।

বলছিলাম চারিত্রিক শৈথিল্যের কথা। বাজারে তাঁর চরিত্র নিয়ে 'কলঙ্ক' রটেছিল। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে নরহরি সরকার ছিলেন অন্যতম। তিনিই দেশে চৈতন্যপূজা প্রবর্তনের পথিকৃৎ। এই পূজার পদ্ধতি ও মন্ত্র রচনা করেছিলেন নিজেই। নরহরির প্রধান শিষ্য লোচন দাস। গুরুর নির্দেশে লোচন একটি চৈতন্যজীবনী রচনা করেন। তার নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'। এই পুস্তকে চৈতন্যদেবকে 'নদীয়া নাগর' হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই চিত্রকে তোমরা হয়ত নিতান্ত অহেতুক বলে মনে করবে। কিন্তু আমি বলছি মহাপ্রভুর চরিত্রের মধ্যে এমন একটা নারীসঙ্গপ্রীতি ছিল, যার জন্য তাঁকে নাগর হিসেবে প্রদর্শিত করার বাসনা উদিত হয়েছিল লোচনের মনে। এ সম্পর্কে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণও তোমাকে দিচ্ছি।

পিতার মৃত্যুর পরে সেই ছাত্রাবস্থাতেই দুপুরে টোল থেকে ফেরার পথে মাঝে

মাঝেই গঙ্গার ঘাটে এসে উপস্থিত হতেন। স্থানীয় মহিলারা তখন আসত স্নানে। সেই স্নানের ঘাটে বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর হয় শুভদৃষ্টি বিনিময়। 'নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।' লক্ষ্মীদেবীও তাঁকে দেখে ভুলে গেলেন। করলেন তাঁর 'পাদবন্দনা'। তারপর বল্লভাচার্যের কাছ থেকে এল নিমাইয়ের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব। শচীদেবী কিন্তু শোনা মাত্রই তা নাকচ করে দিলেন। বললেন—"পিতৃহীন বালক আমার। জীউকপঢ়ুক আগে তবে কার্য আর॥' কিন্তু পরে 'বালক' প্রেমিকটির কাছ থেকে বিবাহেচ্ছার 'ইঙ্গিত' পেয়ে তিনি 'হরষিত মনে' অনুমোদন করলেন বিবাহ প্রস্তাব। চৈতন্য ভাগবত-বৃন্দাবন দাস। পৃঃ ৪৮-৪৯।

বিবাহের পর লক্ষ্মীদেবীর হলো আকস্মিক মৃত্যু। মৃত্যুর কারণ ঠিক ঠিক জানা যায়নি। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার ইচ্ছা তাঁর কোনদিনই ছিল না। সে প্রসঙ্গ থাক।

কিন্তু এর পরেই নিমাই এমন এক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন, যা তাঁর মানব সুলভ দুর্বলতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীবাসের গৃহেই বইত কীর্তনের জোয়ার। এই শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী 'বাল্যবিধবা' হয়ে বাস করতেন পিতৃব্যের গৃহে। এই সময় স্বামীর মৃত্যুর প্রায় আঠার মাস পরে তার গর্ভসঞ্চার হলো। এর জন্য দায়ী করা হয়েছিল নিমাইকে।

এ সব কি বলছেন আপনি প্রভুজী। আমি প্রায় চিৎকার করে বলি, না, নারায়ণী তখন চার বছরের বালিকা মাত্র। এসব বৃন্দাবন দাস নিজেই লিখেছেন তার 'চৈতন্য ভাগবতে'। আপনি ও প্রসঙ্গ বন্ধ করুন। আমি চাই না শুনতে।

তার অর্থ, তুমি সত্য গোপন করতে চাইছ। তুমি না গবেষক, তুমি না ঐতিহাসিক। সত্য উদ্ঘাটিত করাই ত তোমার ধর্ম। তুমি তা হলে সে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে চাইছ। চাইছ একটা সত্যকে জেনেশুনে চাপা দিতে। তুমি কি বলতে চাও তুমি কিছুই জান না। আমি এতক্ষণ বললাম, কই তার একটা কথারও ত তুমি প্রতিবাদ করনি। তাহলে একথার প্রতিবাদ করছ কেন এমন চিৎকার করে। এ ত চৈতন্য প্রেমিকের লক্ষণ নয়।

না না প্রভুজী, আমায় অমন করে অভিযুক্ত করবেন না। আমি শুনতে চাই না ওসব কথা।

না, তোমায় আমি কিন্তু ছাড়ছি না। তোমার কথাই প্রমাণ করছে তুমি সব কিছু জান। আর জেনেশুনেই প্রতিবাদ করছ আমার কথার। তোমাকে বলতেই হবে কি তুমি জান।

সহসা গম্ভীর হয়ে প্রভুজী তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। প্রশান্তিতে ভরা মুখমণ্ডল, কিন্তু দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ আমার মুখের দিকে। আমি বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম প্রভুজীর দিকে। দেখলাম তাঁর চক্ষু দু'টি যেন আমাকে বলতে অনুরোধ করছে। আমি তখন যা জানি ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলাম।

শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী। চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই নারায়ণী দেবীর একমাত্র পুত্র। বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে পিতার কোন নাম উল্লেখ করেননি। বার বার মায়ের নামই উল্লেখ করেছেন। এই নিয়ে সে যুগের বৈষ্ণব সমাজে সংশয়ের গুঞ্জন উঠেছিল। শ্রীবাসেরা চার ভাই। চারজনই চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত। শ্রীবাসের অন্য তিন ভাইয়ের নাম নিয়ে কিছু গোলমাল আছে। স্বয়ং বৃন্দাবন মাত্র দু'জনের নাম উল্লেখ করেছেন—শ্রীবাস ও শ্রীরাম। কবিকর্ণপুর শ্রীপতি বলে আর এক ভাইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। 'প্রেমবিলাসে' কিন্তু পেয়েছি চার ভাইয়ের নাম—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীকান্ত। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে এই চার ভাইয়ের নাম বলেছেন—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি। (আদি, ১০ম)

'প্রেমবিলাসে' দেখতে পাচ্ছি শ্রীবাসের আর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁর নাম নলিনী পণ্ডিত। তিনি নাকি পূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁরি কন্যা নারায়ণী। আর বৃন্দাবন দাস এই নারায়ণীর পুত্র। আবার কেউ কেউ নারায়ণীকে শ্রীরামের কন্যা বলেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে সেরূপ কোন উল্লেখ দেখছি না। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে তাঁর মায়ের নামই উল্লেখ করেছেন। কেবল দেখেছি অন্ত্যখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আত্মপরিচয় একটু বিস্তারিত ভাবে দিয়েছেন—

সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত ॥

মধ্যখণ্ডের ২য় অধ্যায়ে নারায়ণীর বাল্যবয়সের একটি কাহিনী আছে। সুলতানের চর ধরতে আসছে বৈষ্ণবদের, এই গুজব যখন ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে, তখন শঙ্কিত হয়ে উঠল বৈষ্ণব সমাজ। নিমাই নিজ মহিমা ও বিভূতি প্রকাশ করে উড়িয়ে দিলেন রাজভীতি। অবশেষে বললেন—' মোর শক্তি দেখ্ এবে নয়ন ভরিয়া।' তাঁর অলৌকিক প্রভাবে চার বছরের বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলে আরম্ভ করল কাঁদতে ঃ

সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম নারায়ণী ॥

অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী' ॥
সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ।
আজ্ঞা কৈল 'নারায়ণি কৃষ্ণবলি কাঁদ' ॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদে নাহিক সম্বিত ॥'

—চৈ. ভা. মধ্য. ২য় অ. পৃঃ ১২৪

মুরারি গুপ্ত তাঁর কড়চাতেও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন ঃ

শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াভর্তৃকা মধুর দ্যুতিঃ
প্রাপ্য হরেঃ প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা ॥

আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতেও লিখেছেন ঃ

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নারায়ণীই বৃন্দাবন দাসের গর্ভধারিণী। কিন্তু গোল বেঁধেছে এর পর থেকেই। বৃন্দাবন তাঁর গ্রন্থের আর একস্থানে উল্লেখ করেছেন চৈতন্যের ভুক্তাবশিষ্ট বালিকা নারায়ণী আহার করেছিলেন ঃ

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষে প্রভু করে দান ॥
... ...
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী ॥

নিজে কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর জন্ম বিবরণ বর্ণনা করে ধৈর্য হারিয়ে এর পরেই অবিশ্বাসীদের গালি দিয়েছেন—যা বৈষ্ণব-বিনয় ও নমনীয়তার ঘোর বিরোধী ঃ

এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ॥

—চৈ. ভা. মধ্য. ১০ অ. পৃ. ১৭৬

কথা হচ্ছে বৃন্দাবন দাস কোথাও পিতার নাম উল্লেখ করেননি। দেখা যায় প্রায়শঃই এইরূপ প্রসঙ্গে অবিশ্বাসীদের প্রতি তিনি কটূক্তি বর্ষণ করে নিজের হৃদয়ের জ্বালা মিটিয়েছেন। নারায়ণী বাল্যকাল থেকেই চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। চার বছরের বালিকা নারায়ণীকে নিমাই কাঁদিয়ে ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে। কিন্তু কার সঙ্গে নারায়ণীর বিবাহ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে প্রামাণিক উৎসগুলি থেকে কিছু পাচ্ছি না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস—'নারায়ণী'র নন্দন' বলেই বাক্ সংযম করেছেন। অতএব বৃন্দাবন দাসের পিতৃ পরিচয় নিয়ে কিছু যে গণ্ডগোল ছিল তাতে সন্দেহ নাই। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাসে'র কথা বলেছি। গবেষকগণ ইতিহাস হিসাবে এর প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। তাহলেও এই গ্রন্থে বৃন্দাবনের পিতার উল্লেখ আছে। এই মতে নারায়ণী শ্রীবাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিনী পণ্ডিতের কন্যা। নারায়ণীর বয়স যখন এক বছর, তখন তাঁর মা বাবা মারা যান। শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনীদেবী নারায়ণীকে লালনপালন করেন। কুমার হট্টবাসী বৈকুণ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে নাকি বাল্যেই নারায়ণীর বিবাহ হয়।

কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ যেঁহো।
তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ ॥
বৃন্দাবনদাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠনাথ চলি গেল স্বর্গে।—প্রেমবিলাস।

এই বর্ণনা থেকে বৃন্দাবন দাসের পিতৃ পরিচয় নিয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু পরবর্তী কালে গোলযোগটি তীব্র আকার ধারণ করে। জগবন্ধু ভদ্র তাঁর 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকায় লেখেন ঃ

"বৃন্দাবন দাস এহেন নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভজ সন্তান। ১৪২৭ শকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করেন। পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী তখন বিধবা; তাঁহার বয়ঃক্রম নয়, কি দশ বৎসর। একদা নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে তিনি বালবিধবা নারায়ণীকে 'পুত্রবতী হও' বলিয়া অন্যমনে আশীর্বাদ করিলেন। আশীর্বাদ শুনিয়া নারায়ণী নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! একি সর্বনেশে আশীর্বাদ!" অবধূত কহিলেন, "বৎসে, ভয় নাই। তুমি অসতী হইবে না; কেহ তোমার কুৎসা করিতে পারিবে না; আমার আশীর্বাদে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ ভক্ষণে তোমার গর্ভসঞ্চার হইবে, এবং সেই গর্ভে দ্বিতীয় ব্যাসতুল্য এক পুত্ররত্ন জন্মিবে।" ইহার কিছুদিন পরে মহাপ্রভুর চর্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া নারায়ণী ঠাকুরাণী গর্ভবতী হলেন, এবং সেই গর্ভে ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশীতে

বৃন্দাবন দাস অষ্টাদশ মাস গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হলেন। নারায়ণীর গর্ভ যখন সাত-আট মাসের, তখন নবদ্বীপস্থ তদানীন্তন কাজী এই অদ্ভুত গর্ভসঞ্চারের সংবাদ পাইয়া শ্রীমতী নারায়ণী দেবীকে কাছারীতে লইয়া যান। প্রভু নিত্যানন্দ কাজীর গৃহে উপস্থিত হইয়া কাজীকে ভর্ৎসনা পূর্বক কহিলেন, "অবোধ, তুমি স্বেচ্ছায় কেন জ্বলন্ত পাবকে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়াছ? মাতা নারায়ণীর গর্ভে স্বয়ং বেদব্যাস উদিত, তুমি কি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও?" নিত্যানন্দ প্রভুর মুখ হইতে এই বাক্য বহির্গত হইতে না হইতে গর্ভস্থ শিশু হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। কাজী একান্ত ভীত হইয়া শিবিকা যোগে নারায়ণীকে শ্রীবাসগৃহে প্রতিপ্রেরণ করিলেন। কিছু দিনান্তর নারায়ণী মাতুলালয় শ্রীহট্টে যাইয়া বাস করিলেন, এই স্থলেই কবির জন্ম। বৃন্দাবন দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে জারজ সন্তান বলিয়া লোকে তাঁহার মাতাকে নানা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। লোকনিন্দা হইতে মুক্তিপ্রাপ্তি, তথা ভক্তিরসে মন নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে দেড় বৎসরের শিশু সন্তান লইয়া শ্রীহট্ট মাতুলালয় পরিত্যাগপূর্বক নারায়ণী ঠাকুরাণী ১৪৩০ শকের আশ্বিন মাসে নবদ্বীপের সন্নিকট মামগাছি গ্রামে আসিয়া কাঙ্গালির বেশে বাস করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর আদেশক্রমেই নারায়ণী ঠাকুরাণী মামগাছির বাসুদেব দত্তের গৃহে পুত্রসহ বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি উক্ত গ্রামে 'নারায়ণীর পাট' বর্তমান।'—জগদ্বন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকা।

তা ভদ্র মশায় বেশ গল্প ফেঁদেছেন ত। এসব কি তুমি বিশ্বাস কর। ওসব ছাড়া, এ সম্পর্কে আর কি জান আমায় তাই শোনাও। স্থির শান্তস্বরে প্রভুজী বললেন।

প্রভুজী স্বীকার করছি এসব প্রচলিত উপকথার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য যেমন নাই, ঠিক একথাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে বৃন্দাবন দাসের জন্মকথার মধ্যে কিছু রহস্য অবশ্যই আছে।

তাহলে তুমি বল সেই রহস্যটা কি? প্রভুজী শান্ত ভাবেই বললেন।

এ কথা ঠিকই পিতার ঔরসে তাঁর জন্ম হয়নি। উক্ত গৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধব দাসের (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) একটি পদে স্পষ্টতঃই স্বীকৃত হয়েছে ঃ

প্রভুর চর্বিত পান স্নেহবশে কৈলা দান
নারায়ণী ঠাকুরানীর হাতে।
শৈশব বিধবা ধনী স্বাধবী সতী-শিরোমণি
সেবন করিল সে চর্বিত ॥

প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা বালিকা গর্ভিনী-হৈলা
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল।
দশ মাস পূর্ণ যবে মাতৃগর্ভ হৈতে তবে
সুন্দর তনয় এক হৈল ॥
সেই বৃন্দাবন দাস ত্রিভুবন সুপ্রকাশ
চৈতন্যলীলার ব্যাস যেই।
উদ্ধব দাসের দয়া করি দিবে পদছায়া
প্রভুর মানস পুত্র সেই ॥

অবশ্য যদিও উদ্ধব দাস অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি, তাহলেও এই পদ থেকে জানা যাচ্ছে, মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় দু'শত বছর পরেও বৃন্দাবন দাসের জন্মসংক্রান্ত এই কাহিনী বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ছিল।

ব্যাস, আর তোমায় বলতে হবে না। ঐ 'প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা' কথাটির ব্যঞ্জনা অত্যন্ত রহস্যময় কিনা তুমিই চিন্তা করে বল। তোমরা আজকের যুগের বিজ্ঞান-সচেতন মানুষ। মহাপ্রভুর শক্তি সঞ্চারের ফলে অলৌকিক ভাবে নারায়ণী দেবীর গর্ভ হয়, একথা কি আজকে তোমরা বিশ্বাস করবে? আরো একটা কথা, ভদ্র মহাশয়ের কথা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে, নারায়ণীর পুত্র জন্মের পর তার স্থান হলো না পিতৃগৃহে। তাঁকে গিয়ে বাস করতে হল মামগাছিতে বাসুদেব দত্তের গৃহে। কেন তাঁর শ্রীবাসের গৃহে ঠাঁই হলো না। এসব কি একবারও ভেবে দেখবে না?

প্রভুজী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। আমি মাথা অবনত করে আমার কলম ধরে নাড়াচাড়া করতে থাকলাম।

আমি জানি, তুমি আরো অনেক কথা জান এবং বলতে পারবে। সে সব কথা না শুনে তোমায় বলি আমার এই পুরীর ঘটনা। পুরীতেও প্রভু পড়েছিলেন নারীর দৃষ্টিতে। একটা ঘটনা তোমার জানা। দামোদরের জন্যই শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভু সে কলঙ্ক থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমেই ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে।

এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই পিতৃহীন এক 'ব্রাহ্মণ কুমার' কে চৈতন্যদেব খুব স্নেহ করতেন। ব্রাহ্মণ পুত্রটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল। ব্যবহারটিও ছিল ভারী ভদ্র। নম্র স্বভাবের ছেলে। প্রতিদিন সে আসত প্রভুর কাছে। একদিন প্রভুকে না দেখলে বা প্রভুর কাছে না এলে সে থাকতে পারত না। চৈতন্যদেব অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতেন তাঁর সঙ্গে। খুব হৃদ্যতার সঙ্গে। কৃষ্ণদাস লিখেছেন—

প্রভুতে তাঁহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে॥

তাই দামোদর ঐ ব্রাহ্মণ কুমারকে প্রভুর কাছে আসতে নিষেধ করে। কিন্তু সে নিষেধ ব্রাহ্মণ কুমার শুনত না। প্রতিদিনই যথা নিয়মে সে আসত প্রভুর কাছে। যেখানে ভালবাসা পায় ছেলেমানুষ সেখানেই আসে। এইত রীতি। কিন্তু দামোদরের তা কিছুতেই সহ্য হতো না। অবশেষে একদিন যখন—

কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারে দামু কহিতে লাগিলা॥

'গোসাঞি, এবার পুরুষোত্তমের সকলেই জানবে তুমি কেমন গোসাঞি। বেশ হবে। সকলেই তোমার গুণ গাইবে। "গোসাঞির প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হৈবে॥"

না জানার ভান করে প্রভু বললেন—'কাঁহা কহ দামোদর।' কি বলছ তুমি দামোদর, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

দামোদর বললে—হ্যাঁ, তুমি যা ইচ্ছে তাই কর। তুমি ত 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর,' তোমাকে কে কি বলবে বলো।

স্বচ্ছন্দে আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতে মুখ পার আচ্ছাদিতে॥

তুমি লোকের মুখ বন্ধ করতে পারবে। এখানেও একটা কেলেংকারী না করে ছাড়বে না দেখছি। তোমাকে আমি কি আর বলব।

পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কানাকানি বাতে দেহ অবসর॥

বুঝতে পারছ দামোদর প্রভুকে কেন সাবধান করছেন। এই সাবধান বাণীর মধ্যে তুমি কি বলতে চাও, অতীত ঘটনার কোন ইঙ্গিত নাই। দামোদর প্রভুর প্রকৃতি না জেনেশুনেই কি এসব কথা বলছেন। সব কিছুকেই তাঁর লীলা বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। শুধু তাই নয়, তিনি এখানে দেবদাসী লাবণ্যকেও কৃপা করেছিলেন।

এসব কি বলছেন প্রভুজী! কই লাবণ্যের নাম ত কোথাও শুনি নাই। কোথায় কোন গ্রন্থে আছে?

অত উতলা হচ্ছ কেন। বলছি তোমায় শোন, তুমি ত পুরীতে এসেছ। নিশ্চয় থাকবে কিছুদিন। যাও, দেখা কর এখানের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পদ্মশ্রী পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মার সঙ্গে। আরো জানতে পারবে অনেক নতুন নতুন খবর। উনি দীর্ঘকাল গবেষণা করছেন। বিরাট পণ্ডিত মানুষ। ভারত সরকার কি আর ওঁকে অমনিতে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

ওঁর ভীষণ নাম শুনেছি। কিন্তু কোথায় থাকেন তা ত জানি না। আপনি যদি দয়া করে বলেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমি ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।

এ জন্য তোমায় বিশেষ কষ্ট করতে হবে না। ওঁর বাড়ী এই পুরীতেই। পাথর সাই এলাকায়। পুরীর যাকেই বলবে দেখিয়ে দেবে পথ। ওঁকে চেনে সকলেই। তুমি আর এক কাজ করতে পার, কাল সকালেই জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে জিগ্গেস করো যে কোন পাণ্ডাকে, তারাই ঠায় ঠিকানা সব বলে দেবে।

দেখ তুমি নিজেই স্বীকার করছ বৃন্দাবন দাস তাঁর পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন নি। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস কিন্তু জানতেন কে তাঁর বাবা। এ কথা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করে গেছেন। এখনকার ছাপা চৈতন্যভাগবতে আছে কিনা বলতে পারব না, কিন্তু প্রাচীন বহরমপুর সংস্করণের চৈতন্যভাগবতে এই দু'টো লাইন দেখেছিলাম:

'হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে মুখ দরশনে ॥'—চৈ. ভা.

এ মুখ কার মুখ? নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ শ্রীচৈতন্যদেবের। নিজ পিতৃমুখ সন্দর্শন না করার জন্য কবির এই আক্ষেপ।

আমি বললাম, প্রভুজী যা বলছেন, ঠিকই। কিন্তু 'উনি' পিতা বলে বৃন্দাবন দাস জানতেন, এই দু'টি পদ থেকে কিন্তু তা পরিস্কার হচ্ছে না। অর্থাৎ যখন বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন, তখন শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে। প্রভুর নবদ্বীপলীলা দেখেননি বলেই কবির হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। তাই এই আক্ষেপোক্তি।

তোমার কথামত তাই যদি হয়, বলত কবি যখন প্রভুকে লীলাচলে দেখতে আসতে চাইলেন, তখন নিত্যানন্দপ্রভু তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন না কেন? ব্যাপারটা নিত্যানন্দ অবধূতও জানতেন পুরোপুরি। পাছে কবিকে দেখে প্রভুর অপত্য স্নেহ জেগে ওঠে তাই তিনি নিয়ে আসেন নি।

না প্রভুজী ও কারণে নয়, ব্যাপারটা ঘটেছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। কিশোর

বৃন্দাবন গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে আসছিল নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করতে। বর্ধমানে মন্তেশ্বরের কাছে দেনুড় গ্রামে এসে সকলে পান-ভোজন করলেন। ভোজনের শেষে প্রভু নিত্যানন্দ কিশোর বৃন্দাবনকে চাইলেন মুখশুদ্ধি। বৃন্দাবন বললো, এইটি পূর্বদিনের সংগৃহীত হরিতকী আপনি গ্রহণ করুন। তখন নিত্যানন্দ বললেন, তুমি আজ থেকে বড় সঞ্চয়ী হতে শিখেছ। তোমার নীলাচলে প্রভু সন্দর্শনে যাওয়া চলবে না।

এ গল্পটি নিশ্চয়ই ঐ জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের। তা গল্পটি উনি পেলেন কোথায়। কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন? তা গল্প সত্য মিথ্যে যাই হোক না কেন। একটা অজুহাত দেখিয়ে বৃন্দাবনের নীলাচলে আসা বন্ধ করা হয়েছে। তা না হলে দেখ মূলে আমার বক্তব্য কিন্তু ঠিকই আছে।[১]

এবার তোমার আর একটা প্রশ্নের জবাব দিই। তুমি বলছিলে নারায়ণী তখন চার বছরের বালিকা মাত্র। কখন? না যখন তিনি নারায়ণীদেবীকে কাঁদিয়েছিলেন 'কৃষ্ণ' বলিয়ে। তখন তাহলে চৈতন্যদেবের বয়স কত? নিশ্চয়ই তেইশ বছরের কম হবে না। অর্থাৎ সে হলো প্রায় ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

আমি বললাম—'তাহলে আপনিই বলুন প্রভুজী, তেইশ বছরের যুবকের সঙ্গে কি চার বছরের বালিকার প্রেম হওয়া সম্ভব, না তা বিশ্বাসযোগ্য। তাই বলছিলাম এসব প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। অতীতে রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও কথাটা তুলে বৈষ্ণবদের কাছে খুব অপ্রিয় হয়েছিলেন।

অর্থাৎ সেই ভয়ে তুমি অপ্রিয় হতে চাইছ না, তাই ত। প্রভুজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি যা বলেছ, স্বীকার করছি আমি যে কথা। চার বছরের মেয়ের সঙ্গে তেইশ বছরের যুবার প্রেম কোন মতেই সম্ভব নয়। তা হলে তুমিই বলো, চার বছরের বালিকার সসত্বা হওয়া কোন লৌকিক বা অলৌকিক উপায়েও কি হওয়া সম্ভব? এদিকে উদ্ধব দাসের পদাবলীতে তুমি কি বললে—'শৈশব-বিধবা ধনী সাধবী সতীশিরোমণি? কার সঙ্গে বিয়ে হলো প্রামান্য উৎসগুলিতে সে সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। না থাক, বিয়ে যে তখনো নারায়ণীর হয়নি একথা ত তুমি স্বীকার করবে। তা যদি হতো বৃন্দাবন দাস সে কথা লিখতেন অবশ্যই।

কিংবা আমি তোমায় উল্টো দিক থেকেই প্রশ্ন করি। নারায়ণী দেবীর তাহলে কত বছর বয়সের সময় বৃন্দাবনের জন্ম হয়। সে কথা তুমিও ঠিক বলতে পারবে না,

১. এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ যদি জানতে চান পড়ুন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড।

আর আমিও বলতে পারব না। তাহলে যা বলব, তাহবে অনুমান সাপেক্ষ। তোমাদের দেশের ঐতিহাসিক ও সমালোচকগণ কি বলেছেন। জগবন্ধু ভদ্র, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী বা হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির অনুমান, ১৪২৯ শকের (১৫০৭ খ্রী. অ.) বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশীতে বৃন্দাবন জন্মগ্রহণ করেন। আর তোমাদের আধুনিক ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৪৫৭ শকে (১৫৩৫ খ্রী. অ) এবং ডঃ সুকুমার সেনের মতে ১৫০৭-১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন।

এই সব বিখ্যাত গবেষকগণের শক, খ্রীষ্টাব্দ মাথায় রেখে আর একজন বৈষ্ণব সাহিত্যের খ্যাতিমান গবেষক ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের সূত্র ধরে এসো আলোচনা করে অগ্রসর হই। ধরেই নিই ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণীর বয়স চার বছর হয়েছিল। অন্ততঃ চৌদ্দ বছর বয়সের পূর্বে তাঁর মাতৃত্ব লাভ কোন মতেই সম্ভব নয়, অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর বৃন্দাবনের জন্ম হওয়া সম্ভব। কারণ বৃন্দাবন দাস ত বার বার বলছেন ঃ

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইলাভ বঞ্চিত সে মুখ দরশনে॥

অর্থাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যলীলার সময়ে বন্দাবনের জন্ম হয়নি। তাই কবির আক্ষেপ চৈতন্যদেবের জীবৎকালে কবি বর্তমান থেকেও তিনি সে লীলা প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। কারণ, ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব নীলাচলে ছিলেন। তাহলে ১৫১৯ খ্রীষ্টাদের কাছাকাছি সময়ে বৃন্দাবনের জন্ম হওয়া সম্ভব। তাহলে মহাপ্রভুর তিরোধানের সময়ে (১৫৩৩ খ্রী. অ.) কবির বয়স চৌদ্দ কি পনের বেশী হবে না। নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরেও প্রায় আট বছর জীবিত ছিলেন। তাহলে তখন বৃন্দাবনের বয়স প্রায় বাইশ-তেইশ।

এবার আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, তাহলে প্রভুজী, ডঃ মজুমদারের সিদ্ধান্তকে যদি গ্রহণ করি, তাহলে ত চৈতন্য-চরিত্রে কোন কলঙ্কই আরোপ করা চলে না। আমার মনে হয় ডঃ মজুমদারের সিদ্ধান্তই ঠিক। আমার দেশের আর একজন বিখ্যাত গবেষক ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হচ্ছে ডঃ মজুমদারের সিদ্ধান্তকেই বেশী সমর্থন করেছেন। অবশ্য তিনি একথাও স্বীকার করেছেন, বৃন্দাবন দাসের জন্ম রহস্যমণ্ডিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৫।

তুমি তোমার বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য পেয়ে খুব খুশি হয়ে উঠেছ। কিন্তু ডঃ মজুমদার বৃন্দাবন দাসের কথামত নারায়ণী দেবীর বয়স তখন চার বছর, শুধু আলোচনার খাতিরেই ধরে নিয়ে হিসাব করেছেন। এই হিসাব যে নির্ভুল তা বলি

কেমন করে। কেন না, ভুক্তাবশেষ খেয়েই নারায়ণী যে সসত্ত্বা হয়েছিল সে ইঙ্গিত চৈতন্যভাগবতেই আছে।

'ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা যে পাইল ॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান ॥

—চৈ. ভা. মধ্য ১০ অ. পৃ. ১৭৬ (রিফ্লেক্ট)

'বালিকা অজ্ঞান' এই দুটি শব্দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দাও। এখানে কবি কি বলতে চাইছেন? তখনো নারায়ণী দেবীর যুবতীসুলভ জ্ঞান হয়নি। তার অর্থ এই নয় কি, দেহে যৌবন এলেও জ্ঞানে সে তখনো বালিকা। তাই মানব সুলভ দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে একাজ সে করেছিল। অর্থাৎ সজ্ঞানে করে নি। তাই 'বালিকা অজ্ঞান' শব্দ কবি ব্যবহার করেছেন। কথাটা তুমি নিজে ভাল করে চিন্তা করে দেখ। যৌবনের প্রথমে অনেক সময় অজ্ঞানে আমরা দুর্বলতার স্বীকার হই। তার জন্য সারাজীবন আমাদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়। হয়ত 'শৈশবে বিধবা ধনী' নারায়ণী দেবী ও বৃন্দাবন দাসকেও এই একই মর্ম-যন্ত্রনায় সমাজের কাছে নানা কুৎসা শুনতে হয়েছিল।

আর একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে বৃন্দাবন দাসের জন্মকলঙ্ক অপনোদন করার জন্যই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিগণ নানা কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন। এসব বিবেচনা করেই তোমাদের ঐ ডঃ মজুমদার স্পষ্ট করে বলেছিলেন—'শ্রীবাসের ভ্রাতৃতনয়া, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্রী নারায়ণী দেবী বিধবা অবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন একথা মানিয়া লইতে বৈষ্ণব লেখকগণের কষ্ট হয়, তাই তাঁহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে বৃন্দাবন বৈধ বিবাহের ফলে জাত।"—চৈতন্যচরিতের উপাদান।

ডঃ সুকুমার সেনের কথামত যদি ধরা যায় ১৫০৭।৮ বা ৯ খ্রীষ্টাব্দে যদি বৃন্দাবনের জন্ম হয়, তাহলে তখন নারায়ণীর বয়স বৃন্দাবনের কথা মত তাঁর মায়ের বয়স আরো দু'বছর কম হবে। অর্থাৎ নারায়ণীর বয়স তখন মাত্র দু'বছর। তাহলে কি তুমি বলতে চাও নারায়ণী এক বা দেড় বছর বয়সে সসত্বা হয়েছিল। যদি তা না হয়, তাহলে বলতে হবে ডঃ সেন ভুল বলেছেন, নয় বৃন্দাবন দাস নিজেই মিথ্যে লিখেছেন। ডঃ মজুমদার যে হিসেব দিয়েছেন, সেই হিসেব মত ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য হয়। কেননা চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময় অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনের বয়স চৌদ্দ কি পনের হবে।

কিন্তু এতেও সমস্যা কোথায় জান, তাহলে বৃন্দাবন বলতেন না প্রভুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণের ফলে বা উদ্ধব দাসের কথা মত 'প্রভুর শক্তি সঞ্চারে'র ফলে তাঁর জন্ম হয়েছে। কেন না ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দেই ত প্রভু নবদ্বীপ ছেড়ে নীলাচলে চলে এসেছেন। সে ক্ষেত্রে প্রভুর নামে কোন কলঙ্ক লাগতেই পারে না। আর বৃন্দাবন 'চৈতন্যের মানসপুত্র'ই বা হবেন কেমন করে ?

এবার দুনম্বর সমস্যার কথা শোন। নিত্যানন্দের আদেশেই বৃন্দাবন দাস চৈতন্য জীবনী লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এ কথা বৃন্দাবন বার বার উল্লেখ করেছেন। তাহলে কি তুমি বলতে চাও, ঐ ১৪।১৫ বছরের বালকের উপরে তিনি এই গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নিই, নিত্যানন্দ আদেশ দিয়েছিলেন, তাহলেও ঐ বয়সে কি কবি অত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। শুধু যে কবিকে নিত্যানন্দ তথ্য দিয়েছিলেন তা নয়। ঐ বয়সে অমন বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাব্য লেখা, বিশেষ তোমাদের সাহিত্য জগতে তখন চলছে মঙ্গলকাব্যের যুগ। সেই যুগকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ নতুন পথে যাত্রা করা কি কম প্রতিভার কাজ। তাই বলে তুমি মনে করোনা আমি বৃন্দাবনকে প্রতিভাধর নয় বলে অস্বীকার করছি।

আমি বললাম, প্রভুজী, যদি বলি তিনি যৌবনেই অর্থাৎ ২২।২৩ বছর বয়সে 'চৈতন্য ভাগবত' লেখা আরম্ভ করেছিলেন। তাহলে ত সমস্যা মিটে যায়।

প্রভুজী বললেন—অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর নিত্যানন্দ বেঁচেছিলেন আরো আট বছর। তাহলে তোমার কথামত বৃদ্ধবয়সে মৃত্যুর সময় নিত্যানন্দ কবিকে চৈতন্য জীবনী লিখতে বলে গিয়েছিলেন। তা না হয় স্বীকার করলাম। তাহলে আমার প্রথম এবং মূল সমস্যার সমাধান কেমন করে করবে তাই বল।

আমি নিরুত্তর। কোন যুক্তিপূর্ণ উত্তর খাড়া করতে পারলাম না। বসে রইলাম।

প্রভুজী বললেন—বুঝেছি তোমার মনে ভীষণ আঘাত লেগেছে। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য ত এই নয় যে আমি চৈতন্যদেবকে চরিত্রহীন বলে প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছি। আমি যা বলতে চাইছি শেষ পর্যন্ত তা শোন। চারিত্রিক শৈথিল্যের কথা বাদ দাও। ও ভগবান, দেবতা, মহাপুরুষ থেকে আরম্ভ করে কার নাই তা বলতে পার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ থেকে শেষে শ্রীকৃষ্ণ এমন কি যে 'ধোয়া তুলসী' পত্রের কথা বল, বৈষ্ণব আমরা যে তুলসীকে পরম পবিত্র বলে মনে করি তাকেও কি তুমি সতী বলবে ? ওসব ছেড়ে যা বলছি শোন।

তাঁর এই চারিত্রিক শৈথিল্যেও তাঁকে আমরা অবতার বা ভগবান বলে পূজো করি।

তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে আজো হাজার হাজার মানুষ জীবন অতিবাহিত করছে। তৎকালে তাঁর 'অবতার' হওয়ার পথে কোন অন্তরায় ছিল না। সত্য কথা বলতে হলে বলতে হয় তাঁর প্রকৃত জীবন নয়। অবতার হওয়ার পথে সহায়তা করেছে তৎকালের বিচার-বিমুখ অনুরাগীদের অন্ধবিশ্বাস ও ভক্তি। তাঁরা যা দেখতে আগ্রহী ছিলেন সেই সব ঘটনাই নিমাইয়ের জীবনে আরোপিত হয়েছে।

নিমাইকে অবতার বানাবার পক্ষে সেদিন পরিস্থিতিও অনুকূলে ছিল। অল্প বয়স থেকেই তিনি ছিলেন মৃগী রোগী। মূর্ছারোগের জন্য সাময়িক ভাবে তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উপনয়ন সংস্কারের পর তিনি আবার গঙ্গাদাসের টোলে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর পড়াশুনা আর বেশীদূর হয়নি। (—চৈতন্য ভাগবত। পৃঃ ১০০—১০১, ১০৩—১০৪)। বৈষ্ণব শিবিরে যখন যোগ দিলেন তখন ভাবাতিশয্যে তাঁর দেহে আক্রমণ করত মূর্ছা রোগ। সুপ্রাচীন কাল থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণ মৃগীকে মনে করত একটা 'পবিত্র ব্যাধি।' আজো কোন কোন অঞ্চলে এধারণা বদ্ধমূল আছে। বিশেষ করে ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে এই রোগে মূর্ছাকে মনে করা হত দেবতার 'ভর' বলে। তারা মনে করত বাইরে সংজ্ঞা হারিয়ে ভিতরে ভিতরে 'ভর' হওয়া দেবতার সংগে আলাপ করছে। তাই ভাবাবেগে নিমাইয়ের এই ঘন ঘন মূর্ছা হওয়া দেখে তাঁকে 'নরজ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে।' তখন ভক্তরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, 'কৃষ্ণ জন্মিল আপনি' এবং 'এই বুঝি প্রভু অবতার।' আগে যাঁরা চৈতন্যের দেহে দেখেছিলেন 'রাজলক্ষণ', এখন তারাই আবার দেখলেন 'অবতারে'র লক্ষণ। কি, এসব কথা তোমার কাছে খুব 'অসহনীয়'মনে হচ্ছে তাই না। কিন্তু একথা ত ঠিক নিমাই কখনো নিজে তাঁর অবতারত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। তাঁর মূর্ছারোগ বায়ুব্যাধিজনিত মনে করে (শুধু তিনি নন, তাঁর মাও তাই মনে করেছিলেন) আজীবন মহাবিষ্ণু তেল ব্যবহার করতেন।

এমন কি নবদ্বীপ জীবনে যখন তিনি অধ্যাপনা করতেন, তখন একজন ভৃত্য তাঁর মাথায় এই মহাবিষ্ণু তেল মালিশ করত।

নীলাচলেও একবার তাকে অবতার বানানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্য-দেবের বাস্তব জ্ঞান ও পরিমিতি বোধ এত প্রখর ছিল যে তা তিনি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছিলেন। অদ্বৈতাচার্যের প্রস্তাব মত কৃষ্ণ-কীর্তনের পরিবর্তে নবদ্বীপ থেকে আগত ভক্তরা আরম্ভ করেছিলেন চৈতন্য-সংকীর্তন। চৈতন্য এই 'আত্মস্তুতি' শুনে লজ্জায় সে স্থান ত্যাগ করলেন। পরে ভক্তদের ভৎসনার সুরে বললেন—

ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্তন।
কি গাইলা আমারে তা বুঝাও এখন ॥—

চৈ. ভা. শেষ খণ্ড: ছ. ৩৭৭

আর একদিন চৈতন্যদেবকে ভক্তগণ উল্লেখ করলেন 'ঈশ্বর' বলে। তাতে তিনি বাধা দিয়ে বললেন—'আথাল পাথাল কথা কেন বা বলহ।'

এই সব 'ঈশ্বর' আর 'অবতার' সাজিয়ে তাঁর জীবনকে কি আমরা অস্বাভাবিক করে ফেলিনি। কি জান, তাঁর মৃত্যুর পর ভক্ত জীবনীকারদের কল্যাণে মানুষ নিমাইকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

এবার তাঁর ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে দু'একটি কথা বলি। তিনি বরাবরই সন্ন্যাস জীবনের বিরোধী ছিলেন। তিনি সংকল্প করেছিলেন—'গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা মাতার সেবন।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সে সংকল্প তিনি রাখতে পারেননি। তাই বলে যদি এমন কথা মনে করি সন্ন্যাস জীবনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাহলে মস্ত ভুল করা হবে। পরবর্তী জীবনে তিনি সন্ন্যাসকে 'বাতুলের কর্ম' বলে মনে করেছিলেন। বলেছিলেন—'ধর্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম নাশ॥' বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে প্রথম যখন নিমাই মিলিত হলেন, তখন তিনি নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণকে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁকে নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করেছিলেন। তখন চৈতন্যদেব এইসব অস্বস্তিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সার্বভৌমের কাছে স্বীকার করেন—"সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।'—চৈতন্যভাগবত।

হয়ত তুমি বলতে চাইবে এসব কেবল বৈষ্ণবজনোচিত বিনয় বচন মাত্র। এর মধ্যে সত্যতা কিছুই নাই। কিন্তু তাকিয়ে দেখ তাঁর জীবনচর্চার দিকে। কি বিপুল প্রাবল্য ছিল তার মধ্যে। আহার বিহারে সন্ন্যাসীর সংযম ছিল না বিন্দুমাত্র। তাঁর এক একবার 'ভিক্ষার' ভোজ্যদ্রব্য যেমন পরিমাণে ছিল প্রচুর, তেমনি ছিল বিচিত্র সব ব্যঞ্জন। ভোজন বিলাসী চৈতন্যদেবের ভোজনের বর্ণনা 'চৈতন্যভাগবত' আর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে। এইজন্য কেশব ভারতীর গুরু, মাধবেন্দ্র পুরির শিষ্য রামচন্দ্র পুরী, চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরবর্গের ভোজন সন্ন্যাস নিয়ে অনুসন্ধান করেন এবং অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হলে লোভী ও ভোগী সন্ন্যাসীদের ধিক্কার দেন। **Chaitanya—His life and Doctrine by A. K. Majumdar. P. 229-230**।

নিমাই তাহলে গৃহত্যাগ করেছিলেন কেন, এ প্রশ্ন তোমার মনে স্বভাবতই

জাগবে। এর কারণ হলো 'রাজরোষ,' সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও শাক্তদের ষড়যন্ত্র। তারা পরিকল্পনা করেছিল হয় নিমাইকে দেশত্যাগী করবে নয়ত করবে তাঁর জীবন নাশ। তাই তিনি সন্ন্যাস নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর অন্য কোন উপায় ছিল না। যে রাতের অন্ধকারে তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করেন, সে রাত্রিতে তাঁর শয্যায় দু'পাশে শুয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন মহাশক্তিধর গদাধর আর হরিদাস। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরেই ছিলেন না। অথচ এই বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে কত কাব্য, নাটক, সিনেমাই না রচিত হয়েছে। আজো মানুষ বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-ব্যথায় আকুল হয়ে কাঁদে। গৌর পারম্যবাদের কবি লোচন দাসের কবি-কল্পনায় এসব কাহিনী জন্মলাভ করেছে।

আর শচীদেবীর কান্নায় তোমাদের বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। কত অশ্রু সজল কাহিনীই না রচিত হয়েছে। কিন্তু সেদিন রাত্রিতে, যেদিন নিমাই গৃহ ত্যাগ করেন গৃহের দরজায় সারারাত শচীদেবী বসে বসে পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি মোটেই নিদ্রা যান নি। যদিও বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন নিমাই। সেদিন একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। গৃহত্যাগের সময় নিমাই—

জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন প্রভু প্রবোধ উত্তর॥

... ...

তারপর— জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে চলিলা সত্বরে॥—চৈ. ভা. মধ্য. ২৬অ.

এ থেকে কি স্পষ্টই প্রমাণিত হয় না সুলতানের চর রাতে ধরতে আসতে পারে এই আশঙ্কা তাঁর মনে উদয় হয়েছিল।

এবার তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ সম্পর্কে দু' একটি কথা বলি। তোমরা মনে কর যেহেতু নিমাই কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, সেহেতু তিনি ভারতী সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসী। এ ধারণা শুধু তোমার নয়, বড় বড় বৈষ্ণব মহান্তগণও তাই মনে করেন। কিন্তু কেশব ভারতী তাঁকে সন্ন্যাস দিলেও নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করেন নি। তিনি প্রকৃত পক্ষে নাম দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কি, আমার কথা শুনে তোমার মনে ধন্দ লাগছে নিশ্চয়।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম প্রভুজীর মুখের দিকে। উনি স্মিত হাস্যে বললেন—এবার তোমায় একটু তত্ত্ব কথা শোনাব। এসব সাধন-ভজনের কথা। খুব সহজ করে বলা যাবে না। তবু যতদূর সম্ভব সোজা করে বলার চেষ্টা করছি।

সন্ন্যাস গ্রহণের মন্ত্র নাকি মহাপ্রভু পেয়েছিলেন স্বপ্নে। সেই মন্ত্র পেয়েই খট্‌কা লাগল নিমাইয়ের মনে। তিনি ভাবলেন, এ মন্ত্র নিয়ে আমি ত সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারব না। এতে ত আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। স্বপ্নে প্রাপ্ত সেই মন্ত্রটি হলো 'তত্ত্বমসি'। এর অর্থ হলো, এক কথায় না বলে একটু ভেঙ্গে বলি। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ভিতরে 'তত্ত্বম' শব্দটিকে শ্রীপাদ শঙ্কর সমাসবদ্ধ শব্দরূপে গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করেছেন সন্ধিবদ্ধরূপে। তৎ+ত্বম্=তত্ত্বম্। তত্ত্বমসি=তৎ (সেই ব্রহ্ম) ত্বম্ (তুমি-জীব) অসি (হও)—শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ হলো এই! তাহলে এই অর্থে দেখতে পাচ্ছ জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য বুঝাচ্ছে। এরূপ অর্থের কথা ভেবে প্রভুর চিত্ত হয়ে উঠল ব্যাথিত। স্মরণাপন্ন হলেন বন্ধু মুরারি গুপ্তের। তখন—

"মুরারিঃপ্রাহ তৎশ্রুত্বা তস্মন্ত্রে ভগবন্ স্বয়ম্।
ষষ্ঠীসমাসং মনসা বিচিন্ত্য ত্বং সুখী ভব॥"

—মুরারিগুপ্তের কড়চা। ২।১৮।৩-৪।

অর্থাৎ—'ভগবান্! সেই মন্ত্রে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস মনে চিন্তা করিয়া তুমি সুখী হও।'

মুরারি গুপ্ত কি বলতে চাইছেন ভাল করে শোন। 'প্রভু, তত্ত্বমসি বাক্যের 'তত্ত্বম' শব্দটিকে সন্ধিবদ্ধ পদ মনে না করে, মনে করনা ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। তাহলে ষষ্ঠী-তৎপুরুষে 'তত্ত্বম্' শব্দের ব্যাসবাক্য হবে—তস্য (তাঁহার, সেই ব্রহ্মের) ত্বম্ (তুমি-জীব)। তাহলে তখন অর্থ দাঁড়াবে জীব হচ্ছে ব্রহ্মের। জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলে জীব ব্রহ্মেরই, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণ সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য [১।১৭-ক (১) অনু]। যদি এরূপ অর্থ চিন্তা করি প্রাণস্বরূপ প্রিয় হরি-শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করার প্রশ্ন উঠতে পারে না। বরং সেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সেবার জন্য চিত্তের আকুলতাই জন্মাবে। আর প্রভু, তাতেই তোমার চিত্তে সুখের সঞ্চার হবে।

তখন মুরারি গুপ্তের কথা শুনে প্রভু বললেন:

'তত্রোবাচ প্রভুর্বাচং তথাপি খিদ্যতে মনঃ।
শব্দশক্ত্যা করিষ্যামি কিমিত্যুক্তা রুরোদ সঃ॥

—মুরারি গুপ্তের কড়চা। ২।১৮।৫

অর্থাৎ—তথাপি শব্দশক্তি বশতঃ মনের খেদ থেকে যায়। এখন আমি কি করব? এই বলে প্রভু কাঁদতে লাগলেন।'

প্রভুর কথার তাৎপর্য কি বুঝতে পারলে। প্রভু বললেন—"মুরারি, 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অন্তর্গত 'তত্ত্বম' শব্দটি যে সন্ধিবন্ধ পদ নয়, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদ, একথা সত্য এবং এই ষষ্ঠী-তৎপুরুষাত্মক অর্থই যে শাস্ত্রসম্মত, জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতির অন্যান্য উক্তির সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মুরারি তথাপি, 'তৎত্বম্' শব্দ দু'টির যে শক্তি অর্থাৎ অর্থ, তার কথা ভাবলেই মনে খেদ হয়। আসলে কি জান, শ্রুতির সমস্ত উক্তির সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে অর্থ করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা যাদের নাই, তারা এই বাক্যে যে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস আছে, তা বুঝতে পারবে না। যথাদৃষ্ট ভাবে মনে করবে—পরিষ্কারভাবে যখন দেখা যাচ্ছে 'তৎ ত্বম্ অসি,' তখন অন্য অর্থ চিন্তা করবার কি বা প্রয়োজন? 'তাহাই (সেই ব্রহ্মই) তুমি হও' এই অর্থই সঙ্গত। তাদের কল্পিত এই শ্রুতি-বিরুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করে তারা নিজদিগকে ব্রহ্ম মনে করে অপরাধ-গ্রস্ত হবে। এবং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ত্যাগ করে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখেক তাৎপর্যময়ী সেবা হতে, পরমপুরুষার্থ হতে, বঞ্চিত হবে। বুঝলে মুরারি, একথা ভেবেই আমার মনে খেদ জন্মাচ্ছে। আমি এখন কি করব মুরারি!"

তাহলে বুঝতে পারছ প্রভুর খেদের কারণ। খেদ তাঁর বাস্তবিক জীব ব্রহ্মৈক্যবাদীদের জন্য। পরমার্থভূত বস্তু থেকে তারা বঞ্চিত হবে বলেই প্রভুর খেদ এবং তাদের জন্যই সকলের পরিত্রাণকামী প্রভুর এই কান্না। তাহলেও মুরারির কথা শুনে প্রভু আনন্দিত হলেন। অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসাত্মক (অর্থাৎ সেব্য সেবক অর্থ-প্রতিপাদক) অর্থই হলো প্রভুর অভিপ্রেত।

কেশব ভারতীকে এইরূপ অর্থ কানে কানে বুঝিয়ে এবং এই অর্থের অনুগামী মনোভাব নিয়ে নিমাই গুরুকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিতে বললেন। কেশব ভারতী নিমাইয়ের ইচ্ছামত দীক্ষা দিলেন। কিন্তু গুরু কেশব ভারতীর সমস্যা বাঁধল কোথায় জান, নিমাইয়ের তাহলে সন্ন্যাস জীবনে কি নাম তিনি দিবেন। কেশব ত 'ভারতী' সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। তাহলে প্রথা মত গুরুর উপাধিই গ্রহণ করবে শিষ্য। অর্থাৎ গুরুর সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁকে করতে হবে। কিন্তু এখানেই বাঁধল গুরুর মনে বিরোধ। 'ভারতী' হলো কৃষ্ণভজন-বিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসীর উপাধি। আর নিমাই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। সেব্য-সেবক মনোভাব তার। তাহলে একে ত কিছুতেই 'ভারতী' সম্প্রদায়ভুক্ত করা যায় না। মহাচিন্তায় পড়লেন কেশব ভারতী। শেষে অনেক চিন্তা করে মনে মনে ঠিক করলেন এবং মহাপ্রভুর বুকে হাত দিয়ে বললেন—

যত জগতের তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্তন প্রকাশিয়া॥

এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।'
সর্বলোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য ॥

—চৈ. ভা. মধ্য ২৬অ।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম নিয়ে প্রভু খুব আনন্দিত হলেন। কারণ, এর ফলে তিনি আর 'ভারতী' সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোন ভাবেই যুক্ত রইলেন না। বা তোমাদের মত গবেষকগণ বলতে পার প্রকারান্তরে কেশব ভারতী তাঁকে সন্ন্যাস দিলেন না। করলেন 'ব্রহ্মচারী' মাত্র। কারণ 'ভারতী' সম্প্রদায়ে যারা শিক্ষানবীশ তাদেরই অভিধা 'চৈতন্য'। এ থেকে তোমরা মন্তব্য করতে পার, চৈতন্য ধর্মীয় জীবনে খুব উচ্চ-পদের অধিকারী ছিলেন না।

সত্যি সে জন্যই ত বার বার কেউ তাঁকে 'সন্ন্যাসী' বললে বা ভগবানের আসনে বসাতে চাইলে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি ত ব্রহ্ম হতে চাননি, তিনি চেয়েছেন জীব জগতের মুক্তি। তাঁর কথা হলো আগে জগতের উদ্ধার হোক, তারপর যদি সময় থাকে তখন ভাবা যাবে নিজের কথা। আমি এই জন্যই বলছিলাম চৈতন্যকে 'ভগবান' বানিয়ে আমরা আসল মানুষটাকেই হারিয়ে ফেলেছি। ভেবে দেখিনি তাঁর বল-বীর্যের কথা।

চৈতন্যদেবের হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল বিশাল ভারতবর্ষের প্রসারিত পটচিত্র। তোমরা বল বাংলার নিমাই। তোমাদের কবি লিখেছেন—'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' কিন্তু আমার কি মনে হয় জান, তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা মত শুধু দিব্যোন্মাদ ছিলেন না, তাঁর চিত্তে সদা প্রসারিত থাকত ভারতের সাংস্কৃতিক মানচিত্র।

তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তিনি কখনো কথায় বা কাজে ভোলেননি ভারতীয় পটভূমির কথা। গয়ায় বিষ্ণুপদ দর্শনে যে ঐশী অনুভূতি তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত হয় তাকে কখনো নদীয়া, শান্তিপুর, জননী শচীদেবী, পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া, বা স্থানীয় অনুরাগী ভক্তবৃন্দ এঁরা কেউই তাঁর বিপুল হৃদয়াবেগকে বেঁধে রাখতে পারত না। সন্ন্যাসীর বেশে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন পুরীতে নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের জন্য নয়, মহাশক্তিধর রাজা প্রতাপরুদ্রের সহায়তায় শুধু বাংলা আর উৎকলের জনগণকে উদ্ধার নয়—ছুটে গিয়েছিলেন সারা ভারতবর্ষকে মুক্তি দিতে। জগন্নাথ দর্শন কেন উপলক্ষ জান, এখানে জাত পাতের বিচার নাই বলে, এখানেই ছিল ভারত আত্মার মিলন ক্ষেত্র। তাই ভেবেছিলেন এখান থেকেই আরম্ভ করবেন তাঁর যথার্থ মুক্তি আন্দোলন। তিনি সর্বপ্রথম চেয়েছিলেন বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে

পরিচিত হতে। তিনি জানতেন সার্বভৌমকে মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব কত উচ্চ রাজ সম্মান দিয়ে রেখেছেন।

যে হৃদয়াবেগ নিয়ে তিনি ছুটে এসেছিলেন রামানন্দ সন্দর্শনে তা নিল বন্যার রূপ। ঢেউ তুললো দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে। পুরীতে ফিরে এসে তাকে ছড়াতে চাইলেন উত্তরাপথে। তাঁর বৃন্দাবন যাত্রা সফল হলো দ্বিতীয়বারে। প্রথমবার রামকেলিতে গিয়েছিলেন বুঝতে গৌড়বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা অনুকূল কিনা। এর পিছনে ছিল প্রতাপরুদ্রদেবের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পরামর্শ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়বাড়ন্তের পিছনে কার হাত ছিল। কৃষ্ণদেব রায় চাননি হিন্দু রাজ্য সম্প্রসারিত করতে। তিনি চেয়েছিলেন স্বীয় রাজ্যের সম্প্রসারণ। তাই রূপ-সনাতনকে হাত করেই সেবার প্রভু ফিরে এসেছিলেন পুরীতে। তিনি বেছে নিয়েছিলেন এবার তাঁর প্রচারক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে ব্রজধাম পথে বারানসী ও প্রয়াগে। ব্রজধামের ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম। মনে রেখেছিলেন—মথুরা ও বৃন্দাবন, আগ্রা ও দিল্লির কত কাছে। পাঠান সূর্য তখন অস্তমান, মোগল সূর্য তখন সবে উঠেছে। এ অবস্থায় হিন্দু রাজন্যবর্গের, বিশেষত জয়পুরের একটা ভূমিকা তাঁর চোখ এড়ায়নি। বারানসী ত হিন্দু সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। বিনা কারণে লোকনাথ ও ভূগর্ভকে অগ্রদূত রূপে বৃন্দাবনে পাঠাননি তিনি। আর বিনা কারণে বেদান্তীপ্রকাশ সরস্বতীকেও পরাভূত করেননি। কৃষ্ণদাসের অঙ্কিত দিব্যোন্মাদে মত্ত হলেও তাঁর চিত্তে ভারতের সাংস্কৃতিক মানচিত্র থাকত সদা প্রসারিত। তা না হলে সে যুগের শ্রেষ্ঠ ছ'জন বুদ্ধিজীবিকে তিনি বৈষ্ণব আন্দোলনের সেনাপতি করে পাঠাতেন না বৃন্দাবনে।

সহসা প্রভুজী কেমন যেন স্তব্ধ হলেন। আমি তাকালাম ও'র মুখের দিকে। সবিনয়ে বললাম—প্রভুজী, আপনি ত দেখছি চৈতন্যদেবকে জননেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। তাহলে মহাপ্রভুর মধ্যে বৈষ্ণবত্ব কি কিছুই ছিল না? তিনি শুধু জননায়ক ছিলেন? বৈষ্ণব দর্শন কি তাহলে মিথ্যা?

কে বলছে তোমায় সে কথা। প্রভুজী আবার বলতে আরম্ভ করলেন ধীরে ধীরে। অবশ্য আজকের ভাষায় তোমরা বলবে জননায়ক। সে যুগে চৈতন্যদেবই মানুষের মধ্যে এনেছিলেন নবজাগরণ। সংকীর্ণতার গণ্ডী ভেঙ্গে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন মহামানবের মহামিলনের পথ।

কিন্তু ভীষণ পরিতাপের বিষয় কি জান, সে আশা তাঁর পূর্ণ হলো না। ক্রমে নবদ্বীপের সঙ্গে যোগসূত্র তিনি শিথিল করেছিলেন। তিনি দেখলেন রথের সময় গৌড়ীয় যে বৈষ্ণবদল আসেন নীলাচলে, তাঁরা ভুলে গেছেন তাঁর আদর্শের

কথা। আদর্শচ্যুত এই বৈষ্ণবদলকে তিনি নিষেধ করলেন পুরীতে আসতে। বাঁধল নিত্যানন্দের সঙ্গে বিরোধ। প্রভুর মত মেনে দিতে পারলেন না নিত্যানন্দ। অথচ চৈতন্যদেব প্রভুনিত্যানন্দের উপরে কত আশাই না করেছিলেন। কারণও ছিল তাঁর। নিত্যানন্দ বাল্য থেকেই সংসারত্যাগী অবধূত হয়ে ঘুরেছেন সারা ভারতের পথে পথে। ভেবেছিলেন ঘুচে গেছে তাঁর হৃদয়ের সংকীর্ণতা, কানে শুনেছেন ভারতাত্মার মর্মবাণী।

কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময় ব্যায় করেও কোন পরিবর্তন হয়নি তাঁর জীবনে। তিনিও চান ভোগ-ঐশ্বর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি। চান সমাজে প্রতিষ্ঠা। তাই নিষেধ করলেন, পুরীতে আসতে। বার বার পাঁচ বার নিষেধ করা সত্ত্বেও ষষ্ঠবার ১৪৪১ শকাব্দে প্রভু নিত্যানন্দ পুরীতে এসে হাজির হলেন। এরপূর্বে চৈতন্যদেবের কাছে বহুবার নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে এসেছে নানা অভিযোগ। তিনি সে সব অভিযোগ শুনেও গেয়েছেন নিত্যানন্দের প্রশস্তি। অভিযোগকারীদের এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন—

পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল॥

কিন্তু এত করেও উড়িষ্যাবাসীর অন্তরে নিত্যানন্দকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না। একে একে অভিযোগের পর অভিযোগ আসতে লাগল তাঁর কাছে। এমন কি অদ্বৈতাচার্যও অভিযোগ আনলেন নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে। তখন উক্ত শকাব্দেই রথের পর ভক্তবৃন্দের বিদায়কালে মহাপ্রভু অশ্রুপূর্ণ ছলছল দুটি করুণ নয়নে নিত্যানন্দকে কাছে বসিয়ে বললেন ঃ

নিত্যানন্দ কহেন তুমি না আইস বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইব তোমার॥—চৈ. চ.

সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, যিনি সারাজীবন 'অবধূত' হয়ে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটালেন, তিনিই আবার অন্ততঃ ছাপান্ন বছর বয়সে বিয়ে করলেন নিজ শিষ্য সূর্যদাস সরখেলের দুটি কন্যাকে। এসব ত তোমাদের জানা। আমি শুনেছি আরো গুরুতর কথা। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে আরও একটি বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করেছেন ঃ

সূর্যদাস নন্দিনী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী।
নিত্যানন্দ প্রেমময়ী শ্রীবসু জাহ্নবী॥

জাহ্নবী ও বসুধা এই দু'কন্যাকে ত তিনি ধর্মপত্নী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে সরখেল দুহিতা শ্রীমতী চন্দ্রমুখীর সঙ্গে তাঁর কিরূপ সম্পর্ক ছিল। অথবা 'চন্দ্রমুখী' শব্দ কি বসুধা ও জাহ্নবীর বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

কি কিছু বলছ না কেন? প্রভুজী প্রশ্ন করলেন আমাকে। আমি বললাম, জয়ানন্দের পরিবেশিত এই তথ্যের উপর যদি নির্ভর করি তাহলে ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

প্রভুজী বললেন, এসব তথ্য তোমরা গবেষণা করে ঠিক কর। তবে প্রভু নিত্যানন্দের এই বিবাহ নিয়ে তৎকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যে বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছিল তা ত তোমাদের জানা। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর তৎকালে খড়দহে যে মহোৎসব হয়েছিল, তাতে অনেক বৈষ্ণবই যোগদান করেননি। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাটীতে বৈষ্ণবদের সংকীর্তনের যে ব্যবস্থা হয়েছিল, তাতে কৃষ্ণদাসের ছোট ভাই নিত্যানন্দের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। এই নিয়ে নিত্যানন্দের দুই অনুচরের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এসব তথ্য ত তোমাদের কাছে অজ্ঞাত নয়।

শেষে শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গেও ঘটল মনোমালিন্য। তা হলে বাঙালী বলতে কে আর রইল। যাঁরা ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। বলতে গেলে পুরীতে রইলেন স্বরূপ দামোদর আর রঘুনাথ গোস্বামী। বৃন্দাবনে রূপ আর সনাতন। আর আধা বাঙালী ও আধা ওড়িয়া রায় রামানন্দকেও তিনি বসাতেন সমআসনে। প্রশ্ন করি তোমায়, কেন এমন হলো?

কোন উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকি প্রভুজীর দিকে।

কি, কিছু বলবে না, আমার মুখ দিয়েই শুনবে উত্তরটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—যে মাটিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে মাটিও আর ছিল না তাঁর পায়ের তলায়, আর যে গাছকে অবলম্বন করে তিনি বেড়ে উঠছিলেন সে গাছেরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে লেগে গিয়েছিল পোকা। তোমায় এখনো ত তৎকালের উড়িষ্যার রাজনৈতিক অবস্থার কথা বলিনি। এখানের আকাশে বাতাসেও তখন সাম্রাজ্যলোভী শার্দুলের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ভারী হয়ে উঠছে প্রকৃতি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে লেগেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেও একদল অদ্বৈত আচার্যকে ঘোষণা করল ঈশ্বর বলে। আর একদল প্রভু নিত্যানন্দকে চৈতন্যের সমকক্ষ বলে আরম্ভ করল প্রচার করতে। এমনকি গদাধরের পক্ষও নিল কেউ কেউ। তারা আরম্ভ করল *গৌর-গদাধরের পূজা। এই* অবস্থার মধ্যে কেবল মাত্র ধন্যবাদ দিতে হয় বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীকে। একমাত্র তাঁরাই চৈতন্যদেবের সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্বকে সকল বাদ-বিসম্বাদ ও দলবাজির উপরে রাখতে পেরেছিলেন। এইখানে শ্রীচৈতন্যদেবের নির্বাচনে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি।

সনাতন সত্যি ছিলেন 'বুদ্ধিতে বৃহস্পতি' আর রূপ সেনাপতি বা কোষাধ্যক্ষ যাই-হোন, তিনিও দিয়েছিলেন তাঁর যথার্থ যোগ্যতার পরিচয়। এঁরা কাজকর্মে অম্বর রাজপুত বংশের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। এই সময়ে ভারতীয় রাজনীতির আকাশে যদি মোগল সম্রাট বাবরের অনুপ্রবেশ না ঘটত তাহলে পাঠানদের হস্তচ্যুত রাজশক্তি রাজপুতদের করতলগত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখাদিয়েছিল। বাবর হিন্দু-বিদ্বেষী পাঠানদের সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি নিজেকে বিপদ মুক্ত মনে করতে পারেননি, যতক্ষণ না রাণা সঙ্গকে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন।

আশা করি এবার বুঝতে পারবে রূপ-সনাতন কেন বৈষ্ণব-দর্শন রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের আশা আকাংখা যখন এইভাবে বাণ্চাল হয়ে গেল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অন্তর্দ্বন্দ্ব উঠল প্রকট হয়ে, তখন উৎকলে রাজ্যলোভী সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর হয়ে উঠলেন সক্রিয়। কেমন করে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল সে কথায় আসছি পরে।

তবে একথা তোমায় বলছি, বৈষ্ণব-দর্শন পূর্ণতা লাভ করেছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর, তাঁর জীবিত কালে নয়। ষট্-গোস্বামীই সম্পাদন করেছিলেন সে কার্য। চৈতন্যদেবের হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সফল হয়নি বটে কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভেদ মুক্ত করতে, ভারতের অন্তর আত্মাকে এক সূত্রে বাঁধতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন রূপ-সনাতন প্রভৃতি ষড় গোস্বামী। তাই ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামীকে।

প্রভুজী, রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নিয়ে যে দার্শনিক আলোচনা হয়েছিল, তাহলে তাকি সত্য নয়? আপনি ত বলছেন মহাপ্রভুর মৃত্যুর পর বৈষ্ণবধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল। এবং তা করেছিলেন বৃন্দাবনের ষড়্-গোস্বামী।

গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাতকারের ঘটনা লিখেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে। সেই চৈতন্যচরিতামৃত লেখা হয়েছিল কবে? তুমি বলবে এ নিয়ে অনেক মত বিরোধ আছে। তোমাদের গবেষকগণ অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাও করেছেন। সেই বিতর্কের মধ্যে আমি যেতে চাইছি না। শুধু একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ তোমাকে দিচ্ছি। বৃন্দাবনের গোবিন্দমন্দির ও বিগ্রহ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। এই গোবিন্দ-মন্দির নির্মিত হয়েছিল কবে? মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে। রাজত্বের ৩৪ বর্ষে অর্থাৎ

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে। বৃন্দাবন দাস এই মন্দির সম্পর্কে লিখেছেন, 'রাজসেবা হয় তাহা বিচিত্র প্রকার।' তাহলে একথা ত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে গোবিন্দ মন্দির নির্মিত হওয়ার পর কৃষ্ণদাস তাঁর এই গ্রন্থ লেখা আরম্ভ করেছিলেন। তারপূর্বে কিছুতেই হতে পারে না। ধরে নাও গ্রন্থ শেষ করতে তাঁর পাঁচ থেকে দশ বছর সময় লেগেছিল। এ হলো অনুমানের কথা।

এই গ্রন্থ বৃন্দাবন থেকে উৎকলে আসার পথে চুরি হয়েছিল বনবিষ্ণুপুরে। এ কাহিনী তোমরা নিশ্চয়ই জান। যদি এই গ্রন্থ-চুরির সংবাদ সত্য হয়, তাহলে গ্রন্থ সমাপ্তির কালও জানা যেতে পাবে। গ্রন্থ ত চুরি করেছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর মল্ল। তাঁর রাজত্ব কাল হলো ১৫৮৭ থেকে ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ ৩১।৩২ বছর। তাহলে এর মধ্যেই ঘটেছিল গ্রন্থ-চুরির ঘটনা। আর একটা বড় প্রমাণ দিই বৃন্দাবনের উক্ত গোবিন্দ মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন, পণ্ডিত হরিদাস। তিনিই অনুরোধ করেছিলেন কবিকে, তিনি যেন মহাপ্রভুর 'শেষলীলা'র কথা তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন।

'তেঁহো অতি কৃপা করি আজ্ঞা দিলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে॥'—চৈ. চ.

অতএব তোমাদের পণ্ডিতগণ শক আর খ্রীষ্টাব্দ নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ যাই করুন না কেন, আমার মনে হয় কবি কৃষ্ণদাস ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পরে তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তাহলে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে এই হিসেবে হয় ৬১ বছর অতীত হওয়ার পর কবি গ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিংবা ধরো কবির লেখা শেষ হয়েছিল দশ বছর পরে, তাহলে ৭১ কি ৭২ বছর হবে।

এখন কথা হচ্ছে, এই ৬০।৭০ বছর পরে কেউ কি মনে রেখেছিল চৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে কি প্রশ্ন করেছিলেন বা রায় রামানন্দ তাঁর কি জবাব দিয়েছিলেন, না কেউ মনে রেখেছিল? তেমন কোন প্রমাণ কি দিতে পারবে?

যদি তা না পার তাহলে বলবো ঐ চৈতন্য-রায় রামানন্দ সংবাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজের কল্পনা-প্রসূত। তবে একথা ঠিক, কৃষ্ণদাস প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি কল্পনা ও ঘটনাকে মিশিয়ে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের রসের পর্যায়, রাধা প্রেম ও সখীসাধনা সম্পর্কে সংক্ষেপে যা বলেছেন, পরবর্তীকালে তাই বৈষ্ণবধর্ম, তত্ত্ব ও সমাজকে সংহত আকার দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

কিন্তু এই যে সাধ্যসাধন তত্ত্ব, এর উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন চৈতন্য-পরবর্তীকালে লেখা তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্ষদ, পরিকর বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের গ্রন্থ

থেকে। দেখবে কবিকর্ণপুর, স্বরূপদামোদর ও রূপগোস্বামীর গ্রন্থের বহু শ্লোক তিনি দিয়েছেন ঐ সাধ্য-সাধন তত্ত্বের মধ্যে ঢুকিয়ে। মনে পড়ছে না রূপগোস্বামীর সেই বিখ্যাত শ্লোক ঃ

'অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥'
—উজ্জ্বলনীলমণি (শৃঙ্গারভেদ কথন, ৪৩ শ্লোক)
—চৈ. চ. মধ্য. ৮ম. পরি.

প্রেমের গতি স্বভাবত সর্পের ন্যায় কুটিল। এই জন্যই যুবক-যুবতীর মধ্যে অহেতু ও সহেতু এই দু'রকমের মান উদয় হয়।

আমি বললাম তাহলে গীতায় যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন আছে। বা যে সাধন তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, তাও সমৃদ্ধ হয়েছে ব্যাসদেবের কবি-কল্পনাতে ?

প্রভুজী বললেন—হ্যাঁ, তুমি ঠিক কথাই বলছ। ব্যাসদেবই বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সার সার কথাগুলি সংগ্রহ করে কৃষ্ণ অর্জুনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। তা না হলে কৃষ্ণ-অর্জুন ঐ ভাবে তত্ত্বালোচনা করেননি। গীতাকে সামনে উদাহরণ রেখেই কৃষ্ণদাস তাঁর 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-গীতা'ও রচনা করেছেন। এ কথা কেউ না বললেও আমি বলছি মহাভাবতের মধ্যে যেমন গীতা, তেমনি চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে 'সাধ্য-সাধন' তত্ত্ব। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতে পারি। কিন্তু আজকে সে প্রসঙ্গ থাক। তবে গীতা সে বৌদ্ধ 'ধম্মপদে'র পরে সম্পাদিত হয়েছে তা ত তোমার জানা। 'ধম্মপদে'র শ্লোক গীতাতে আছে। শুধু আছে বললে ঠিক বলা হলো না। ধম্মপদে যা বলা হয়েছে সংক্ষেপে, গীতায় সেই একই ভাবের ব্যাখ্যা আছে বিস্তৃত ভাবে। এই মুহূর্তে ঠিক মনে আসছে না, তুমি বলতে পারবে না ধম্মপদের একটা শ্লোক যা গীতাতে বিশদ রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে ?

আমি স্মৃতি-মন্থন করে ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলাম—

"অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া।
অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং ॥'—ধম্মপদ, অত্তবগ্‌গ, ৪

'নিজেই নিজের আশ্রয়, অন্য আশ্রয় আর কে হবে ? নিজেকে দমযুক্ত (অর্থাৎ সংযত) করলেই দুর্লভ আশ্রয়লাভ হয়।'

প্রভুজী বললেন—দেখ, ঐ শ্লোকেরই বিশদ ব্যাখ্যা করে গীতাকার বলছেন—

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥—গীতা, ৬।৫-৬

'নিজেকে কখনও অবসন্ন করবে না, নিজেই নিজের উদ্ধারসাধন করবে, কেননা প্রত্যেকে নিজেই নিজের বন্ধু অথবা শত্রু। যে নিজেকে জয় (অর্থাৎ সংযত) করে সে নিজেই নিজের বন্ধু হয়, যে তা করে না সে নিজেরই শত্রুতা করে।'—ধম্মপদ পরিচয়—প্রবোধচন্দ্র সেন। পৃ ২৬-২৭।

অতএব বুঝতে পারছ গীতা শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী নয়। গীতার শ্লোক-গুলি তৎকালের শ্রেষ্ঠ বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে আহরণ করে ব্যাসদেব গ্রথিত করেছেন একত্রিত করে। গীতাকার সে কথা স্বীকারও করেছেন। ঐ যে—

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

এই শ্লোক থেকে কি বোঝা যাচ্ছে না, বিভিন্ন উপনিষদ থেকে কবি যে শ্লোক এবং তথ্য আহরণ করেছেন প্রকারান্তরে তাই বলতে চেয়েছেন।

দেখো, মূল বিষয় ছেড়ে অনেকটা কিন্তু চলে এসেছি। এবার শোন কলিঙ্গের তৎকালীন রাজনৈতিক চিত্র কেমন ছিল।

উড়িষ্যার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে শ্রীচৈতন্যদেব কেমন করে জড়িয়ে পড়লেন, তা জানতে হলে উড়িষ্যার ইতিহাস জানতে হবে। মোটামুটি ইতিহাস তুমি জান। তাই আমি যা বলব তার অনেক তোমার জানা আবার অনেক অজানাও থাকবে।

প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকালে উড়িষ্যায় এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। প্রতাপরুদ্র ছিলেন সূর্যবংশীয় রাজা। তাই বলে উড়িষ্যার সিংহাসনের উপর তাঁর আদৌ কোন আইনসঙ্গত অধিকার ছিল না। একটু পূর্ব ইতিহাস সংক্ষেপে বলি।

কপিলেন্দ্রদেব বা কপিলেশ্বর দেব 'গজপতি' রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কপিলেন্দ্রদেবের পূর্বপুরুষগণ সূর্যবংশ থেকে উদ্ভূত বলে কথিত। কপিল নীলাচলে আসেন সহায় সম্বলহীন অবস্থায়। জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের অনুগ্রহে জগন্নাথের প্রসাদ খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। তাহলেও কপিল ছিলেন বুদ্ধিমান। তখন উৎকলের রাজা ছিলেন মত্ত-ভানুদেব। শীঘ্রই পাণ্ডাদের অনুগ্রহে কপিল রাজার সুনজরে পড়েন। কপিল স্বীয়গুণে মত্ত-ভানুদেবের অনুচর পদে উন্নীত হন। কোন এক সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে কপিল রাজাকে বিশেষ সহায়তা করেন। তখন রাজা তাঁকে মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। কবি বাসুদেব রথ বিরোচিত 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' নামক সংস্কৃত কাব্য

থেকে জানা যায় গঙ্গবংশীয় শেষ রাজা কজ্জল ভানুদেব যখন বিজয় অভিযানে রাজ্যে অনুপস্থিত ছিলেন তখন মন্ত্রী কপিল পাণ্ডাদের সহায়তায় উৎকলের সিংহাসন অধিকার করেন। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে কপিলের পদবী ছিল 'সামন্তরায়।'

সে যাইহোক, এই যে পাণ্ডাদের সহায়তায় কপিল উৎকলের সিংহাসনে বসলেন এর জন্য তাঁকে পাণ্ডাদের অধিকারে থাকতে হলো। নামে মাত্র তিনি রাজা হলেন। রাজা কপিলন্দ্রদেব জগন্নাথের নাম করে পাণ্ডাদের বহু ধনরত্ন, তৈজসপত্র ও অলংকারাদি দান করেছিলেন। শ্রীমন্দিরে উৎকীর্ণ তৃতীয়-লিপি থেকে এসব জানা যায়। এই লিপির তারিখ ৩৫ তম অঙ্ক অর্থাৎ ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল।

কপিলেন্দ্রদেবের পুত্র পুরুষোত্তমদেব প্রকৃত পক্ষে রাজা হওয়ার অধিকারী ছিলেন না। কপিলেন্দ্রদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'হমীরদেব'ই ছিলেন সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। কিন্তু পুরুষোত্তমদেব পাণ্ডাদের সঙ্গে চুক্তি করে তাদের সহায়তায় সিংহাসন অধিকার করেন। ফলে ভ্রাতৃ-বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন পুরুষোত্তম দেব আবার পাণ্ডাদের সহায়তায় বড়দাদাকে প্রতারণা করে সিংহাসনে স্থায়ী ভাবে আরোহন করেন। পুরু-ষোত্তমদেব যখনই কোন বিপদে পড়েছেন, তখনি তাঁকে সাহায্য করেছে পাণ্ডারা। অতএব বুঝতেই পারছ ধীরে ধীরে পাণ্ডারাই স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে কেমনভাবে রাজাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। অর্থাৎ রাজা ছিলেন পাণ্ডাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে।

যখন প্রতাপরুদ্রদেব উৎকলের রাজা হলেন, তখন তিনি দেখলেন নামে মাত্র তিনি রাজা হলেও পাণ্ডাদের হাতে আবদ্ধ। তিনি ছিলেন শক্তিশালী রাজা। তাই চাইলেন পাণ্ডাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে রাজশক্তিকে মুক্ত করতে। কিন্তু তা সহজ ছিল না। জগন্নাথ মন্দিরে যে সেবক-সংঘ আছেন তাঁরা ৩৬ প্রকারের। এঁদের সকলের সংখ্যা ১২শ থেকে ১৮ শতের মত। এঁদের মধ্যে যিনি পরিচালক, তাঁর উপাধি হলো' ছত্রিশ-নিয়োগ-নায়ক' বা পাটযোষী মহাপাত্র।'

এই ৩৬ প্রকার সেবকের মধ্যে যাঁর 'গোচ্ছিকার' উপাধি, তিনি জগন্নাথ মন্দিরের দ্বাররক্ষী গোষ্ঠীর প্রধান। দ্বাররক্ষীকে বলে 'প্রতিহারী।' অর্থাৎ জগন্নাথ মন্দিরের একটি নিজস্ব সৈন্যবাহিনীও ছিল বা এখনো নামে মাত্র আছে।

চৈতন্যদেব পুরীতে আসার পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য চৈতন্যদেবের নাম নীলাচল সহ সারা উৎকলে ছড়িয়ে পড়ল। ঘটনাটি হলো, একদিন শ্রীচৈতন্যদেব ভাবাবেশে জগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন মুল মণ্ডপের দিকে অর্থাৎ সিংহাসনের দিকে। তখন বিশালাকার বলিষ্ঠ শরীর অনন্ত গচ্ছিকার তাঁকে

সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন। চৈতন্যদেব ভাবাবেগে অনন্তকে হাত দিয়ে সরিয়ে সোজা চলতে লাগলেন। তাতেই অনন্ত ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল পূজাপীঠ 'অনসরপিণ্ডি'তে।

'হায় হায়' করে উঠল পাণ্ডার দল। অনন্ত সেই গছিকার বংশের ছেলে, যার পূর্ব পুরুষ মত্ত হাতিকে দাঁতে ধরে পরাজিত করেছিল, তাই তাদের পদবী 'মত্তগজ প্রতিহারী।' এমন যে মহাবলশালী অনন্ত, তাকে চৈতন্যদেব কিনা হাত দিয়ে সামান্য একটু সরিয়ে দিতেই একেবারে পড়বি ত পড়—পড়লি গিয়ে সোজা অনসরপিণ্ডিতে।

'অনসরপিণ্ডি' কোন স্থানটিকে বলে জান, মূল মন্দির আর মুখ্যশালার ভিতরে একটি প্রশস্ত স্থান আছে। সেস্থানে স্নান পূর্ণিমা থেকে আষাঢ় মাসের অমাবস্যা পর্যন্ত শবর সেবকগণ নানা উপচার দিয়ে যে পূজা করেন, তাকেই বলে অনসর।' 'অনসর পিণ্ডি' মানে গুপ্ত পূজার স্থান।

বিদ্যুতের মত ত্বরিত গতিতে সারা নীলাচলে ছড়িয়ে পড়ল এই সংবাদ। মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবকে 'বড়ালেংকা'জানাল সঙ্গে সঙ্গে। প্রতাপরুদ্রদেব কে এই চৈতন্য তাঁর সম্পর্কে সব খোঁজ-খবর নিতে রাজ্যের সকলকেই নির্দেশ দিলেন। আর তিনি মনে মনে ভাবলেন, পাণ্ডাদের যতকিছু শৌর্যবীর্য সবই ত ঐ অনন্ত থেকে। অনন্তের মত শক্তিশালী তাঁর সেনাপতিও নন, অতএব এমন অনন্তকে যে সামান্য করাঘাতে ভূ-তলশায়ী নয়, ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে অতদূরে অনসর পিণ্ডিতে—না জানি সে কতবড় বীর। হয়ত কোন বাইরের শত্রু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে প্রবেশ করেছে তাঁর রাজ্যে। জগন্নাথকে অপবিত্র করে মন্দির লুণ্ঠন করতে চায়। আর মন্দির যদি শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হয়, তাহলে রাজ্যের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব। ডেকে পাঠালেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে। তাঁর কাছ থেকে সব সংবাদ শুনে তবেই হলেন শান্ত। কিন্তু রাজা তিনি। ভাবলেন, যে সন্ন্যাসীর এত বল বিক্রম তাঁকেই তাঁর প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এই জাতীয় সন্ন্যাসীর দ্বারাই সিদ্ধ হবে তাঁর উদ্দেশ্য।

দেখতে দেখতে সারা উৎকলে ছড়িয়ে পড়ল শ্রীচৈতন্যদেবের নাম। উৎকলবাসীরা 'সচল জগন্নাথ' বলে ছুটে আসতে লাগল দলে দলে মহাপ্রভুকে দেখার জন্য। শেষ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো লোকে জগন্নাথকে দর্শন আগে না করে চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে ভিড় জমাতে লাগল।

প্রতাপরুদ্রদেব দেখলেন এই সুযোগ। তিনি প্রভুর এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে দাবিয়ে রাখতে চাইলেন জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিতবর্গকে। ফলে চৈতন্যদেব হলেন পুরোহিতদের রোষভাজন।

এদিকে সেনাপতি বা অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধর ছিলেন অতি-উচ্চাআশা সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর লক্ষ্য হল উৎকলের সিংহাসন। তিনিও রইলেন না বসে। লিপ্ত হলেন পুরীর মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে। কিন্তু চৈতন্যের জনপ্রিয়তা তখন এমন তুঙ্গে সেখান থেকে তাঁকে নামাতে হলে তৈরী করতে হবে অন্য কাউকে দ্বিতীয় চৈতন্য। সন্ন্যাসীর প্রতিপক্ষ দাঁড় করাতে হবে সন্ন্যাসীকেই। কণ্টকে নৈব কণ্টকম্। গোবিন্দ বিদ্যাধর ভাবলেন, পুরোহিতদের হাত করতে পারলে উৎকলের সিংহাসন তার দখলে আসবেই। কারণ পাণ্ডারাইত আসল শক্তির কেন্দ্র।

এ উদ্দেশ্য সফল হতে দেরী হলো না তাঁর। দ্বিতীয় চৈতন্য তাঁরা সৃষ্টি করলেন অতিবড়ী জগন্নাথ দাসকে। কি জগন্নাথ দাসের নাম কি শোন নি ?

বিস্ময়াবিভূত আমি বললাম, জগন্নাথ দাসের নাম শুনব না কেন। আমাদের মেদিনীপুরে তাঁর নবাক্ষরী পয়ারে রচিত ভাগবত এক সময় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ওড়িয়া ভাষায় বঙ্গাক্ষরে কাঁথি নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। আমার সংগ্রহে সে ভাগবতের কোন কোন অংশ আছে। তিনিই ত 'বড় ওড়িয়া মঠে'র প্রতিষ্ঠাতা। শুনেছি তাঁর জন্ম হয়েছিল কাপলেশ্বরপুর গ্রামে। তিনি নাকি ব্যাসদেব কৃত শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা পাঁচ অধ্যায় বেশী রচনা করেছিলেন। এতে নানাপ্রকার তত্ত্ববিরোধ ও মায়াবাদ-গন্ধ ও প্রবেশ করিয়ে ছিলেন। শুনেছি তাঁকে নাকি মহাপ্রভু নিজেই 'অতিবড়' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বা গোবিন্দ বিদ্যাধর চক্রের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এখন কথা ত শোনা নাই বা জানিও না।

তা সব কথা আর জানবে কেমন করে। তাইত বলছিলাম, তোমাকে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে ওড়িয়া পুঁথি পত্র আবিষ্কার করতে হবে। তা না হলে পারবে না সব রহস্যের সমাধান করতে।

এদেশে অতিবড়ী জগন্নাথ দাসের ভীষণ নাম। প্রতাপরুদ্রদেব যেমন চৈতন্যভক্ত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর প্রধান মহিষী পট্টমহাদেবী শ্রীগৌরী অতিবড়ী জগন্নাথ দাসের শিষ্যা ছিলেন। দিবাকরদাস প্রণীত 'শ্রীজগন্নাথচরিতামৃত' পড়ে দেখো অনেক কথা জানতে পারবে। মহিষী তাঁর নিজের প্রাসাদ জগন্নাথ দাসকে দিয়েছিলেন মঠ স্থাপন করার জন্য। এ মঠ তুমি দেখেছ ?

না প্রভুজী, বড় ওড়িয়া মঠে এখনো যাওয়া হয় নাই।

যাবে। মঠের ভিতরে প্রবেশ করে দেখবে, এখনো প্রাচীন প্রাসাদের অনেক নিদর্শন দেখতে পাবে। শোন, যা বলছিলাম তোমায়। চৈতন্যদেবের সঙ্গে জগন্নাথ দাসের বিরোধ বাঁধতে দেরী হলো না। জগন্নাথ দাস নিজেকে শ্রীরাধা বলে প্রচার

করতে আরম্ভ করলেন। নিজে স্ত্রীবেশ ধারণ করে উৎকলের গ্রামে গ্রামে নিজের রচিত ভাগবত গান করে সকলকে মুগ্ধ করতে লাগলেন। উৎকলে তাঁর হাজার হাজার শিষ্য হতে আরম্ভ করল। যাজপুরে অল্প দিনের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। ক্রমে উড়িষ্যার রমণী সমাজে জগন্নাথের প্রভাব ভীষণ বেড়ে গেল। সুন্দরী রমণীগণ নাকি তাঁর গান না শুনলে থাকতে পারতেন না।

কথাটা কানে গেল মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের। তিনি বুঝতে পারলেন জগন্নাথকে আর বেশী বড় হতে দেওয়া যাবে না। তাই কারারুদ্ধ করলেন জগন্নাথ দাসকে। তখন উৎকলের রমণীগণ রানী শ্রীগৌরীর নেতৃত্বে জগন্নাথকে কারামুক্ত করতে চাইলেন। সহজে দমলেন না প্রতাপরুদ্রদেব। রাজ্যে নারীরা অন্ন-জল ত্যাগ করল। শেষে জগন্নাথ দাস নারীবেশ ধারণ করে কারারক্ষীকে প্রতারিত করে পালিয়ে গেলেন কারাগার থেকে। এর পরই জমে উঠল নাটক। চারিদিকে প্রচারিত হতে থাকল জগন্নাথ দাসের অলৌকিক ঐশীশক্তির কথা। দ্বিতীয় চৈতন্যদেব হতে জগন্নাথ দাসের আর বেশী সময় লাগল না। প্রতাপরুদ্রদেব রুষ্ট হয়ে মঠ ত্যাগ করে উৎকল থেকে চলে যেতে আদেশ দিলেন জগন্নাথ দাসকে। তখন কিন্তু জগন্নাথ দাস তাঁর ঘাঁটি শক্ত করে ফেলেছেন। জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডারা আর গোবিন্দ বিদ্যাধর পূর্ণ সমর্থন করছেন তাঁকে। পাণ্ডারা দাবী করল চৈতন্যদেবের চেয়ে জগন্নাথ দাস অনেক বড় সাধক। চৈতন্যদেব ত কৃষ্ণবিরহিনী পাগলিনী রাধারূপে নিজেকে কল্পনা করে সাধন করছেন, কিন্তু জগন্নাথ দাস স্বয়ং শ্রীরাধিকা। চৈতন্যদেব বলেন 'হরেকৃষ্ণ' আর জগন্নাথ দাস বলেন—'হরে রাম।' অতএব জগন্নাথ দাস শুধু বড় নন অতি বড়।

দেখতে দেখতে উড়িষ্যার সেদিনকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি পরিস্কার দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদিকে প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্যসম্প্রদায়। আর একদিকে গোবিন্দ-বিদ্যাধর, মন্দিরের পুরোহিতকুল ও জগন্নাথ দাস।

শেষে দু'দল থেকেই প্রশ্ন উঠল কে বড়? চৈতন্যদেব, না জগন্নাথ দাস। শেষে পরীক্ষার ব্যবস্থা হলো। জগন্নাথ মন্দিরই হলো পরীক্ষা কেন্দ্র। পরীক্ষার প্রশ্ন হলো—ঝড়ের রাতে প্রদীপ প্রজ্জ্বালন।

বলতে বলতে সহসা থেমে গেলেন প্রভুজী। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম হাসছেন মৃদু মৃদু। জিগ্যেস করলাম, প্রভুজী থামলেন কেন?

না, ভাবছি, তুমি বুঝি মনে করছ আমি সব মিথ্যে বলছি।

না না, আমার কাছে ত আপনার সব কথাই নতুন বলে মনে হচ্ছে। ঝড়ের রাতে প্রদীপ প্রজ্জ্বালন' ঠিক বুঝতে পারলাম না। কোথায় আছে এসব' কাহিনী?

এই পরীক্ষার ফলাফল তোমায় বলব না। কোন পুঁথিতে আছে তাও না।

তুমি কালকে গিয়েই দেখা করো পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মার সঙ্গে। তিনিই তোমাকে বলে দেবেন সব হদিস। তাঁর কাছেই আছে এসব কাহিনী যে পুঁথিতে তিনি পেয়েছেন, সেই পুঁথি। আমি তোমায় শেষের অংশটুকু বলি। যার জন্য তুমি এতক্ষণ আকুল আগ্রহে আমার কথা শুনছ।

কৃষ্ণদেব রায়ের কথা বলেছি। তাঁর হাতে বার বার আক্রান্ত হয়ে একের পর এক দুর্গের পতন হতে আরম্ভ করল। পুরী শহর হুসেন শাহ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছিল। এসব ঘটনা তোমার জানা। দুই প্রান্তের প্রতিপক্ষদের হাতে প্রতাপরুদ্রদেবের শোচনীয় পরাজয় রাজার উপর চৈতন্যদেবের অস্বাস্থ্যকর প্রভাব বলে বিদ্যাধর দেশের জনগণের কাছে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। দেশের জনগণের মধ্যে দেখাদিল নানা প্রশ্ন। রাজা ও চৈতন্যদেব দেশের জনগণের কাছ থেকে অনেকটা বিছিন্ন হয়ে পড়লেন। এক রকম বন্দী হলেন চৈতন্যদেব কাশী মিশ্রের গম্ভীরাতে। এই সময়ের কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণণা করেছেন 'বিরহ-উম্মাদ' বলে। অদ্বৈতাচার্যের তর্জা কথা ত তোমাদের জানা। তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন প্রভুকে। জগন্নাথ দাসের সঙ্গে বিরোধ তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ওঁর অনেক অন্তরঙ্গ পার্ষদ ব্যাপারটাকে ভালভাবে গ্রহণ করতে না পেরে প্রভুকে পুরী ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু চৈতন্য যখন সে কথা শুনলেন না তখন তাঁরাই পালিয়ে গেলেন বৃন্দাবনে। এসব অনেক তথ্য পাবে তুমি 'জগন্নাথচরিতামৃত' কাব্য থেকে।

গোবিন্দ বিদ্যাধর তখন ক্ষমতা দখলের চরম পর্যায়ে উপনীত। তিনি এবার পুরোহিতকুলের কাছে চাইলেন পূর্ণ সহযোগিতা। তাঁদের চৈতন্যবিরোধিতা ত ছিলই, অধিকন্তু আর্থিক টোপও দিলেন বিদ্যাধর। তিনি ঘোষণা করলেন, তীর্থযাত্রী ও ভক্তদের কাছ থেকে পূজা, দান, প্রণামী ইত্যাদি বাবদ যে বিপুল আয় হতো তার সবটাই পাবে পাণ্ডারা।

সুচতুর চৈতন্যদেব গোড়া থেকেই পুরোহিতদের ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন। তাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল। দ্বাররক্ষী মহাবলবান অনন্ত প্রতিহারী প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাই পাণ্ডাগণ তার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। তার পরিবর্তে দ্বার-রক্ষক বাহিনীতে অন্য একজনকে প্রধান দলপতি নিয়োগ করা হয়েছিল। তার নাম দীনবন্ধু প্রতিহারী। সে ত বলবান ছিলই, অধিকন্তু সে ছিল যেমন ধূর্ত তেমনি কুটবুদ্ধি সম্পন্ন। বিদ্যাধর আর পুরোহিতদের নিজের লোক।

চৈতন্যদেবের যিনি দেহরক্ষক ছিলেন, তার নাম কাশীশ্বর। সে ও ছিল ভীমদেহী মহাবলবান ব্যক্তি। (এ নামটি দেখছি 'চৈতন্যাবদানে' ডঃ শ্রীকুমার সেন ও উল্লেখ করেছেন, পঞ্চম অধ্যায়) শুধু তাই নয় যে দণ্ড তিনি ভার্গবী নদীতে (কুয়াখাই নদীর উপনদী। চন্দনপুরের নিকট প্রবাহিত) ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছিলেন সেই দণ্ড তিনি আবার গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন।

কিন্তু এতসব সাবধানতা অবলম্বন করেও শেষ রক্ষা তিনি করতে পারলেন না। হেরা পঞ্চমীর সংকীর্তন শেষ হয়েছে। আষাঢ় শুক্ল সপ্তমী তিথি। গুণ্ডিচা মন্দিরে কীর্তন চলছে। তখন সন্ধ্যারতির সময়। গুণ্ডিচা মন্দিরে গরুড় স্তম্ভের কাছে প্রভু পার্ষদবর্গ পরিবৃত হয়ে দেখছেন আরতি। এমন সময় শত শত মশালের তীব্র আলোকে ঝল্সে উঠল গুণ্ডিচা মন্দির। একটা তীব্র আলোকের ঝল্কানিতে বাঁধিয়ে গেল চোখ। গরুড় স্তম্ভের পিছনে চৈতন্যদেব নাই খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল চারদিকে। দীনবন্ধু প্রতিহারীর বাহিনী তখন উধাও। তাদের আর একদল বাঁধিয়ে দিল মহাগণ্ডগোল। জগন্নাথের গলার মালা কেন পড়ল ছিঁড়ে। এই নিয়ে মহাকোলাহল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না চৈতন্যদেবকে। অশ্বারোহী অনন্ত সিংহ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ছুটলেন দিকে দিকে। শেষে এক স্থানে পাওয়া গেল প্রভুর উত্তরীয় অর্থাৎ বহির্বাস। আর এক স্থানে পাওয়া গেল গলার মালা। শেষে মৃত দেহও পাওয়া গেল তোটা গোপীনাথ মন্দিরে। রায় রামানন্দের তত্ত্বাবধানে প্রভুকে সমাধি দেওয়া হলো ঐ তোটা গোপীনাথ মন্দিরের চত্তরেই। তুলসী মন্দিরের সামনে যে ছোট সমাধি মন্দির আছে, ওইটিই মহাপ্রভুর সমাধি। ঐস্থানেই শায়িত আছেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের হোতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

কিন্তু প্রভুজী বিশ্বাস করি কেমন করে। আর ঐ যে দীনবন্ধু প্রতিহারীর কথা বললেন, ঐ নামই বা কোথায় আছে?

তা ত তোমায় বলতে পারব না। আমার বিশ্বাস, কোন নয় কোন ওড়িয়া পুঁথিতে তুমি পাবে। সেইটিই তোমায় আবিষ্কার করতে হবে। তুমি ত ভারত সেবাশ্রম সংঘে রয়েছ, ওখানে মহারাজকে জিগ্গেস করো তিনিও বলবেন দীনবন্ধু প্রতিহারীর নাম। দীনবন্ধুই নাকি বুকের উপরে বসে গলা টিপে শ্বাস বন্ধ করে মেরেছিল প্রভুকে। অন্যান্যরা সাহায্য করেছিল তাকে।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা বলছ, তোমায় ত বললাম, তুমি গিয়ে দেখা করো পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মার সঙ্গে। দীনবন্ধুর নাম কোথায় আছে তা উনি হয়ত বলতে পারবেন না। কিন্তু আর যা বল্লাম সে সবের প্রাচীন এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ

তুমি পাবে। দেখবে সমাধির কথাও লেখা আছে পুঁথিতে। জগন্নাথ দাস কিভাবে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করলেন তাও জানতে পারবে।

এরপর যদি তোমার মনে কোন অবিশ্বাস জেগে থাকে তাহলে আমি তার নিরসন করব কেমন করে। যেখানে তোমার অবিশ্বাস হবে যুক্তি দিয়ে লিখবে। জানিয়ে দেবে পাঠকদের। তুমি যা পাবে তার উপরে ভিত্তি করে তোমার অভিমত ব্যক্ত করবে।

আমি ত সারাজীবন ভজনা করছি মহাপ্রভুকে। তবুও তাঁর সম্পর্কে এমন সব কথা বললাম, এসব যদি তুমি লেখো, তাহলে সকলে ত আমাকে চৈতন্য-বিদ্বেষী বলে মনে করবে। এখানেও যারা আমায় চেনে তারাও তাই মনে করে। কিন্তু তার মধ্যে পার্থক্য কোথায় জান, ওরা বলে চৈতন্যদেব হীন বীর্যের লোক ছিলেন, আমি তা স্বীকার করি না কিছুতেই। আমি যে সব প্রমাণ দিলাম, তা তুমি বিচার করে দেখো। এসব তথ্য থেকে তাঁকে ভীরু বলে প্রমাণ করা যায় কি।

শেষে তোমাকে একটা কথা বলি, চৈতন্য হত্যার পর গোস্বামীদের হাতে তাঁর প্রবর্তিত গণ আন্দোলন সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত হয়ে মাত্র মুণ্ডিত-মস্তক ধর্মান্ধদের কীর্তনের দলে পর্যবসিত হয়েছে। আর অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে দেখ, রামদাস স্বামী ভক্তি-আন্দোলনকে রাজনীতির খাতে প্রবাহিত করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্বাধীন মারাঠা রাজ্য। মারাঠা জাতি লাভ করেছিল নতুন জীবন। জেগে উঠেছিল সারা দেশটা কি অপূর্ব প্রাণোন্মাদনায়।

কিন্তু আজকে সব থেকে বড় দুঃখ কি জান, চৈতন্যদেবের এত দূরদর্শিতা, যার মধ্যে ছিল এত সদ্‌গুণ, যিনি ছিলেন অমিত পৌরুষের অধিকারী, সেই তাঁকেই তোমরা মন্দিরে পুজো করছ ভগবান বানিয়ে, আর আমরা গালি দিচ্ছি চৈতন্যের জন্য নাকি বীর্যহীন জাতিতে পরিণত হয়েছি আমরা। তোমরা তাঁর দু'হাত নিয়ে সন্তুষ্ট নও, বানিয়েছ চতুর্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ। আর আমরা গেছি তোমাদেরও ঊর্দ্ধে। চার হাতেও সন্তুষ্ট হইনি আমরা। গড়েছি ষড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ। তাই স্থাপন করে মন্দিরে পুজো করছি। আমার দেশের গবেষকগণ পুঁথিপত্র ঘেঁটে তথ্য সাবুদ দিয়ে প্রমাণ করে ছেড়েছেন, চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মকে উৎকলবাসী গ্রহণ করার জন্যেই পরিণত হয়েছি হীনবীর্য জাতিতে। এর থেকে পরিতাপের বিষয় কি আর হতে পারে বলো।

তুমি ত এখনো কিছুদিন থাকবে পুরীতে। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলো। দেখছি বৃষ্টিও থামছে না। আজকে এসো। কালকে কিন্তু যাবে পণ্ডিতজীর সন্ধানে।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। প্রণাম করে উঠে এলাম প্রভুজীর ভজন কুঠি থেকে। সারাদিন খাওয়ার কথা মনেই ছিল না। মাথায় উড়ানীটা জড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলাম ভিজে ভিজে।



॥ পাঁচ ॥

চৈতন্য-জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায়

॥ ১ ॥

আজ চৌঠা অক্টোবর, শনিবার। গত রাতেও ভীষণ বৃষ্টি হয়েছে। কয়েক দিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই ঘুমিয়েছি একটানা সারারাত। ঘুম ভাঙল সকাল সাতটায়। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এলাম সমুদ্র স্নান করে।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়লাম সাড়ে সাতটার মধ্যে। তখনো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি স্বর্গদ্বার থেকে জগন্নাথ মন্দিরে। সঙ্গে কিশোরও আছে। ও মন্দিরে পুজো দেবে। আমি চুপচাপ চলেছি ভাবতে ভাবতে। গত দিনের কথাই ভাবছি।

প্রভুজীর কথাগুলো যেন বার বার ধ্বনিত হচ্ছে কানের কাছে। কাল যেভাবে উনি চৈতন্যদেবকে ব্যাখ্যা করলেন, ঠিক এমনভাবে ত কোনদিন ভেবে দেখিনি। যতই ভাবছি নিজে নিজেই কেমন যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠছি। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় চৈতন্য জীবনের যে বিচার বিশ্লেষণ করলেন, তাকে নস্যাৎ করা যায় না কিছুতেই। চৈতন্য-জীবনের উপরে এ যেন সম্পূর্ণ নতুন আলোকপাত। ইতিপূর্বে কোন কোন গবেষক তৎকালীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেবকে খাড়া করতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু এমন করে তথ্য প্রমাণ দিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রতিটি ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে পেরেছেন বলে মনে পড়ছে না।

চৈতন্যদেব সমসাময়িক উৎকলের রাজনীতিতে যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তা সঠিকভাবে আমারও জানা ছিল না। ইতিপূর্বে অনেক পাঠকই আমাকে পত্র দিয়ে জানিয়েছেন, মহাপ্রভু ত সন্ন্যাসী মানুষ, তাঁকে সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধর কেনই বা হত্যা করলেন। কি তাঁর অপরাধ।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি যেন ঠিক ঠিক যুক্তিযুক্ত তথ্য প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। প্রভুজী যেভাবে পুরো ঘটনাটি ব্যাখ্যা করলেন, তাতে পরিষ্কার হয়ে গেছে চৈতন্য-হত্যার কারণ।

কিন্তু কে এই প্রভুজী। ইনিত ডঃ মুখোপাধ্যায় কথিত প্রভুজী কোনমতেই হতে পারেন না। যদি তিনিই হতেন, তাহলে এত কথা বললেন, রামানন্দের চিঠির কথা কি চেপে রাখতে পারতেন। প্রশ্ন করতে স্পষ্টইত বললেন, কে জয়দেব মুখোপাধ্যায়, তাকে তিনি চেনেন না। তাঁর সঙ্গে এঁর কোন কথাও হয়নি। যেভাবে জয়দেব বাবু প্রভুজীর বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে কোন মতেই মিলছেও না। ইনি ত বাঙালী মোটেই নন, কেননা এঁর কথার মধ্যে ওড়িয়া ভাষার টান লক্ষ্য করেছি পুরোপুরি। প্রতিটি শব্দের শেষ অক্ষরের উপরে জোর স্বাসাঘাত দিয়ে উচ্চারণ করেন।

ওড়িয়া এমন একটি সংস্কৃতজ ভাষা, যা অর্ধসহস্রাব্দি কালের মধ্যে সব থেকে কম বদলেছে। মাগধি প্রকৃত থেকে উৎপন্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের ছ'টি ভাষার (বাংলা, ওড়িয়া, আসামি, মৈথিলী, মাগধি এবং ভোজপুরী) মধ্যে ওড়িয়াই তার শব্দের অন্তস্থ স্বরবর্ণকে রেখেছে টিকিয়ে। তাই এই ছয়টি ভাষার মধ্যে রক্ষণশীল ওড়িয়াই আদিম 'মাগধি অপভ্রংশ' গুলি রাখতে পেরেছে বাঁচিয়ে।

শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, জাতিগতভাবে শিল্পের ক্ষেত্রেও যেন বড় রক্ষণশীল। বড় 'কনসারভেটিভ।' ভাবতে সত্যি আশ্চর্য লাগে—যে কলিঙ্গ তার এই শ্রীক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার গোঁড়ামিকে একেবারে নস্যাৎ করে ফেলল—যা নাকি আসমুদ্র হিমাচলে আর কোথাও হলো না সম্ভবপর—সেই কলিঙ্গই কি করে তার যাবতীয় শিল্পে-ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, নাচে, গানে, মীনার কাজে, বস্ত্রশিল্পে এতটা রক্ষণশীল হয়ে থাকল সহস্রাব্দি কাল ধরে। অথচ আশপাশের শিল্প-স্ফুরণ সে দেখেছে, বুঝেছে—কিন্তু নিজ জারকরসে সম্পূর্ণ জীর্ণ না করে কোন কিছুই সে গ্রহণ করেনি।

এমনি এলোমেলো ভাবছি। মাঝে মাঝে চিন্তার ধারাবাহিকতা যেন হারিয়ে ফেলছি। আবার ঘুরেফিরে সেই প্রভুজীর কথাই মনে পড়ছে। এ মানুষ কখনই স্টেটসের সেই বৃদ্ধ অধ্যাপক হতেই পারেন না। অথচ জিগ্গেস করতে তিনি ত বললেন, তাঁকে প্রভুজী বলেই সকলে ডাকে। অন্য কোন নামে পরিচিত হলে সে কথা তিনি ত বলতেন। খামকা, এত কথা ভাবছি কেন। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে কে সেই অন্তরঙ্গ পার্ষদ, যে যুক্ত ছিল গোবিন্দ বিদ্যাধরের চৈতন্য নিধন চক্রে। কার নাম উল্লেখ করেছিলেন রায়রামানন্দ। পাঠকবৃন্দ বার বার আমাকে পত্রাঘাতে অস্থির করে তুলেছেন, বলুন, কে সেই অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

খুঁজেছিলাম জয়দেব বাবুর বই তন্ন তন্ন করে। কিন্তু ঠিক-ঠিকানা পাইনি প্রভুজীর। অবশ্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—'এখন পর্যন্ত আনন্দ জানেই না মাধবী ও প্রভুজীর আস্তানাটা কোথায়? কোন ব্যাপারেই অকারণ কৌতূহল প্রদর্শন তার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই প্রভুজীর পুরীর আবাস জানতে চাইতে দ্বিধাবোধ করেছে সে।

আজ মনে হচ্ছে ওটা জানা থাকলেই ভাল হত হয়ত।'—কাঁহা গেলে তোমা পাই। পৃষ্ঠা. ৮৩।

তাহলে কে এই প্রভুজী? ইনি কি জয়দেব বাবুর মানস-সৃষ্টি? কিন্তু উনি যে বলেছেন—'প্রথম খণ্ডের সমস্ত ঘটনাই যে সত্যভিত্তিক এবং বর্ণিত সকল চরিত্রই যে আজও জীবিত—সে বিষয়ে পাঠক-পাঠিকা নিঃসংশয় হতে পারেন।'—ঐ, কভার পৃষ্ঠা-লিপি।

কেমন যেন নিজে নিজেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। মনকে প্রবোধ দিই— তা অত ভাবনার কি আছে বাপু। তুমি ত যাচ্ছ পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মার কাছে। তাঁকেই প্রশ্ন করবে সরাসরি। জেনে নেবে কে এই বৃদ্ধ অধ্যাপক প্রভুজী? কেটে যাবে তোমার মনের দ্বন্দ্ব। পুরীতে চৈতন্য-গবেষক প্রভুজী বলে কেউ থাকলে নিশ্চয়ই তাঁকে উনি চিনবেন। তাছাড়া তিনি যখন চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করছেন, তাঁকে ত না জানার কথা নয় পণ্ডিতজীর।

কিশোর বললে—আমরা এসে গেছি জগন্নাথ মন্দিরের কাছে। জুতোগুলো রাখতে হবে।

সহসা ছিন্ন হলো চিন্তা জাল। তাকিয়ে দেখি সামনে অরুণ স্তম্ভ। সত্যি এসে গেছি সিংহ দরজার সামনে। দুজনে জুতোগুলো জমা দিয়ে এগিয়ে গেলাম সিংহ দরজার দিকে। সঙ্গীকে বললাম, ভাই তুমি পুজো দেওয়ার বন্দোবস্ত কর। আমি দেখি পণ্ডিতজীর ঠিকানা জোগাড় করতে পারি কিনা।

তা দেখলাম, এক ডাকে চেনে সবাই পণ্ডিতজীকে। যাকেই শুধালাম সেই বললে —এই পুরীতেই পণ্ডিতজীর বাড়ী। তবে একটু দূরে। পথর সাই। চলে যান সোজা গুণ্ডিচাবাটীর পথে। দেখবেন ডান দিকে চলে গেছে একটা বড় রাস্তা। চলে যাবেন সে দিকেই। তারপর যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই দেখিয়ে দেবে পণ্ডিতজীর বাড়ী।

তখন প্রায় দেড়টা। খুঁজে খুঁজে হাজির হোলাম সদাশিব রথশর্মার বাড়ীর সামনে। পাকা বাড়ী। দেওয়ালে পাথরের প্লেটে পণ্ডিতজীর নাম লেখা। ঢুকে পড়লাম সাহস করে। একেবারে ভিতরে। কে একজন মাধ্যাহ্নিক আহার করছিলেন, সরাসরি তাকেই শুধালাম। উনি বাড়ীতে আছেন কিনা।

আছেন। তবে এখন ত ও'র সঙ্গে দেখা হবে না। আপনি আসুন তিনটের পর। কি আর করব। অগত্যা ফিরে এলাম আশ্রমে। একটানা বৃষ্টি আর হচ্ছিল না বটে। তবে আকাশে ভীষণ মেঘ। অন্ধকার হয়ে আছে চারিদিক। মাঝে মাঝে দু'এক পশলা বৃষ্টিও হচ্ছে।

বিকেলে যখন গিয়ে হাজির হোলাম, ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটে। খবর দিতেই একটি ১৪।১৫ বছরের মেয়েছেলে আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল পণ্ডিতজীর শোয়ার ঘরে। বসে রয়েছেন তক্তাপোষে। খোলা গা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ছোট করে ছাটা মাথার চুল। চোখ দুটি উজ্জ্বল। সমৃদ্ধ দেহসম্পদে।

ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। উনি সাগ্রহে বললেন—বসুন। বলে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তক্তাপোষ। যাতে বসে আছেন, বসতে বললেন তাতেই। আমি বসলাম, একটু যেন সঙ্কুচিত হয়ে। ব্রাহ্মণ, তায় পণ্ডিত মানুষ। কি জানি আমাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবেন।

কিন্তু বৃথা সে আশংকা আমার। অতি সরল, দেখলাম, যেন কোন গোঁড়ামিই নাই। নিরভিমানী সাদাসিধে অতি সুন্দর মানুষ।

তমলুক থেকে আসছি বলতে প্রথমটা ঠিক যেন বুঝতে পারছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লাম—তাম্রলিপ্তের কথা। এবার পণ্ডিতজী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। পরিষ্কার সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলায় বললেন—তাম্রলিপ্তের নাম খুব ভাল করেই জানি। পূর্ব-ভারতের প্রাচীন সামুদ্রিক বন্দর। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধির কথা বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে জানা যায়। সেই তাম্রলিপ্তের অপভ্রংশ এখন তমলুক।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—ঠিকই বলেছেন পণ্ডিতজী। সেই তমলুক থেকেই আমি আসছি। দেখা করতে আপনার সঙ্গে। অনেক নাম শুনেছি আপনার। আমার দেশের বড় বড় কাগজে আপনার নাম সহ 'চৈতন্যচকোর' পুঁথির ছবি ছাপা হয়েছে। তাছাড়া আমি ত আগে থেকেই আপনার গবেষণার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম।

চৈতন্যচকোর নয় 'চৈতন্য চক্‌ড়া'। তোমরা বাংলায় যাকে কড়চা বল, ওড়িয়া ভাষায় তাকেই বলে 'চক্‌ড়া।' এর অর্থ হলো স্থানীয় ইতিহাস। ইংরেজীতে যাকে বলে 'রিজিওন্যাল হিস্ট্রি (regional history)। বলতে পার প্রামাণিক আঞ্চলিক বিবরণী। ওঁরা বোধহয় ঠিক বুঝতে পারেননি, মনে করেছেন চৈতন্যচন্দ্রকেই বুঝি ওড়িয়াতে 'চৈতন্যচকোর' বলে। কিন্তু চকোর মানে ত এক জাতের পাখি।

আমি বললাম—কড়চাকেই ওড়িয়াতে যে 'চক্‌ড়া' বলে তা আমি জানি। বিভ্রান্ত হয়েছিলাম কাগজের ছবি আর বিবরণ পাঠ করে। তাই ত এলাম আপনার কাছে। আচ্ছা পণ্ডিতজী, যার কথা কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, সেই পুঁথিটিই ত বৈষ্ণব দাসের 'চৈতন্য চক্‌ড়া' ?

না না, সেটি হলো গোবিন্দ দাস বাবাজীর 'চৈতন্য চক্‌ড়া।'

কিন্তু আমি ত ঐ পুঁথিটি বৈষ্ণবদাসের বলে আমার বই-এ লিখেছি।

তুমি তা হলে ডঃ জয়দেব বাবুর বই দেখেই সিদ্ধান্ত করেছ। বৈষ্ণব দাসের বই-এর নাম 'চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া'। সে হলো ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। গঞ্জাম জেলায় শিকুলা গ্রামে গিয়েছিলাম রাধাকৃষ্ণ পাণ্ডার বাড়ী। পেয়েছিলাম তার বাড়ী থেকেই তালপাতায় লেখা উক্ত পুঁথিটি। বড় জীর্ণ। প্রাচীন উৎকল করণী লিপিতে লেখা। শেষাংশটিই কিছুটা ভাল ছিল। প্রথমাংশের তালপাতাগুলো জুড়ে গিয়েছিল বিশ্রীভাবে। কীটদষ্ট, অস্পষ্ট এই পুঁথিটি নিয়েই আমি সর্বপ্রথম কাজ আরম্ভ করি। ঐ পুঁথিরই কিছু অংশ এই পুরীর আনন্দময়ী আশ্রমের গবেষক ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় ও কিছু অংশ ভক্ত জয়লাল ডালমিয়াকে দিয়েছিলাম গবেষণার জন্য। বলেছি পুঁথিটি কীটদষ্ট, জীর্ণ। ঐ জীর্ণ পুঁথির দু'টি পংক্তি থেকে জানা গেছে, সম্ভবতঃ ওর রচয়িতা ছিলেন বৈষ্ণব দাস।

'এ পোথি রচিল দীন বৈষ্ণব দাস। (৩৭ পৃষ্ঠা)
দীন হীন বৈষ্ণবের চকড়া রচনা। (৪০ পৃষ্ঠা)

এর থেকেই অনুমান করা হয় পুঁথিটি বৈষ্ণব দাসের লেখা। কোথাও কোথাও হয়ত বৈষ্ণবচরণও লেখা থাকতে পারে।

প্রশ্ন করি, আপনি ত বৈষ্ণব দাসের 'চৈতন্য গৌরাঙ্গ চক্‌ড়া'র আবিষ্কর্তা। ঐ পুঁথিতে শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধির কথা লেখা আছে। যতদূর সম্ভব সেই দুটো পংক্তি আমার মনে পড়ছে ঃ

আজ্ঞা দিলে বিলোপিনো রাজা শ্রীঅঙ্গকু।
সমাধি করিল সর্বে নাম রতন ঘোষি ॥

আমার প্রশ্ন হচ্ছে—মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভুর মৃতদেহকে কোথায় সমাধি দিতে আদেশ করেছিলেন, তা কি ওই পুঁথিতে লেখা আছে?

তোমাকে গোড়াতেই বললাম না, ঐ পুঁথিটি আমি দুজনকে গবেষণার জন্য দিয়েছি। তাছাড়া জীর্ণ অস্পষ্ট ঐ পুঁথির প্রাচীন করণী অক্ষরের সব পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সমাধি স্থানের কথা ওতে লেখা আছে কিনা আমি বলতে পারব না।

তবে আমি গোবিন্দদাস বাবাজীর যে পুঁথি আবিষ্কার করেছি, তাতে মহাপ্রভু সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত নতুন তথ্য পেয়েছি। যা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

আমি উৎসাহিত হয়ে জিগ্‌গেস করি—আপনি প্রভুজীকে চেনেন? সেই প্রভুজী যিনি এককালে আমেরিকা স্টেট্‌সের অধ্যাপক ছিলেন। ভদ্রলোক অবসর গ্রহণ করে বাস করছেন পুরীতে। আসল কি নাম তার জানা যায়নি। তিনি নিজেকে 'প্রভুজী' বলে পরিচয় দেন। আজ ছ'বছর নাকি 'চৈতন্য ব্রত' গ্রহণ করেছেন। গবেষণা

করছেন শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে? এই প্রভুজী ডঃ জয়দেব বাবুকে তাঁর গবেষণায় অনেক সাহায্যও করেছেন। বলতে গেলে তাঁর জন্যই জয়দেব বাবুর অনেক সুবিধা হয়েছে। এই প্রভুজীই নাকি শ্রীচৈতন্যদেবকে লেখা রায়রামানন্দের একটি চিঠি রাজমহেন্দ্রীর প্রাচীন মহাফেজখানা থেকে আবিষ্কার করেছেন। তাতে লেখা আছে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ কোন পার্ষদ নাকি যোগ দিয়েছিলেন চৈতন্য নিধন চক্রে?

পণ্ডিতজী বললেন—তুমি কি বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। স্টেটসের অবসর প্রাপ্ত কে অধ্যাপক এখানে চৈতন্যদেবকে নিয়ে আজ ছ'বছর গবেষণা করছেন, কই তাঁকে ত আমি জানি না। রায় রামানন্দের চিঠির কথাও কিছু বলতে পারব না। অন্য কি জানতে চাও তাই বলো।

বললাম—প্রাচীন কবি গোবিন্দ দাস বাবাজী সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন। কি ভাবে পুঁথিটি কোথায় আবিষ্কার করলেন?

হ্যাঁ. প্রায় চার বছর আগে। পণ্ডিতজী বলতে আরম্ভ করলেন। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ জুন, বালিসাহিতে গিয়েছিলাম কলিঙ্গ সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের একটি জন সভায়। গঙ্গামাতা মঠের মোহান্ত বনমালী দাস গোস্বামী বললেন—আমার মঠে কিছু ওড়িয়া পুঁথি আছে। দেখুন না, সে সব পুঁথি নিয়ে গবেষণা করা যায় কিনা। তিনি বেশ উৎসাহিত হয়ে কথাগুলি বললেন। এর কিছুদিন পরেই আমি আর জগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ডঃ মেজর বি. কে. মহান্তি গেলাম উক্ত মঠে। আমরা দু'জন মোহান্ত বনমালী দাস গোস্বামীর কাছে প্রার্থনা জানালাম পুঁথিগুলি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করতে। মোহান্তি সাধক মানুষ। পোঁছেছেন জীবনের শেষ প্রান্তে। তিনি সব শুনে পুঁথিগুলি দান করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শেষে আমায় একটি বিশেষ পুঁথি দেখিয়ে বললেন—দেখুন, এই পুঁথিটি পুজার আসনে ছিল। নিত্য সচন্দন তুলসীতে পূজিত-হচ্ছিল। আমার অন্তিম ইচ্ছা, আপনি এটি প্রকাশ করুন। সেই বিশেষ পুঁথিটিই হলো 'শ্রীচৈতন্যচকড়া।'

সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম—ঐ পুঁথিটি কার লেখা? পুঁথি থেকে লেখকের কোন আত্মপরিচয় পাওয়া গেছে কি?

তা পাওয়া যাবে না কেন। পুঁথিটির রচয়িতা প্রাচীন কবি শ্রীল গোবিন্দ দাস বাবাজী (পট্টনায়ক)। পুঁথির প্রথমেই কবি তাঁর আত্মপরিচয় এই ভাবে দিয়েছেন:

করণ কুল সম্ভব নাম মো গোবিন্দ।
বৈষ্ণব দীক্ষারে দাস নাম মোর পদ॥

আশা করি এ ভাষা তোমার বুঝতে কোন কষ্ট হবে না। লেখক করণ কুলে জন্ম· গ্রহণ করেছিলেন। নাম ছিল তাঁর গোবিন্দ। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর 'দাস' হন।

গ্রন্থ শেষ করার আগে আরো বিস্তৃতভাবে কবি তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কবি লিখেছেন ঃ

বালিসাহি ঘনামল্ল পাটনার বাস।
পীতাম্বর পিতা মোর ভাই কৃত্তিবাস॥
দেউলে করণ পাঞ্জী লেখন বেউসা।···

অর্থাৎ বালিসাহি ঘনামল্ল পাটনায় আমার বাড়ী। পীতাম্বর আমার পিতার নাম। ভাইয়ের নাম কৃত্তিবাস। আমাদের বংশের ব্যবসা হলো মন্দিরের পঞ্জিকা লেখা।

তারপর কবি কেমন করে বৈষ্ণব হলেন, দিয়েছেন তারও বিবরণ। কবি লিখেছেন ঃ

শ্যামানন্দ কুঞ্জ মঠে দীক্ষা ঘেণি লই॥
পট্টনায়ক সাঁতরা পদ বদলিলা।
গোবিন্দ দাস বাবাজী নাম মোর হেলা॥
দইবে মোহর পত্নী হীরা অজি থিলা।
এ জীব গুরু গোবিন্দ ভজি ধন্য হেলা॥

অর্থাৎ কবি বলছেন—আমি শ্যামানন্দ কুঞ্জমঠে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। আমার পদবী ছিল পট্টনায়ক সাঁতরা। তা বদল করে আমার নাম হলো গোবিন্দ দাস বাবাজী। দৈবাৎ আমার পত্নী হীরা হারিয়ে গিয়েছিল। গুরু গোবিন্দকে ভজনা করে আজ আমি অমূল্য সম্পদ পেয়ে ধন্য হোলাম।

কবি এত সংযত হয়ে তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন, এর থেকে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কবির পত্নী হীরা দৈবাৎ কি করে কোথায় হারিয়ে গেল বা দেহত্যাগ করলো এ থেকে তা' কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু জানা যাচ্ছে না।

তবে কবি তাঁর গ্রন্থ সমাপ্তির কথা লিখেছেন বেশ স্পষ্ট ভাষায়। কবি বলছেন ঃ

চতুর্দ্দশ ষষ্ঠাধিক পচাশত শকে।
চকড়া শেষ করলু করমানু বিপাকে॥
চকড়া পাঞ্জী লেখি ছামুরে জনাই।
ক্ষেত্রের চরিত এথি অন্যলীলা নাই॥
নয়নে দেখিন সাধুবাণী অনুরূপ।
চকড়া সমাপ্ত কলু আজ্ঞারে প্রত্যক্ষ॥
প্রভু নীলাদ্রি মণ্ডল পদে রখি ধ্যান।
চৈত্র শুক্ল নবমীরে লেখন সম্পূর্ণ॥

বেশ বোঝাই যাচ্ছে ১৫৩৪ অব্দে কবি তাঁর গ্রন্থ লেখা শেষ করেছিলেন। চকড়াটি লিখে কবি নিবেদন করেছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের কাছে। আরো বলছেন, মহাপ্রভু কেবল মাত্র শ্রীক্ষেত্রে যে সব লীলা প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলি ভিন্ন অন্য কোন লীলার কথা এতে লিখেন নি। আরো বলছেন, তিনি যা চোখে দেখেছেন এবং যা সাধু মুখে শ্রবণ করেছেন, কেবল মাত্র তাই লিখেছেন। প্রভু নীলাদ্রির চরণ স্মরণ করে চৈত্র শুক্ল নবমীতে কবি তাঁর চকড়া শেষ করেছেন।

কিন্তু আমি যেটি পেয়েছি, সেই পুঁথিটি কিন্তু গোবিন্দ দাস বাবাজীর মূল পুঁথি নয়। মূল পুঁথি থেকে অনুলিপি করেছেন, লিপিকার—শ্রীশ্রীরসিকরাজ মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ে শ্রীশ্রীগঙ্গামাতা মঠের অধিকারী বাবাজী শ্রীল ভগবান দাস গোস্বামী মোহান্ত। প্রতিলিপি করা হয়েছিল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থে লিপিকরণের সাল তারিখের উল্লেখ আছে ঃ

'শকে ১৬৪৪ ভাদ্র পদ অষ্ঠম্যাস্ সম্পূর্ণ পুস্তক পাঠান্তর ১৭৪৪।' আমি বললাম —পণ্ডিতজী, আপনি কি দয়া করে একবার পুঁথিটি আমায় দেখাবেন। দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।

সে পুঁথি ত তোমায় দেখাতে পারব না। তাছাড়া, বর্তমানে আমার কাছেও নাই। তোমার দেশের মন্ত্রী ডাঃ অজিত কুমার পাঁজা, (বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) এসেছিলেন পুরীতে। চাইলেন। না বলতে পারলাম না। বললেন, বৃহত্তর ক্ষেত্রে পুঁথিটি যাতে প্রচারিত হয় এবং গবেষণা হয় তার বন্দোবস্ত করবেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, তাহলে পুঁথিটির কোন নকল বা জেরক্স কপিও কি করে রাখেননি ?

উনি বললেন—তা করা হয়েছে। ভুবনেশ্বর মিউজিয়ামের তালপাতার পুঁথি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নীলমণি মিশ্র, পুঁথির প্রতিটি পৃষ্ঠা মাইক্রো ফিল্ম করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া ওড়িয়া ভাষায় বইটি প্রকাশিত ও হয়েছ।

সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম—ওড়িয়া ভাষায় কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে ?

প্রকাশ করেছেন কটক চারণ গোষ্ঠী। এই সংস্থার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মহারাণা (কালিয়া) পরম আগ্রহে প্রকাশের সব দায়িত্ব নিয়েছেন। এটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশত আবির্ভাব স্মারক হিসেবে প্রকাশিত হবে।

আচ্ছা পণ্ডিতজী, এই পুঁথির মধ্যে কি আছে ? শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য কি মিলেছে ?

বললাম না, কবি শ্রীচৈতন্যদেবের শুধু নীলাচল লীলাই এতে ব্যক্ত করেছেন। এই লীলাকাহিনীগুলির মধ্যে চৈতন্য-জীবনের বহু অপ্রকাশিত ঘটনাই প্রকাশিত

হয়েছে। নিশ্চিতরূপে এগুলি অভিনব ও চমকপ্রদ। একটি ঘটনা আছে—মহাপ্রভু জগন্নাথের মন্দির গাত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনীর দৃশ্যাবলীর ভাস্কর্য দেখেছিলেন। মন্দির গাত্রের সর্বত্রই অপূর্ব স্থাপত্য ভাস্কর্যে অলংকৃত মূর্তিগুলি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি দেখেছিলেন সমগ্র মন্দিরে ভাগবতের প্রকাশ। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দের পর এসব কারুকার্য চুণের পলেস্তারায় ঢাকা পড়ে যায়। সমগ্র মন্দির যে শিল্প সুষমায় সুসজ্জিত ছিল, ক্রমে তা মানুষ ভুলে যায়। তারপর থেকে সকলেই মনে করত জগন্নাথের মন্দির নিরাভরণ সাদাসিধে রেখ দেউল মাত্র।

আমিই প্রথম উদ্যোগ করেছিলাম, বলেছিলাম, না, জগন্নাথ মন্দির নিরাভরণ নয়। উপরের চুণের পলেস্তরা ভাঙলেই বেরিয়ে পড়বে মন্দিরের আসল রূপ। এই নিয়ে শেষে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা চলেছিল। এখন ত দেখতেই পাচ্ছো চুনের পলেস্তরা খোলা হতেই একে একে বেরুচ্ছে মন্দির-গাত্রের অলংকরণ। অতএব চৈতন্যদেব যা দেখেছিলেন বা গ্রন্থকার যে বিবরণ দিয়েছেন, তা কেমন অক্ষরে অক্ষবে সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

নতুন তথ্যের কথা বলছিলাম—অনেক নতুন তথ্য আছে। যেমন—ভূমি দণ্ডবত প্রসঙ্গ, অতিবড়ি জগন্নাথের সঙ্গে মিলন, জগমোহনের স্তম্ভে ষড়ভুজ মূর্তি স্থাপন, গোদাবরী রাজগুরুর পদত্যাগ, অষ্টভুজ নারায়ণ দর্শন, কৃষ্ণচিন্তামণি রহস্য, সিদ্ধ বকুল প্রসঙ্গ, অচ্যুতানন্দ দাসের মন্ত্রগ্রহণ, আহ্লা মঠ প্রসঙ্গ, মূর্তি মণ্ডপে শ্রীচৈতন্য মূর্তি স্থাপন, প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে প্রদীপ প্রজ্বালন—এসব কাহিনী নিঃসন্দেহে যেমন অভিনব, তেমনি সকলের কাছে অজ্ঞাত ত বটেই।

আবার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রামান্য জীবনীতে যে সব প্রসঙ্গ তথ্য-সমৃদ্ধ নয়, সে সব প্রসঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে 'চৈতন্য চকড়া'য়। যেমন লাবণ্যের কথা। কোন প্রামাণ্য জীবনীতে মল্লবীর অনন্ত প্রতিহারীর কাহিনী নাই। চকড়ায় কিন্তু তা রয়েছে। আবার মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতন, রাঘবের ঝালি সমর্পণ প্রভৃতি কাহিনী সম্পূর্ণ অনুপস্থিত রয়েছে 'চৈতন্য চকড়া'য়।

কবি নিজেই লিখেছেন গ্রন্থে ৫৪টি মাত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন :

চউবন লীলা মোর সম্পূর্ণ হইলা ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্মে ইহা সমর্পিলি।
চউবন লীলা মালা লেখি বঢ়াইলি ॥

অর্থাৎ আমার ৫৪টি লীলা বর্ণনা এখানেই শেষ হল। আমি এই লীলা কাহিনী-গুলিকে চুয়ান্ন দানার মালার মত সমর্পণ করলাম শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে।

এই যে মোট ৫৪টি লীলার কথা কবি বলেছেন, এর মধ্যে অধিকাংশই ইতিপূর্বে

আমাদের জানা ছিল না। 'চৈতন্য চকড়া' আবিষ্কারের ফলেই এসব জানা সম্ভব হয়েছে।

বল্লাম—অনন্ত প্রতিহারীর কথা একটু যদি বলেন। শুনতে বড় আগ্রহ হচ্ছে। দয়া করে সংক্ষেপে একটু বলুন না।

সেদিনটি ছিল রবিবার। কার্তিক মাসের শুক্লদশমী। এই বলে পণ্ডিতজী বলতে আরম্ভ করলেন। চকড়াতে ঠিক লেখা আছে এইভাবে ঃ

কার্তিক দশমী রবিবার দিবসরে।
অঘটন ঘটন ঘটিলা দেউলরে॥
মুখ মন্দিররে গোরা মহাভাবে রহি।
প্রভু দরশনে ইচ্ছা প্রবল হুই॥

কবি বলছেন—জগন্নাথ মন্দিরে একটা অঘটন ঘটল। মুখ্য মন্দিরে গোরা রায় মহাভাবে নিমগ্ন হয়ে জগন্নাথ দর্শন করছিলেন। হঠাৎ তাঁর প্রবল ই'চ্ছে হল, কাছে গিয়ে তিনি প্রভুকে দর্শন করবেন। ভাবাবেশে প্রভু এগিয়ে চললেন সিংহাসনের দিকে ঃ

ভাবের আবেশে গোরা হইল তৎপর !
প্রতিহারী অনন্ত (গোচ্ছিকার) যে বলিষ্ঠ শরীর॥
নিষেধ করন্তে গোরা ভাব-তনু ধরি।
করে আড়াইন দেলে দ্বার-প্রতিহারী॥

বলিষ্ঠ শরীর অনন্ত প্রতিহারী তখন ভাব-তনু ধরে প্রভুকে যেতে নিষেধ করল। প্রভু তখন ভাবে উন্মত্ত। অনন্তকে হাত দিয়ে সরিয়ে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাতেই অনন্ত ঃ

অনসর পিণ্ডি ধারে যাইন পড়িলে।
হাহাকার দেউলরে সর্ব্বে নির্বার্ত্তিলে॥

অর্থাৎ ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল 'অনসরপিণ্ডি' পূজাপীঠে। তখন মন্দিরের সকলে হাহাকার করে উঠল। প্রভুর মূর্তি তখন ভয়ঙ্কর মত্তগজের মত। চলে গেছেন সিংহাসনের কাছে। তারপর নিলেন জগন্নাথের চরণ প্রসাদ। ফিরে এলেন প্রসন্ন মনে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীক্ষেত্রের সর্বত্র প্রচারিত হলো এ সংবাদ। প্রতিহারী অনন্ত একেবারে বিস্ময়ে হতবাক : এমন বলশালী পুরুষ তিনি ত দেখা দূরের কথা, কানেও শুনেননি কখনো। বললে সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ঈশ্বর না হলে এমন সর্বশক্তিমান কে আর হতে পারে। প্রভুর কাছে নতি স্বীকার করলেন তিনি। গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক ধারণ করে, শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন প্রভুর কাছে।

রাজার কাছে কর্মচারীরা এসব কথা গিয়ে প্রকাশ করল। তখন ঃ

রাজা আজ্ঞা দেলে সর্ব্বে আলপন কর।
সকল ঘটনা কহ'মোহর ছামুর ॥

রাজা করণকে আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কর। জানাও অভ্যর্থনা। পরিচিত হও ঘনিষ্ঠভাবে। এই শ্রীচৈতন্য কে? এঁর সম্পর্কে সকল ঘটনা অর্থাৎ সংবাদ এনে আমাকে জানাও।

স্মরণ করে দেখ, এই ঘটনা কিন্তু প্রামাণ্য চৈতন্য জীবনীতে কোথাও নাই। যা আছে তাহলো চৈতন্যদেব পুরীতে পেঁছেই সিংহদ্বার অতিক্রম করে মুখ্য মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

হেন কালে গৌরচন্দ্র জগত জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙকর্ষণ ॥
দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুঙ্কারে।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবারে ॥
তখন— লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দিকে ছুটে সব নয়নের জল ॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝে এ ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥
অজ্ঞ পরিহারি সব উঠিল মারিতে।
আস্তে ব্যস্তে সার্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে ॥

—চৈ. ভা. শেষ খণ্ড, ২য় অধ্যায়।

এখানে দেখো অনন্ত প্রতিহারীর কথা না বলে বৃন্দাবন দাস বলছেন, 'অজ্ঞ পরিহারি'। অর্থাৎ মূর্খ প্রতিহারী সকলে মিলে তাঁকে মারতে উদ্যত হলে দৈবাৎ বা ঘটনাক্রমে আগত সার্বভৌম মহাশয় ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে প্রভুর পৃষ্ঠদেশ আবরিত করে রক্ষা করলেন প্রভুকে।

কিন্তু দেখুন, চকড়া বলছে সম্পূর্ণ অন্য কথা। জগন্নাথ দর্শনের পর শ্রীচৈতন্যদেব আশ্রয় লাভ করেছিলেন গঙ্গামাতা মঠে। বাসুদেব সার্বভৌমের প্রাচীন আশ্রমের নামই ছিল গঙ্গামাতা মঠ।

আলম্বা দেবীর মন্দিরের কাছ থেকে প্রভু নিজ বহির্বাস কটিদেশে বেঁধে আরম্ভ করলেন ভূমি-দণ্ডবৎ (দণ্ড-ভাঙ্গা। দণ্ড ভেঙ্গে চলা)। দুর্লভ এ দৃশ্য। উৎকলে এমন প্রথা পূর্বে ছিল না।

ভূমি দণ্ডবত কাকে বলে তুমি জান কি?

আমি বললাম—সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে দু'বাহু প্রলম্বিত করলে যেখানে হাত পৌঁছায়, পুনরায় সেখান থেকেই দণ্ডবত করে অগ্রসর হতে হয়। আমরা মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ভাষায় একে 'দণ্ডভাঙ্গা' বলি। কেউ কেউ আজো এইভাবে দণ্ড ভেঙ্গে ভেঙ্গে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন।

ঠিকই বলেছ। মহাপ্রভুও ঐভাবে দণ্ড ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অগ্রসর হলেন মন্দিরের দিকে। তারপর মন্দিরে এসে ভূমি দণ্ডবত করতে করতেই আরম্ভ করলেন মন্দির প্রদক্ষিণ। মুখে 'হা কৃষ্ণ,' 'হা কৃষ্ণ' নাম। এই দুঃসহ প্রচণ্ড দৈহিক পরিশ্রমের ফলে 'মুরছিত প্রায় তনু, নেত্র থন থন॥'

যখন মহাপ্রভুর এই অবস্থা, তখনই বাসুদেব সার্বভৌম তাঁকে নিজ আশ্রমে অর্থাৎ গঙ্গামাতা মঠে সাদরে নিয়ে গেলেন। তাই বলছিলাম, চকড়ায় প্রতিহারীগণ কর্তৃক প্রভুকে মারার কথা নেই। বরং প্রভুর সামান্য হস্তাঘাতেই ধরাশরী হয়েছিল মহাবলশালী অনন্ত প্রতিহারী এই কথাই আছে। আর তাতেই সারা শ্রীক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের নাম।

এই কথা বলেই সহসা পণ্ডিতজী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন—তুমি কত দিন আছ পুরীতে। আমি ত আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে এখুনি যেতে হবে কটক। গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে আছে।

বলতে বলতে ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন বাড়ীর লোকজনদের। তাড়াতাড়ি তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে বললেন।

আমি বললাম—আরো দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই। আচ্ছা শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান সম্পর্কে 'চৈতন্য চকড়া' কিছু বলেনি? দয়া করে একটু সংক্ষেপে বলুন না। এত দূর থেকে এজন্যই এসেছি আপনার কাছে।

দেখুন, আমার হাতে সময় যে কম। তা আছে। মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য নতুন্য তথ্য চকড়া দিয়েছে। আপনি ত ওড়িয়া পড়তে পারেন। 'উৎকল প্রসঙ্গ' এই এখুনি পেলাম। এটি উড়িষ্যা সরকারের নিজস্ব পত্রিকা। এই ৮৬ মার্চ সংখ্যায় আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেব'। এতেই লিখেছি প্রভুর অন্তর্ধানের কথা। পড়ে দেখে নেন।

বললাম—এত তাড়াতাড়ি কি এত বড় প্রবন্ধ পড়তে পারব। তার চেয়ে আপনি বলুন না সংক্ষেপে। আমি লিখে নিচ্ছি।

বিরক্ত না হয়ে বললেন—লিখুন।

'হেরা পঞ্চমীর সংকীর্তনের পর, আষাঢ় শুক্ল পঞ্চমীর দিন শ্রীচৈতন্যদেব গুণ্ডিচাবাড়ীর মন্দিরের ভিতরে কীর্তন করতে ছিলেন। গদ গদ ভাবাবেশ। কীর্তন

চলতে ছিল। এই সময়ে সন্ধ্যারতির সময় হল। মহাপ্রভু গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করতে লাগলেন। হঠাৎ দেখা গেল একটা বিদ্যুতের মত তেজ প্রকাশ পেল। তারপর দেখা গেল চৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে নাই। তখন পার্ষদরা খুঁজতে লাগলেন সমগ্র নগরে। কোথায় গেলেন প্রভু! কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না তাঁকে। শেষে স্বরূপ দামোদর আর রায়রামানন্দ দেখলেন, প্রভুর বহির্বাস, গলার মালা পড়ে আছে গোপীনাথের মন্দিরে। প্রভু তাহলে কোথায় গেলেন। রায়রামানন্দ সিদ্ধান্ত করলেন, প্রভু গোপীনাথ বিগ্রহের জানুদেশে যে ফুটো আছে তাতে এবং জগন্নাথের শরীরে লীন হয়ে গিয়েছেন। শেষে প্রভুর বহির্বাস ও মালা তাঁরা সকলে সমাধি দিলেন। তোটা গোপীনাথ মন্দিরের চত্বরেই।

লিখতে লিখতে প্রশ্ন করি কোথায় ?

যেখানে তুলসী চৌরা দেখেছ, তারি সামনে সে ছোট মন্দিরটি, ঐটিই হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য সমাধি। গবেষকগণ ঐ স্থানকেই প্রভুর সমাধি বলে চিহ্নিত করেছেন।

দেখুন আর দেরী করতে পারছি না। আপনি চিঠি দেবেন। আমি উত্তর দেব। পরে এলে দেখা করবেন। তখন এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনার বাড়ী ত মেদিনীপুরে। ঐ অঞ্চলেও বহু প্রাচীন তালপাতার পুঁথি পাওয়া যায়।

বললাম—হ্যাঁ পণ্ডিতজী, ও রকম পুঁথি আমি পেয়েছি কয়েকখানা। তবে বড্ড জীর্ণ ও কীট দষ্ট।

তবুও রাখবেন যত্ন করে। আর একটা কথা 'চৈতন্য চক্ড়া' আপনি পাবেন আপনার কলকাতাতেই। স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ প্রকাশ করছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাংলা অক্ষরেই ওড়িয়া ভাষাতেই। বাংলায় তর্জমাও করা হয়েছে। হ্যাঁ, আমার সম্পাদনাতেই বেরিয়েছে। আপনি চিঠি দিলেই ওরা পাঠিয়ে দেবে ডাকে। ঠিকানা লেখুন, ২১/২, বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা।

আমি অনুনয় করে বললাম, আপনার বাবার নাম, আপনার বয়স কত যদি অনুগ্রহ করে বলেন। আর যদি একটি ফটো তোলার অনুমতি দেন।

বাবার নাম পণ্ডিত রামচন্দ্র রথ। বয়স ৭০ ত বটেই। ফটো তোলার এখন সময় হবে না। তবে হাতের কাছে এই একটি ফটো আছে। ব্যাখ্যা করছি চৈতন্য চক্ড়া সম্পর্কেই। যদি কাজে লাগে এইটাই নিয়ে যান।

বলতে বলতে খাতার ভিতর থেকে ফটোটি বের করে দিলেন আমার হাতে। আমি বাড়িয়ে দিলাম খাতা। উনি নিজের নাম সই করে দিলেন।

আমি প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। উনি তখন পোষাক পরতে ব্যস্ত। ঘড়ি দেখলাম, তখন প্রায় বিকেল পাঁচটা।

॥ ২ ॥

বাড়ী ফিরেই সংগ্রহ করলাম চৈতন্য চকড়া। বিডন স্ট্রীটের আনন্দ আশ্রম থেকে নিজেই কিনে নিয়ে এলাম। আকুল আগ্রহ নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে ট্রেনে বসে বসেই পড়তে আরম্ভ করলাম।

বৈশাখ মাস, শুক্ল পঞ্চমী তিথি। দেবদাসী লাবণ্য। শুধু সে দেবদাসী নয়, সম্প্রদা প্রধানাও। জগন্নাথ মন্দিরের এ এক ভিন্ন সম্প্রদায়। সুন্দরী বিদুষী ভক্তিপরায়ণ মহিলারা দেবদাসী রূপে সেবা করেন জগন্নাথদেবের। এরা সাধরণত তিন শ্রেণীতে বিভক্তঃ গায়িকা, নর্তকী, আর বাহির গায়ণী অর্থাৎ যারা বাইরে গান করে। ভিতর গায়ণীও আছে। বড় শৃঙ্গারের সময় যারা জগন্নাথের সামনে গান করে। তাদেরই বলে ভিতর গায়ণী।

কাকে বলে বড় শৃঙ্গার? জগন্নাথদেব রাত্রে যখন শয়ন করেন। তাকেই বলে বড় শৃঙ্গার। অর্থাৎ জগন্নাথদেবকে পরিয়ে দেওয়া হয় রাত্রে শয়নের সময় রাধা নামাঙ্কিত গীতগোবিন্দ মুদ্রিত বস্ত্র। তখন সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হয় দেবদাসীরা। তারা সুমধুর কণ্ঠে আরম্ভ করে সঙ্গীত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-সম্বন্ধ রসমধুর সে সঙ্গীত। তখন দেবদাসীদের উর্ধ্বাঙ্গ থাকে উন্মোচিত। আর বক্ষদেশের কুচযুগল অনুলিপ্ত হয়ে কুমকুম চন্দনে। বড় শৃঙ্গারের এই হলো রীতি।

আর লাবণ্য, এই দেবদাসী সম্প্রদায় প্রধানা। সেই নিয়োগ করে দেবদাসীদের। তাই লাবণ্যকে দেবদাসী নিয়োগের শ্রেষ্ঠীও বলা যায়। এমন যে লাবণ্য, সেও 'সেবাভাবে' বশ হলো। কেমন করে?

লাবণ্য সে দেবদাসী নিত্য সেবা করে।
দিবাবশানে দর্শনে গায়ে গীত সুরে॥

—চৈ. চকড়া. পৃ. ৮

প্রতিদিন সন্ধ্যা হলে মধুর সুরে, গরুড় স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে মধুর স্বরে গান করে। গায় সে গীতগোবিন্দের মধুর ললিত পদাবলী। কি সুমিষ্ট তার কণ্ঠস্বর।

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্.
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।
রাধিকা তব বিরহে কেশব॥ ১১॥

—গীতগোবিন্দ, ৪র্থ সর্গ

হে কেশব, তোমার বিরহে ক্ষীণ দুর্বল হয়েছে রাধার দেহ। পাষাণভার বোধ হচ্ছে তার স্তনলগ্ন হার। হে কেশব, তোমার বিরহে।

ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্
বালশশিনমিব সায়মলোলম্ ॥ ১৬ ॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিত মরণেব নিকামম্ ॥ ১৭ ॥ —গীতগোবিন্দ, ৪র্থ সর্গ।

শ্রীমতী বসে আছে করতলে কপোল রেখে তোমারি আপেক্ষায়। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন সন্ধ্যার আকাশে ম্লান শিশু প্রতিপদের চাঁদ।

হে কেশব, শ্রীমতী জানে তোমার বিরহে সুনিশ্চিত তার মৃত্যু। তাই জন্মান্তরে সে যেন তোমাকেই পায়, সেই আশায়, দিবানিশি জপ করছে শ্রীমতী হরি, হরি।

শ্রীচৈতন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন গরুড় স্তম্ভের বাম দিকে। দক্ষিণ হস্তে স্তম্ভ স্পর্শ করে। রাধা ভাবে বিভোর হয়ে দর্শন করছেন জগন্নাথ দেবকে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না বলরামকে। লাবণ্যের গীতগোবিন্দের গানে বিভোর মহাপ্রভু।

'বৈষ্ণবী ভক্তি প্রধানা' এই লাবণ্যকে মান্য করে সকলেই। সেদিন অক্ষয় তৃতীয়া। জন সমাগমে পরিপূর্ণ মন্দির। প্রচণ্ড ভীড় গরুড় স্তম্ভের কাছে। এত ভীড় যে নিশ্বাস পর্যন্ত নেওয়া যাচ্ছে না। ভাবাবেশে আবিষ্ট গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করছেন। এমন সময় বেজে উঠল আরতির ঘণ্টা। সচকিত হয়ে উঠল সকলে। হরি হরি জয়ধ্বনিতে গম্‌গম্ করে উঠল মন্দিরাভ্যন্তর।

ব্যগ্রভরে মিলিলেন লাবণ্য তক্ষণ ॥
জন ঘোষে ইষ্টমুখ দর্শন ন পাই।
উৎকণ্ঠিতা দাসী চড়ে প্রভু পৃষ্ঠে যাই ॥
নাহি জ্ঞান মন তার জগন্নাথ রত।
আরম্ভিল সুরে গীত চন্দনে চর্চিত ॥ —চৈ. চকড়া. পৃ. ৯

ব্যগ্রভরে দেবদাসী লাবণ্য এল এগিয়ে। মানুষের ভীড়ে দেখতে পেল না সে ইষ্টমুখ। উৎকণ্ঠিতা দাসী উঠে পড়ল প্রভুর পৃষ্ঠে। দেখতে লাগল জগন্নাথকে। ইষ্টমুখ দরশনে লাবণ্য বিভোর। কোন জ্ঞান নাই তার। বাহ্যজ্ঞান রহিত বটে, কিন্তু কণ্ঠ থেকে তার ধ্বনিত হচ্ছে ঃ

চন্দন চর্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালী।
কেলি চলন্মণিকুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডযুগ স্মিত শালী ॥
হরিরিহ মুগ্ধ নিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥ ৪০ ॥
—গীতগোবিন্দ। প্রথম সর্গ।

আজ বনমালীর নীল কলেবর, পীত বসনে ঢাকা। শোভা পাচ্ছে নীল কলেবরে শ্বেতচন্দন। দুলছে দুই কানে মণিময় কুণ্ডল। সেই মণির আভা পড়ছে এসে হাস্য-উজ্জ্বল কপোলে। প্রেমমুগ্ধ বিলাসিনীদের নিয়ে প্রেমবিলাসে রত আজ বনমালী।

শেষ হল আরতি। চেতনা ফিরে এল লাবণ্যের। তখন সে বুঝতে পারল তার প্রকৃত অবস্থা। তখন ঃ

প্রভু পাদে পড়ি সেই আকুলে কান্দিল ॥
ন্যাসী পায়ে পড়ি দাসী আকুল বচনে।
মহাপরাধী ক্ষমন্তু আকুলিত মনে ॥
ত্রাণ কর ক্ষম দোষ পতিতে উদ্ধর।
অজ্ঞান দাসীর অপরাধ ত্রাহি কর ॥—চৈ· চকড়া পু· ৯

লাবণ্য প্রভুর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল আকুল হয়ে। বললে অনুনয় করে—মহা অপরাধী আমি। ক্ষমা করুণ অনুগ্রহ করে। আমি অল্পমতি অজ্ঞান দাসী। পতিতা নারী। মহাপাতক থেকে উদ্ধার করুন আমাকে।

তখন প্রভু ভাবাবেশে বললেন—ধন্য, কে তুমি রমণী ? বাহ্যজ্ঞান শূন্য দাসী, তুমি ভক্ত কুল শিরোমণি। সন্ন্যাসীব নারী অঙ্গ স্পর্শ মহা অপরাধ। যেটুকু আমার এ অহংকার ছিল, আজ চূর্ণ হল।

সেদিন থেকেই দেবদাসী লাবণ্য দূরে থেকে দর্শন করত মহাপ্রভুকে। দর্শন না করে কখনো ঘরে ফিরত না সে। প্রভু চলে গেলে গরুড় স্তম্ভের পাশে যেখানে দাঁড়িয়ে প্রভু জগন্নাথ দর্শন করতেন, সেখানকার পদরজ তুলে নিত মাথায়—'জয় গৌরহরি'বলে।

সে দীক্ষা নেয়নি বটে প্রভুর কাছে, কিন্তু কণ্ঠে নিল তুলসীর মালা। কপালে নিল হরিমন্দির তিলক। এই নিয়ম সম্প্রদায় প্রধানা লাবণ্য স্থির করে দিল অন্য সমস্ত দেবদাসীদেরও। সেদিন থেকে অনুগত হল দেবদাসীরা সকলেই মহাপ্রভুর।

রামানন্দ রায় লাবণ্যের এই কাহিনী শুনে তাকে গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠী বলে দিলেন স্বীকৃতি। লাবণ্যের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

এরপর কেটে গেল কত দিন, মাস, বৎসর। দেবদাসী লাবণ্য প্রভুর চরণে সমর্পণ করেছে কায় মন। বার্ধক্যভরে পীড়িত সে। উপস্থিত তার অন্তিম সময়।

সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের পঞ্চমী। নৃসিংহবল্লভ উদ্যানে নৃসিংহ চরণে ধ্যানে নিমগ্না। প্রায়োপবেশন করে মধুর কণ্ঠে গাইছে 'গীতগোবিন্দের' গান। কর্ণাট রাগের অপূর্ব স্বর মূর্চ্ছনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে উদ্যান-স্থলী। বিরহ-আর্তিতে গাইছে লাবণ্য ঃ

নিন্দতি চন্দনমিন্দু-কিরণ মনু বিন্দতি খেদমধীরম্ ।
ব্যাল-নিলয়-মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরম্ ।
সা বিরহে তব দীনা
মাধব মনসিজ-বিশিখ-ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥ ২ ॥

—গীতগোবিন্দ। ৪র্থ সর্গ।

হে মাধব, তোমার বিরহে আজ দীনা শ্রীমতী। পঞ্চশরের বাণের আঘাতের ভয়ে, আশ্রয় নিয়েছে তোমারি ধ্যানে। শীতল যে চন্দন, স্নিগ্ধ যে চাঁদের কিরণ তাও আজ হয়ে উঠেছে অগ্নিজ্বালাময়। এমন যে দখিনা মলয়ানিল, তাও আজ বিষের মত হয়ে উঠেছে জ্বালাময়। কারণ, চন্দন বন ছুঁয়ে আসার সময় চন্দন-বৃক্ষের কোটরের সর্প-বিষ মিশে যাচ্ছে তার অণুতে অণুতে।

প্রভু যাচ্ছিলেন সেই পথে। সংকীর্তনের দল নিয়ে তোটা গোপীনাথে। গান শুনে থমকে দাঁড়ালেন। কি অপূর্ব মধুর কণ্ঠস্বর। কে এ নারী, হৃদয় দিয়ে গাইছে—'সা বিরহে তব দীনা।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন তন্ময় হয়ে। শেষ হল সঙ্গীত। ধীরে ধীরে প্রভু প্রবেশ করলেন উদ্যানে। প্রভুকে দেখে আকুল হয়ে উঠল লাবণ্য। সে লুটিয়ে পড়ল প্রভুর পদতলে। প্রাণ ত্যাগ করল লাবণ্য।

প্রভু বললেন, এ বৈষ্ণবী সাধারণ নারী নয়। চল, একে নিয়ে গিয়ে স্বর্গদ্বারে দাহ করি। কৌড়িবাণ জমিদার কানাই খুণ্টিয়া বহন করল সমস্ত ব্যয়ভার। প্রভু নন্দসুত দাসীকে উদ্ধার করলেন।

কুসুম পরশে পট নিস্তারিলা প্রায়।
দাসী তরি গলা রায়মতে কলা থয় ॥—চৈ. চকড়া, ৫৬

মালার ফুল রইল প্রভুর কাছে। মুক্তি পেল পাটের সুতা। রায় রামানন্দ বললেন—পার হয়ে গেল দাসী।

কাহিনীটি পড়ে ভাবতে লাগলাম মনে মনে। এ কাহিনী ত আছে কৃষ্ণদাস কবি রাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে।' তবে লাবণ্যের নাম নাই। কৃষ্ণদাস লিখেছেন—

উড়িয়া এক স্ত্রী দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ॥
দেখিয়া গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥
আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥—চৈ. চ. অন্ত্য. ১৪ অধ্যায়।

দেবদাসীর গানের কথাও কৃষ্ণদাস লিখেছেন অন্ত্যলীলার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। সে

ঘটনার মধ্যেও নেই কোন সামঞ্জস্য। দেবদাসীর গান শুনে প্রভু আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যাচ্ছিলেন। পুরুষ কি নারী কোন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না তাঁর। তখন 'আস্তে ব্যস্তে গোবিন্দ তার পিছনে ধাইলা।'

ধাইয়া যায়েন স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রী-গান বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে॥
স্ত্রীনাম শুনি মহাপ্রভু বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা॥—চৈ. চ. অন্ত্য. ১৩ অধ্যা.

তারপর প্রভু গোবিন্দকে ধন্যবাদ দিলেন। কারণ কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবের উক্তি উদ্ধৃত করে বলছেন—'স্ত্রী-পরশ হেলে আমার হইত মরণ॥'

একই ঘটনা ব্যক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে। দু'টো ঘটনার মধ্যে 'চৈতন্য চকড়ার' কাহিনীটিকেই যেন অধিকতর সত্য বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে কি ভেবে কৃষ্ণদাস গোস্বামী ঘটনাটিকে ভিন্ন ভাবে সাজিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, ভাবতে গেলে কেমন যেন সন্দেহ জাগে মনে। কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুকে পূত চরিত্রের কঠোর সন্ন্যাসী রূপে বর্ণনা করেছেন। সামান্যতম কলঙ্ক যেন তাঁর চরিত্রকে স্পর্শ না করে সেদিকে তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন সতর্কভাবে।

প্রভুজী বলেছিলেন, লাবণ্যকে চৈতন্য কৃপা করেছিলেন। 'কৃপা' শব্দটিকে ব্যাখ্যা না করলেও তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটি ধরতে কষ্ট হয় না। 'চৈতন্য চকড়ার' অনেক স্থলে মহাপ্রভুর মানবিক রূপটি অধিকতর স্পষ্ট। এখানে আমরা চৈতন্যকে মানুষরূপে উপলব্ধি করতে পারি।

॥ রাধা নাম কেন ভাগবতে নাই ॥

একদিন প্রভু যাচ্ছিলেন মন্দিরে। সহসা দাঁড়িয়ে পড়লেন কল্পতরু অর্থাৎ বটবৃক্ষের তলায়। সঙ্গে স্বরূপ দামোদর। স্তম্ভিত শ্রীচৈতন্যদেব। কে এমন সুকণ্ঠ গায়ক করছে মধুর সুরে ভাগবত পাঠ। প্রভু বললেন দামোদরকে, দেখ তো কে ওই ভাগবত পাঠ করছে। স্বরূপ বললেন, প্রভু উনি একজন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। শ্রীজগন্নাথের আপন জন। নাম জগন্নাথ দাস। অটইনাথ মন্দিরের পুরোণ পাণ্ডা। ভাগবতের ভাবরসের সার কথা ব্যাখ্যা করেন বেশ সুন্দর করে।

প্রভু বললেন, তাই নাকি। আমি এই কল্প বৃক্ষের শাখাতলে বিশ্রাম করছি।

তুমি যাও ঐ ব্রাহ্মণের কাছে। ওকে জিজ্ঞেস কর কিছু গুপ্ত কথা। ঐ ভাগবতাধ্যায়ী ক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা কর, ভাগবতে কেন রাধা নাম নাই?

'পচার সে রাধা নাম ভাগবতে কাহি' নাহি' ॥'—চৈ. চকড়া পৃ. ১২

ভক্তশ্রেষ্ঠ দামোদর প্রভুর নির্দেশ মত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন এই গুপ্ত কথাটি। তখন ঃ

শুনি হাসি জগন্নাথ কলেক প্রণাম।
উত্তম প্রশ্ন করিল হিয়া কম্পাইন ॥

জগন্নাথ প্রশ্ন শুনে একটু হাসলেন। প্রণাম করলেন প্রশ্ন কর্তাকে। বললেন, উত্তম প্রশ্ন করেছ। হৃদয় আমার কেঁপে উঠল। তারপর করজোড়ে ভক্তিভরে জগন্নাথ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? এমন গুপ্ত প্রশ্ন আমাকে শুধালে? তারপর ভাবে গদগদ হয়ে বলতে আরম্ভ করলেন ঃ

কৃষ্ণসাধ্য সাধক এ জীব নিরন্তর।
সাধনা রাধিতা রাধা প্রেমভাব সার ॥
রাধা রাসেশ্বরী রম্যা কৃষ্ণমন্ত্রস্য দৈবতম্।
সা বিদ্যা সর্ববন্দিয়াং চ বৃন্দারণ্য-বিহারিণীম্ ॥
বৃন্দারণ্য অটে অনাহত হৃদচক্র।
দিব্যজ্যোতির্ময়ী রাধা নিবাস তত্রৈক ॥
পরাৎপরতরাং পূর্ণা পূর্ণচন্দ্রা বরাননা।
মুক্তি-ভুক্তি-প্রদাং নিত্যা মূল-প্রকৃতি সাপরাম্ ॥

সাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। আর এ জীব নিরন্তর সাধক। সাধনাই হলো আরাধিতা রাধা। প্রেম ও ভাবের সার। ভাবের সার বস্তুই হলো রাধা প্রেম। রাসেশ্বরী রমণীয়া হলেন শ্রীরাধিকা। কৃষ্ণ-মন্ত্রই তাঁর উপাস্য। সকল যুগের বন্দনীয় হলো সেই বিদ্যা। বিরাজ করেন 'কৃষ্ণ-বৃন্দারণ্যে, বৃন্দারণ্য সেত আর সত্যি সত্যি অরণ্য নয়, সে হলো হৃদয়ের অনাহত চক্র। সেই অনাহত চক্রে বিরাজ করছেন জ্যোতির্ময়ী শ্রীরাধিকা। তিনি পরাৎপরা, তিনি পূর্ণতমা। মুখমণ্ডল তাঁর পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। ভক্তি আর মুক্তি, ভুক্তি আর মুক্তি। তিনি নিত্য, মূল প্রকৃতি স্বরূপিনী পরাও তিনি। পুরুষ আর প্রকৃতির মধ্যে নেই তারতম্য। ভেদও নাই কোন।

মূল প্রকৃত্যে পুরুষে তারতম্য নাই।
একের অভাবে অন্য সত্তা ন রহই ॥

'রা' বর্ণ দান নিতরাং 'ধা' নির্বাণ প্রদায়িকা।
উচ্চারণে মুক্তিশ্চৈব সা হি 'রাধা' প্রকীর্ত্তিতা ঃ॥
রেফবৈ নিশ্চলা ভক্তি হি লক্ষ্য কৃষ্ণ পদাম্বুজম্।
'ধ'-কার সহজা নিত্যা, তত্ত্ব হরিক্ষর-দ্বয়ম্॥

একের অভাবে অন্যের কোন সত্তাই থাকে না। 'রা' বর্ণের গূঢ়ার্থ হল, যিনি সতত দান করেন। আর 'ধা' বর্ণের অর্থ নির্বাণ প্রদান করেন। এই শব্দের উচ্চারণ মাত্রই মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। তাই রাধা বলে কথিত। তার মধ্যে যে রেফ্ মাত্রা আছে, তাহলো নিশ্চল ভক্তির স্বরূপ। তাঁর লক্ষ্যস্থল হল শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ। আর 'ধ' কার হল সহজাত্মিকা, তার তত্ত্ব হল 'হরি' এই অক্ষরদ্বয়।

রাধা গুণাত্মিকা কৃষ্ণ গুণ বাচক বিগ্রহঃ।
গুণাত্মিকা মহাভাব প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণ দৃশ্যবৈ॥
রাধা কৃষ্ণাত্মিকা নিত্যা কৃষ্ণ রাধাত্মক স্বয়ম্।
কৃষ্ণ প্রাণগত রাধা প্রাণ ভাগবতস্য চ॥
প্রাণয়েব শরীরস্য পরাসত্তৈক কেবলম্।
শরীরম্ দৃশ্য স সাক্ষাৎ উহ্য প্রাণ সদৈব হিঃ ॥
সা হি ভাগবতে উহ্যা, রাস রাসেশ্বরী স্বয়ম্।
প্রকট কৃষ্ণচরিত শুক মুখাৎ বিনিসৃতম্॥
যথা গোরা কৃষ্ণতনু রাধা ভাবান্বিত।
তথা ভাগবতে কৃষ্ণ (সাক্ষাৎ) রাধা বিরহিত॥
প্রেমী প্রেমাস্পদ দুহুঁ অভেদ্য জগতে।
কৃষ্ণলীলা মহাভাব প্রেমের সহিতে॥
রসেশ্বর উহ্য প্রেম অপ্রকট ভাব।
দাহিন প্রকটি রাম লীলার স্বভাব।
রাধা নিধি কৃষ্ণ চিন্তামণি নাম ধরে।
গুপ্ত গুপ্ততম তত্ত্ব অনুভব সারে॥
বারে যদি রাধা নাম ভাগবতে আসে।
রাধা লীলামৃত নাম হেব তা প্রকাশে॥—চৈ. চকড়া, পৃ, ১২

রাধা নাম হল গুণাত্মিকা, আর গুণবাচক বিগ্রহ হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে গুণাত্মিকার 'মহাভাব' থাকে প্রচ্ছন্ন। সেই ভাবের দৃশ্য পরিণতিই হলেন শ্রীকৃষ্ণ। আর কৃষ্ণের আত্মা হলেন রাধা। নিত্য কৃষ্ণ রাধাত্মক। তাই কৃষ্ণের প্রাণ হলেন রাধা। সে রাধা ভাগবতের প্রাণ। আর প্রাণই হল শরীরের মধ্যে পরম সত্তা। কিন্তু

কার্যত শরীরই দৃশ্যমান। অর্থাৎ এই দেহকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু পরম সত্তা যে প্রাণ, তাকে আমরা কেউই পাচ্ছি না দেখতে। সে আছে সর্বদা অদৃশ্য, উহ্য। ভাগবতে তাই রাস রাসেশ্বরীর নাম তত্ত্ব আছে উহ্য। হয়নি প্রকাশিত। তাই শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখারবিন্দ থেকে প্রকটিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রই। যেমন, গোরা সাক্ষাৎ কৃষ্ণের বিগ্রহ, কিন্তু রাধা ভাবাশ্বিত। তেমনি কৃষ্ণ চরিত ভাগবতে প্রকট। রাধা হলেন বিরহিত। প্রেমী আর প্রেমাস্পদ জগতে অভেদ্য। কৃষ্ণলীলা মহাভাব, জড়িত প্রেমের সঙ্গে। কিন্তু অপ্রকট রাসেশ্বরীর গুহ্য প্রেম। তা প্রকাশিত হচ্ছে ভাবে। প্রেম আছে অপ্রকট, প্রকটিত হয়েছে ভাব। দক্ষিণ ভাব প্রকট, বাম ভাবই হল লীলার স্বভাব। স্বভাবেই থাকে ভাব মিশে। তাইত, রাধা-নিধি, কৃষ্ণ চিন্তামণি। এই গুপ্ততম অনুভূতি বুঝতে হয় অনুভবের দ্বারাই। যদি 'ভাগবতে' রাধা নাম একবার উচ্চারিত হতো, তাহলে ভাগবতের নাম হত 'রাধা-লীলামৃত'।

তারপর জগন্নাথ দাস ভাবে তন্ময় হয়ে গেয়ে উঠলেন 'গীতগোবিন্দে'র সেই গীত। ধরলেন বরাড়ী রাগে ঃ

রাধা বদন বিলোকন বিকসিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গম্
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গম্ ॥
হরিমেকরসং চিরম অভিলষিত বিলাসম্
সা দদর্শ গুরুহর্ষ-বশংবদ-বদনমনঙ্গ বিকাশম্ ॥ ২৪ ॥ ১১ স্বর্গ।

চাঁদকে দেখলে, সাগর যেমন তরঙ্গ-ভঙ্গে হয়ে ওঠে উদ্বেল। তেমনি শ্রীমতী দেখলেন তাঁকে, দেখে গোবিন্দের মুখ আনন্দ-রসে হয়ে উঠল উদ্বেল। অপূর্ণ ছিল অন্তরে যে অভিলাষ, এখন তা হবে পূর্ণ সার্থক। সেই আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো শ্রীমতী-গত প্রাণ গোবিন্দের মুখমণ্ডল।

হরিই এক মাত্র রস, এই রসই হল ভক্তের চিরবিলাসের বস্তু। শ্রীরাধা হলেন রসের আধার। সে রস অপ্রকট, অপ্রকাশ্য।

দূরে বটবৃক্ষের শাখাশ্রয়ে বসে বসে এসব কথাই শুনছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। সহসা একটা হুংকার করে উঠলেন। আর পরক্ষণেই হা-কৃষ্ণ বলে হয়ে পড়লেন মূর্চ্ছিত।

তারপর মূর্চ্ছাভঙ্গ হলে প্রভু বললেন, শ্রীক্ষেত্রের কে তুমি ব্রাহ্মণ? মহাভাবের স্বরূপ বলে আমাকে শীতল করে দিলে?

কেহ তুহুঁ ক্ষেত্র দ্বিজ মহাভাবময়।
শীতল করিল হিয়া ভাব কল থয় ॥
সে হি দিনু প্রতিদিন উভয়ে মিলন্তি।
কোলাকুলি হোই লভি ভাগবত প্রীতি ॥—চৈ· চকড়া পৃ· ১৩

সেদিন থেকেই জগন্নাথ মন্দিরে হয় উভয়ের নিত্য মিলন। গড়ে উঠে হৃদ্যতা ঃ হয় নিত্য আলিঙ্গন। সে আলিঙ্গন হয় ভাগবতের প্রতি প্রীতি বশতই।

কিন্তু কে এই জগন্নাথ দাস ? প্রশ্ন করেছিলেন চৈতন্যদেব, কে তুমি ক্ষেত্রস্থলের ব্রাহ্মণ ? কিন্তু চকড়াকার সে পরিচয় আমাদের দেননি। তবে কি এই জগন্নাথ দাসই সেই বিখ্যাত ভাগবত লেখক এবং কথক আর অতিবড়ী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা-অতিবড়ী জগন্নাথ দাস ?

চৈতন্য চকড়ার সম্পাদক পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মা উক্ত পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠার ৩৩ সংখ্যক ফুটনোটে লিখেছেন—'শ্রীমন্দির কূর্মবেড়া প্রাঙ্গণে কল্পবৃক্ষের মূলে কল্প গণেশ আছেন তার ঠিক সম্মুখে ভাগবত আচার্যের স্থান বিদ্যমান। সেই ঘরে 'অতিবাড়ি' মঠের অবস্থান। এখানে অতিবড়িতে জগন্নাথ বিশ্রাম করতেন। তার সামনে ভাগবত পাঠের স্থান বেদীরূপে আছে।'

এই অতিবড়ী জগন্নাথ দাসকে নিয়ে বৈষ্ণব সমাজে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বলেন, ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন না। কিন্তু সে আলোচনায় আসার পূর্বে 'চৈতন্য চকড়া'য় জগন্নাথ দাসের সম্পর্কে আরো যে সব কাহিনী আছে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃতে কিন্তু জগন্নাথ দাসের কোন নাম নাই। বৃন্দাবন দাসও 'চৈতন্যভাগবতে' জগন্নাথের কোন উল্লেখই করেননি। অন্যান্য চৈতন্যজীবনীগুলিতেও পাচ্ছি না জগন্নাথ দাসের নাম।

॥ ঝড়ের রাতে প্রদীপ প্রজ্জ্বালন ॥

রাজকর্মচারীরা ভাগ হয়ে গেল দু'দলে। কেউ বললেন জগন্নাথ দাস শ্রেষ্ঠ। আবার কেউ বা বললেন চৈতন্যদেবই শ্রেষ্ঠ। এ বিবাদের মীমাংসা আর হয় না। দেখা দিয়েছে নামেরও ভেদ। শ্রীচৈতন্যদেবের ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। জগন্নাথ দাসেরও তাই। তাহলে বিভেদটা কোথায় ? ক্রম নিয়েই দেখা দিয়েছে বিভেদ॥ শ্রীচৈতন্যদেব বলেন ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

কিন্তু জগন্নাথ দাস, মেনে নিতে পারেননি এ ক্রম। তিনি বলেন 'হরে কৃষ্ণ' আগে নয়, আগে হবে 'হরে রাম।' তাই তিনি কীর্তন করেন ঃ

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥

এই ভাবে চলতে থাকে দু'দলের কীর্তন। এর কোনটি ঠিক, আর কোনটি যে বেঠিক, তার মীমাংসাই আর হয় না। দু'জনকেই উৎকলের মানুষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তবে যেন শ্রীচৈতন্যদেবকেই উৎকলের জ্ঞানী-গুণী মানুষ বেশী ভক্তি করে। তাই বলে জগন্নাথ দাসকেও লোকে কম শ্রদ্ধা করে না।

দু'দলের সমর্থকদের কাছে দু'জনেই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। এই মনোভাবটাই শেষে তীব্র আকার ধারণ করল। অবশেষে এই দু'জনের মধ্যে কে বড়, তা' পরীক্ষা করার একটা মস্ত সুযোগ এল।

সেটা কার্তিক মাস। কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি। সন্ধ্যার সময় সহসা উঠল প্রবল ঝড়। কেউ পারছে না বাড়ী থেকে বেরোতে। জগন্নাথদেবের পাকশালা থেকে প্রদীপ জেবলে আনতে হয়। তবেই হয় জগন্নাথের মঙ্গল আরতি। কিন্তু ঝড় যে প্রচণ্ড বেগে বইছে, তাতে আগুন আনা যাচ্ছে না কিছুতেই। তাই বিলম্ব হচ্ছে আরতির। ভক্তরা সাজিয়েছেন দু'টি প্রদীপ। কিন্তু জ্বালাতে পারছেন না কিছুতেই। বসে আছেন হতাশ হয়ে।

ঠিক এমনি সময়ে সেই ঝড়ের মধ্যে আরতি দর্শনের জন্য মন্দিরে এসে হাজির হলেন দুই মহাপুরুষ। তখন ঃ

করণে বোইলে এবে পরীক্ষা করিবা।
বইঠা দেইন সাধ্য সাধন জানিবা ॥
আখণ্ডল পাত্র বলে ঠাকুর শুনিবা।
বইঠা ন জাএ বাতে সে বা কি করিবা ॥—চৈ. চকড়া পৃ. ৫৫

করণবৃন্দ অর্থাৎ কূটনৈতিক কর্মচারীরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করলেন, এই একটা মহা সুযোগ এসেছে। আমরা পরীক্ষা করব, শ্রীচৈতন্য ও জগন্নাথ দাসের মধ্যে কোন মহাত্মা শ্রেষ্ঠ। তখন আখণ্ডল পাত্র নামে এক কর্মচারী বললেন, ঠাকুর দেখুন কি প্রচণ্ড ঝড়। এই ঝড়ের মধ্যে কিছুতেই জ্বালান যাচ্ছে না আরতির প্রদীপ। এখন বলুন কি করি?

এই কথা শুনে তখন ঃ

হরি প্রভু গৌরচন্দ্র করে ধরি দীপ।
সংকীর্তন মধ্যে নৃত্য কলে অনুরূপ ॥
প্রখর পবনে দীপ করয়ে জড়ই।
নৃত্য সঙ্গে নৃত্য করে দীপ শিখা তহিঁ ॥—চ. চকড়া পৃ ৫৫

প্রভু গৌরহরি গৌরচন্দ্র হাতে তুলে নিলেন একটি প্রদীপ। নৃত্যের তালে তালে আরম্ভ করলেন সংকীর্তন। দেখা গেল সহসা সেই প্রবল ঝড়ের মধ্যে জ্বলে উঠল প্রদীপ। আর প্রভুর নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপের দীপ শিখাও আরম্ভ করল নৃত্য করতে। কিন্তু তবুও নিভল না প্রদীপের শিখা। এই না দেখে জগন্নাথ দাস আর স্থির থাকতে পারলেন না। তখন ঃ

জগন্নাথ মধ্য এক বইঠা ধরিলে।
চৈতন্য গোসাই নাম মধ্যে মজ্জি গলে ॥
অখণ্ড সে দুই ধরি দুই মহাজন।
জগমোহনে পশিলে সহাস্য বদন ॥
জয় বিজয় দ্বার রে বইঠা রাখিলে।
মন্দ দেখি সেবকে যে কবাট ফেইলে ॥—চৈ. চকড়া পৃ. ৫৫

জগন্নাথ দাসও তুলে নিলেন আর একটি প্রদীপ। মগ্ন হলেন চৈতন্যের নামের মধ্যে। দেখা গেল না নেচেও জ্বলে উঠল জগন্নাথ দাসের হাতের প্রদীপ। তখন দুই মহাজন দুই অখণ্ড দীপ ধরে সহাস্য আননে প্রবেশ করলেন জগমোহনের মধ্যে। রাখলেন জয় বিজয় দ্বারে প্রদীপ। খোলা হল দ্বার। তখন আরম্ভ হল জগন্নাথের আরতি। অলৌকিক লীলা প্রকাশে দু'জনেই হলেন সফল। বোঝা গেল দু'জনেই সিদ্ধ মহাপুরুষ। ছুটে এল অগণিত মানুষ এই অলৌকিক লীলা দর্শন করতে।

মন্দিরের কর্মচারী পরিচ্ছা বললেন, এতো সামান্য কথা নয়। সাধুর হাতে দুটি প্রদীপই জ্বলে উঠল। এত সিদ্ধিরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাজাজ্ঞায় এই সিদ্ধির কথা হয়ে থাক চিরস্মরণীয়। অখণ্ড জ্যোতির মতই এই কীর্তিও হয়ে থাক অখণ্ড। তাই রাজা ব্যবস্থা দিলেন, প্রতি বছর কার্তিক মাসে জয় বিজয় দ্বারে গম্ভীরা থেকে আসবে পাঁচটি প্রদীপ, আর জগন্নাথ দাসের ওড়িয়া মঠ থেকেও আসবে পাঁচটি। এই দশটি প্রদীপ নিশ্চিতভাবে হবে প্রজ্জ্বলিত। আজও দুই মহাপুরুষের নামে চলে আসছে এই নিয়ম। আসে কৃষ্ণভাবে পাঁচটি, আর রাধা ভাবেও আসে পাঁচটি। রাজার এই আদেশ শুনে সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল। সার্বভৌম কার্তিক মাসে সংকীর্তন করলেন 'বালধূপ'। খনুতা আর ধ্বজা প্রদান করা হল উভয়কেই। এই যে কীর্তি, অর্থাৎ এই যে সাধনার সিদ্ধি—এ কেবল সম্ভব হল চৈতন্যচন্দ্রের মহিমার জন্য। বলতে গেলে এ ত তাঁরই মহিমার প্রতীক।

এই কাহিনী থেকে এটুকু বোঝা যায় দু'জনের মতবাদের মধ্যে একটা মতবিরোধ ছিল। তবে, জগন্নাথ দাসের সঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ কোন বিরোধ ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে একটা বিরোধ ভিতরে ভিতরে হয় ত কোন

রাজনৈতিক কারণে দানা বেঁধে উঠেছিল। সেই মতবিরোধের কথাই প্রভুজী বলছিলেন পরিষ্কার করে। আমি লক্ষ্য করেছি আজও বৈষ্ণব আর অতিবড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধের কথা পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাঁর 'শ্রীক্ষেত্র' পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে দিয়েছেন।—শ্রীক্ষেত্র, ২য় খণ্ড। পৃষ্ঠা ৩৩১—৩৫৩।

॥ রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আলোচনা হয়নি ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' গোদাবরী তীরে মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের সাক্ষাতের পর ৫।৭ দিন ধরে যে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন, বলে লিখেছেন, সম্ভবত তখন তার সামান্যতমও আলোচনা হয়নি। কবিরাজ গোস্বামী সাধ্য-সাধন তত্ত্বে যে নবধা ভক্তির বিস্তৃত দার্শনিক আলোচনা করেছেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের রচনা। এর দ্বারা কবিরাজ গোস্বামীর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রকাশই ঘটেছে। এবং পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বে রসের পর্যায়, রাধাপ্রেম ও সখী সাধনা সম্পর্কে বৈষ্ণব সমাজকে একটা সংহত আকার দিতে পেরেছে। গোবিন্দ দাস বাবাজীর 'চৈতন্য চকড়া' থেকে অন্ততঃ সে কথাই প্রমাণ করে।

গোবিন্দ দাস রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে।

বাসুদেব সার্বভৌমই বলেছিলেন চৈতন্যদেবকে রামানন্দের কথা। তিনিই নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন প্রভুকে দক্ষিণ দেশে। চকড়া ঘটনাটি পরিবেশন করেছেন এইভাবে।

চিলিকা পথরে ধরি কীর্তন মণ্ডলী।
আসিকা নগরে রহি, পন্তা বাটস্মরি ॥
ঋষি কুল্যা তটে কলেক বিশ্রাম।
শ্রীকূর্ম যে নাগাবলী আদি ভূমি জেত ॥
সংকীর্তন নাম ঘোষে তারিল সে তেতে ॥
প্রভুর মণ্ডলে রায় রামানন্দ বীর।
ভেটিলে কীর্তন দল অতি ভাবাতুরে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মাহা বাহু প্রজন্যভয়ভঞ্জনম্।
কীর্তন শুনিয়া প্রভু প্রহসিত মন ॥

রামানন্দ শ্রীচরণে পড়ি ভাবাবেশে।
কেলি কৈল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের আবেশে ॥
কি সাধন কর্ছ তহ ভক্তঙ্ক প্রধান।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি গায়ন মোহর সাধন ॥ —চৈ. চ. পৃ. ২১

চিল্কা হ্রদের পথ ধরে চলছে প্রভুর সংকীর্তনের দল। চলতে চলতে এল আশিকা নগরে। (এ হলো গঞ্জাম জেলার একটি ছোট্ট শহর। এখানে ঋষিকুল্যা নদীর তটে প্রভু বিশ্রাম করছেন কীর্তনের দল সহ। পন্তা বাটেস্মরি অর্থাৎ পাংগা ভূমি। লবণাক্ত ভূমি। নদীর লোনা তীরভূমি। ঋষিকুল্যা হল দক্ষিণ উড়িষ্যার একটি প্রসিদ্ধ নদীর নাম। নাগাবলীও একটি নদীর নাম।)

এখন প্রভু কীর্তনের দল সহ বিশ্রামান্তে চলেছেন শ্রীকূর্ম নাগাবলীর পথ ধরে। সংকীর্তনে চলছেন সকলকে পবিত্র করে। যখন কীর্তনের দল এল 'কভূর' মণ্ডলে, প্রভু দেখতে পেলেন রায় রামানন্দকে। সংকীর্তন দল ভাবে বিভোর। মিলন হলো দুজনের। প্রভুকে দেখেই রামানন্দ বললেন—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু প্রজন্য ভয় ভঞ্জন।' এমন কীর্তন শুনে প্রভু হলেন পুলকিত। তখন ভাবাবেশে রামানন্দ লুটিয়ে পড়লেন প্রভুর চরণে। প্রেমাবেশে প্রভু তাঁকে তুলে নিলেন কোলে। প্রেমভরে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভক্তশ্রেষ্ঠ, কি সাধনা করছ তুমি? রায় বললেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই-ই আমার সাধনা। 'আর ত কিছুই নাই, সর্বকিছু একমাত্র কৃষ্ণেরই।' আমি এই বলেই শুধু প্রণাম করছি। কৃষ্ণ বিনা আমার নেই অন্য কোন গতি। সর্বস্ব আমার কৃষ্ণনাম। যুগল রসের রাধা ভাবই আমার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

এই কথা শুনে শরীর হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত। তিনি রামানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। 'দৃঢ়ভক্তির' এই উক্তি মোহিত করল তাঁর হৃদয়। প্রভু বললেন, জগন্নাথ ধাম প্রভুর নিত্য লীলা স্থল। শ্রীক্ষেত্র পূর্ণ ভাগবত ভূমি। আমি থাকব সেই পুণ্য ভূমিতেই। হে সুধীশ্রেষ্ঠ, তুমি চলে এসো সেখানে। আমি বলিষ্ঠ লীলা প্রকাশ করব পুরুষোত্তমে।

এই কথা বলে প্রভু চলে গেলেন দক্ষিণ দেশে। তখন রামানন্দ বুঢ়ালেঙ্কা নামক একজন কর্মচারীকে পাঠালেন পুরী। ক্ষেত্রে এই চরিত কথা প্রচারিত হল লোকমুখে। বুঢ়ালেঙ্কা বললেন রাজার কাছে গিয়ে, চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন এখানে, তখন কেউ আমরা তাঁকে চিনতে পারিনি। ইনি যে সে সন্ন্যাসী নন, পাবন নাম প্রচারে স্বয়ং পতিত পাবন। হে মহারাজ, আপনি তাঁর কাছেই নিজ মন আবদ্ধ রাখুন।

এই ঘটনার পর চক্ড়াকার বলছেন ঃ

আঠ মাস সংবৎসর পূছাই ঠাকুর।
পুনঃ বিদ্যানগরী রে নামর প্রচার॥
ডগরা কহিলা মিলি কীর্তন পথরে।
চলন্তু ভো দেব বেগে ক্ষেত্র বরে।
উৎকণ্ঠিত প্রভু তহিঁ ঘাটী মান দেই॥
ব্রহ্মাগিরি পথে তহিঁ উপস্থিত হোই। —চৈ· চকড়া পৃ· ২৩

অতিবাহিত হল এক বৎসর আট মাস। এতদিন তিনি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। তারপর এসে হাজির হলেন বিদ্যানগরে। রামানন্দের দেশে। করলেন নামের প্রচার। এই নাম প্রচারের সময় পথে রাজার দূত এসে জানাল, প্রভু, শীঘ্র ফিরে চলুন শ্রীক্ষেত্রে। রাজার ডাক শুনে প্রভু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। ধরলেন সোজা পথ। কিন্তু সে পথ বনাকীর্ণ দুর্গম-ব্রহ্মাগিরির পথ। অবশেষে সেই পথে উপস্থিত হলেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে।

পথে আলালনাথকে দর্শন করলেন। প্রণাম করে বললেন, 'যিনি কৃষ্ণ, তিনিই নারায়ণ।' এদের মধ্যে নেই কোন ভেদ।

চকড়া সংক্ষেপে রামানন্দ-সাক্ষাৎকার সম্পর্কে দিয়েছেন এইটুকু মাত্র সংবাদ। এর মধ্যে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আলোচনার কোন সামান্যতম ইঙ্গিতও নাই। এমন কি বিদ্যানগরে ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে অবস্থানের কথাও নাই। ফিরে এসে রামানন্দের দেশে কীর্তন প্রচার করেছিলেন, সে সম্পর্কে পূর্ব অধ্যায়ে প্রভুজী যে আলোচনা করেছিলেন, তাই সত্য বলে মনে হয়। ইঙ্গিত বরং আছে। অন্তত: ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের আলোচনা অনৈতিহাসিক এ কথা স্বীকার করতেই হয়।

তবে স্মার্তরা যে চৈতন্যদেবের উপরে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি, তা যে সত্য গোদাবর রাজগুরুর পদত্যাগ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই ঘটনার কথা কোন প্রামাণ্য চৈতন্য জীবনীতে পাইনি। চকড়াকার দিয়েছেন আমাদের সেই সংবাদ।

দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরেই প্রভু আশ্রয় নিলেন কাশী মিশ্রের বাটীতে। তাঁর যে উদ্যান ছিল সেখানেই নির্মিত হল শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। আর কাশী মিশ্রের আলয়ে একটি গুপ্ত কক্ষও তৈরী হল শ্রীচৈতন্যদেবের জন্য। প্রভুর ভারী পছন্দ হল গুপ্ত কক্ষটি। তিনি আনন্দে বৈষ্ণবদের নিয়ে উৎসব করলেন। সেই উদ্যানের পাশেই

হরিদাস করলেন তাঁর কুটীর নির্মাণ। এখানেই স্বতন্ত্রভাবে পণ্ডিত বক্রেশ্বর বাস করতে লাগলেন।

এসব কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে স্মার্ত রাজগুরু বিদ্যান বৃদ্ধ গোদাবর মিশ্র হলেন অত্যন্ত দুঃখিত। দিনে দিনে এসব হলো কি। ভক্ত আর ভাগবতের অত্যাচার, কৃষ্ণের লীলামৃত প্রচার—এ যে জঘন্য পাপাচার। এই ভেবে তাঁর মন বড় বিষন্ন হল। মুখ হল মলিন। স্মার্ত তিনি। এসব সহ্য করতে পারলেন না কিছুতেই। তাই—

রাজাজ্ঞা নেইণ মহতরে ত্যাগ কলে।
সারিয়া তটরে গ্রাম এক সংস্থাপিলে॥
তুম রায় পুট নামে করিণ শাসন।
গমিলে স্থবির সর্বজন পুজ্যজন॥ —চৈ· চকড়া, পৃ· ২৫

রাজগুরু স্মার্ত গোদাবর রাজার কাছে বিদায় নিয়ে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন। গিয়ে হাজির হলেন সারিয়া নদীর তীরে। সেখানে 'তুমরায় পুট্ট' নামে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই গ্রামে গিয়ে বসতি নিল যত স্মার্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, পুরী থেকে স্মার্ত গোদাবর মিশ্রের দেখাদেখি অন্যান্য বৃদ্ধ স্মার্তরাও ত্যাগ করলেন শ্রীক্ষেত্র। এতে রায় রামানন্দ ভারী খুসি হলেন। তিনি পুরীতে এসে চৈতন্য লীলা আস্বাদন করতে লাগলেন। চৈতন্যদেবও রামানন্দের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করতে লাগলেন সানন্দে।

'তুম রায় পুট' সম্পর্কে পণ্ডিত সদাশিব রায় চকড়ার টীকায় লিখেছেন—'পুরী জেলার বাণপুর থানা প্রতাপ গ্রামের দক্ষিণে 'সারিয়া' নদীর তটদেশে 'তুমরায় পুট' ব্রাহ্মণ শাসনে গোদাবর রাজগুরু বংশজ সামন্তগণ বর্তমানেও বাস করেন। উৎকল প্রদেশের রাজপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ গ্রামকে শাসন বলা হয়। শাসনের মধ্যে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠির বসতি। দুই পাশে শিব দুর্গার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজারা ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও পরামর্শদাতা বলে ইতিহাসে পরিচিত। পুরীর মুক্তিমণ্ডপে কেবল এই শাসন গ্রামবাসী ব্রাহ্মণদের বসার জন্য পৃথক মণ্ডপ আছে। সেখানে অন্য কেউ বসতে পারে না। এঁরা অধিকাংশই বেদজ্ঞ পণ্ডিত। শাসন গ্রামবাসীদের বিষয়ে আপ্তবাক্য প্রচলিত আছে—"শান্তি সদাচার নরাত্মভাবঃ স শাসনঃ ভুম্বুরোবাসভূমি।"—চৈ· চকড়া, টীকা। পৃ· ২৫।

॥ প্রতাপরুদ্রের প্রথম চৈতন্য দর্শন ॥

মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভুকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। রাজার সেই ব্যাকুলতার কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। অবশেষে সার্বভৌম ভট্টাচার্য আর রামানন্দ প্রকারান্তরে মহারাজাকে দেখিয়েছিলেন রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যদেবকে। ভট্টাচার্য এই যুক্তি দিয়েছিলেন :

রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা।
রথ-আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেইকালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ ॥
কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সে কালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি ॥

—চৈ. চ. মধ্য. ১১ পারি.

কিন্তু চকড়াকারের মতে প্রভুকে দর্শন করেছিলেন মহারাজ জগন্নাথ মন্দিরেই। সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রমাণস্বরূপ জগন্নাথ মন্দিরে আজো নিদর্শন আছে। নিম্নরূপ সে কাহিনীটি।

চৈতন্যদেবের ভাব-ভক্তির কথা শুনে ভারী খুশি হয়েছেন মহারাজ। একদিন গোপীনাথ পাটপাত্র এসে প্রভুকে অনুরোধ করলেন, আপনি রাজপ্রাসাদে গিয়ে দর্শন দান করুন রাজাকে। গোপীনাথের এই কথা শুনে

বোইলে কি বিশ্বম্ভর বিষয়ী প্রধান।
তাহাঙ্ক সাক্ষাতরে মোর কিবা প্রয়োজন ॥
জগন্নাথ নিজ দাস এথি নাহিঁ শংকা।
মাত্র তোর রাজা অটে অতি যুদ্ধ রংকা ॥ —চৈ. চ. পৃ. ২৬

মহাপ্রভু বললেন, রাজার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তিনি ত বিষয়ী মানুষ। জানি জগন্নাথের সেবক তিনি। এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এ কথাও জানি, তোমাদের রাজা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়।

গোপীনাথের কাছে রাজা এই কথা শুনে প্রভুকে দেখার জন্য আরো ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। পরামর্শ করলেন রায় রামানন্দের সঙ্গে। তখন রামানন্দ বললেন, আপনাকে আমি নিশ্চিত রূপে দর্শন করাবো। কিন্তু আমাদের যেতে হবে ছদ্মবেশে। শুভ্র

বস্ত্র আর শুভ্র উত্তরীয় পরিধান করে রাজা ও রামানন্দ উপস্থিত হলেন মন্দিরে। গোপনে অপেক্ষা করতে লাগলেন জগমোহনে। এই গোপন উপস্থিতি অন্য কেউ জানতে পারল না। প্রভু বেড়া সংকীর্তন করে প্রবেশ করছেন মন্দিরে। লেখক বলছেন, এই সময়ে প্রভু ভাবাবেশে যে রূপ প্রকাশ করলেন তা বর্ণনাতীত। ক্ষমতা নাই চকড়াকারের বর্ণনা দেওয়ার। বিস্তারিত উদ্দণ্ড দুই ভুজ। নয়নদ্বয় অশ্রুতে পরিপূর্ণ। মুখে 'হরেকৃষ্ণ' নাম। সঙ্গে নিত্যানন্দ কীর্তন করছেন। বয়সে জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ। তাঁর শুক্ল শরীর, ভাব গম্ভীর। হাতে ধারণ করেছেন শিঙা। মন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করে যখন জগমোহনে প্রবেশ করলেন, অন্তরাল থেকে রামানন্দ দেখলেন মহাপ্রভুকে।

সেটি কোন দিন? চকড়াকার বলছেন, সেই শুভ দিনটি হলো জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমী। সেই দর্শনে ছিল রাম রূপের অপূর্ব বিভব। রামানন্দ রাজাকে নির্দেশ করে বললেন:

পশ্যন্তু রাজ রাজেশ জগন্নাথ পরায়ণম্।
সাক্ষাৎ নামাবতারম্ হি বিশ্বম্ভর শুভাননম্॥
রাজা হেরিল বিচিত্র রূপ সমাহার।
হরে কৃষ্ণ রাম তিনি তত্ত্ব লক্ষণ নিকর॥
ত্রিভঙ্গ স্থান সংস্থানম্।
গৈরিক বসন বাসনাভৃতম্॥
নানাবরণ সৌভাগ্যম্ কমনীয় মুখাম্বুজম্।
পীতবর্ণ বপুন্যাসী দণ্ড কমণ্ডলু ধরম্॥
হরেনাম ইতি তত্র তদূর্ধ্বে দেবকী সুতম্॥

হে মহারাজ, আপনি দর্শন করুন জগন্নাথ পরায়ণকে। দেখুন, সাক্ষাৎ নামের অবতার বিশ্বম্ভর। তখন রাজা দেখলেন, তাঁর মধ্যে রূপের বিচিত্র সমাহার। গৈরিক বসনে আবৃত হয়ে হরে কৃষ্ণ রাম এই তিন তত্ত্বের হয়েছে অপূর্ব সমাহার। কি অপূর্ব ত্রিভঙ্গ ধামে রয়েছেন দাঁড়িয়ে। কমনীয় মুখাম্বুজ নানা অলংকারে সুশোভিত। দণ্ড কমণ্ডলু ধারী অপূর্ব সন্ন্যাস বপু। তার উপরে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। শ্যামল বর্ণ। ধরা রয়েছে অধরে বংশীখানি। তারও উপরে ধনুর্বাণধারী বিরাজিত শ্রীরামচন্দ্র।

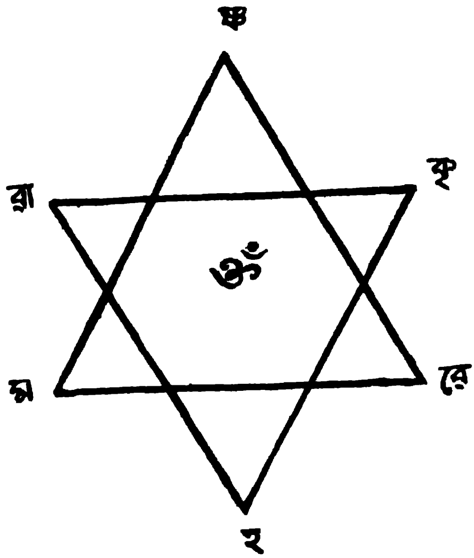
একই দেহে এই অপূর্ব মূর্তিত্রয় দেখে ভক্তিভরে দুজনে:

'হরে কৃষ্ণ নামম্' ইতি পাদাৎ শিরাবধি।
প্রপন্ন পারিজাতায় গৌরসুন্দর তে নমঃ॥

এহি মত দুহঁ জন প্রণাম করিলে।
অন্যে দ্বিভুজে সন্ন্যাসী রূপ প্রকাশিলে॥
ষড়ভুজ যন্ত্র সহিত ত্রয় নাম প্রকল্পিলে
ষোড়শ নামরে ষোহল স্তম্ভ বিচান্তিলে॥—চৈ. চ. পৃ. ২৭

চরণ থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত হরে কৃষ্ণ রাম প্রকটিত এই তিন মূর্তি। হে শরণাগতির আশ্রয় গৌরসুন্দর, তোমাকে জানাই আমাদের প্রণাম। বলে দুজনেই ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন। উঠে দেখেন, সেই অপূর্ব ষড়ভুজ মূর্তি আর নেই। দাঁড়িয়ে রয়েছেন দ্বিভুজ শ্রীচৈতন্যদেব।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র এই যে প্রভুর ষড়ভুজ মূর্তি দর্শন করলেন, তাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পরিকল্পনা করলেন ষড়ভুজ যন্ত্রের সঙ্গে ত্রি নাম, আর ষোড়শ নামের প্রতীক জগমোহনের ষোলটি স্তম্ভ। সেই পরিকল্পিত ষড়ভুজ যন্ত্রের নিম্নে দেওয়া হল চিত্ররূপ।



প্রতাপরুদ্র দেব যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখেছিলেন ষড়ভুজ মূর্তিতে, সেখানে সকলেই মনে করেছিল, শ্রীচৈতন্যদেবই সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার। তারপর মহারাজ পট্ট-জ্যোতি মহাপাত্রকে ডেকে বললেন, আমি যেখানে এই অদ্ভুত মূর্তি দর্শন করলাম, যখন মন্দিরের কাজ শেষ হবে, এই স্তম্ভে এই ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্তি স্থাপন করতে হবে। মূর্তিটি নির্মিত হবে এইভাবে—মাঝে মহাপ্রভু, দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বামে

আমি থাকব সেবকের মত। আমার হাতে থাকবে রাজদণ্ড, ছত্র আদি সমস্ত রাজ-প্রতীক। এই মূর্তির দ্বারা জগতে প্রচার হবে নামের আর নাম তত্ত্বের।

তারপর রাজা বললেন রামানন্দকে—প্রভুকে আর প্রত্যক্ষ দেখার প্রয়োজন নাই। তুমি তাকে জগন্নাথের পট্টবস্ত্র প্রদান কর। রাজা প্রাসাদে ফিরে গিয়ে সবাইকে বললেন এই অপূর্ব দর্শনের কথা। ভক্তিতে গদ গদ হয়ে আরো বললেন—আমার পিতা-মাতা ইনিই আর গুরু বলতেও ইনি। মহান রাজগুরু কাশী মিশ্র, তাতে কোন সংশয় নাই। সিংহাসনের প্রত্যক্ষ সেবাও তাঁর প্রয়োজন নাই। আমি পূর্বেই ঘোষণা করেছি, মন্দিরে কেবল 'গীতগোবিন্দ'ই পাঠ হবে। সে আজ্ঞার হবে না কোন পরিবর্তন। কিন্তু গম্ভীরা অধীশ্বরের অনুমতি ভিন্ন কেউ পারবে না জগন্নাথ মন্দিরে কীর্তন করতে। অন্য সেবার জন্য পরিষদ আমাকে যেন অনুরোধ না করে কারণ তাহলে আমার নীতি ভঙ্গ হবে।

এরপর আর শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ মন্দিরে আসেন নি। এক বৎসর বাস করলেন গম্ভীরাতে। এক বৎসর পরে আষাঢ় অমাবস্যায় পুনরায় তিনি এলেন মন্দিরে। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব রথীপুর রাজবাটী ত্যাগ করে পুরীতে এসে বাস করতে লাগলেন স্থায়ী ভাবে। তিনি সমর্পণ করলেন নিজেকে প্রভুর শ্রীচরণে। ঘোষণা করলেন ঃ

'চৈতন্য ঠাকুর আম্ভ সম্পদ ভইল ॥' —চৈ. চকড়া. পৃ. ২৯

অর্থাৎ চৈতন্য ঠাকুর আমার পরম সম্পদ। চকড়ার মতে রাজার চৈতন্য-দর্শনের এই হলো পূর্ণ বিবরণ। চৈতন্যচরিতামৃতের সঙ্গে এই ঘটনার তফাৎ কতখানি তা সহজেই বোঝা যায়।

॥ প্রভুর কথাতেই গোপীনাথকে ক্ষমা করেছিলেন মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব ॥

উড়িষ্যার আধুনিক ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, শ্রীচৈতন্য শেষে উৎকলের প্রশাসনেও হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি এই পুস্তকের ৭৭ পৃষ্ঠা থেকে ৮১ পৃষ্ঠার মধ্যে। চৈতন্য চকড়ার বিবরণ দেখে এখন স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ থেকে এই মতের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলাম, তা ভ্রান্ত। এ বিষয়ে ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাবের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে এতদিনে অন্ততঃ একটি প্রাচীন প্রমাণ মিলেছে। যার থেকে বলা যায়, উড়িষ্যার আধুনিক ঐতিহাসিকদের

অভিমতই ঠিক। চৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রদেবের রাজ্য-প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করুন অন্ততঃ তাঁর অনুরোধেই গোপীনাথের প্রাণরক্ষা পেয়েছিল। একথা যথার্থ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরবর্তীকালে ঘটনাটিকে অন্যভাবে সাজিয়ে চৈতন্যদেবকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

এখন শুনুন চৈতন্য চকড়ায় এই ঘটনাটি কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বিবরণটি আনুপূর্বিক দিতে চেষ্টা করছি।

বড় যেনা গোপীনাথ কাম্বির বিষয়ী।
হরিল যে বহু বিত্ত হোইন বিষয়ী॥
রাজা তারে দণ্ডিবার কারণে রাইল।
কটকে অটকে তাঙ্কু আকটে রাখিল॥
রায় রামানন্দ দুঃখ সাগরে বুড়িল।
প্রভুর সমীপে কিছিমাত্র ন ভাষিলে॥
সেবক শঙ্কর দিনে গম্ভীরারে বসি।
প্রভুঙ্ক সমীপে কহে শোক বহি আসি॥
রামানন্দ দুঃখ প্রভু সহি ন করন্তি।
পটাও করণে কহ নৃপ ক্ষমা আবরন্তি॥
দেউল করণ প্রভু আজ্ঞা ঘেনি গলা।
কটকরে রাজা আগে বৃত্তান্ত কহিলা॥ —চৈ. চকড়া. পৃ. ৩৫-৩৬

গোপীনাথ বড় জেনা ছিলেন কাঁন্দি (কাঁথি, মেদিনীপুর জেলায়) রাজ্যের শাসন কর্তা। সে রাজার বহু বিত্ত আত্মসাৎ করেছিল। রাজা তাকে দণ্ড দিলেন। বন্দী করে রাখলেন কটকে। একথা শুনে রায় রামানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিন্তু কিছু বললেন না প্রভুকে। কিন্তু প্রভুর সেবক শঙ্কর একদিন গম্ভীরাতে প্রভুকে সব ঘটনা খুলে বললেন। উপস্থিত রামানন্দও অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন। তখন প্রভু বললেন, তুমি একজন কর্মচারী পাঠাও। রাজাকে বল সে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে। করণ প্রভুর এই আদেশ নিয়ে কটকে গমন করল। গিয়ে জানাল রাজাকে প্রভুর সংবাদ।

প্রতাপরুদ্র চৈতন্যকে গুরু বলে স্বীকার করলেও মেনে নিলেন না চৈতন্যদেবের কথা। তিনি যথার্থ রাজার মতই তাঁর ব্যক্তিত্ব বজায় রাখলেন। এ বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যে বলেছেন, মহারাজ চৈতন্যের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন, অন্ততঃ একথা স্বীকার করা যায় না—যদি চৈতন্য চকড়ার কথাকে সত্য বলে মনে করি।

করণের সংবাদ শুনে তখন প্রতাপরুদ্র বললেন :

রাজা কহে গণ অর্থ করে যেহু চোরি ।
তাহার মস্তক ছেদ নীতিরে বিচারী ॥
সমস্ত বিত্ত সে দেব ইহা দৃঢ় জান ।
প্রভুর ভাবরে তার হেব পরিত্রাণ ॥
ভূমি বৃত্তি তাহাঙ্কর কোট হই গলা ।
বিষয়ী পদ কড়িন ক্ষমা তাঙ্কু দিলা ॥
ক্ষেত্রবরে আসি প্রভু পাথরে পড়িলা ।
রাজা ন চাহিলা মুখ রায় ন চাহিলা ॥ —চৈ. চকড়া. পৃ. ৩৬

রাজা বললেন করণকে, এ তুমি কি বলছ, গণ-অর্থ যে চুরি করে তার শিরশ্ছেদ করা উচিত। তবে হ্যাঁ, যদি সে তার সমস্ত ধন-সম্পদ দাখিল করে, তাহলে প্রভুর আজ্ঞায় তাকে না হয় ক্ষমা করতে পারি। রাজা শেষে গোপীনাথের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। তার কেড়ে নেওয়া হল বিষয়পতির পদ। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা থেকে ক্ষমা করলেন রাজা তাকে। শ্রীক্ষেত্রে গোপীনাথ এসে প্রভুর শরণাগত হল। কিন্তু, না রাজা, না প্রভু, না রায় রামানন্দ—কেউই তার মুখ দর্শন করলেন না।

এই ঘটনা থেকে এটুকু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে প্রভুর কথায় মহারাজ গোপীনাথের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব করলেও পুনরায় তার হাতে শাসন ভার দেন নি। বরং তার ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি সব নিয়েছিলেন কেড়ে। এতে চৈতন্যকে কতটুকু দোষী করা সম্ভব হবে বুঝি না।

তবে চকড়াকার বলেছেন :

রাজা নিজে ক্ষেত্রবরে অপযশ হেলা।
প্রভু পাশে ন রখিলে নিত্যলীলা মগ্ন ॥
আপনি রচিলে ধর্ম প্রচার কীর্তন ॥ —চৈ. চকড়া. পৃ. ৩৬

এতে শ্রীক্ষেত্রে রাজার নিজের অপযশ হলো। প্রভু তাকে পাশে রাখলেন না। রইলেন নিজলীলায় নিত্য মগ্ন হয়ে। কোন বিষয়েই ভ্রূক্ষেপ করলেন না। চললেন কীর্তন ধর্ম প্রচার করে।

এই ঘটনা থেকে নিরপেক্ষ বিচার করলে চৈতন্যদেবের করুণার্দ্র-হৃদয়েরই পরিচয় মিলে। মহারাজের রাজ্য-প্রশাসনে মোটেই তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। যখন স্বেচ্ছাচারী গোপীনাথ প্রভুর শরণাগত, তখনো তিনি তাকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি শুধু প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছিলেন, অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিলে প্রকৃত শাস্তি তার হবে না।

অপরাধী যদি মরেই গেল, তাহলে সে নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করবে কেমন করে ? আর অনুশোচনা না করলে অপরাধী নিজেকে সংশোধনই বা করবে কেমন করে ? এই ঘটনা থেকে চৈতন্য-চরিত্রের দু'টি দিক আমরা দেখতে পাই। তিনি যেমন কোমল হতে পারতেন, আবার তেমনি কার্যক্ষেত্রে লোকশিক্ষার জন্য কঠোরও হতেন। চৈতন্য চরিত্রের এই ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

॥ চকড়ায় অন্তর্ধান রহস্য ॥

চৈতন্য চকড়ায় বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস বাবাজী শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যও পরিবেশন করেছেন। সে সম্পর্কে পদ্মশ্রী পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মার উক্তিও সাক্ষাতকার প্রসঙ্গে বলেছি, তখন পর্যন্ত আমি 'চৈতন্য চকড়া' পুঁথি দেখি নাই।

এখন পুঁথি থেকেই সমগ্র ঘটনাটি পাঠকদের সামনে ব্যক্ত করছি। চকড়াকার সাল এবং তিথির কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারিখ বা বারের কোন উল্লেখ করেন নি। এখন মূল থেকে উদ্ধৃতি সহ-সম্পাদকের অবিকল অনুবাদ রাখছি আপনাদের সামনে।

চতুর্দ্দশ ষষ্ঠাধিক পঞ্চশত শাকে।
অপূর্ব্ব লীলা ঘটিলা প্রত্যক্ষে ॥
শুক্ল সপ্তমী তিথি যে অবশ কইলা।
আতুর ভাবরে গোরা কীর্তনে গমিলা ॥
আড়প মণ্ডপে চারি সম্প্রদায় সহ।
উদ্দণ্ড নর্ত্তন অস্তব্যস্ত প্রভু দেহ ॥
গোবিন্দ স্বরূপ দুহেঁ আকুলিত তনু।
শ্রীঅঙ্গ সম্ভালিবারে চকিত সুতনু ॥
পাদুক কুণ্ড সমীপে বেঢারে বসিলে।
বিরহ কীর্ত্তনে সর্ব্বে অসম্ভাল কলে ॥
ফিটি বহির্বাস গলা মালা অসম্ভাল।
মহারাসস্থলী রাসগীতে অনর্গল ॥
সর্ব্ব নেত্র তার পূর্ণ আকুল বদন।
রায় পাশে বসি করে আকুলে ক্রন্দন ॥

মৃদঙ্গ বেতাল স্বর কাতরে বেতাল।
সর্ব্বে অনুভব কলে সম্বরণ কাল ॥ —চৈ. চ. পৃ. ৫৯

অনুবাদ—"চৌদ্দশ, ছাপ্পান্ন শকে (১৫৩৩ খ্রীঃ) এক অদ্ভুত লীলা সংঘটিত হ'ল। আষাঢ় শুক্ল সপ্তমী তিথি। আতুর ভাবে গোরা কীর্তন করতে লাগলেন। সেই গুণ্ডিচা মন্দির। অস্ত ব্যস্ত শরীর। উদ্দণ্ড কীর্তনে মত্ত। বিহ্বল গোবিন্দ ও স্বরূপকে ধরে পাদুকা কুণ্ডের সমীপে বসে পড়লেন। অপূর্ব বিরহ কীর্তন। মহারাসস্থলী প্রকম্পিত হল। বহির্বাস খুলে গেল। গলার মালা ছিঁড়ে পড়ে গেল। মহারাসস্থলী রাসগীতে অবিরাম মুখরিত। বিরহে মিলন। সবার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন। রায় রামানন্দের পাশে বসে সবাই কাঁদছেন। সব কিছু বেতাল। স্বর বেতাল, মৃদঙ্গ বেতাল। সবাই অনুভব করলেন, 'লীলা সম্বরণে'র কাল উপস্থিত।" —পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মা। পৃ. ১০৫

সন্ধ্যা আরতি দরশনে সেবকে রাইলে।
বিজে দ্বার দেই গলে গোরাঙ্গ ঠাকুর ॥
গরুড় স্তম্ভ সমীপে দরশনে আতুর ॥
সন্ধ্যা আরতি উঠিলা পড়িলা চহল।
ছিণ্ডি পড়িলা প্রভুঙ্ক অধরর মাল ॥
সহসা শতেক চন্দ্র উদিয়ার তেজ।
প্রকাশরে নেত্র সর্ব্ব কি ঘটিলা আজ ॥
দিব্যজ্যোতি প্রায় তেজ গরুড় পছরু।
জগন্নাথ ছামু যাতে পড়ে ধাতি কারু ॥
হরি হরি জয় নীলাচল পতি জয় জয়।
শবদে আড়প কম্পে ন' ধরিলা থয় ॥ —চৈ. চকড়া পৃ. ৫৯

ভাবানুবাদ—"সন্ধ্যারতির সময় হ'ল। সেবকরা আদর করে ডেকে নিয়ে গেল গোরাঙ্গ ঠাকুরকে। প্রভু গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে আকুল চিত্তে দর্শন করতে লাগলেন। আরতির ধ্বনি উঠল। চারিদিকে নামের ঐকতান। এই সময় জগন্নাথের গলার মালা হঠাৎ ছিঁড়ে পড়ে গেল। সহসা মহাভাব যেন শত চন্দ্রোদয়ের জ্যোতির মত দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশিত হল। সকলের চোখের সামনে গরুড় স্তম্ভের পিছন থেকে একটি জ্যোতিঃ গিয়ে জগন্নাথের শরীরে বিলীন হয়ে গেল। জয় হরি। জয় গোর হরি। জয় নীলাচলপতি ধ্বনিতে সমস্ত গুণ্ডিচা মণ্ডপ মুখরিত হয়ে গেল। প্রভুর স্বরূপ আর দেখা গেল না।"

স্তম্ভ পাশে থিলে প্রভু ন দিশে বদন।
কেনে গলে ভক্ত সর্ব্ব আকুলিত মনে॥ *
কেহ বোলে সিংহাসন পথে অবাগলে।
প্রতিহারীগণে বাক্য অস্বীকার কলে॥
আকুলে খোজন্তি সর্ব্বে বৈষ্ণব মণ্ডলী।
দেখিলে নিরেখি আড়পর বনস্থলী॥
কেহ বোলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সর পথে গলে।
খোজিন স্বরূপ তথি নিরাশ হইলে॥
নৃসিংহ বল্লভ আই তোটারে খোজিলে॥
গোবিন্দ সেবক সঙ্গে বৈষ্ণব কেতেক।
সমুদ্র পংতা খোজই করি মহাশোক।

ভাবানুবাদ—"সবাই বললে কোথায় গেলেন? কেউ বললেন, সিংহাসনের দিকে গেলেন। প্রতিহারীরা বললো না—প্রভু সিংহাসনের দিকে তো যান নি। বৈষ্ণবরা আকুল হয়ে গুণ্ডিচা মণ্ডপের বনস্থলী খুঁজতে লাগলেন। কয়েকজন ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের দিকে গেলেন। সেখানে গিয়েও নিরাশ হলেন। কিছু লোক নৃসিংহ বল্লভ আইটোটায় সন্ধান করলেন। সেবক গোবিন্দর সঙ্গে কিছু বৈষ্ণব শোকাকুল হয়ে সমুদ্রের ধারে খুঁজে দেখলেন।"

* এই অংশে—"স্তম্ভ পাশে থিলে প্রভু ন' দিশে বদন॥" এই পংক্তির অনুবাদ দেখছি না। 'প্রভু স্তম্ভের আশে ছিলেন, তাহলে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না কেন।' সম্ভবত ভাবানুবাদ করলে এরূপই দাঁড়াবে।

এর পরের অংশ :

সেবক ভকতগণ বড় দেউল রে।
খোজন্তি সিন্ধ বকুলে নগর মধ্যরে॥
অনন্ত সিংহ পাত্র যে অশ্বরে আরোহী।
গোরাচান্দ গলে কেনে অবাক কাঁহি॥
তোটা গোপীনাথ তাঙ্ক প্রিয় স্থলী।
রায় বোলে অবা থিবে ধর্ম সেহি স্থলী॥
সকলে ধাবন্তি বস্ত্র বেশ অসম্ভালি।
গোপীনাথ বেঢ়া ঠারে বহির্বাস দেখি॥
স্বরূপ বৈষ্ণবগণে হেলে মহাসুখি।
মাত্রক খেদ ঘটিলা চৈতন্য ন' দেখি॥

ভাবানুবাদ—"শ্রীমন্দির, সিন্ধ বকুল সব জায়গায় দেখা হ'ল। কোথাও কোন সন্ধান মিলল না। কর্মচারী অনন্ত সিংহ অশ্বারোহণে খুঁজতে বেরোলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। কোথায় গেলেন প্রভু? রামানন্দ রায় বললেন হয়তো তিনি গোপীনাথ মন্দিরে থাকবেন। দেখলেন সেখানে বহির্বাস পড়ে আছে। সবাই আবার মন্দিরে গেলেন। কিন্তু মহাপ্রভুকে না দেখে পুনঃ কাতর হয়ে পড়লেন।"

বৈষ্ণবগণ আতুরে করন্তি বিচার।
অচেতন গৌরচন্দ্র অচেত শরীর ॥
ভক্তগণ এস্থানকু আদরে আনিলে।
বহির্বাস পড়ি অছি প্রভু কেনে গেলে॥
এমন্ত সময় রায় রামানন্দ ধীর।
শোকের অধীর হেবা সামান্য বিচার!
দেখ অদভুত বস্তু এথারে ঘটিছি।
প্রভু অঙ্গবাস মালা এ-ঠারে পড়িছি ॥
গোপিনাথ জানুদেশে ক্ষতর আকার।
ন'থিলা ত কদা এহু বিচিত্র ব্যাপার ॥
দৈবী সত্তা দেব সঙ্গে বিলীন লভিলা।
একে দেয়ি প্রভু লীলা সম্বরণ কলা ॥
এতেক সকলে মিলি হরি হরি কলে।
অবশেষ নেই তথি সমাধি রচিলে ॥—চৈ চকড়া পৃ. ৬০

ভাবানুবাদ—"বৈষ্ণবরা আতুর হয়ে বললেন, বোধহয় প্রভু অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। কোন ভক্তজন মহাপ্রভুকে এখানে নিয়ে এসেছেন। তা না হলে বহির্বাস এখানে পড়ল কেমন করে? রায় রামানন্দ বললেন, শোকে অধীর হওয়া বৈষ্ণবের লক্ষণ নয়। এ সাধারণ লোকের লক্ষণ। দেখ এখানে বহির্বাস পড়ে আছে। আরও দেখ টাটা গোপীনাথের জানুদেশে একটি ক্ষত চিহ্ন হয়েছে যা আগে ছিল না। আমার মনে হয়, দিব্য সত্তা এই পথ দিয়ে বিগ্রহে বিলীন হয়ে গিয়েছেন। সবাই হরি নাম করলেন। স্বেচ্ছা নির্মিত তনু, জগন্নাথ দেহে বিলীন হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে হরিধ্বনি করে সেই ব্যবহৃত বস্তু যেগুলি পড়েছিল, সেগুলি নিযে (তথি সমাধি রচিলে) তথায় সমাধি রচনা করলেন।"

এর পরের ঘটনা উদ্ধৃতি সহ অনুবাদ না করে আমার ভাষায় বলছি। সমাধির পর চললো অখণ্ড কীর্তন। উল্টারথের কীর্তন করলেন স্বরূপাদি ভক্তগণ। চললো

অখণ্ড নামযজ্ঞ। এই কীর্তনে গীত হল শ্রীচৈতন্যের অমৃতময় বাণীগুলি। বেড়া সংকীর্তন ও চললো নিষ্ঠা ভরে। শোকাতুর হৃদয়ে কীর্তন করতে করতে সবাই হলেন প্রেমে বিভোর। তারপর শুক্লা দ্বিতীয়াতে সবাই প্রবেশ করলেন জগন্নাথ মন্দিরে। শেষ হলো অখণ্ড নামযজ্ঞ। গৌড় ভক্তরা ফিরে গেলেন স্বদেশে। রাধাকান্ত মঠে বা গম্ভীরাতে অভিষেক হল মহাপ্রভুর পাদুকার। সেই পাদুকা দু'টি ঘোষিত হলো 'গম্ভীরা ঈশ্বর' নামে। রাধাকান্ত দেবের সেবা পূজা নিয়ে শান্ত হয়ে গেল সকলেই। সকলের শোক সন্তপ্ত হৃদয় শান্ত হলো।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব কাঠের শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি তৈরী করে বালি নবরর নগরে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই উপলক্ষ্যে হলো সংকীর্তন মহোৎসব। আটষট্টি সম্প্রদায়ের সাকারবাদী বৈষ্ণবগণ হলেন একত্রিত। অতিবড়ী জগন্নাথ দাস এসে প্রদান করলেন পাদ্য অর্ঘ্য। রাজা প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণবগণকে করালেন বিপুল মহাপ্রসাদের সেবা শ্রীধামে নাম সংকীর্তনের সেবা প্রতিষ্ঠা করে সবাই নিলেন বিদায়। রাজা রামানন্দ রায়কে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন কটকে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এই ভাবে শেষ হলো গৌর লীলা।

চৈতন্য চকড়ায় বর্ণিত এই হলো শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান কাহিনী। এইবার এই কাহিনীটি নিয়ে পর্যালোচনা করা যাক। প্রভুজী বলেছিলেন, আরতির সময় সহসা প্রচণ্ড আলোকের ছটায় সকলকে ধাঁধিয়ে দিয়ে মহাভাব গ্রস্ত প্রভুকে অপহরণ করা হয়েছিল। তারপর তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করে মৃতদেহ ফেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল টোটা গোপীনাথ মন্দিরে। পরে সেখানেই দেওয়া হয়েছিল প্রভুর সমাধি।

তিনি এই ঘটনাটি আমার কাছে বলেছিলেন যুক্তিসঙ্গত ভাবে সাজিয়ে। যাতে গ্রহণ করা যায় বিশ্বাসযোগ্যভাবে। চৈতন্য চকড়ায় এমন বহু ঘটনা আছে যা অলৌকিকতার মোড়কে মোড়া। চকড়াকার গোবিন্দ দাস বাবাজী বলেছেন, যা তিনি দেখেছেন এবং সাধু মুখে শুনেছেন, তাই রাজার আদেশে লিখেছেন। গ্রন্থটি লেখা তিনি শেষ করেছেন, 'চতুর্দ্দশ অষ্টাধিক পচাশত শকে।' চৈত্র শুক্ল নবমীরে লেখন সম্পূর্ণ ॥' এই অংশের বাংলা অর্থ করেছেন সম্পাদক পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মা—'চৌদ্দশ আটান্ন শকাব্দে (১৫৩৩ খৃ.) আমি এই গ্রন্থখানি শেষ করলাম।' 'চৈত্র শুক্ল নবমীতে আমার লেখা সমাপ্ত করলাম।'

প্রভুর লীলা সম্বরণের শকাব্দ হলো চকড়াকারের মতে—চতুর্দ্দশ ষষ্ঠাধিক পঞ্চশত শাকে।' 'শুক্ল সপ্তমী তিথি যে অবশ কইলা।' এর বাংলা অর্থ পণ্ডিতজী করেছেন —'চৌদ্দশ, ছাপান্ন শকে (১৫৩৩ খৃঃ) এক অদ্ভুত লীলা সংঘটিত হল।' আষাঢ় শুক্ল সপ্তমী তিথি।'

তাহলে আষাঢ় মাসে প্রভু লীলা সম্বরণ করলেন আর গ্রন্থকার তাঁর চকড়া লিখলেন চৈত্র মাসে। অর্থাৎ ৮ মাসের ব্যবধানেই গ্রন্থটি লেখা শেষ হয়েছিল। বলতে গেলে একেবারে সমসময়েই। এ রকম আর কোন চৈতন্য জীবনী এর আগে লেখা হয়নি। বলতে গেলে তরতাজা খবর সব।

কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না 'চতুর্দ্দশ ষষ্ঠাধিক' আর 'চতুর্দ্দশ অষ্টাধিক' এ দুই-এরই খ্রীষ্টাব্দ কেমন করে ১৫৩৩ হল। ১৪৫৬ শকাব্দে আষাঢ় মাসে প্রভু লীলা সম্বরণ করলেন। আর ১৪৫৮ শকাব্দের চৈত্র মাসে চকড়াকার তাঁর গ্রন্থ রচনা শেষ করেছিলেন এইরূপ অর্থই হয়। আমার মনে হয় এ বিষয়ে অনুবাদক বোধ হয় ভ্রমে পতিত হয়েছেন। ১৪৫৬ শকাব্দের অনুযায়ী খৃষ্টাব্দ ধরেছেন ১৫৩৩ (পৃ. ১০৫)। আবার ১০৭ পৃষ্ঠায় ১৪৫৮ শকাব্দের অনুযায়ী খৃষ্টীয় বর্ষও ধরেছেন ১৫৩৩। অথচ এই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ ১৪৫৮ শকাব্দ নয়, ১৪৫৬ ও নয়। এটা হওয়া উচিত ১৪৫৫।

এতকাল আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথাকেই প্রামাণ্য বলে ধরে রেখেছি। তিনি তাঁর চৈতন্য চরিতামৃতে লিখেছেন ঃ

'চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে লীলা অবসান॥' —চৈ. চরিতামৃত।

যদি জয়ানন্দের প্রদত্ত সময়কে পুরাতণ বর্ষপঞ্জীর সঙ্গে মিলিয়ে হিসেব করি তাহলেও লীলা অবসানের কাল হয় ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দই। তৎকালে প্রচলিত জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে ১০০ শত বৎসর পরে প্রবর্তিত গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে মিল রেখে হিসেব করলে শকাব্দ ১৪৫৫, ৩১ আষাঢ় (খৃঃ ১৫৩৩, ৯ জুলাই) হয়।

আর এই পুস্তকে প্রভুর 'তিরোধান' প্রবন্ধে যে আলোচনা রেখেছি, তাতে দেখা যাচ্ছে এর এক বৎসর পূর্বে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রভু লীলা সম্বরণ করেছিলেন। (পড়ুন 'তিরোধান' পৃ. ১৫৭-১৬২)।

তাহলে এই সিদ্ধান্ত করা যায়, শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের ৮ মাস পরে নয় ২ বৎসর ৯ মাস পরে ১৪৫৮ শকাব্দে চৈত্র মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে লেখক তাঁর গ্রন্থ লেখা শেষ করেছিলেন। চকড়াকার সেই কথাই বলেছেন স্পষ্ট করে।

তাহলেও বলা যায় এত প্রাচীন এবং মহাপ্রভুর অপ্রকটের এত কাছাকাছি আর কোন চৈতন্য জীবনী লেখা হয়নি। অন্ততঃ আমাদের হাতে এর থেকে আর এমন কোন প্রাচীন পুঁথি নাই।

এখন আলোচ্য এই ঘটনাটি কতদূর সত্য। দেখা যাচ্ছে ঘটনাটি দুটি স্তরে বিভক্ত। একটি—গরুড় স্তম্ভের পিছন থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে জগন্নাথে মিশে

যাওয়া, ঠিক তার পর মুহূর্তে চৈতন্যদেব অদৃশ্য। দ্বিতীয় সুর—একটি জলজ্যান্ত মানুষ সহসা অদৃশ্য হয়ে যাবে তৎকালে অলৌকিকতায় বিশ্বাসী মনও তা বিশ্বাস করতে পারে নি সুস্থ চিত্তে। তাই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে খোঁজাখুজি আরম্ভ করেছিলেন। এই অনুসন্ধানের পর্যক্রম বা কার্যক্রম শুধু মন্দিরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা সমগ্র শ্রীক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এমন কি তৎকালের দ্রুতগামী যান অশ্বারোহনেও খোঁজ করতে ছুটে ছিলেন অনন্ত সিংহ।

মহাপুরুষদের জীবনে অলৌকিকতা আরোপ করতে হয়। তা না হলে তাঁর মহাপুরুষত্ব বাড়ে না। এই বিজ্ঞানের যুগে বিংশ শতাব্দীতে আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনেও অজস্র অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি করেছি। যুক্তিবাদী ভক্ত হৃদয় অনেক সময় এসব কাহিনী বিশ্বাসও করে এবং বিশ্বাস করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

কেন এমন হয়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তা সহজে ধরা পড়ে। শিশু অসম্ভব কিছু শুনতে ভালবাসে। তাই রূপকথার গল্প তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এই কল্পনা প্রবণ শিশু মনটা যখন বড় হয় তখনো সে মরে যায়নি। সৃষ্টির ক্ষেত্রে কল্প-বিজ্ঞানের দানকে কোন মনস্তত্ত্ববিদই অস্বীকার করেন নি। তাইত রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়া আজ আকাশে বিমান হয়ে চষে বেড়াচ্ছে মহাকাশকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছিলেন, স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়ে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার কথা। সৃষ্টির রাজ্যে চিন্তা এবং কল্পনার মূল্য অসীম। মনস্তত্ত্ববিদগণ বলেন, শিশুকে অসম্ভব অলৌকিক যদি কিছু বলতেই হয়, তাহলে তা যেন বিজ্ঞান ভিত্তিক হয়। তাই বোধহয় সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান যুগে কল্প-বিজ্ঞান।

শুধু এইটুকু কথা মনে রেখেই আসুন আমরা চৈতন্য-অন্তর্ধান রহস্যের প্রথম কাহিনীটি নিয়ে আলোচনা করি। অর্থাৎ তরতাজা ঘটনাটি তখনো পুরোপুরি অলৌকিক কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়নি। সেই অর্ধেক স্বর্ণ নকুলের মত কিছুটা অলৌকিক আর কিছুটা লৌকিক রূপে কবি কল্পনায় মাত্র জন্মলাভ করেছে।

কথাটা ভালভাবে চিন্তা করুন, জগন্নাথে তীব্র জ্যোতির মধ্যে যদি জ্যোতিরূপে চৈতন্যদেব মিশে গেলেন, তাহলে খোঁজাখুজি কেন? আর খোঁজাখুজি করতে গিয়ে পাওয়া গেল গলার মালা ও বহির্বাস। কবি ঘটনাটিকে অলৌকিক রূপ দিতে গিয়েও পারেননি শেষ রক্ষা করতে। তাই ধরা পড়ে গিয়াছেন সহজেই। শেষ চেষ্টা অবশ্য করেছিলেন। রায় রামানন্দের মুখ দিয়ে গোপীনাথের জানুতে ক্ষত আর জগন্নাথে অপ্রাকৃত দেহ যে বিলীন হতে পারে সে কথা বলিয়েছেন। তারপর প্রভুর সেই

পরিত্যক্ত বা ছিনিয়ে নেওয়া বস্তুগুলিকেই গোপীনাথের মন্দিরে সমাধি দেওয়া হয়েছে বলে লিখেছেন।

তাহলে গোটা ব্যাপারটা কি দাঁড়াল। কবি লৌকিক আর অলৌকিক, এ দু'টোর কোনটাকেই বাদ দেন নি। তাই হয়। একটা সদ্য খুনের ঘটনাকে যখন অপরাধী চাপা দিতে চায়, তখন তার মাথায় চিন্তার ক্ষেত্রে কল্পনার যে বিকাশ ঘটে বাস্তবতার ক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞাতে তাতে অনেক খুঁত থেকে যায়। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।

অতএব প্রভুজী এই ঘটনার যে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, তারমধ্যে শুধু যে যুক্তি আছে তাই নয় সত্যও আছে। এবং সে সত্য যেমন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত, তেমনি চৈন্য-বিষয়ক সর্বপ্রাচীন সম্প্রতি আবিষ্কৃত পুঁথি 'চৈতন্য-চকড়া'র সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সুদৃঢ়।

এখন আসুন আমরা আর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় প্রবেশ করি। সে আলোচনাটি রাখব চৈতন্য চকড়ার উপরে। আলোচ্য পুঁথিটি বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস বাবাজীর লেখা মূল পুঁথি নয়। মূল থেকে প্রতিলিপি করা হয়েছিল ১৬৪৪ শকাব্দে। অর্থাৎ আজ থেকে ৩৪৩-৪৪ বৎসর পূর্বে। পুঁথিটির প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি এখন আলোচ্য বিষয় হল তাই।



।। ছয় ।।



চৈতন্য চকড়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাচীনত্ব

নবাবিষ্কৃত 'চৈতন্য চকড়া'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি এ সম্পর্কে একটি আলোচনা এই পুস্তকে রাখতে চাইছি বিভিন্ন কারণে। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস গবেষকগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই পুস্তকে লেখক যে ৫৪টি চৈতন্য-জীবনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তার অনেকগুলিই আমাদের কাছে আজো অজ্ঞাত ছিল। যে ঘটনাগুলি আমরা জানি তার আদিতে কিরূপ ছিল তা জানতে পেরেছি। উৎকলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব যে সংযুক্ত ছিলেন তার একটা আভাস পাই। চৈতন্য সমসাময়িক কালে তাঁর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী যে উৎকলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার স্পষ্ট আভাসও চকড়ায় আছে। আজ যেসব ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে আদিতে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের সময়ে তার প্রকৃত রূপ কেমন ছিল তাও জানা যায়। এতদিন যে সব কিংবদন্তী লোক মুখে মুখে চলে আসছিল চৈতন্য চকড়া থেকে তার একটা লিখিত নিদর্শন অন্ততঃ আমাদের হাতে এসেছে।

শুধু পাচ্ছি না রাজনৈতিক চক্রান্তের কথা। তবে ঘটনার বিন্যাসে তার একটা ক্ষীণ আভাস আছে। এই রাজনৈতিক চক্রান্তের কথা 'মাদলা পঞ্জীতে' অস্পষ্টভাবে এবং ইতিহাসে পাচ্ছি একমাত্র স্পষ্ট ভাবে। এর কারণ হয়ত লেখক নিজে যেহেতু বৈষ্ণব ছিলেন, তাই হয়ত খোলাখুলি স্পষ্ট করে লেখেননি, এমনও হতে পারে।

আবিষ্কারক সম্পাদক পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মা এই পুস্তকের ভুমিতে লেখক ও পুঁথির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—'প্রাপ্ত পুঁথিটির পাতাগুলি অক্ষত, অখণ্ডিত। লেখা পরিস্কার, স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ। লম্বা ১৪"। চওড়া ১½"। মোট ৫৭টি পাতা রয়েছে পুঁথিতে। পাঠোদ্ধার করে দেখলাম লেখক অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তথ্যনিষ্ঠ, সংযত, জ্ঞানী, স্বল্পভাষী, সুকবি, শব্দ চয়নে সিদ্ধহস্ত। নিজে ভাবুক। ভাবনিধি চৈতন্যের দিব্য ভাবোজ্জ্বল গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলি চিত্রকরের মত বাণীবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিকের মত সাল তারিখ তিথি নক্ষত্র স্থান কাল উল্লেখ করেছেন।"

এই উদ্ধৃতির শেষের বাক্যটি নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষকগণের কিছু বিভ্রান্তি ঘটবে। চকড়ায় যেসব শকাব্দের আর মাসের উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে এতদিন সর্বসম্মতভাবে সাল তারিখের অনৈক্য সমস্যার সম্মুখীন করবে অনিবার্যভাবে। উপরে যে সব ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বললাম তার সবগুলি যদি ধরে ধরে ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করতে চাই, তাহলে এই পুস্তকের কলেবর অস্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হবে। তাই আমি আমার প্রয়োজনমত তথ্যেরই কেবলমাত্র ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়ে বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করব। কেন না আমি চৈতন্য চকড়ার সমালোচনা করতে বসি নাই। এই পুস্তকে ইতিপূর্বে যে সব ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ দেয়েছি তার অনেকগুলি যে এই চকড়ায়ও লিখিত আছে আমার উদ্দেশ্য সে কথাই বলা।

আমার পুস্তকে ৮৩, ৮৪ পৃষ্ঠায় তুক্কা ও কৃষ্ণদেব রায়ের কথা উল্লেখ করেছি। তুক্কার অপর এক নাম জগন্মোহিনী। এই ঘটনার কথা চকড়াকারও উল্লেখ করেছেন। তবে প্রতাপরুদ্রের কন্যার নাম চকড়াকার বলেছেন অন্নপূর্ণা। কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের পুত্র বীরভদ্র যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন চকড়াকারের মতে 'শক চৌদশ অষ্টাধিক ত্রিংশ বর্ষ।' অর্থাৎ ১৪৩৮ শকাব্দে। ইংরাজী ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে। আর আমি 'মঙ্গলগিরি অনুশাসন' থেকে বলেছি ঐ সময় ছিল ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন। এই যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন বীরভদ্র। চকড়ায় আছে তার মৃত্যু হয়েছিল। ১৮ দিন পরে মহারাজ খবর পেয়েছিলেন পুত্রের মৃত্যু হয়েছে যুদ্ধে। এই সংবাদে রাজা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। রাজা এ সংবাদ পেয়েছিলেন পুরীতে থাকাকালীন। সংবাদ শুনেই সেই রাতে চলে গেলেন কটকে। প্রতিহারী এই সংবাদ গিয়ে জানাল শ্রীচৈতন্যকে। তিনি শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপরই সিদ্ধান্ত নিলেন যাবেন গৌড়ে।

এখনো লুকিয়ে আছে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন, বিজয়-নগর রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়বাড়ন্তের মূলে কারা রয়েছে। তাই কালবিলম্ব না করে সাতদিন পরে চললেন রূপ-সনাতনকে দলে টানতে। যাওয়ার পথে কটকে দেখা করে রাজাকে সান্ত্বনা দিলেন। সঙ্গে ছিলেন, রামানন্দ, কানাই খুণ্টিয়া, শিখি মহান্তী। পুরীতে সাতদিন কি পরামর্শ হচ্ছিল? কটকে অবস্থান করে প্রভু কি মহারাজকে শুধু সান্ত্বনা বাক্য ছাড়া আর কিছু পরামর্শ দেন নি?

তাহলে চকড়ার কথা মত ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দেই চৈতন্যদেব এসেছিলেন গৌড়ে। আমি কিন্তু লিখেছি ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের কথা। পৃষ্ঠা ৬৬। কোন কোন গবেষকের মতে সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে বিজয়া দশমীর দিন যাত্রা করেন গৌড়াভিমুখে। (দ্র. শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন পঞ্জী)।

সাধারণ দৃষ্টিতে আমার সঙ্গে ২ বছরের তফাৎ হচ্ছে। এই দু'বছর কমবেশীর কারণ কি ?

চকড়াকার বলেছেন ৮ মাস পরে প্রভু গৌড় থেকে ফিরে এলেন পুরীতে। তারপর সন্ধি করলেন জামাতা কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে। এই ঘটনার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাহলে ১৪৩৮ শকাব্দের পূর্বেই রাজকন্যা অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কৃষ্ণদেব রায়ের। চৈতন্যদেব গৌড় থেকে ফিরে আসতেই সন্ধি করলেন প্রতাপরুদ্রদেব রায়ের সঙ্গে। তাঁর আগে নয়। এই সন্ধি কি প্রভুর পরামর্শে রাজা করেছিলেন ? সেকথা চকড়াকার বলেন নাই। কিন্তু একথা আছে, কন্যা অন্নপূর্ণাকে পাঠিয়ে দিলেন জামাতার কাছে। তাহলে কৃষ্ণদেব রায়কে কন্যা বিয়ে দিলেও কন্যাকে তিনি পাঠান নি। হয়ত প্রকৃত ঘটনা তা নয়, অন্নপূর্ণা নিজেই যেতে চায়নি তার স্বামীর বাড়ী। কারণ, চকড়াকার এত কথা না বললেও একথা বলেছেন, চৈতন্যদেব অনেক উপদেশ দিয়ে তবেই পাঠিয়েছিলেন অন্নপূর্ণাকে তার স্বামী কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে। কি রকমের উপদেশ তার কিন্তু কোন উল্লেখ নাই।

চকড়াকার দেখছি গোড়া থেকেই সে সব ঘটনা বলছেন তার অধিকাংশই সংক্ষেপে —অনেকটা সূত্রাকারে। শুধু তাই নয় প্রতিটি শব্দ-এর মধ্যে যেন অনেক কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে। শব্দগুলি বড় ইঙ্গিতবহ।

আমার মনে হয়, বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস বাবাজী 'শ্রীচৈতন্য চকড়া' লিখে পরে আরো বিস্তৃত করে চৈতন্য বিষয়ক কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন। এটি ছিল তার 'নোট বই।' তাই ত তিনি নামও দিয়েছিলেন 'শ্রীচৈতন্য চকড়া' অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য কড়চা। এই কবির অন্য কোন বই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়েছে কি না জানা নাই। তবে আবিষ্কারক পণ্ডিতজী একথা বলেছেন, এই গ্রন্থের লিপিকার মোহান্ত ভগবান দাস গোস্বামী ওড়িয়া 'গৌরাঙ্গ ভাগবতে'র রচয়িতা। এই মন্তব্য তাঁর নিজের নয়। ময়ূরভঞ্জের সুপণ্ডিত ডঃ ফকিরমোহন দাস মহাশয়ই এই সিদ্ধান্ত করেছেন।

যাই হোক, এবার এর পরের প্রসঙ্গে আসি।

প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্যদেহে রাম, কৃষ্ণ, হরি এই তিন মূর্তি দেখেছিলেন একই অঙ্গে। তাই তিনি ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের পরিকল্পনা করেছিলেন। মন্দির নির্মাণের স্থপতি পট্টজ্যোতি মহাপাত্রকে ডেকে বললেন, যখন মন্দির নির্মাণ শেষ হবে, আমি যেখানে এই অদ্ভুত শক্তি দর্শন করলাম সেখানে সেই স্তম্ভে যেন ষড়ভুজ মূর্তি স্থাপন করা হয়।

কথা হচ্ছে প্রতাপরুদ্রদেব কি জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন ? এ বিষয়ে ইতিহাস কি বলে। মন্দিরে গীতগোবিন্দ গানের ব্যবস্থাও করেছিলেন রাজা। এ

সম্পর্কে আর অন্য কোন সাক্ষী বা প্রমাণ আছে কি ? এ সব অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন। তাহলেই প্রমাণিত হবে 'শ্রীচৈতন্য চকড়া'র প্রাচীনত্ব।

মন্দির নির্মাণের ইতিহাস সংক্ষেপে বলি। পুরীর বর্তমান মন্দিরের বয়স বেশী নয়। মন্দিরটি সম্ভবত একাদশ অথবা দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। গঙ্গা বংশীয় রাজা চোরবর্মা মন্দিরের নির্মাতা। শাস্ত্র বলে অন্য কথা। চোর গঙ্গা প্রথমে এ মন্দির নির্মাণ করেন নি ঃ

প্রসাদ পুরুষোত্তমস্য নৃপতি কোন নাম কুর্তুংক্ষম।
স্তস্যোত্যাদ্য নৃপৈরুপেক্ষিতময়ং চক্রেয় ' ঙ্গেশ্বর ঃ ॥

অর্থাৎ পুরুষোত্তমের এই মন্দির সংস্কার কার্য যা পূর্ববর্তী রাজন্যগণ উপেক্ষা করে করেন নি, গঙ্গেশ্বর সেই সংস্কার কার্যই করেছেন মাত্র। শাস্ত্রের কথা যদি নাও ধরি, তাহলেও আমরা একথা মেনে নিতে বাধ্য। মহাভারতেও নীলাচলের কথা আছে। এ ছাড়া বহু প্রাচীন শাস্ত্রেও বার বার দেখছি নীলাচলের কথা। এইসব গ্রন্থ অন্ততঃ চোরগঙ্গার সিংহাসন আরোহনের হাজার বছর পূর্বে লেখা হয়েছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে বর্তমান পুরীতে ত নীলাচল নাই। অর্থাৎ পাহাড় নেই। কিন্তু পুরীর মন্দিরটি ভূভাগ থেকে অনেক উঁচুতে নির্মিত। মন্দিরে উঠতে হলে মনে হয় যেন একটি ছোট পাহাড়ে উঠছি।

ফার্গুসন সাহেব তাই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, হয়তো পুরীই সেই দন্তপুর। (আমি কিন্তু আমার 'বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে' তথ্য প্রমাণ দিয়ে বলেছি, মেদিনীপুর জেলার দাঁতনই সেই সুপ্রাচীন দন্তপুরী,) কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের একটি দাঁত তাঁকে দাহের সময় চিতা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সেই দাঁতের উপর একটি মন্দির নির্মাণ করেন। ফার্গুসন তাঁর মতের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ নাই। শ্রীক্ষেত্রেও জাতিভেদ নাই ? ভারতবর্ষে এই একটি মাত্র স্থান যেখানে অন্ন উচ্ছিষ্ট হয় না। হীনযানী বৌদ্ধরা মূর্তি পূজার বিরোধী। তাঁরা গৌতম বুদ্ধের মূর্তি কখনো নির্মাণ করেন না। তাই জগন্নাথ দেবের মূর্তি কি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত ? বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ত্রি-রত্ন। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।' তাই পুরী মন্দিরেও পাশাপাশি তিন রত্ন—বলরাম, সুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণ। হীনযানী বৌদ্ধরা সংযমী সন্ন্যাসী। স্ত্রী দেবতা বা শক্তির পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই কি পুরী মন্দিরে রাধা পরিত্যক্ত ? শুধু ভাই বোনের অবস্থান। 'ধৃ'

1. Journal of A.S.B. Vol. LXVII, Part I (1898).

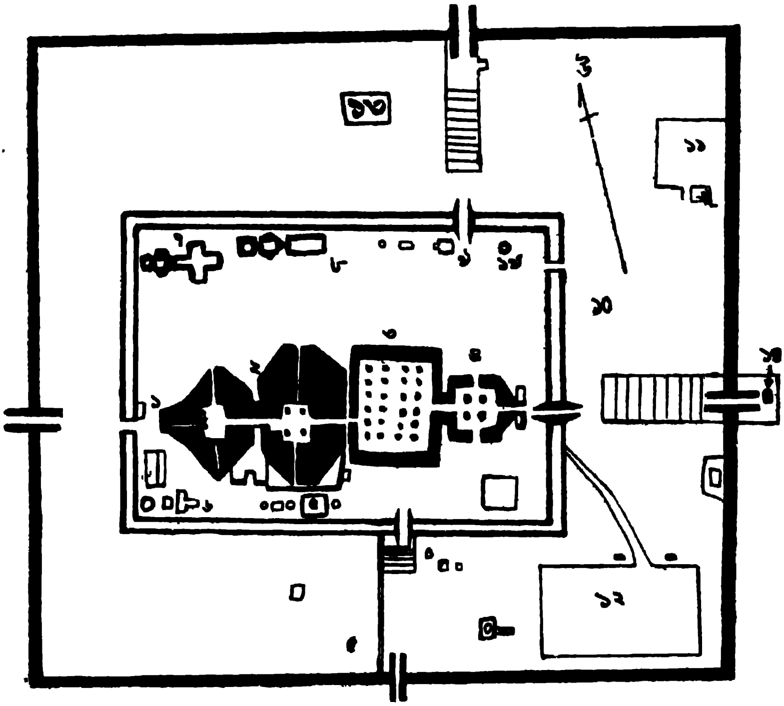
ধাতু নিষ্পন্ন, অর্থাৎ ধারণ করে বলেই বোধ হয় সংস্কৃত ধর্ম। পালিতে এই 'ধম্মে'র স্ত্রীরূপই কল্পনা করেছেন বৌদ্ধ শাস্ত্রকাররা। 'বুদ্ধ' ও 'সঙ্ঘ' পুংলিঙ্গ শব্দ। আশ্চর্য হলো, জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যস্থিত 'ধম্মে'র প্রতীক সুভদ্রা দেবীই হলেন স্ত্রীলোক। দুই পাশে রয়েছেন পুরুষ। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে হয়ত রথযাত্রারও কিছু সম্পর্ক আছে। ফা-হিয়েন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে মধ্য এশিয়ার খোটানে এক রথ-যাত্রার প্রসঙ্গে বলেছেন—"শহর থেকে তিন অথবা চার লি দূরে নগরবাসীরা একটি চার চাকার রথ নিয়ে এল। উচ্চতায় সেটি ৩০ হাত।...মূল বিগ্রহকে কেন্দ্র স্থলে বসান হল দুই বোধিসত্ত্বকে।' সিংহলে বুদ্ধদেবের শব-দন্ত-ভারতের দন্তপুরী থেকেই তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে দন্তকুমারও হেমমালা নিয়ে গিয়েছিলেন সিংহলে। এখনো শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই দন্তোৎসব রথযাত্রা করেন।

সাকার বুদ্ধ যেমন স্তূপপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই সাকার জগন্নাথের পিণ্ডবত হয়ে যাবার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। ওড়িয়া কবি মাগুনিয়া দাসের একটি উদ্ধৃতি থেকেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

'মুই বউদ্ধ রূপ হই কলি যুগরে থিবু রহি।
সুবর্ণ হাত গোড় করি গড়াহি দেহ দণ্ডধারি॥
দেখিলে সিংহাসন পরে বিজয়ে বউদ্ধ রূপরে।
পদ অঙ্গুলি নাহি হাত শ্রীদারুব্রহ্ম জগন্নাথ॥'

মন্দিরের পরিকল্পনায় কলিঙ্গ স্থাপত্য-রীতি শাস্ত্রসম্মতভাবে মেনে চলা হয়েছে। মন্দিরটি পূর্বমুখী। ৯০ ডিগ্রি দক্ষিণে হেলানো। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে নির্মিত হয়েছে মন্দিরের বিভিন্ন অংশ। যেমন, যথাক্রমে—দেউল, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগ মণ্ডপ। এই চারটি মন্দিরকে টিকিয়ে রাখতে জগমোহনে চারটি, নাট মন্দিরে ষোলটি এবং ভোগ মণ্ডপে চারটি স্তম্ভ দাঁড় করাতে হয়েছে। এই তিনটিই হলো শাস্ত্র সম্মত পীড় দেউল বা ভদ্রা-দেউল। সমস্ত মন্দির চত্তরকে বেষ্টন করে আছে প্রকাণ্ড প্রাচীর ৬৬৫´ × ৬৪০´। প্রাচীরের উচ্চতাও কুড়ি পঁচিশ ফুট। এই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনের ভিতর আবার একটি প্রাচীর। পব পৃষ্ঠায় পুরীর মন্দিরের ভূমি নকশা দেওয়া হল। নকশাটি নারায়ণ সান্যালের পরিকল্পনা অনুসারে অংকিত।

পুরীর মন্দিরের ভূমি নকশা



১। বিমান	৮। ধর্মরাজ বা সূর্যনারায়ণ
২। জগমোহন	৯। পাতলেশ্বর
৩। নাটমন্দির	১০। আনন্দবাজার
৪। ভোগ মণ্ডপ	১১। স্নানবেদী
৫। মুক্তি মণ্ডপ	১২। রন্ধনশালা
৬। বিমলা দেবীর মন্দির	১৩। বৈকুণ্ঠ (যাত্রীশালা)
৭। লক্ষ্মীদেবীর মন্দির	১৪। অরুণ স্তম্ভ
	১৫। চৈতন্য পদচিহ্ন মন্দির

মন্দিরের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বর্ণনা না দিলে আলোচনা বুঝতে অসুবিধা হতে পারে, তাই নিম্নে বর্ণনা দিচ্ছি ঃ

১। বড় দেউল। উচ্চতা প্রায় ২১৬´। রেখ দেউল। এখন প্লাস্টার খোলা হচ্ছে। মন্দিরের আদি ভাস্কর্য প্রকটিত হচ্ছে। চৈতন্যদেব ভাগবতের কাহিনীর চিত্ররূপ দেখেছিলেন, সে বর্ণনা চৈতন্য চকড়ায় আছে। সঙ্গে ছিলেন শিখি

মহান্তি। "শিখি খেনি গোরা রায় বেড়া বুলাইলে। দেবা দেবী সহ প্রভু দেউল দেখিলে।"—পৃ. ৬

এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মা বললেন, ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ মন্দিরের বিমান অংশে কৃষ্ণলীলা ধারাবাহিকভাবে অঙ্কিত করা হয়েছিল। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে কারুকার্য ও মূর্তিগুলি চুণের পলেস্তারায় চাপা দেওয়া হয়। ১৯৮০ সালে পণ্ডিতজী সরকার বাহাদুর ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই কথার সত্যতা প্রমাণ করতে বললে মন্দিরের একটি অংশের পলেস্তারা খুলে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করেন। ফলে আজ মন্দিরের পূর্বকারুকলা উন্মাটিত হচ্ছে।

২। জগমোহন—এটি পঞ্চরথ পীড়-দেউল। চারটি থাম।

৩। নাট মন্দির—পীড়-দেউল। এক রথ, প্রকাণ্ড হল ঘর ৬৮´ × ৬৮´। স্তম্ভ শোভিত দাক্ষিণাত্যের নাট মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ১৬টি থামের উপরে হলের ছাদ রক্ষিত।

৪। ভোগ মণ্ডপ—পঞ্চরথ পীড়-দেউল। হলুদে রঙের বেলে পাথরে নির্মিত। গোলা রঙ ব্যবহারের জন্য উপরের রঙ দেখাচ্ছে লালচে।

৫। মুক্তি মণ্ডপ—জগমোহনের দক্ষিণে ৩৮´ × ৩৮´ মাপের চতুষ্কোণ হলঘর। ষোলটি স্তম্ভ। এইটি প্রতাপরুদ্রদেব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্মাণ করেন। এখন এখানে পণ্ডিতেরা শাস্ত্র পাঠ করেন।

৬। বিমলা দেবীর মন্দির—ইনি তান্ত্রিক দেবী। মহাষ্টমীর দিন এখানে ছাগ বলি হয়। শ্রীক্ষেত্রে কেবল মাত্র বৎসরে একদিন এখানেই বলিদানের অনুমতি আছে।

৭। লক্ষ্মীদেবীর মন্দির—মহারাজ চোরগঙ্গের নির্মিত এই মন্দিরটি মূল মন্দিরের সমকালে স্থাপিত। এই মন্দিরের নিজস্ব চারটি অঙ্গই আছে। অর্থাৎ—দেউল, জগমোহন, নাট-মন্দির ও ভোগমণ্ডপ।

৮। ধর্মরাজ অর্থাৎ সূর্যনারায়ণ—অষ্ট ধাতুর সূর্য ও চন্দ্র মূর্তি। পুরাতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, কোনার্কের মূল বিগ্রহটি সম্ভবত পুরী মন্দিরের বিরিঞ্চিত মন্দিরে লুক্কায়িত আছে। বলা হয়েছে, মাদলা পঞ্জী মতে এইটি কোনার্কের মূল বিগ্রহ।[১]

---

১ Konark, Archaeological Survey of India (1986) – by Smt. Debala Mitra, P. 76.

৯। পাতালেশ্বর—শিব মন্দির। ধর্মরাজ মন্দিরের পূর্বদিকে, ভূগর্ভে অবস্থিত।

১০। আনন্দবাজার—এখানে জগন্নাথের প্রসাদ বিক্রয় হয়।

১১। স্নান বেদী।

১২। রন্ধনশালা—এখানে জগন্নাথদেবের ভোগ রন্ধন হয়।

১৩। ধনী যাত্রীদের বাসস্থান।

১৪। অরুণ স্তম্ভ—অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়গণ এনেছিলেন কোনার্ক থেকে। তাঁরাই এটিকে স্থাপন করেন পুরী মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে।

১৫। চৈতন্য পদচিহ্ন মন্দির—এই ছোট মন্দিরে চৈতন্য পদচিহ্ন স্থাপিত আছে।

এই হল মন্দিরের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইতিহাস কি বলে? এই মন্দিরের কোন অংশ কি প্রতাপরুদ্রদেব নির্মাণ করেছিলেন। এমন কোন প্রমাণ কি মন্দির গাত্রে লিপিবদ্ধ আছে, যা থেকে বুঝা যাবে রাজা সত্যই চকড়া কথিত মূর্তি বা গীত-গোবিন্দ গানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শিলালিপিতে প্রতাপরুদ্রদেবের একটি অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অনুশাসনটি খোদিত আছে জগন্নাথ মন্দিরের জয়বিজয় দ্বারে বাম দিকে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রণীত Antiquities of Orissa গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে (vol. 11. Appendix, Calcutta 1830, P. 165—167) আছে, তিনি ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের জগমোহনের প্রবেশ-দ্বারের দুই পাশে ক্ষোদিত শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় জয়বিজয়-দ্বারের দক্ষিণ পাশের পাঁচটি ও বাম পাশের সাতটি লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। তার মধ্যে কপিলেশ্বরদেব, পুরুষোত্তমদেব, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ও মানগোবিন্দ গোবিন্দদেব (মাদলা পঞ্জীতে আছে গোবিন্দ বিদ্যাধরদেব) কর্তৃক উৎকীর্ণ পর্যায়ক্রমে ৫, ৪, ২ ও ১টি (সর্বসমেত ১২টি) লিপির পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮-১০২।

প্রতাপরুদ্রদেবের যে লিপিটি আছে তা উৎকীর্ণ হয়েছিল, তাঁর রাজত্বের চতুর্থ অঙ্কে, শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে ১০ তারিখ বুধবারে। ইংরাজী ১৮ই জুলাই, ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। সেই শিলালিপিতে মহারাজের আদেশটি নিম্নরূপ ঃ

আকার—৩'৩" × ১'৩"। পংক্তি সংখ্যা—১০

১। বীর শ্রীগজপতি গউড়েশ্বর নবকোটী কর্ণাট কলবরগেসর বিরবর শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব।

২। মহারাজাঙ্কর সমস্ত ৪ অঙ্ক শ্রাহী ককড়া স্থ ১০ বুধবারে অবধারীত আইঙ্গা প্রমাণে বড়।

৩। ঠাকুরঙ্ক গীতগোবিন্দ ঠাকুর ভোগবেলে এ নাট হোইব। সন্ধ্যধূপ সরিলা ঠারু।

৪। বড় সিঙ্গার পরিযন্তে এ নাট হোইব। বড় ঠাকুরঙ্ক সম্পরদা কপিলেশ্বর ঠাকুরঙ্ক বন্ধা।

৫। নাচনীমান পুরুণা সম্পরদা তেলঙ্গী সম্পরদা এখানে সবিহেঁ বড় ঠাকুরঙ্ক গীতগো।

৬। বিন্দ হুঁ আনগীত ন সিখীবে। আনগীত ন গাইবে। আন নাট হোই পরমেশ্বরঙ্ক ছামুরে ন।

৭। হব এ নাট বিতরকে বইষ্ণম গাঅণ চারীজন অছান্তি এখানে গীত-গোবিন্দ গীতহি সে গাইবে

৮। এহাঙ্ক ঠারু অশিক্ষিত মানে একশ্বররে শুনী গীতগোবিন্দ গীত হিঁ সে

৯। শিখীবে আনগীত ন শিখীবে এহা

১০। জে পরীক্ষা আনগীত নাট করাইলে জানী সে জগন্নাথঙ্ক দ্রোহ করই।

বঙ্গানুবাদ—"বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি-কর্ণাট-কলবর্গেশ্বর বীরবর শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব মহারাজের চতুর্থ অঙ্ক কর্কট (শ্রাবণ) মাস, শুক্লপক্ষ ১০ তারিখ, বুধবারের আদেশ-অনুযায়ী বড়ঠাকুরের শ্রীগীতগোবিন্দ ঠাকুরভোগের সময়ে নৃত্য হইবে। সন্ধ্যাধূপের শেষ হইতে 'বড়শৃঙ্গার' পর্যন্ত এই নৃত্য হইবে। বড় ঠাকুরের সম্প্রদায়, কপিলেশ্বর ঠাকুরের নিযুক্ত নৃত্যকারিণীগণ, পুরাতন সম্প্রদায়, তৈলঙ্গী সম্প্রদায়—ইহারা সকলেই বড়ঠাকুরের গীতগোবিন্দ ছাড়া অন্য গীত শিক্ষা করিবে না, অন্য গীত গাহিবে না। অন্য নৃত্য কদাপি পরমেশ্বরের সম্মুখে হইবে না। এই নৃত্যকারিগণ ব্যতিরেকে বৈষ্ণব গায়ক চারিজন আছেন। তাঁহারা গীতগোবিন্দের গীত গাহিবেন। ইঁহাদের নিকট হইতে অশিক্ষিতগণ একস্বরে শুনিয়া গীতগোবিন্দের গীতই শিখিবে, অন্য গীত শিখিবে না। যে 'পড়িছা' (মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী) ইহা জানিয়া অন্য গীত নৃত্য করাইবেন, তিনি শ্রীজগন্নাথের দ্রোহ করিবেন।"

এই শিলালিপি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে গীতগোবিন্দ গীতের আদেশ মহারাজ দিয়েছিলেন। চকড়াতেও সে কথার উল্লেখ আছে। পট্টজ্যোতি মহাপাত্রকে বলেছিলেন রাজা—'ভোগমণ্ডপরে মুরতি হোইব স্থাপিত॥" এই ভোগমণ্ডপ প্রতাপ-রুদ্রদেব নির্মাণ করেছিলেন, ইতিহাসেও সে প্রমাণ পেয়েছি। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্মাণের কথা। শিলালিপিতে দেখছি ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। চকড়াতে কোন তারিখের উল্লেখ নাই। ইতিহাসে দেখছি প্রতাপরুদ্রদেব উৎকলে রাজত্ব করেছেন ১৪৯৭ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। শিলালিপি বলছে ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল আদেশটি। তাহলে ৪র্থ বর্ষ হয় না। হয় রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষ। এখানে ১ বছরের হেরফের এমন কিছু মারাত্মক নয়। সমস্যা হলো অন্য জায়গায়। চৈতন্যদেব পুরীতে গিয়ে হাজির হন ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে। তাহলে ১০।১১ বছর পূর্বে রাজা গীতগোবিন্দ গানের নির্দেশ দিয়েছেন। তা যদি হয়, বৈষ্ণব চারজন গায়কের কথা উল্লেখ করেছেন কেন? এর একমাত্র উত্তর হতে পারে উৎকলে আগে থেকেই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত ছিল, তাই বলেছেন বৈষ্ণবদের কথা। রামানন্দ ছিলেন গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ রসজ্ঞ। চকড়ায় অবশ্য একথা লেখা আছে, রাজা বলছেন—"গীতগোবিন্দ আজ্ঞা কি শ্রীমুখে কাটাই॥" অর্থাৎ 'আমি পূর্বেই ঘোষণা করেছি যে মন্দিরে কেবল গীতগোবিন্দ পাঠ হবে। সে আজ্ঞা ত পরিবর্তন করা যাবে না।' এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে চৈতন্যদেবের আগমনের পূর্বেই রাজা তাঁর এ আদেশ প্রচার করেছিলেন। অতএব চকড়াকারের সঙ্গে ইতিহাসের কোন অমিল দেখছি না। এর থেকে আর একবার প্রমাণিত হলো চকড়া ঐতিহাসিক দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রাচীনতার দাবী সে করতে পারে।

একটি বিষয়ে সন্দেহ জাগে, তাহলে ভাষা। শিলালিপির যে ভাষার নমুনা দিয়েছি, চকড়ার ভাষা যেন তত পুরাতন মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত মার্জিত। এ বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনারও প্রয়োজন আছে। তবে সে আলোচনা এই প্রসঙ্গে না করাই ভাল। আমি শুধু গবেষকগণেব কাছে আমার সন্দেহের কথা উল্লেখ করেই নিরস্ত হতে চাই।

এবার অতিবড়ী জগন্নাথ দাসের সম্পর্কে আলোচনায় আসছি। প্রভুজীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব নাকি জগন্নাথ দাসকে অতিবড় আখ্যা দিয়েছিলেন। একথা কিন্তু বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন এমন কথা মহাপ্রভু কখনই বলতে পারেন না। তাহলে একথা কে বলেছেন? না, জগন্নাথ দাসের সম্প্রদায়ের ভক্তরাই এই উপাধি নিজে নিজেরাই গ্রহণ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেছেন।

এ বিষয়ে দিবাকর দাসের 'জগন্নাথচরিতামৃতে' একটি কাহিনী আছে। একদিন নাকি শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ দাসকে তাঁর পূর্ব জন্মের বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন। জগন্নাথ তার উত্তরে বলেন—'প্রভু আপনি ত অন্তর্যামী। জানেন সকল কথাই। তবুও আমি

বলছি। একদিন আম রাধাকৃষ্ণের ধ্যান করছিলাম। তখন আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম আমার প্রাপঞ্চিক অস্তিত্ব। সহসা অনুভব করলাম, রাধাকৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি চেয়ে রয়েছেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে। আনন্দ রসে দু'জনেই মগ্ন। হেসে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই হাসি থেকেই হল আপনার আবির্ভাব। তারপরে শ্রীরাধাও উঠলেন হেসে। সেই রাধারানীর হাস্য থেকেই জন্ম হলো আমার।

এত কথা শুনে চৈতন্যদেব বললেন—'এত বড় রহস্য কথা। জগন্নাথ! তুমি স্বয়ং শ্রীরাধার অংশ।' এই কথা বলে মহাপ্রভু তাঁর গায়ের উত্তরীয় বেঁধে দিলেন জগন্নাথ দাসের মাথায়। তারপর বললেন—'তুমি এত বড় কথা বললে, আজ থেকে খ্যাত হবে অতি বড় নামে।'' এই প্রসঙ্গে দিবাকর দাস আরো লিখেছেন, চৈতন্যদেব জগন্নাথকে এত উচ্চ সম্মান দেওয়ার জন্য গোড়ীয় ভক্তদের মনে জেগেছিল ঈর্ষা। তাঁরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন।

পূর্বেই বলেছি গোড়ীয় কোন বৈষ্ণব কবি চৈতন্য জীবনীতে অতিবড়ী জগন্নাথ দাসের নামও পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। জগন্নাথ দাসের সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষ্ণবদের একটা বিরোধ চলে আসছে আজো পর্যন্ত। আজ আর তাতে রাজনীতির গন্ধ নাই। বর্তমানের যে বিরোধ, তা হলো পরস্পরের দর্শনের মতবিরোধ। এই বিরোধ যে দু'জন মহাপুরুষের সমকালেই মিটে গিয়েছিল, সে কথা কিন্তু বৈষ্ণব প্রাচীন কবি গোবিন্দ দাস বাবাজী বলেছেন।

চৈতন্য চকড়ায় অতিবড় শাখা কেমন করে স্থাপন হলো সে কাহিনী আছে। জগন্নাথ দাস ছিলেন পট্টমহিষীর শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু। জগন্নাথদেবের চরণের সেবক। বৈষ্ণব জগন্নাথ, গোস্বামী ব্রাহ্মণ। চৈতন্যদেবের সঙ্গে আকুল চিত্তে প্রতিদিন মন্দিরে এসে জগন্নাথ দর্শন করেন। তারপব ফিরে যান সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে।

রাধাষ্টমী জগন্নাথের জন্মদিন। মন্দিরকে বেষ্টন করে বেড়া সংকীর্তন করে মনে মনে ভাবলেন, চৈতন্য প্রভুকে আজ আমার জন্মদিনে প্রণাম করে যাই। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, গৌরাঙ্গ সুন্দর দাঁড়িয়ে আছেন নিশ্চল হয়ে গরুড় স্তম্ভের পিছনে। জগন্নাথ দাস গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে। ভাবাবেশে শ্রীমূর্তি দর্শন করছেন প্রভু। দেখে মনে হল প্রভুর হৃদয় আবেগে উদ্বেল। প্রভু অর্চনা ও ধ্যান করতে করতে কেমন যেন হয়ে পড়ছেন বিষাদাচ্ছন্ন। কৃষ্ণমন্ত্রে ধ্যান করছেন জগন্নাথদেবকে। ধ্যান শেষে মনে মনে প্রভু স্নিগ্ধ বকুল ফুলের মালা গেঁথে তাতে

---

১ আপণ শ্রীঅঙ্গ পাছোড়ি।
কশা বসন অঙ্গু কাডি॥
দাসঙ্ক শিরে বান্ধি দেলে।
'অতিবড়' বোলি বোইলে॥
অতি বড় কথা কহিলে।
তেনু অতি বড় হোইলে॥
—জগন্নাথচরিতামৃত। তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থি দিয়ে সমর্পণ করলেন ইষ্টদেবকে। কিন্তু দেখলেন মালাতে গ্রন্থি থাকার জন্য, কিছুতেই পরানো যাচ্ছে না জগন্নাথের মাথায় মালা। তাই সন্তপ্ত হয়ে উঠেছে চৈতন্যদেবের হৃদয়। হয়ে উঠছে উদ্বেল আবেগে। চোখে ঝরছে অশ্রু ধারা। থরথর করে কাঁপছে সর্ব অঙ্গ।

প্রভুর ভাব দেখে ভাগবতী জগন্নাথদাস বললেন বিনীতভাবে—'হে মহাভাগ, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করুন। নিয়ম আছে জগন্নাথের মালার গ্রন্থি দিতে নাই। কেন না, প্রভু ত কোন বাঁধনেই আবদ্ধ নন। তাই গ্রন্থি থাকার জন্যই প্রভু ভুবন সুন্দর আপনার মালাখানি পরছেন না। অর্থাৎ প্রভু আপনি পারছেন না পরাতে। প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন। মালাটি গ্রন্থি মুক্ত করে পরিয়ে দেন প্রভুর দুই হাতে। আতুরের ব্যাথার মধ্য দিয়েই এই গ্রন্থি বিরহিত মালার চরিত হল প্রকটিত। তখন ঃ

উত্তরীয় করি প্রভু দাসঙ্ক শিররে।
বান্ধি শাড়ি অতি বড়ি নাম দেলে শাখা বিচাররে ॥
অতি বড়...তুহঁ ভাগবত প্রাণ।
অনেক দিনব আশা করিলু পূরণ ॥ —চৈ. চকড়া, পৃ. ৫৩

তখন প্রভু আপনার উত্তরীয়টি খুলে বেঁধে দিলেন জগন্নাথের মাথায়। তারপর বললেন, আজ থেকে তুমি 'অতি বড়'। তোমার বৈষ্ণব শাখা 'অতি বড়' বৈষ্ণব শাখা বলে খ্যাত হবে। উদার ভাগবত প্রাণ তুমি। আজ আমার অনেক দিনের আশা পূর্ণ হল।' এই কথা বলে ঃ

শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ কোলাকুলি হই।
উদ্দণ্ড নৃত্য করিলে জগন্নাথে চাহি ॥
শাড়ি কণ্ঠি দেলে চৈতন্য ঠাকুর।
আরাম্ভিল বড়োৎকল মহন্ত বিচার ॥

শ্রীচৈতন্য ও জগন্নাথ পরস্পর দুজনে হলেন আলিঙ্গনে আবদ্ধ। তারপর জগন্নাথের দিকে চেয়ে দুজনে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন। জগন্নাথকে পরিয়ে দিলেন। 'শাড়ি কণ্ঠি'। সম্পাদক এর বাংলা অর্থ করেছেন—'প্রভু নিজের গলার চাদর জগন্নাথকে পরিয়ে দিলেন।' কিন্তু প্রভু এর আগেই ত তাঁর উত্তরীয় খুলে বেঁধে দিয়েছেন। তিনি ত একটির বেশী দুটি উত্তরীয় এক সঙ্গে ব্যবহার করতেন না। তাহলে আবার গলার চাদর পাবেন কোথা থেকে। আমার মনে হয়, এই অংশের বাংলা অর্থ হওয়া উচিত—'প্রভু তাঁকে শাড়ি ও তুলসীর মালা দিলেন পরিয়ে।'

আজো এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ মাথায় প্রভুর দেওয়া শাড়ির প্রতীক চিহ্ন স্বরূপ

ছোট শাড়ি বেঁধে রাখেন। কারণ, এঁরা নিজেদের রাধা ভাবে ভজনা করে শ্রীরাধিকার।

এর পরই 'অতিবড় গোসাই'রে হুইলে প্রকাশ॥' অর্থাৎ স্বীকৃতি পেল বড় ওড়িয়া মহান্তরা।

মত্ত বলরাম ছিল শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত। কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপাতেই পরিচিত হলেন জগন্নাথ দাস গোস্বামী রূপে। 'শ্রীচৈতন্য গুরু পরম্পরা খ্যাত হলো।' অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকেই এঁদের গুরু পরম্পরা আরম্ভ হ'ল। সকলে আনন্দিত হলেন অতিবড় বৈষ্ণব শাখা প্রবর্তনের সংবাদ শুনে। এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি রাজার কাছে করণ ব্যক্ত করল। সব বৈষ্ণব 'জয় জয়' ধ্বনি করলেন। দুই মহাপুরুষের মধুর মিলন উপলক্ষ্যে নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠিত হল। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির স্মৃতি রক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন ভগবানের পবিত্র বস্ত্র। পরমানন্দ মহাপাত্র ঐ বস্ত্র নিয়ে এলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে। সম্মুখে বস্ত্রটি রেখে প্রণাম করলেন প্রভুকে।

কবি দিবাকর দাসের শেষ উক্তিটিও সত্য বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন—চৈতন্যদেব জগন্নাথদাসকে এত উচ্চপদ বা স্থান দিয়েছিলেন বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রভুর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ কথা যে সত্য তার প্রমাণ মেলে এই 'শ্রীচৈতন্য চকড়াতে'ও। ভাগবতী জগন্নাথদাসের রাধা তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে চৈতন্যদেব তাঁকে যখন অত্যন্ত ভালবাসতে আরম্ভ করলেন তখন ঃ

কতক পার্শ্বর এহা সহি ন পারন্তি।
উড়িয়া ব্রাহ্মণে প্রভু পিরতি করন্তি॥

কিছু পার্ষদ এই ঘটনাকে সহ্য করতে পারলো না। উৎকলবাসী এই ব্রাহ্মণের প্রীতি তাদের কাছে হয়ে উঠলো অসহনীয়। তখন ঃ

চৈতন্য কহিলে এ যে ক্ষেত্র দ্বিজবর।
ভাগবতী জগন্নাথ প্রিয়তম নর॥

'চৈতন্য বললেন, ক্ষেত্রবাসী এই ব্রাহ্মণ পরম ভাগবতী। জগন্নাথের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি।' রাধাভাবের জন্য যেমন রায় রামানন্দ আমার অতি প্রিয়, তেমনি জগন্নাথ দাস ভাগবতী ক্ষেত্রের অলঙ্কার স্বরূপ। দেখ আমার কাছে তার নিত্য দাস ভাব। সে আমাকে তার 'ইষ্ট' বলে মনে করে। নিত্য ভাগবত পাঠ করে কল্প বৃক্ষের নীচে। অতএব তাকে তোমরা দণ্ডবত কর।

এসব কথা কি প্রমাণ করে না প্রভুজীর কথিত তথ্যকে। চৈতন্যদেবের বুদ্ধির

তিনি প্রশংসা করেছিলেন। জগন্নাথ দাসকে স্বীকৃতি দিয়ে, তাকে বড় পদ দিয়ে তিনি হয়ত সত্য সত্যই চেয়েছিলেন কৌশলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এড়াতে। হয়ত শেষ পর্যন্ত তার সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। এত করেও তিনি গোবিন্দ বিদ্যাধর চক্রের হাতে অনিবার্য ভাবে শিকার হয়েছিলেন। প্রভুজীর বিচার বিশ্লেষণ ইতিহাস সম্মত ভাবে হলেও এখনো আমার হাতে স্পষ্ট লিখিত কোন প্রমাণ আসেনি বা আমি তা আবিষ্কার করতে পারিনি। সে ত আমরাই অক্ষমতা। তবে অনুসন্ধান আমার চলবে। আমি খুঁজব কোথায় কি ভাবে লুকিয়ে আছে প্রভুজী কথিত সত্যের গোপন পুঁথিপত্র।

প্রভুজীর কথাকে আমি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারিনি। কেন না তিনি যে সব কথা বলেছিলেন ইতিহাস এবং পুঁথিতে তাঁর কথার সত্যতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। তাই এসেছে তাঁর প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস।

জগন্নাথ দাস সম্পর্কে আর একটু কথা বলতে চাই। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ 'নিউ ওড়িষা' পত্রিকায় (ইংরেজী দৈনিক পত্র) 'অতিবড়ী জগন্নাথ দাস' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তি মহাশয়। তখন ত আর 'শ্রীচৈতন্য চকড়া' আবিষ্কৃত হয় নাই। তাতে তিনি লিখেছিলেন—'Mahapurush Jagannath Das was a Personal friend of Chaitanya.'

মহাপুরুষ জগন্নাথ দাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং পার্ষদ। এমন যে জগন্নাথ তাঁর কথা কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবি বা মহাত্মা কোন চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি। জগন্নাথ দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪১২ শকাব্দে বা ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্রমাস রাধাষ্টমীর দিন। তাঁর বাবার নাম ছিল ভগবান দাস। মায়ের নাম পদ্মাবতী। ভগবান দাস ছিলেন কৌশিক গোত্রীয় 'দাস' উপাধিধারী ব্রাহ্মণ।

যাই হোক, অধ্যাপক মহান্তি মহাশয়ের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর উড়িষ্যার বৈষ্ণব সমাজে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। সেদিন যদি এই চকড়া আবিষ্কৃত হত তাহলে প্রমাণিত হত মহান্তি মহাশয় যা বলেছিলেন, তাঁর অনেক কথাই সত্য। রাজনৈতিক দিক থেকে তৎকালে জগন্নাথ দাস যে গোবিন্দ বিদ্যাধরের পক্ষের লোক ছিলেন এবং সে জন্যই হয়ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। এছাড়া দর্শনের দিক থেকেও দুজনের মতপার্থক্য ত ছিলই। আর একটি গুরুতর গুজব শুনেছি শ্রীক্ষেত্রে, প্রতাপরুদ্রদেবের কোন মহিষীর সঙ্গে নাকি গোবিন্দ বিদ্যাধরের গোপন প্রেম ছিল। এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করি।

চৈতন্য চকড়াতে অসামঞ্জস্য যা চোখে পড়েছে তাহলো সাল তারিখ নিয়ে। সেটাই

সব থেকে বড় সমস্যা। সে সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে এ প্রসঙ্গের শেষ করতে চাই।

চকড়াতে উড়িষ্যার তৎকালীন ইতিহাসের বিশেষ ছায়াপাত উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য-জীবনের অনেক অজ্ঞাত ঘটনা আমরা জানতে পারব, আবার অনেক ঘটনার ফাঁক পূরণও করা যাবে। পরবর্তী যুগে বিকৃত তথ্যের প্রকৃত সত্যও নিরূপিত হবে। কিন্তু বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন মূল ঘটনার সময় ও তারিখ নিয়ে। অর্থাৎ এ পর্যন্ত স্বীকৃত সময়ের সঙ্গে গ্রন্থকার প্রদত্ত সময়ের সামঞ্জস্য হচ্ছে না। অথচ গ্রন্থকার বলছেন, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী।

প্রথম শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীক্ষেত্রে আগমন সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলছেন :

শক বর্ষ চৌদশ একত্রিশ শুভ।
ভাদ্র শুক্ল নবমী দিবসান্ত ঠাব॥
ন্যাসী গোরা রায় আসি ক্ষেত্রে প্রবেশিলে।
কৃষ্ণনাম প্রেমভাবে ভাসাইয়া দেলে॥ —চৈ চ.তকা

এই অংশের সম্পাদক অনুবাদ করেছেন—'শকাব্দ চৌদ্দশ একত্রিশ ভাদ্রমাসের শুক্ল নবমীর দিনে, সন্ন্যাসী গোরা রায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, কৃষ্ণ নাম প্রেম প্রবাহে ভাসিয়ে দিলেন।'

গ্রন্থকারের মতে ১৪৩১ শকাব্দ ভাদ্র মাসে চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করেন। জন্ম ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥ চৈ. চ. মধ্য. ৩য়. পরি.

তাহলে জন্ম যদি ১৪০৭ শকাব্দে হয় ইংরেজী হবে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। তাহলে শ্রীচৈতন্যের বয়স ২৪ বছর পূর্ণ হবে ১৪৩১ শকাব্দে। খ্রীষ্টাব্দ হবে ১৫১০। ২৬ বা ২৭শে মাঘ তিনি সংসার ত্যাগ করেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন ২৯ মাঘ। তারপর ফাল্গুন মাসের সম্ভবত মাঝামাঝি যাত্রা করেন নীলাচল। চকড়াকার বলছেন, প্রভু শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে পেঁছান ভাদ্র মাসে শুক্লা নবমী তিথিতে। তাহলে চৈতন্যের নীলাচলে পেঁছতে কি ৫।৬ মাস সময় লেগেছিল ? আর সেটাও কি ১৪৩১ শকাব্দ হবে ? ঠিক বুঝতে পারলাম না এই কথার তাৎপর্য। কোথায় যেন গণ্ডগোল হচ্ছে বলে মনে হয়।

অন্তর্ধান সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে লীলা অবসান ॥ —চৈ. চ আদি,
১১ পরি, (বসুমতী সং)

চড়কায় অন্তর্ধান সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

চতুর্দ্দশ ষষ্ঠাধিক পঞ্চশত শকে।
অপূর্ব লীলা ঘটিলা প্রত্যক্ষে ॥
শুক্ল সপ্তমী তিথি যে অবশ কইলা। —চৈ চকড়া, পৃ ৫৯

অর্থাৎ ১৪৫৬ শকের শুক্ল সপ্তমী তিথিতে তিনি অন্তর্ধান করেন। এ সম্পর্কে এক বছরের কম বেশী নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামানই ভাল এই জন্য যে, অন্তর্ধান সম্পর্কে এ পর্যন্ত নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তবে জয়ানন্দও ১৪৫৫ শকাব্দের কথাই বলেছেন। আষাঢ় মাসের কথায় লোচন, জয়ানন্দ, গোবিন্দদাস বাবাজী একমত।

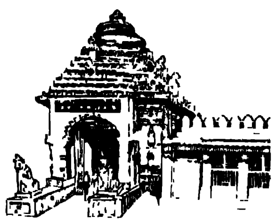
গৌড় যাত্রার শকাব্দের অসামঞ্জস্যের কথাও ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অন্যান্য তারিখ, শকাব্দ ও তিথি সম্পর্কে নানা অনৈক্য বিশেষ ভাবিয়ে তুলে। উড়িষ্যাতে প্রচলিত গণনা বিলায়তি সৌরমানে ব্যবহৃত হলেও রবির (রাশ্যান্তর) সঞ্চারের পূর্বদিনে মাস সমাপ্ত হয়। শকাব্দ সাল প্রভৃতি কতকগুলি সাল গণিত হয় সৌরমাণে। ঐ সৌর বৎসরের পরিমাণ ৩৬৫।১৫।৩১।২৪ অনুপল। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে শকাব্দ ও বঙ্গাব্দ পরিবর্তিত হয়। অতএব গোবিন্দ দাস বাবাজী তাঁর চকড়ায় যে শকাব্দের কথা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে বিলায়তি সৌরমানের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। শকাব্দ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই গণনা করা হয় একই নিয়মে। অর্থাৎ সৌরমানে।

আমরা মনে হয়, লিপিকার ভগবান দাস গোস্বামী মোহান্ত মূল পুঁথি থেকে নকল করার সময় হয়ত কিছু রদবদল করেছেন, না হয় যে পুঁথি থেকে তিনি নকল করেছিলেন, তা জীর্ণ ও অস্পষ্ট হওয়ার জন্য সঠিক পাঠ উদ্ধার করতে না পেরে নিজের অনুমান সাপেক্ষে যা সঠিক বলে মনে করেছেন তাই লিখেছেন। এই সন্দেহের কারণ হল, পদের শেষে যতিপাত সর্বত্র ঠিক ঠিক বসান হয় নি। আমি ১ (।) দাঁড়ি ২ (।।) দাঁড়ির কথা বলছি। মূল গ্রন্থের ভাষাতেও লিপিকার কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করেছেন বলে মনে হয়। পুঁথিতে যে সংখ্যাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তাহলো ব্রাহ্মণী সংখ্যা।

ওড়িয়া হরফের ক্রম বিবর্তন বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে পুঁথিটি সত্যই

প্রাচীন কিনা। মূল পুঁথি থেকে প্রতিলিপি করা হয়েছে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ দু'শত বছরও এখন হয়নি। ইতিপূর্বে আমি সম্পাদকের অনুবাদ দেখে আবার বলেছি ৩৩৪ বছর পূর্বে বলে। মূল, পুঁথির হরফ বা অক্ষর কেমন ছিল তা আজ আর পরীক্ষা করার উপায় নাই। কারণ মূল পুঁথিটি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। বর্তমান পুঁথির অক্ষর দেখে একথা বলা যায় ওড়িয়া হরফগুলি অধচীন নয়। তিনশত বছর পূর্বেও ওড়িয়া হরফ পুঁথির অক্ষরের মতই ছিল।

এই সব নানা দিক থেকে বিচার করে একথা বলা যায় পুঁথিটির আবিষ্কার এই বিংশ শতাব্দীতে চৈতন্য-জীবনের উপরে এক নতুন আলোকপাত করেছে। তৎকালের বিশ্বাস অনুযায়ী অলৌকিকতার প্রবেশ ঘটলেও সম্পূর্ণ ইতিহাস বিকৃত হয়নি। ভাষা সাড়ে চার শত বছরের পুরাণো ওড়িয়া না হলেও 'শ্রীচৈতন্য চকড়া' প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে। সে দাবী উপেক্ষণীয় নয়।



॥ সাত ॥



নিত্যানন্দ নাকি চৈতন্যদেবকে দাহ করেছিলেন

এমন একটি লিখিত ও মুদ্রিত কাহিনী আমার হাতে এসেছে। এই কাহিনীটি মহামুনি ভাগুরির উক্তি। মহামুনি ভাগুরির অদ্ভুত ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগত-কৃতার্থ থেকে বটসাঞ্জিলীলা, রামায়ণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা, গোলকলীলা, পাণ্ডবলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, কলি, মহাকলি, ঘোরকলি, জগন্নাথলীলা এই সকল একত্র করে শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রভাস খণ্ড' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। প্রকাশক, অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০ গরাণহাটা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

এই গ্রন্থ থেকে কাহিনীটি অবিকল উদ্ধৃত করছি পাঠকদের অবগতির জন্যে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা সম্বরণ কথন

হেথা লীলা অন্তকরি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
বসিলেন নিম্বতলে জীবে ত্রাণ জন্য ॥
সঙ্গেতে অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ ছিল।
প্রভু অন্তকাল জানি ঘিরিয়া বসিল ॥
মহাপ্রভু কন শুন পারিষদ গণ।
আমার অন্তিম কাল হইল এখন ॥
আর দেহভার নাহি করিব বহন।
দেহ রাখি যাব আমি বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
বিলম্ব না কর শুন আমার বচন।
নিম্বতলে শয্যা কর আমার কারণ ॥
দেহত্যাগ কালে তাহে করিব শয়ন।
নিম্ব সেবি জুড়াইব তাপিত জীবন ॥
শয্যার শিয়রে রাখ তুলসী-মঞ্জুরী।
আমাকে করাও স্নান আনি গঙ্গাবারি ॥
অঙ্গের দুকূলে কর তিলক শোভন।

কর্ণমূলে হরিনাম করাও শ্রবণ ॥
এই কথা বলি প্রভু দেব নারায়ণ।
নিম্বতলে শয্যাপরে করিল শয়ন ॥
প্রভুর সে দশা হেরি নিত্যানন্দ কান্দে।
কহেন আপন দুঃখ হরিপদ বৃন্দে ॥
যোড় করে বলে প্রভু করি নিবেদন।
আমার কি গতি হবে ওহে নারায়ণ ॥
তুমি জগতেব পতি জগতের নাথ।
আজ্ঞা কর কিসে হবে আমার সাক্ষাত ॥
যুগে যুগে আমি দাস তোমার চরণে।
কোথা যাও ওহে প্রভু ছাড়িয়ে এক্ষণে ॥
ত্রেতা যুগে হৈলে যবে রাম অবতার।
লক্ষ্মণ হইয়া সেবা করিনু অপার ॥
কৃষ্ণরূপ দ্বাপরেতে করিলে ধারণ।
বলরাম হয়ে সেবি গিয়ে বৃন্দাবন ॥
কলির প্রথমে এই তব অবতার।
হইয়া নিতাই পদ সেবি অনিবার ॥
যুগে যুগে আমি তব চরণের দাস।
এবে কোথা কর গতি ছাড়ি নিজ দাস ॥
অদ্বৈতাদি পারিষদ সকলেতে কান্দে।
ধূলায় ধূসর তব পদ মাত্র বন্দে ॥
জীবের নিস্তার করি তুমি নারায়ণ।
স্বধাম বৈকুণ্ঠপুরে চলিলে এখন ॥
সঙ্গে করি লও সবে করি কৃপাদান।
পদসেবা করি মোরা গিয়ে তব স্থান ॥
নিতাইরের কাতরতা দেখি নারায়ণ।
কহিলেন ধীরে ধীরে এই সে বচন ॥
নিতাই প্রাণের ভাই তোরে কি ছাড়িব।
তোর লাগি ধরাধামে আমি যে রহিব ॥
হরিমূর্তি স্থাপিয়াছে ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়।

জগন্নাথ বলরাম অতি দিব্য কায় ॥
আমি জগন্নাথে রব তুমি বলরামে ।
দর্শনে তরিবে যত জীব নরাধমে ॥
রথোপরে যে করিবে সে রূপ দর্শন ।
পুনর্জন্ম আর তার না হবে গ্রহণ ॥
বাজারে প্রসাদ অন্ন যে হবে বিক্রয় ।
একত্রেতে খাবে বসি যত বর্ণচয় ॥
জাতিভেদ না থাকিবে প্রসাদ প্রভাবে ।
মুচিতে প্রসাদ দিলে ব্রাহ্মণ খাইবে ॥
সবে মাত্র না চলিবে যবনের গণ ।
জগন্নাথ ক্ষেত্রে হয় যবন বারণ ॥
কণ্ঠধারী মাত্র ভেদ ক্ষেত্রে না রহিবে ।
কুকুরে উচ্ছিষ্ট কৈলে তাহাও ভুঞ্জিবে ॥
এত বলি নিতাইয়ের কোলে শ্রীগৌরাঙ্গ ।
রাখিলেন মোক্ষ মূর্তি আপন শ্রীগৌরাঙ্গ ॥
সহচরগণ মিলি আর নিত্যানন্দ ।
সমুদ্রের তীরে কৈল চিতার প্রবন্ধ ॥
বহু মলয়জ কাষ্ঠ করি আহরণ ।
করিল উত্তমরূপে চিতার সাজন ॥
নিত্যানন্দ করিলেন প্রভু অগ্নিকার্য ।
দহিতে লাগিল দেহ ঘোর অগ্নিবীর্য ॥
অর্দ্ধদেহ অগ্নিকার্যে করিল দাহন ।
না হয় দাহন আর হেরিয়া তখন ॥
জলে ভাসাইয়া দিল মিলি সর্বজন ।
বর্তিল সে জগন্নাথে প্রভু সনাতন ॥
অধমে আশ্বাস মাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ ।
লিখিয়া ভাষায় গ্রন্থ করিল চয়ন ॥

—প্রভাস খণ্ড । পৃষ্ঠা ২২৮-২২৯ ।

জানি না এই ভাগুরি মুনির প্রকৃত পরিচয় । তিনি কতদিন আগে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন । আমার 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' পড়ে জনৈক পাঠক বাড়ীতে

এসে বলেন, আপনি অযথা কেন এত পরিশ্রম করছেন। মহাপ্রভু ত নিত্যানন্দের কোলেই মৃত্যু বরণ করেছিলেন আর অবধূত নিত্যানন্দই তাঁকে দাহ করেছিলেন। একথা স্বয়ং মহামুনি ভাগুরি বলেছেন।'

একথা বলেই তিনি নাম করলেন প্রভাসখণ্ডের। খোঁজ করে সত্যসত্যই প্রভাস খণ্ডেই পেলাম এই কাহিনী। প্রবীণেরা অনেকেই এ কাহিনীকে সত্য বলে মনে করেন। বুঝলাম, শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে কালে কালে তাহলে এমন কাহিনীও পল্লবিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে মুদ্রিত পুস্তকাকারে। এ কাহিনীর সত্যাসত্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে চাই না। শুধু এইটুকু আমার বক্তব্য, শ্রীচৈতন্যদেব যাই হোন, তিনি ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তায় বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের দাহ করার প্রথা কি আছে ? আমার জানা নাই।

সম্প্রতি একটি পত্র পেয়েছি বিষ্ণুপুর থেকে। লেখক মাননীয় ব্রজকিশোর রাউৎরায়। তাঁর বাড়ী উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর থেকে ৪০ মাইল দূরে পর্বতবেষ্টিত দুর্গম স্থানে। গ্রামের নাম পিণ্ডামুল। এই পিণ্ডামুল গ্রামে প্রায় ত্রিশ ঘর বৈষ্ণব বাস করেন। ব্রজকিশোর বাবু লিখেছেন—"তারা নিজেকে চৈতন্য সম্প্রদায় ভুক্ত বলে। কিন্তু সমাধির পরিবর্তে শবদাহ করে।" আমি যতদূর জানি বংশানুক্রমে বৈষ্ণবগণ শবদাহ করেন না।

ব্রজকিশোর বাবু আর একটি পত্রে জানিয়েছেন, মুকুন্দ দাসের, 'মঙ্গল রসকরিকা' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"এই মতে নিত্য লীলা করে গোরা রায়।
আটচল্লিশ বয়েসে কৈল, অন্তর্ধান।
গোপীনাথ মন্দিরে গেলা ঈশ্বর দেখিতে।
তথি অন্তর্ধান কৈল নিজ অংগ সহিতে॥

মুকুন্দ দাস নামে কোন সহজিয়া সাধক বা পদকর্তা ছিলেন কিনা আমার জানা নাই। তাই এ সম্পর্কে কোন বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারলাম না। ব্রজকিশোর বাবু কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন সে সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আমায় কিছু জানান নাই। যাই হোক, এই চারটি চরণ থেকে এ কথা জানা যাচ্ছে গোপীনাথের মন্দিরেই প্রভুর অন্তিম লীলা শেষ হয়েছিল।

॥ আট ॥



উপসংহার

পূর্ববর্তী সংস্করণ দুটিতে কোন উপসংহার লিখি নাই। লেখকের শেষ কথা অনেকেই জানতে চান এবং সেই দাবী জানিয়ে অনেক পত্রও দিয়েছেন। শেষ কথা কি সহজে বলা যায়। আমাকে শেষ কথা বলতে হলে উপযুক্ত নথি-পত্র, তথ্য-প্রমাণ দিয়েই বলতে হবে। তা যতক্ষণ না আমার হাতে আসছে কিংবা আবিষ্কার না করতে পারছি, ততক্ষণ শেষ কথা বলি কেমন করে। তাই, শেষ যে কথা বলা যায় না কিছুতেই।

পুঁথিপত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সব কাহিনী পেয়েছি, সেই সব কাহিনীগুলিকে সংগ্রহ করে ব্যক্ত করেছি। কোন ঘটনাকেই সামান্য বলে মনে করি নাই। যখন যে ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছি তার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি খাড়া করে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছি এবং বলেছি কি হতে পারে চিন্তা করে দেখুন। কিন্তু কোন বিষয়েই চূড়ান্ত রায় দিতে পারি নি।

তবে চূড়ান্ত রায় একটা আমি দিতে চাই। সেই জন্যই ত এত বছর প্রাণপণে চেষ্টা করছি। হাতে এমন কোন প্রাচীন প্রমাণ পাচ্ছি না যে, তাঁকে সত্যসত্যই গুমখুন করা হয়েছিল। ইতিহাস ধরে অগ্রসর হতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে চৈতন্যদেবের হত্যার ঘটনা সত্য। কিন্তু ইতিহাস কোথাও সে কথা স্পষ্ট করে বলছে না। এর পিছনে গোবিন্দ বিদ্যাধরের (মান গোবিন্দ গোবিন্দ দেবের) চক্রান্ত যে ছিল তা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। মাদলাপঞ্জীর বিবরণ অনুসারে জানা যায় প্রতাপরুদ্রের পুত্র কালু-আ দেবকে গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক প্রতাপরুদ্রদেবের এক উচ্চ কর্মচারী নিহত করেন। মাদলা পঞ্জী থেকে আরো জানা যায় চৈতন্যদেবের লীলা সংগোপনের তিন বৎসর পূর্বে প্রতাপরুদ্র পরলোক গমন করেন। ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্বধামে গমন করেন। কালুআ দেব এক বৎসর পাঁচ মাস তিন দিন রাজত্ব করার পর নিহত হন। তারপর সম্ভবত গোবিন্দ বিদ্যাধরেরই চেষ্টায় প্রতাপরুদ্রদেবের

আর এক পুত্র কখাড়ুআ দেব ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। তিনিও প্রতাপরুদ্রদেবের আর এক পুত্রের সঙ্গে নিহত হন। গোবিন্দ বিদ্যাধর ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজা হন এবং ভোই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।—হিস্ট্রি অফ উড়িষ্যা। আর. ডি. ব্যানার্জী, প্রথম খণ্ড। পৃষ্ঠা—৩৩৭-৩৮।

আমার এর পরের কথা হলো—চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান সম্পর্কে আমি যে সব কাহিনী প্রাচীন বাংলা ও ওড়িয়া পুঁথি থেকে সংগ্রহ করেছি তা এক রকম নয়। মোটামুটি তার মধ্যে ৯টি ঘটনা প্রধান। সংক্ষেপে ঘটনাগুলি হলো ঃ

১। লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে'—জগন্নাথের দারুময় দেহে লীন। স্থান—জগন্নাথ মন্দির।

২। কবিরাজ কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র সূত্র থেকে অনেকে অনুমান করেন—ভাবোন্মাদ অবস্থায় সমুদ্রে পতনের ফলে মৃত্যু।

৩। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে—রথযাত্রায় নৃত্যের সময় পায়ে ইটালের আঘাত লাগে। ষষ্ঠীর দিনে বেদনা হয়। মৃত্যু তোটা গোপীনাথের মন্দিরে।

৪। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর আবিষ্কৃত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র পরিশিষ্টাংশে—জগন্নাথ মন্দির থেকে ন্যাসীর বেশে মদনগোপাল মন্দিরের দিকে চলে গিয়েছিলেন। আর ফিরেন নাই।

৫। ওড়িয়া কবি অচ্যুতানন্দ ও দিবাকর দাসের মতে—জগন্নাথে লীন। স্থান—জগন্নাথ মন্দিরেই।

৬। বৈষ্ণব দাসের 'শ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া'র মতে—হরিনাম সহকারে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। মৃতদেহ পড়েছিল গরুড় স্তম্ভের পিছনে। সে স্থান থেকে আনা হয়েছিল তোটা গোপীনাথের মন্দিরে।

৭। ঈশ্বর দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবতে' লিখেছেন—চৈতন্যদেব জগন্নাথ দেহে চন্দন লেপন করতে করতে ৩রা বৈশাখ জগন্নাথ দেহে লীন হন। পরে জগন্নাথের নির্দেশে শব শূন্যে বহন করে ভাসিয়ে দেওয়া হয় পুরী থেকে ৪০ মাইল দূরে প্রাচী নদীতে।

৮। গোবিন্দ দাস বাবাজীর 'শ্রীচৈতন্য চকড়ার, বর্ণনানুযায়ী—গুণ্ডিচা বাটীতে আষাঢ় মাসে সপ্তমী তিথিতে সন্ধ্যারতি দর্শনের সময় সহসা গরুড় স্তম্ভের পিছন থেকে তীব্র জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে লীন হন জগন্নাথ দেহে। আর তাঁকে পাওয়া যায়নি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বহির্বাস ও মালা পাওয়া গেল। সেই বস্তুগুলিকেই তোটা গোপীনাথ মন্দিরের চত্তরে সমাধি দেওয়া হয়।

৯। মহামুনি ভাগুরি কথিত 'প্রভাস খণ্ডে'—নিত্যানন্দের কোলে নিম্ববৃক্ষ তলে তিনি দেহত্যাগ করেন। পরে নিত্যানন্দই তাঁকে দাহ করেন।

এই ৯টি কাহিনী থেকে এই কথা বলা যায় শ্রীচৈতন্যদেবের দেবদেহ সত্যসত্যই কোন দারুময় বিগ্রহে লীন হয়ে যায়নি। হয়ত তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি। কোন দুর্ঘটনায়ও হতে পারে। তা সে হত্যাই হোক (বা গুমখুন) বা ইটালের আঘাতেই হোক।

জয়ানন্দ আর গোবিন্দ দাস বাবাজীর কাহিনী দুটিকে এক করলে একটা বিশ্বাসযোগ্য সমাধান করা যায়। প্রভুর পায়ে ইটাল বেজেছিল, তার ফলে ভীষণ ব্যাথা হয়েছিল সে কথা তিনি কাউকে বলেন নি। ষষ্ঠী বা সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার সময় আরতি দর্শন করতে গিয়ে উদ্দণ্ড কীর্তনে যখন মত্ত তখন সেই বেদনা সহ্য করতে না পেরে গোবিন্দ ও স্বরূপকে ধরে বসে পড়েন পাদুকা কুণ্ডের কাছে। তারপর তাঁকে আনা হয় তাঁর প্রিয় পার্ষদ গদাধরের কাছে। তখন তিনি অচৈতন্য। সম্ভবত সেই রবিবার দিনেই তিনি দেহত্যাগ করেন। এবং তোটা গোপীনাথ মন্দিরের চত্তরেই তাঁর মরদেহকে সমাধিস্থ করা হয়। যে ছোট্ট সমাধি মন্দিরটি আছে সেইটিই মহাপ্রভুর সমাধি। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার একমাত্র উপায় সমাধি উৎখনন। কিন্তু কোন দিন তা সম্ভব হবে না। ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে প্রচণ্ড আপত্তি আসবে।

যদি না উৎখনন সম্ভব হয় তাহলেও স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগে—যদি প্রকৃত ঐটিই সমাধি হয় তাহলে স্থানটি ত তীর্থক্ষেত্র রূপে প্রসিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। এতদিন তা কেন হয়নি। এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে রাজনৈতিক প্রশ্ন এসে পড়বে। আর তা যদি আসে তাহলে বলতে হয়, দুর্ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, সে দুর্ঘটনা ইটালের আঘাত এবং সে আঘাত অমনি অমনি লাগে নি। গোবিন্দ বিদ্যাধরের দুষ্ট চক্রই দূর থেকে ইষ্টক খণ্ড নিক্ষেপ করেই তাঁকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছিল। দুর্বৃত্তদের সে প্রচেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে সফল না হলেও কয়েকদিনের মধ্যেই সফল হয়েছিল।

আর তা যদি না হয় এবং ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় যদি বিচার করতেই হয়, তাহলে বলতে হয় যেভাবে প্রতাপরুদ্রদেবের পুত্র কালুআদেবকে গোবিন্দ বিদ্যাধর সুকৌশলে ও সুগোপনে হত্যা করেছিল, সেভাবেই শ্রীচৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়েছিল। এবং মৃতদেহ তোটা গোপীনাথেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। বৈষ্ণবদাস বলেছেন মৃতদেহ পড়ে থাকার কথা। ঐভাবে মন্দিরে মৃতদেহ পড়ে থাকতে পারে না। অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কেউ মেরে ফেলে দিয়েছিল।

কারণ, যতগুলি কিংবদন্তী ও লিখিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তার অধিকাংশতেই তোটা গোপীনাথের কথা আছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় গোপীনাথেই সমাধিস্থ করা হয়েছে তাঁর পূত দেহ। চৈতন্য চকড়াতে সে কথা স্পষ্ট বলাও আছে।

প্রভুজী বলেছিলেন দীনবন্ধু প্রতিহারীর নাম। তিনিই নাকি ঘাতক। এই কথার কোন সত্যতা আছে বলে আমি এখন পর্যন্ত মনে করতে পারছি না। যতদিন পর্যন্ত প্রাচীন লিখিত কোন প্রমাণ না আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততদিন ইতিহাসের কাছে তা আর পাঁচটা কিংবদন্তীর মতই থাকবে। এই কথার ঐতিহাসিক কোন মূল্যই নাই।

অনেক সময়, কিংবদন্তী নিতান্ত কিংবদন্তী না হয়ে সত্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ কিংবদন্তীর মূলে কিছু সত্য নিহিত থাকে। যেমন এতদিন শোনা ছিল বিগ্রহের জানুতে যে ছিদ্র আছে, যাকে 'চৈতন্য চকড়া' বলছে 'ক্ষতের আকার' সেখান দিয়েই নাকি মহাপ্রভু গোপীনাথের দেহে লীন হয়েছেন। এই কথা চলে আসছিল লোক মুখে মুখে। কিন্তু এই গুজবের লিখিত কোন স্বাক্ষর পাওয়া যাচ্ছিল না। এতদিন পরে পাওয়া গেল লিখিত কাহিনী। যদিও এই কাহিনীর মধ্যে বিন্দু মাত্র সত্য নাই। অতিবড়ী জগন্নাথদাসের সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবদের মতভেদের কথা শুধু শুনে আসছিলাম। কোথাও কোন লিখিত প্রমাণ মিলছিল না। চৈতন্য চকড়ায় মিলেছে তার ইঙ্গিত। 'অতিবড়ী' আখ্যা দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব একথা বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এ কথার সত্যতা লিখছে বৈষ্ণব কবির লিখিত গ্রন্থে। যদিও সে কাহিনী প্রচলিত কাহিনী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এতদিন পাণ্ডাদের মধ্যে যে গুজব চলে আসছে, তারাই নাকি চৈতন্যদেবকে গুমখুন করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার লিখিত কোন প্রমাণ মিলছে না। কিন্তু এই গুজকের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তা সত্য বলে মনে হয়। এ বিষয়ে প্রভুজী আমাকে যে ইতিহাস সম্মত ব্যাখ্যা করেছেন, তা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। অর্থাৎ পাণ্ডাদের দ্বারাই উৎকলের রাজা নির্ধারিত হতেন অনেক সময় অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত ঘাতকের নামটি নিশ্চয়ই কোন পুঁথি থেকে আবিষ্কৃত হবে। এতদিন ত কোন নামই জানা যাচ্ছিল না। এখন সত্য হোক, মিথ্যে হোক অন্তত তা জানা গেছে।

সন্ন্যাসীর বেশ ধরে গোপীনাথের মন্দির থেকে মহাপ্রভু গোপনে পালিয়ে গিয়েছিলেন, এ কথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, তাঁর মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ কিছুতেই ঐ ভাবে পালাতে পারেন না। যদি যুক্তি দিয়েও পালনকে সমর্থন করা যায়, তাহলেও 'আউল চাঁদ' নিমাই চাঁদ নন। আউল চাঁদ বৈষ্ণব ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর অনুগত ভক্ত। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রামান্য ইতিহাস থেকে একথা জানা যায়।

এ কথা ঠিক, শ্রীচৈতন্যদেব মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আয়ু যে আর বেশী দিন নাই, এ

কথা জানতে পেরেছিলেন। তাই একান্ত পার্ষদগণকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন পূর্বেই। জয়ানন্দ আর গোবিন্দ দাস বাবাজী যে কথা বলেছেন, তাতে কিঞ্চিৎ সত্য আছে বলে মনে হয়। সম্ভবত তাঁর বিরুদ্ধ চক্র যে এ বিষয়ে চেষ্টা করছে তা তিনি ভাল করেই জানতেন।

শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যু তাঁর হয়নি। রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলেই হয়েছিল তাঁর জীবনাবসান। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মকে পরবর্তী রাজা গোবিন্দ বিদ্যাধর চেয়েছিলেন উৎকল থেকে উচ্ছেদ করতে। সেইজন্য তিনি এ বিষয়ে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, তার ফলেই পরবর্তী কালে ৫০ বছর গৌড় এবং উৎকলে কীর্তন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উৎকলে অতিবড়ী সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন আর গৌড়ে শাক্তরা পুণরায় জেগে উঠেছিল। ইংরেজ-আমলের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শাক্তদের প্রভাব যে বাংলাদেশে ছিল, সে কথা ইতিহাস থেকেই জানা যায়।[১] পরবর্তীকালে শ্যামানন্দ ও তাঁর শিষ্য রসিকানন্দ মেদিনীপুর ও উৎকলে পুনরায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

চৈতন্যদেবের আদর্শই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গোড়াতে বিপ্লবীরা ভক্তির কথা বললেও শেষ পর্যন্ত সে আদর্শ থেকে তাঁরা বিচ্যুত হয়েছিলেন। বর্তমান দেশের এই পরিস্থিতিতে চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তি এবং প্রেমের সার্বজনীন আবেদন বিচার বিশ্লেষণ করে শিক্ষিত যুব সমাজ যদি না গ্রহণ করেন এবং গবেষকগণ এবং ধর্মীয় নেতারা যদি না যুব মানসকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন তাহলে এদেশে কোন দিন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং জাতীয় সংহতিও অক্ষুণ্ণ থাকবে না। শ্রীচৈতন্যদেব আত্মাহুতি দিয়েছিলেন বিরাট ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বলেই। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ঘুচিয়ে এক জাতি এক প্রাণ করা যদি না তাঁর জীবনের লক্ষ্য হত, তাহলে হয়ত এমন ভাবে নিজে তিনি শেষ হতেন না। জীবে প্রেমই কৃষ্ণ প্রেম, জীব সেবাই কৃষ্ণের সেবা। সে প্রেমের উচ্চাদর্শ হলো কান্তা প্রেম। শ্রীচৈতন্যদেবের এই প্রেমের কথাই বলেছিলেন বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে পরবর্তীকালের বীর সন্ন্যাসীগণ। কিন্তু তাতেও রয়ে গেছে একটা মস্ত ভুল বোঝাবুঝি।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্যের আবরণ উম্মোচন করতে গিয়ে বারে বারেই আমার এই কথাই মনে হয়েছে। পরম পরিতাপের বিষয়, আজো দেশের এই দুর্দিনে আমরা তাঁর সেই মহান ঐশ্বরীয় সত্ত্বাকে উপলব্ধি করতে পারছি না। মন্দিরে আবদ্ধ রেখে চার হাত বানিয়ে পুজো করছি ভগবান বলে। জানি না এতে তাঁর অন্তরাত্মা শান্তি পাচ্ছে কিনা।

১। এ বিষয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদসঞ্চার' উপন্যাসে ইঙ্গিত মেলে।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

['শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' গ্রন্থে যে সব ব্যক্তির নাম মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে অথচ বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাঁদের কয়েকজনের পরিচয় ও কয়েকটি স্থান-নামের বিবরণ তথ্য সহ এই অংশে পরিবেশিত হলো।]

॥ **কানাঞি খুঁটিয়া** ॥

বৈষ্ণব দাসের 'চৈতন্যচকড়া' থেকে এই পুস্তকে যে উদ্ধৃতিটি আছে :

কানাই খুঁটিয়া শিখি মহান্তি আবর।
ঘেনিলে অঙ্গকু তোটা গোপীনাথ পুর॥

'খুঁটিয়া' হলো উৎকলে ব্রাহ্মণের উপাধি। খুঁটিয়া সম্পর্কে ওড়িষ্যার বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। কারো মতে এটি রাজপ্রদত্ত উপাধি। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির দ্বার রক্ষকগণ খুঁটিয়া নামে পরিচিত, কেহ কেহ বলেন জগন্নাথদেবের শৃঙ্গারের জন্য মাল্য-সরবরাহ করাই খুঁটিয়াগণের নির্দিষ্ট সেবা। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায় নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেব ব্রজলীলার অভিনয় করতেন। এই অভিনয়ে কানাই খুঁটিয়া পার্ট করতেন নন্দগোপের। আর জগন্নাথ মাহান্তি সাজতেন ব্রজেশ্বরী। শ্রীচৈতন্যদেব কানাই খুঁটিয়াকে পিতা ও জগন্নাথ মাহান্তিকে মাতৃজ্ঞানে বন্দনা করতেন।

কানাই খুঁটিয়া রচিত একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থের কথা শুনা যায়—নাম 'মহাভাব-প্রকাশ'। ওড়িয়া গবেষকগণ বলেন, এই গ্রন্থের মূললিপি নাকি আমেরিকায় পাচার হয়েছে। পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কটকে এই পুঁথির অসম্পূর্ণ কিছু অংশ দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থে কানাই খুঁটিয়ার ভনিতায় একটি পদ আছে।

কানাই খুঁটিয়া কয় মোর মনে হেন লয়,
বংশী হৈল অবলা বধিতে॥ (৪৩৪ নং পদ)

দিবাকর দাসের লেখা 'জগন্নাথ-চরিতামৃতে' আর একজন 'কাহ্নু খুঁটিয়া'র সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি অতিবড়ী সম্প্রদায়ের গুরু জগন্নাথ দাসের ষোলজন শিষ্যের অন্যতম। অতিবড়ীগণের সাম্প্রদায়িক গুরুপরম্পরাক্রমে অতিবড়ী জগন্নাথ দাস শ্রীমন্মহাপ্রভু থেকে পঞ্চম অধস্তন। অতএব এই কাহ্নু খুঁটিয়া চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কানাই খুঁটিয়া নন।

পুরীতে এখন যাঁরা কানাই খুঁটিয়ার বংশধর বলে পরিচয় প্রদান করেন, তাঁরা পাণ্ডার কাজ করেন। পাণ্ডা অর্থে তীর্থগুরু। এই খুঁটিয়া বংশধররা কিন্তু কানাই খুঁটিয়া থেকে অবিচ্ছিন্ন বংশলতা দেখাতে পারেন না।

॥ শিখি মাহান্তি ॥

শিখি মাহান্তি বাস করতেন পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র নীলাচলে। তিনি ছিলেন শ্রীমন্দিরের 'লিখনাধিকারী' অর্থাৎ দেউলকরণ। মুরারি মাহান্তি তাঁর ছোট ভাই। কনিষ্ঠা ভগ্নির নাম মাধবী দেবী। মুরারি ও মাধবী দেবী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। শিখি প্রথমে গৌরভক্ত ছিলেন না, ভাইবোন অনেক বোঝানো সত্ত্বেও শিখি গৌরসুন্দরের প্রতি অনুরক্ত হন নি। একদিন ভাই-বোন, দাদা, শিখির সঙ্গে চৈতন্য সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। আলোচনা কালে তিনি নিদ্রিত হন। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন শ্রীচৈতন্যদেবকে। জেগে উঠে ভাই-বোনকে পরম স্নেহ-ভরে আলিঙ্গন করেন। ভাই-বোন উভয়ে বিস্মিত হন। শিখি বললেন—আমি অতি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছি। দেখলাম গৌরসুন্দর জগন্নাথকে দর্শন করে পুনরায় দারু ব্রহ্মের দেহে প্রবেশ করছেন, আবার ক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে দর্শন করছেন পুরুষোত্তমদেবকে. আবার প্রবিষ্ট হচ্ছেন দারুব্রহ্মের শ্রীঅঙ্গে। আমি জাগ্রত হয়েও এখন দেখছি সেই দৃশ্য। তিনি আমাকে ঐ দেখ, আহ্বান করছেন। আমি তাঁর কাছে যেতেই পরম প্রেম ভরে তিনি আমায় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করলেন।'

বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন শিখি। কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন মন্দিরের দিকে। পিছনে পিছনে ভাই-বোনও চললো। মন্দিরে গিয়ে দেখলেন জগমোহনে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীচৈতন্যদেব। আশ্চর্য হলেন মাধবী ও মুরারি। চোখ দিয়ে তাঁদের আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। শ্রীচৈতন্য শিখিকে দেখে 'তুমি মুরারির দাদা' বলে দীর্ঘ বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। শিখি দেহে অপূর্ব শিহরণ অনুভব করলেন। দেখতে লাগলেন সর্বত্র চৈতন্যময়। তাঁর হৃদয় চৈতন্যপ্রেম রসে উদ্বেল হয়ে উঠল। সেদিন থেকেই শিখি সব কিছু ভুলে হলেন চৈতন্য-ভক্ত। প্রাণমন ঢেলে দিলেন চৈতন্য সেবায়।

চৈতন্যদেবের সাড়ে তিন জন ভক্তের মধ্যে শিখি অন্যতম। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে ঃ

*　　*　　*

জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন ॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ ।
শিখি মাহিতি তিন তাঁর ভগিনী অর্ধজন ॥ চৈ. চ. অ ২।১০৫-৬

*   *   *

মাধবী দেবী শিখি মাহীতির ভগিনী ।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে তার নাম গণি ॥

॥ **তুক্কা** ॥

উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের কন্যা। ইঁহার অপর নাম জগন্মোহিনী। চৈতন্য চকড়ায় দেখছি আরো একটি নাম অন্নপূর্ণা। মাতার নাম গৌরী দেবী। ইনি মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের পট্টমহাদেবী। 'হিষ্ট্রি অফ ওড়িষ্যা' থেকে জানা যায় ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুন বিজয়নগর রাজ শ্রীকৃষ্ণদেব রায় কোণ্ডবীডু রাজ্য আক্রমন করে প্রতাপরুদ্রের পুত্র কোণ্ডবীডু শাসনকর্তা বীরভদ্রদেবকে বন্দী করেন। বিজয়নগর রাজ কৃষ্ণদেব রায় বার বার প্রতাপরুদ্রের রাজ্য আক্রমণ করে উহার কিছু অংশ অধিকার করেন। তখন প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীকৃষ্ণরায়ের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী আদরিণী কবিকন্যা তুক্কা বা জগন্মোহিনীকে কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে বিয়ে দেন এবং বিয়ের যৌতুক স্বরূপ তাঁর অধিকৃত কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত ভূভাগ প্রদান করেন। (Sources of Vijayanagar History, PP, 116, 132, 143-45, 155.)

বিয়ের পর কৃষ্ণদেব রায় তুক্কাকে ভীষণভাবে লাঞ্ছিত করেন। তুক্কার কোমল হৃদয় এই অনাদর ও অবহেলায় অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে। জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। শেষে তিনি লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যান কুডাপাহা (Cuddapah) জেলার নির্জনতম অঞ্চল কম্বম্' নামক স্থানে। এখানে তাঁর জীবন দুঃসহ বেদনার মধ্যে অতিবাহিত হয়।

'তুক্কাপঞ্চকম্' নামে সংস্কৃতে লেখা পাঁচটি শ্লোক তার রচিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। মুকুল ভট্ট রচিত 'অভিধাবৃত্তিমাতৃকা' গ্রন্থে এঁর একটি পদ্য আছে। নিম্নে তুক্কা-পঞ্চকম্ উদ্ধৃত করা হলো।

তুক্কা-পঞ্চকম্

তুক্কা নাম গজপতিপুত্রী কৃষ্ণদেব রায়পত্নী
চরন্ বনান্তে নবমঞ্জরীষু, ন ষট্‌পদো গন্ধফলীমজিঘ্রৎ।
সা কিং ন রম্যা স চ কিং ন রন্তা,

বলীয়সী কেবলমীশ্বরাজ্ঞা ॥ ১ ॥

মা কিংশুক প্রকটয়াত্মনিমেষমাত্রং,
মন্মস্তকে বিহরতীতি মধুব্রতোঽয়ম্ ।
কিং লালতীবিরহবেদনয়া ত্বদীয়ং,
দৃষ্টবা প্রসূনমচিরাদনলভ্রমেণ ॥ ২ ॥

ভ্রমর ভ্রমতা দিগন্তরালে,
ক্বচিদাস্বাদিতমীক্ষিতং শ্রুতং বা ।
বদ সত্যমপাস্য পক্ষপাতং,
যদি জাতী কুসুমানুকারি পুষ্পম্ ॥ ৩ ॥

কুসুমানি লিখন্তু নাম চিত্রে,
কতিচিৎকারু বিশেষ রূঢ় শিক্ষাঃ ।
সুরভিত্বমমূনি কিং লভন্তে,
কিমু চৈতষু রসং পিবন্তি ভৃঙ্গাঃ ॥ ৪ ॥

কিং মালতি ম্লায়সি মাং বিহায়,
চুচুম্ব তুম্বীকুসুমং ষড়ঙ্ঘ্রিঃ ।
লোকে চতুর্ভিশ্চরণৈঃ পশুঃ স্যাৎ,
স ষড়্ভিরত্যর্থপশুর্ণ কিং স্যাৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের টীকাকার নাণ্ডিল্লগোপ [তাঁর টীকার মঙ্গলাচরণে প্রতাপরুদ্রদেবের কন্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণদেব •রায়ের বিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন—

প্রতাপরুদ্রস্য গজেশ্বরস্য, পুত্রীং পবিত্রীকৃতভূতধাত্রীম্ ।
প্রত্যগ্রহীদ্যঃ প্রকটপ্রতাপো, ভদ্রাং সুভদ্রামিব পাণ্ডবেয়ঃ ॥
তস্য শ্রীকৃষ্ণরায়স্য প্রাজ্যরাজ্যধুরন্ধরঃ ।
কুলক্রমাগতো মন্ত্রী সাল্বতিম্মচমুপতিঃ ॥

॥ গোবিন্দ বিদ্যাধর ॥

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গোবিন্দ বিদ্যাধর ছিলেন প্রতাপরুদ্রদেবের মন্ত্রী। গোবিন্দ বিদ্যাধর উৎকলে ভোই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ডঃ আর. সি. মজুমদার তাঁর 'অ্যান এ্যাডভ্যান্স হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া' পুস্তকে লিখেছেন 'ভোই' অর্থে 'লেখক কুলসম্ভুত।' গোবিন্দ বিদ্যাধর প্রতিষ্ঠিত ভোই রাজবংশ উৎকলে ১৮ বছর রাজত্ব করেন। মাদলা-পঞ্জীর বিবরণ অনুসারে জানা যায় প্রতাপরুদ্রের পরে তাঁর পুত্র

কাল্‌আ দেব সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ১ বৎসর ৫ মাস ৩ দিন রাজত্ব করার পর গোবিন্দ বিদ্যাধর কর্তৃক নিহত হন। ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্রদেবের অপর পুত্র কখাড়ুআ দেব আবার গোবিন্দ বিদ্যাধর কর্তৃক উৎকলের সিংহাসনে বসেন। এর এক বৎসর পরে কখাড়ুআ দেব সহ প্রতাপরুদ্রদেবের অন্য এক পুত্র নিহত হন। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ বিদ্যাধর উৎকলের সিংহাসনে আরোহন করে ভোই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

গোবিন্দ বিদ্যাধরের পরে তাঁর পুত্র চক্রপ্রতাপ রাজা হন। তারপরে গোবিন্দেব পৌত্র নরসিংহ জেনা ও রঘুরাম জেনা উৎকলের সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দদেব হরিচন্দন রঘুরামকে পরাজিত করে উৎকলেব সিংহাসনে বসেন।

গোবিন্দ বিদ্যাধর জগন্নাথদেবের নাট্যমন্দির নির্মাণ করেন। এবিষয়ে সব ঐতিহাসিকগণ একমত নন। কেউ কেউ বলেন রাজা প্রতাপরুদ্রদেব নাকি এই নাট্যমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। নির্মাণ কাল ১৪৯৭ থেকে ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

জগন্নাথ মন্দিরের জয়-বিজয়-দ্বারে যে ১২টি আদেশ উৎকীর্ণ আছে তার কোন কোনটি নাকি গোবিন্দ বিদ্যাধরের। ইহা মাদলা পঞ্জীর অভিমত।

॥ প্রতাপরুদ্রদেব ॥

প্রতাপরুদ্রদেব সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা এই পুস্তক পাঠে ইতিপূর্বেই পাঠকগণ জেনেছেন। গজপতি বংশের রাজা প্রতাপরুদ্রদেব। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কপিলেন্দ্রদেব বা কপিলেশ্বর দেব। এর পূর্বপুরুষগণ সূর্যবংশ থেকে উদ্ভূত বলে কথিত হন। মাদলা পঞ্জী থেকে জানা যায়—প্রাচ্যগঙ্গবংশের সর্বশেষ রাজা মত্ত-ভানুদেব ছিলেন অপুত্রক। জগন্নাথদেব আদেশ করেন রাজাকে, তিনি যেন রাজ্যের উত্তরাধিকারী রূপে এমন একজনকে নির্বাচিত করেন, যিনি জগন্নাথের ভোগরন্ধনের যে হাঁড়ি ফেলে দেওয়া হয় অর্থাৎ কুণ্ডি তাতে যে অবশিষ্টাংশ থাকে তাই খেয়ে জীবন ধারণ করেন। অনুসন্ধানে জানা গেল শ্রীবিমলাদেবীর মন্দিরের নিকটে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় কপিল নামে এক ব্যক্তি উক্তরূপে জীবন ধারণ করছেন। মত্ত-ভানুদেব এই ক্ষত্রিয় কপিলকে নিজ অনুচর রূপে নিয়োগ করলেন। এই কপিলই মত্ত-ভানুদেবের মন্ত্রী-পদে উন্নীত হন। কালক্রমে মত্ত-ভানুদেব কপিলকে উড়িষ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। এইভাবে উড়িষ্যায় গজপতি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের কুলপঞ্জী শেষে দেওয়া হলো।

প্রতাপরুদ্রের পিতার নাম পুরুষোত্তম দেব এবং মাতার নাম রূপাম্বিকা। প্রতাপ-রুদ্রের পিতা ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে

আরোহন করে ঐতিহাসিকগণের মতে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে নিহত হন। প্রতাপরুদ্র পরম বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। প্রতাপরুদ্রের নামে প্রচলিত 'সরস্বতী বিলাস' কাব্যের 'প্রবন্ধবংশাবতরণ' নামক প্রথম বিলাস থেকে জানা যায়, 'শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব গৌড়দেশাধিপতির দর্প চূর্ণ করেছিলেন এবং শরণাগত সুলতান হুসেন শাহকে রক্ষা করেছিলেন। মহানদী তীরস্থ কটক নগর প্রতাপ-রুদ্রদেবের রাজধানী ছিল। সরস্বতী বিলাস কাব্য থেকে জানা যায়—প্রতাপরুদ্রদেবের শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা, শ্রীমহিলা নামে চারজন মহিষী ছিলেন। এছাড়া আরো কয়েকজন মহিষীর নাম ওড়িয়া লেখকগণের গ্রন্থ থেকে জানা যায়। দিবাকর দাসের জগন্নাথ চরিতে আছে, প্রতাপরুদ্রদেবের পট্টমহাদেবী ছিলেন—শ্রীগৌরী দেবী। ইনি অতিবড়ী জগন্নাথ দাসের শিষ্যা বলে উল্লিখিতা হয়েছেন। এছাড়া আরো দু'জন মহিষীর নাম জানা যায়। ঈশ্বর দাস 'ভানুমতী' নামে একজন মহিষীর নাম উল্লেখ করেছেন। আবার সুদর্শন দাস 'বিদ্যুৎকান্তি' নামে অপর একজন মহিষীর কথাও বলেছেন। এদিকে জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে 'চন্দ্রকলা' নামে আর এক মহিষীর কথা আমাদের জানিয়েছেন। এই চন্দ্রকলার প্রামাণিকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ প্রকাশ করেন।

'সরস্বতী বিলাসে' পুরুষোত্তম নামে এক পুত্রের উল্লেখ আছে। সম্ভবত ইনিই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পুরুষোত্তম জেনা নামে কথিত। ইতিহাসে কালুআ দেব, কখাড়ুআ দেব ও বীরভদ্র দেব নামে আরো তিনজন রাজপুত্রের নাম পাওয়া যায়। কালুআ দেব ও কখাড়ুআ দেব প্রতাপরুদ্রদেবের পরে যথাক্রমে ১৫৪০—৪১ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৫৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। বীরভদ্রদেব ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'কোণ্ডবীডু' দণ্ডপাটের রাজপ্রতিনিধি রূপে শাসনকর্তা ছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন—প্রতাপরুদ্রদেব প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। পরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন।

প্রতাপরুদ্রদেব যখন ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন বঙ্গদেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজের গুণ্টুর জেলা পর্যন্ত রাজ্য এবং তেলিঙ্গনার অধিকাংশ তাঁর অধিকারে ছিল। রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁর সাম্রাজ্য-বিস্তারের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। তখন বিদরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাহমনী সুলতান মহম্মদ। বিজয়নগরের সালুব-বংশ ছিল ধ্বংসোন্মুখ এবং গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ্ ততখানি পরাক্রমশালী হয়ে উঠতে পারেন নি। প্রতাপরুদ্রদেবের

বৃথা-রাজ্য-জয় পিপাসা ছিল না। তাই তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে চেষ্টা করেন নি। পরবর্তী কালে একের পর এক যখন দুর্গ এবং রাজ্য হাতছাড়া হতে লাগল তখন গোবিন্দ বিদ্যাধর স্বভাবতই চক্রান্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এজন্য ওড়িয়া ঐতিহাসিকগণ চৈতন্যদেবকেই প্রধানত দায়ী করেছেন। কিন্তু চৈতন্যদেব এজন্য যে দায়ী ছিলেন না তা ইতিহাস পাঠ করলেই জানা যায়।

প্রতাপরুদ্রদেব হীনবীর্য সম্রাট ছিলেন না। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় যখন রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত নেলোর জেলার অন্তর্গত উদয়গিরি আক্রমণ করেন, তখন তিনি ৩৪০০ পদাতিক সৈন্য ও ৮০০ শত হস্তী নিয়ে উদয়গিরিতে উপস্থিত হন। প্রতাপরুদ্রদেব দশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও মাত্র চার শত হস্তী নিয়ে প্রায় দেড় বৎসর কাল কৃষ্ণদেব রায়কে বাধা দেন।

অনুশাসন লিপি থেকে জানা যায়, এই যুদ্ধের পরে তিরুমল কান্তরায় নামক প্রতাপরুদ্রদেবের এক মাতুলকে কৃষ্ণদেব রায় উদয়গিরিতে বন্দী করেন।

প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের শেষ ভাগে উড়িষ্যার সীমা ছিল—দক্ষিণে গোদাবরী নদী ও উত্তরে রূপনারায়ণ বা হলদী নদীর তীরবর্তী 'পিছলদা' গ্রাম। তৎকালে এই গ্রামের সীমা দিয়েই নদী প্রবাহিত ছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

মদ্যপ যবন-রাজার আগে অধিকার।
তাঁর ভয়ে পথ কেহ নারে চলিবার ॥
পিছলদা পর্যন্ত সব তাঁর অধিকার।
তাঁর ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥
দিন কত রহ, সন্ধি করি তাঁর সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥
*　　*　　*
জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল ॥
মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদ পার করাইল।
পিছলদা পর্যন্ত সেই যবন আইল ॥

প্রতাপরুদ্রদেবের কয়েকটি অনুশাসন লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। জগন্নাথদেবের মন্দিরের 'জয়-বিজয় তোরণে'র বাম দিকে রাজত্বের ৪র্থ অঙ্কে (১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই বুধবার) উৎকীর্ণ একটি লিপি থেকে জানা যায় তিনি জগন্নাথ ও বলরামের সম্মুখে শ্রীগীতগোবিন্দ গানের অনুমতি দিয়েছেন।

মাদলা-পঞ্জী অনুসারে জানা যায় প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের তিন বৎসর পূর্বেই তিরোহিত হন। কিন্তু এই তথ্য সত্য নয়। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মহাপ্রভুর প্রকটকালেই তিনি পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করেন। তারপর যখন শুনলেন মহাপ্রভু লীলা-সংগোপন করেছেন, প্রভুর বিয়োগ বিরহ-দহন সহ্য করতে না পেরে নীলাচল পরিত্যাগ করেন।

সংগোপনে রাজা ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা থেকে ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব-দিকে প্রতাপপুর গ্রামে পালিয়ে যান। এই স্থানের নাম পূর্বে রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জের নামানুসারে ছিল রামচন্দ্রপুর। পরে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হয় প্রতাপপুর।

এই প্রতাপপুরের পাণ্ডাদের মুখে একটি কিংবদন্তী শোনা যায়। প্রতাপরুদ্রদেব যখন শুনলেন মহাপ্রভু পালিয়ে যাবেন বৃন্দাবন তখন রাজা সেই ভাবী বিরহের কথা স্মরণ করে একটি কাঠের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মূর্তি নির্মাণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব উৎকল ত্যাগ করলে রাজাও সেই দারুময় মূর্তিটি নিয়ে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন। পরে রামচন্দ্রপুরে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিনি ভাবলেন তাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত। তখন তিনি ৫৮ জন পাণ্ডাকে ডেকে অর্পণ করলেন শ্রীচৈতন্য বিগ্রহের সেবা পূজার ভার এবং দান করলেন ভূ-সম্পত্তি। গৌরসুন্দরের শ্রীপদ স্মরণ করতে করতে সেই রামচন্দ্রপুরেই তিনি নাকি দেহত্যাগ করেন। ময়ূরভঞ্জের রাজা স্থানটির নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করেন মহারাজের স্মৃতি-রক্ষার্থে প্রতাপপুর। এবং তিনি একটি মন্দিরও নির্মাণ করেন। শোনা যায় মন্দিরটি কালাপাহাড় কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তখন শ্রীচৈতন্যের শ্রীবিগ্রহকে গোপনে হরিহরপুর দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে প্রতাপপুর ডাকবাংলোর পশ্চিম দিকে একটু দূরে অবস্থিত একটি মন্দির প্রতাপরুদ্রের সমাধি মন্দির নামে প্রসিদ্ধি ছিল স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে। কিন্তু নদীর ভাঙনের ফলে উক্ত মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এখনো ফাল্গুনের দোল পূর্ণিমাতে শত শত লোক প্রতাপপুরে আগমন করে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত এই চৈতন্য-বিগ্রহকে দর্শন করে উৎসব পালন করেন।

সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাঁর 'শ্রীক্ষেত্র' পুস্তকে লিখেছেন: 'কথিত হয় যে, শ্রীনরেন্দ্র সরোবরের তীরে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যারত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু ও সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মমূলে সাষ্টাঙ্গ-প্রণত শ্রীপ্রতাপরুদ্রের একটি আলেখ্য তাঁহার আদেশেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ঐ আলেখ্যেরই একটি প্রতিলিপি মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে

রক্ষিত আছে।' (Archaeolgical Survey of Mayurabhauja—(VOL. I) by Nagendranath Vasu, PP. 31-35. ছবিটির প্রতিলিপি প্রথমেই আছে।

প্রতাপরুদ্র ও তাঁর পূর্বপুরুষগণের প্রাসাদেরভগ্নাবশেষ পুরীর বালিসাহি পল্লীতে 'পুরুণা নহর' নামে আজো প্রায় ৩০ একর ভূমির উপর এই পুরাতন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখলে এখনো উড়িষ্যার অতীত গৌরবের স্মৃতি হৃদয়কে অভিভুত করে।

প্রতাপরুদ্র পরমবিদ্যোৎসাহী ও ধর্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। রাজমাহেন্দ্রীর প্রশাসক রায় রামানন্দ তাঁর আদেশেই 'জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক' রচনা করেছিলেন। কবিকর্ণপুর প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক মহারাজের আদেশেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা যাত্রা কালে অভিনীত হয়েছিল।

রাজা প্রতাপরুদ্রদেব কয়েকটি গ্রন্থ স্বয়ং রচনা করেছিলেন বলে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এগুলির মধ্যে ১। শ্রীসরস্বতী বিলাস ২। শ্রীপ্রতাপমার্তণ্ড বা প্রৌঢ়-প্রতাপমার্তণ্ড ৩। নির্ণয়-সংগ্রহ ৪। কৌতুকচিন্তামণি।

শ্রীসরস্বতী বিলাসের মহীশূর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে এই গ্রন্থটি একটি প্রামান্য স্মৃতি-গ্রন্থ রূপে বিশেষ আদৃত হয়ে থাকে। এই গ্রন্থটির রচনাকাল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন।

শ্রীপ্রতাপ মার্তণ্ড শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নামে আরোপিত আর একটি স্মৃতি-গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একটি পুঁথি পুণার 'ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে'-এ সংরক্ষিত আছে। গবেষকগণ মনে করেন এই পুস্তকটি প্রতাপরুদ্রদেবের কোন সভাপণ্ডিতের দ্বারা রাজার আদেশে রচিত হয়েছিল। গবেষকগণ বলেন পরাশর-গোত্রীয় শ্রীনারায়ণের পৌত্র ও শ্রীমাধবের পুত্র শ্রীরামাকৃষ্ণ এই গ্রন্থের প্রণেতা।

নির্ণয় সংগ্রহ গ্রন্থ এযাবৎ আবিস্কৃত হয় নাই। অর্থাৎ এই পুঁথির কোন সন্ধান মিলেনি।

কৌতুক চিন্তামণি ইন্দ্রজাল-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ। তিনটি দীপ্তি বা অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ। পুণার ভাণ্ডারকর গবেষণাগারে এই পুঁথির দুইটি অংশ সংরক্ষিত আছে। বিকানীর মহারাজের গ্রন্থাগারে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত ৫৩ পৃষ্ঠার একটি পুঁথি সংরক্ষিত আছে। আনুমানিক ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

॥ প্রতাপরুদ্রের একটি বাংলা পদ ॥

কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯২নং পুঁথিতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ভণিতা-যুক্ত একটি বাংলা পদ আছে। তবে এই পদটি স্বয়ং প্রতাপরুদ্রের রচিত কিনা এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পদটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হলো—

আভরণ-মাঝে হ'ব দু'খানি নূপুর ॥
নখচন্দ্রে চকোর, পদকমলে ভ্রমর।
ওরূপে মুকুর হব, নিরাগে চামর ॥
আর এক সাধ আমি করিয়াছি মনে।
অতি ক্ষীণ রেণু হৈয়া থাকিব চরণে ॥
রেণু হইতে না পাই যদি মনে অনুমানি ॥
প্রতাপরুদ্রে কৃপা প্রভু করহ আপনি ॥

(বাংলা পুঁথির বিবরণ, তৃতীয় ভাগ, ১৬০ পৃষ্ঠা)

॥ গজপতি রাজবংশের বংশ তালিকা ॥

শ্রীকপিলেন্দ্রদেব বা শ্রীকপিলেশ্বরদেব—(মহিষী—শ্রীপার্বতীদেবী)
(১৪৩৫—৭০ খৃঃ)
|
শ্রীপুরুষোত্তম দেব—(মহিষী—শ্রীরূপাম্বিকা বা শ্রীপদ্মাবতী দেবী)
(১৪৭০-৯৭ খৃঃ)
|
শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব বা শ্রীবীররুদ্রদেব—(পট্টমহাদেবী—শ্রীগৌরী) শ্রীপদ্মা,
(১৪৯৭—১৫৪০ খৃঃ) শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা, শ্রীমহিলা, ভানুমতী ও শ্রীবিদ্যুৎকান্তি
|

পরুষোত্তম বড়জেনা (বড়জানা)	কালুআ দেব (১৫৪০-৪১ খৃঃ)	কখাড়ুআ দেব (১৫৪১-৪২ খৃঃ)	বীরভদ্র দেব	জগন্মোহিনী বা তুক্কা (বিজয় নগর-রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের পত্নী)

॥ কাশী মিশ্র ॥

কাশীনাথ মিশ্র বা সংক্ষেপে কাশী মিশ্র গজপতি বংশের রাজপুরোহিত। জগন্নাথদেবের সমস্ত সেবার অধ্যক্ষ ও পর্যবেক্ষক ছিলেন। ইহার বাড়ী জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের অতি নিকটেই ছিল। প্রতাপরুদ্রদেব এঁকে রাজগুরু-জ্ঞানে সম্মান এবং প্রত্যহ পদসেবা করতেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের বাড়ীতেই অবস্থান করতেন। গৃহদেবতা রাধাকান্ত দেবকে প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে নির্জনে তাঁরি সেবাপূজা করতেন। এই কাশী মিশ্রের বাড়ীর গম্ভীরাতে শেষ জীবন শ্রীচৈতন্যদেব অতিবাহিত করেন। এখান থেকেই তিনি অন্তর্ধানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। গৌড়ীয় ভক্তগণ এলে তাঁদের বাসস্থান ও সেবাদির বন্দোবস্ত করতেন। গুণ্ডিচা মার্জনের সময় মহাপ্রভু কাশী মিশ্র, পরিছা ও সার্বভৌম

ভট্টাচার্যের অনুমতি গ্রহণ করতেন। হোরাপঞ্চমীর দিন মহাপ্রভুর প্রীতির জন্য প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছানুসারে রথযাত্রা অপেক্ষা অধিক সমারোহের ব্যবস্থা করতেন এই রাজগুরু। কাশী মিশ্রকে মহাপ্রভুর লীলা সহচর বলা হয়। বৃন্দাবন দাস কাশী মিশ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

কাশী মিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণরসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাহার আবাসে ॥

কাশী মিশ্রের গৌর-প্রীতির কথা উড়িষ্যার পল্লীগীতিতেও শোনাও যায় ঃ

সুনার বরণ পোষাপক্ষী টিকু
কিএসে দেখছ ভাইরে।
কাশী মিশ্র তাকু বান্ধি রখিঅছি
হৃদয়র ডোরী দেই রে।

কাশী মিশ্রের আরাধিত দেবতা রাধাকান্ত জীউর নাম অনুসারে এক্ষণে এই মঠের নাম 'রাধাকান্ত মঠ'। কাশী মিশ্র নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা করতেন! গোপালগুরু রাধাকান্তের বামভাগে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে ললিতা দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ছাড়া রাধাকান্তের বামে নৃত্যরত শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি ও দক্ষিণে দারুময় নিত্যানন্দের বিগ্রহ বর্তমান আছে।

॥ সার্বভৌম ভট্টাচার্য ॥

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ। পূর্ব নিবাস ছিল বর্তমান নবদ্বীপ বা চাঁপাহাটী থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে বিদ্যানগর পল্লীতে। ইনি ষড়দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। শাঙ্কর-বেদান্তশাস্ত্রে এঁর পাণ্ডিত্য তৎকালে সমগ্র গৌড়-উড়িষ্যায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। শেষ বয়সে শ্রীক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীতে এসে তিনি সপরিবারে ক্ষেত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। প্রতাপরুদ্রের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। সার্বভৌমরা দুই ভাই। ছোট ভাই-এর নাম বিদ্যাবাচস্পতি। সার্বভৌমের পুত্রের নাম চন্দনেশ্বর ও কন্যার নাম ষষ্ঠী। ডাক নাম ছিল 'ষাঠী।' এই ষাঠীর স্বামীর নাম অমোঘ পণ্ডিত। তিনি নীলাচলেই বাস করতেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন সর্বপ্রথম জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে শ্রীমন্দিরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যান এবং পরিছাগণ তাঁকে বেত্র প্রহারে জর্জরিত করেন, তখন এই সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে রক্ষা করেন এবং গৃহে অচৈতন্য অবস্থায় নিয়ে আসেন। এবং সর্বপ্রথম তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা বুঝতে পারেন মহাপ্রভুর এই মূর্ছা সাধারণ মূর্ছা নয়--এ হলো কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার—মহাভাবের লক্ষণ।

পরে এই বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গেই বেদান্ত-তর্কে মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে পরাজিত করেন। তখন সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণ করেন শ্রীচৈতন্যদেব নরদেহে পূর্ণ ব্রহ্ম। এই পুস্তকে সে কথা বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করেছি। ভগবান যে কলিযুগে গৌরবর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হতে পারেন তিনি ভাগবতের নিম্নোক্ত-শ্লোকটি আবৃত্তি করে পণ্ডিতবর্গকে বুঝিয়েছেন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞেঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥—ভা· ১১।৫।৩২

এই শ্লোকের পূর্ববর্তী শ্লোক দশম শ্লোকে বলা হয়েছে কোন এক কলিতেও শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। একাদশ শ্লোকের অর্থ হলো—বর্তমান কলিতেও স্বয়ং ভগবানই পীতবর্ণরূপে সপরিবারে অবতীর্ণ হবেন এবং সুবুদ্ধিব্যক্তিগণ সংকীর্তনবহুল যজ্ঞের দ্বারা তাঁর আরাধনা করবেন।

এই সার্বভৌমের বিশেষ চেষ্টায় ও কৃপায় রথযাত্রা কালে প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। সার্বভৌম রথযাত্রার পর মহাপ্রভুকে এক মাস তাঁর বাড়ীতে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য কাতর প্রার্থনা করেন। মহাপ্রভু সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। একদিন মহাপ্রভু আহারে বসেছেন, এমন সময় সার্বভৌমের জামাতা মহাপ্রভুর সামনে প্রচুর আহার্য দেখে প্রভুর নিন্দা করতে থাকেন। তখন সার্বভৌম তাকে লাঠি দিয়ে প্রহার করতে উদ্যত হন এবং জামাতাকে গালাগালি করে অভিশাপ দিতে থাকেন। সার্বভৌম-গৃহিনী শোকে দুঃখে শিরে করাঘাত করতে করতে কন্যাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন 'ষাঠী মোর বিধবা হোক।'

পরের দিন প্রাতঃকালেই সংবাদ পাওয়া গেল, জামাতা অমোঘ দুরারোগ্য কলেরাতে আক্রান্ত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের নিন্দা শোনাবধি স্বামী-স্ত্রী-দুজনেই জলগ্রহণ পর্যন্ত করেন নি। এখন কলেরার কথা শুনে তাঁরা দুজনেই শাস্ত্রের দণ্ড বিষয়ক শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন। এদিকে অমোঘ মৃত্যু-শয্যায় আই-ঠাই করছে। এমন সময় গোপীনাথ আচার্যের কাছে অমোঘেব এই অসুখের কথা শুনে মহাপ্রভু ছুটে এলেন অমোঘের শয্যাপার্শ্বে। বুকে হাত বুলাতেই সুস্থ হলো অমোঘ। মহাপ্রভু সমস্ত অপরাধ ক্ষালন করে অমোঘকে বলালেন কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণপ্রেমে উম্মত্ত হয়ে নাচতে লাগল অমোঘ। আর মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে পড়ে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নিজের গালে নিজে চড় মারতে লাগলেন। আত্মধিক্কারে নিজে নিজে আহত হতে লাগলেন। মহাপ্রভু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ

সার্বভৌম গৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয় অন্যজন রাহু দূর।।

তারপর এলেন মহাপ্রভু সার্বভৌমের 'বাড়ীতে। প্রসন্ন করালেন উভয়কে। নিজে বসে থেকে খাওয়ালেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য আর তার গৃহিনীকে। ষষ্ঠীর মাতার সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখেছেন ঃ

ষষ্ঠীর মহাভক্ত তেঁহো স্নেহেতে জননী।।

।। রূপ সনাতন।।

রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীদের অন্যতম দু'জন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীর নাম উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ।।

বৈষ্ণব সাহিত্যে রূপ-সনাতনকে নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। সে সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিখতে গেলে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে হবে। সে সব বাদানুবাদ ছেড়ে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলি—এঁরা ছিলেন কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ। চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে চলে আসেন বাংলাদেশে। এর পিছনে আছে রাজনৈতিক ও পারিবারিক কলহের ইতিহাস। সর্বজ্ঞ জগদ্গুরু ছিলেন কর্ণাট দেশের রাজা। এঁর পুত্রের নাম পদ্মনাভ। পদ্মনাভ সম্ভবত গঙ্গাতীরে নবহট্টে বাস করেন। বর্তমানে কাটোয়ার নিকট নৈহাটী গ্রামে। থাকতেন যজন-যাজন নিয়ে। পদ্মনাভের পাঁচপুত্র। ছোট পুত্রের নাম মুকুন্দ। পারিবারিক কলহে নৈহাটী ছেড়ে প্রস্থান করেন পূর্ব বঙ্গে। যশোহরে এসে ফতেয়াবাদে বাস করেন। মুকুন্দের পুত্রের নাম কুমারদেব। অনেকগুলি সন্তান ছিল কুমারের। এই কুমারের সন্তানই সনাতন, রূপ ও অনুপম। অনুপমের আর এক নাম বল্লভ। চৈতন্যদেব জ্যেষ্ঠ দু'ভায়ের নাম দিয়েছিলেন—সনাতন ও রূপ। কোন কোন্ গ্রন্থে এঁদের আরো দু'টি নাম পাওয়া গেছে। যেমন অমর (রূপ) ও সন্তোষ (সনাতন)।

অনুপম ছিলেন হুসেন শাহের টাঁকশালের মালিক। রূপের উপাধি ছিল দবিরখাস। সনাতন সাকর মল্লিক নামে সুলতান দরবারে উপস্থিত হতেন। এই 'সাকর মল্লিক' ও 'দবির খাস' প্রকৃত পক্ষে কার উপাধি, তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। চৈতন্য-

ভাগবতে 'সাকরমল্লিক আর রূপ দুই ভাই।' এরূপ উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সনাতন হচ্ছে 'সাকর মল্লিক'। মহাপ্রভু সাকর মল্লিক নাম ঘুঁচিয়ে সনাতন নাম রাখেন। তাই বলে রূপকে স্পষ্ট করে 'দবির খাস' বলে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে রূপ যেন 'সাকর মল্লিক' বলে মনে হয়। পদে আছে—'রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে।' এজন্য আধুনিক লেখক সনাতনকেই—সাকর মল্লিক ও দবির খাস—এ দু' নামেই অভিহিত করেছেন। এ বিষয়ে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'শ্রীচৈতন্য ও তার পার্ষদ' গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৭—৪৯) বিশদ আলোচনা করেছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে' রূপকেই দবির খাস বলেছেন। এই বিতর্কের শেষ এখনো হয়নি। যাই হোক দবিরখাস আর সাকর মল্লিক নাম নহে উপাধি। সম্ভবত দবিরখাস ও সাকর মল্লিক সনাতনেরই ছিল এই দু'টি উপাধি। একথা গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীও বলেছেন।

আবার কোন কোন লেখক বলেন এঁরা ছিলেন জাতিতে পিরালী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এ কথা সত্য বলে মনে হয় না। আমি প্রথমে যে রূপ-সনাতনের বংশ পরিচয় প্রদান করেছি, তা জীব গোস্বামীর 'লঘুতোষিণীর' শেষে বংশ ধারার বিবরণ দেখে।

পুরীতে যবন হরিদাসের কুটীরে তাঁরা বাস করতেন, মন্দিরে প্রবেশ করে কোনদিন জগন্নাথ দর্শন করতেন না, ম্লেচ্ছ মনে করতেন নিজেদের—এর দ্বারা কোন কোন লেখক প্রমাণ করতে চান এঁরা দু'জন যবন ছিলেন। এ ধারণা সত্য নয়।

তবে আত্মগ্লানিতে দু'জনে অহরহ দগ্ধ হতেন। বহুদিন ম্লেচ্ছ সংসর্গ করেছেন। আচার-ব্যবহার করেছেন পাঠান সুলতানের সঙ্গে, নোকরি করেছেন যবন রাজের অধীনে—ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁদের স্থান অমনিতেই অনেকটা অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছিল। আত্মগ্লানি দেখা দিয়েছিল, হিন্দু হয়ে করেছেন হিন্দুর সর্বনাশ। ভেঙেছেন হিন্দুর মঠ দেউল। এসব কথা বলেছি আমার মূল পুস্তকে। তাই বলে যেখানে বিশ্বস্ত প্রমাণ পাচ্ছি সেখানে রূপ-সনাতনকে কোন মতেই যবন বলে স্বীকার করতে পারছি না।

সনাতন গোস্বামীর জন্ম খ্রীষ্টাব্দ ১৪৮৮ ও মৃত্যু ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭১ বছর বয়সে। রূপের জন্ম হয়েছিল ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যু ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বছর বয়সে। (গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মতে)।

এঁদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব, আদর্শ ও দার্শনিক মতবাদকে সুদৃঢ় ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের দূরদর্শিতা ছিল বলেই এ দুটি রত্নকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন। পাকা জহুরী তিনি জহর চিনতেন।

॥ পণ্ডিত গদাধর ॥

পণ্ডিত গদাধরের পরিচয় মোটামুটি এই পুস্তকে আছে। গৌরহরি ও গদাধর শক্তিমান ও শক্তি রূপে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যুক্ত। মহাপ্রভুর ভক্ত সমাজে 'গদাধর প্রাণনাথ' ও 'গদাই গৌরাঙ্গ' নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ। যমেশ্বর মন্দিরের সংলগ্ন একটি বাগানে মহাপ্রভু গদাধরের বাসস্থান নির্ধারণ করেছিলেন। বাগানকে ওড়িয়া ভাষায় তোটা বলে। মহাপ্রভু গদাধরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শোনার জন্য প্রত্যহ এই তোটায় যেতেন। চৈতন্যজীবনীতে আছে—

গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে ॥

পণ্ডিত গদাধর ছিলেন গোপীনাথের পূজক ও সেবক। তোটা গোপীনাথের মন্দির প্রসংগে গদাধর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব। গদাধরের তিরোধান সম্পর্কে আজো কোন প্রামান্য নজির পাওয়া যায় নি। সম্ভবত তোটা গোপীনাথ মন্দিরের পাশেই তাঁর এবং চৈতন্যদেবের সমাধি আছে। দ্রষ্টব্য 'শ্রীচৈতন্যের সমাধির সন্ধানে।'

॥ চাঁদকাজী ॥

হুসেন শাহের আঠারোজন পুত্র কন্যা ছিল। চাঁদকাজী, হুসেন শাহের একজন দৌহিত্র। চৈতন্যদেব যখন চাঁদকাজীর বাগান বাড়ী ভেঙে লণ্ডভণ্ড করেন, তখন হুসেন শাহ গৌড়ে ছিলেন না। তিনি গিয়েছিলেন উড়িষ্যায় যুদ্ধ করতে। খুব সম্ভবত ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু চাঁদকাজীর বাড়ী ভগ্ন করেছিলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর সমাধি মায়াপুরে বামনপুকুর নামক স্থানে আজিও বিদ্যমান। এই স্থানের প্রাচীন নাম সিমুলিয়া।

স্থান-পরিচিতি

॥ রামকেলি ॥

মালদহ থেকে গৌড় যাওয়ার পথে পিয়াসবাড়ি (সরকারী রেশম কুঠি) থেকে আধ মাইলের মধ্যে রামকেলি গ্রাম। হুসেন শাহের সময় এই গ্রামই ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান। রূপ-সনাতন এখানেই বাস করতেন। এই গ্রামের প্রবেশ পথেই রূপ-সনাতন সেবিত মদনমোহনের ঠাকুর বাড়ী ও কেলিকদম্ব বৃক্ষ। একটি বেদীর মধ্যে দুইটি

কদম্ব ও দুইটি তমাল গাছ আছে। এই তমালতলেই নাকি চৈতন্যদেব অবস্থান করেছিলেন। গ্রামের সঙ্গে রূপ-সনাতনের স্মৃতি বিজড়িত। বৈষ্ণবদের পবিত্র তীর্থ। রামকেলির অপর নাম গুপ্ত বৃন্দাবন। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মেলা হয়।

॥ গুণ্ডিচাবাটী ॥

জগন্নাথদেবের মন্দির থেকে পূর্ব-উত্তরে প্রায় দু'মাইল দূরে গুণ্ডিচা মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ, ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের মহিষীর নামানুসারে মন্দিরের নাম গুণ্ডিচা মন্দির হয়েছে। মূল মন্দির নির্মাণের আগে জগন্নাথ বিগ্রহ নাকি এই মন্দিরেই ছিলেন। এই মন্দিরের অল্প দূরেই 'ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর' নামে একটি প্রকাণ্ড সরোবর আছে। রথযাত্রা দিবসে জগন্নাথদেব, বলরাম, সুভদ্রা মূল মন্দির থেকে রথে আরোহন করে গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করেন এবং সাতদিন অবস্থান করেন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোকুলবাসীদের ত্যাগ করে মত্ত হয়েছিলেন পৌর-লীলায়। পরে কুরুক্ষেত্রে মিলন হয়েছিল উভয়ের। তখন ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্যময় স্থান কুরুক্ষেত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব মাধুর্যলীলাধাম বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠেন।

এখানে ব্রজেন্দ্রনন্দন হলেন জগন্নাথ আর রাধা ভাবে ভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর। ঐশ্বর্য লীলাভূমি নীলাচল থেকে মাধুর্যের লীলাভূমি সুন্দরাচল বা গুণ্ডিচার দিকে রথে আকর্ষণ করে নিয়ে যান—এই হলো গুণ্ডিচা-বাসের রহস্য।

এই মন্দির রথের আগে পার্ষদগণ সহ শ্রীচৈতন্যদেব মার্জনা করতেন। এই মন্দিরেই মহাপ্রভুর তিরোধান হয়েছিল বলে কোন কোন চৈতন্যজীবনীকার লিখেছেন। এখানে চৈতন্যের পদচিহ্ন একটি ছোট মন্দিরে আছে।

॥ তোটা গোপীনাথের মন্দির ॥

জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সমুদ্র বালুকাময় পথে যেতে হয় যমেশ্বর তোটা। উৎকল ভাষায় তোটা বা টোটা শব্দের অর্থ বাগান। জগন্নাথদেবের দ্বার-পাল হলেন পঞ্চ শিব মূর্তির অন্যতম যমেশ্বরদেব। যমেশ্বরদেব মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে যমেশ্বরের তোটা বা উদ্যান ছিল। এই উদ্যানে বাস করতেন গদাধর পণ্ডিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব একদিন এলেন ভাবে বিভোর হয়ে এই উদ্যানে। বসে পড়লেন বালুকাময় ভূমিতে। ভাবোম্মত্ত অবস্থায় বললেন—'কোথায় আমার প্রাণনাথ' বলে হাত দিয়ে আরম্ভ করলেন বালি খুঁড়তে। গদাধর বাধা দিয়ে বললেন—প্রভু খুঁড়ছেন কেন? বললেন চৈতন্যদেব—এখানে যদি কোন নিধি পাই, তাহলে কি তুমি নেবে?

সবাই মিলে বালি খুঁড়ে দেখলেন একটি প্রস্তরীভূত মূর্তি। কোলে করে তুললেন মহাপ্রভু। মূর্তি দেখে চৈতন্যদেব বললেন—এটি হলো গোপীনাথের শ্রীমূর্তি। এই বলে মূর্তিটি দান করলেন গদাধরকে। পণ্ডিত গদাধর এই বিগ্রহটির সেবা পূজার ভার গ্রহণ করলেন। এই হলো তোটা গোপীনাথ মন্দিরের পূর্ব ইতিহাস। গদাধরের পর 'মামু-ঠাকুর' এই বিগ্রহের সেবা পূজার ভার গ্রহণ করেন! প্রবাদ মামু-ঠাকুরের বয়স হলে তিনি কুব্জ হয়ে পড়েন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিগ্রহের সেবা-পূজা করতে পারতেন না। তখন সংকল্প গ্রহণ করলেন এই সেবাহীন জীবন তিনি রাখবেন না। তখন নাকি ভক্তবৎসল গোপীনাথ ভক্তের সেবা গ্রহণের জন্য কিঞ্চিৎ নুয়ে পড়েন। তদ্ অবস্থায় বিগ্রহটি এখনো আছে। চৈতন্য চকড়ার মতে মামু ঠাকুর নন, স্বয়ং গদাধর।

এই গোপীনাথের বামে ও দক্ষিণে কৃষ্ণবর্ণা শ্রীরাধা ও ললিতার মূর্তি আছে। এসম্পর্কেও নানা কিংবদন্তী শোনা যায়। চকড়ায় আছে এই তোটা গোপীনাথের জানু ভেদ করেই নাকি শ্রীচৈতন্য প্রবেশ করেছিলেন।

॥ গম্ভীরা ॥

উৎকল প্রদেশে মন্দিরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্রগৃহকে গম্ভীরা বলে। উৎকল-সাহিত্যে গম্ভীরা শব্দের অর্থ নির্জন ক্ষুদ্র গৃহ। অমৃতপ্রবাহভাষ্যে গম্ভীরা শব্দের অর্থ এইরূপ আছে—অলিন্দের পর দালান, তার ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে গম্ভীরা বলে। আমাদের দেশে মাটির ঘরে প্রাচীনকালে যে 'চোরাকুঠরী' থাকত অনেকটা তদ্রূপ। কাশী মিশ্রের ঘরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে যে নির্জন ঘরে শ্রীচৈতন্যদেব সাধনা ও বিশ্রাম করতেন, তারই নাম গম্ভীরা। কাশী মিশ্রের ভবনে দ্বার ছিল তিনটি। এই তিনটি দ্বার উদ্ঘাটন না করলে বাইরে আসা যেত না।

কাশী মিশ্র নিঃসন্তান থাকার জন্য গোপালগুরুকে রাধাকান্তের সেবায় নিযুক্ত করেন। বর্তমানে ইহা রাধাকান্তের মঠ নামে খ্যাত। এই মঠের অন্তর্গত সিদ্ধবকুল বা সাধক হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান অবস্থিত।

এখানে মহাপ্রভুর পাদুকা, কাঁথা, কমণ্ডলু রক্ষিত আছে। রাধাকান্ত মঠের সেবকরা বলেন কাঁথাটি নাকি পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামী তৈরী করেছিলেন মহাপ্রভুর বহির্বাস দিয়ে। ভিতরে কলার পেটো অর্থাৎ শুকনো কলাখোল চিরে চিরে নির্মিত হয়েছিল। আবার কেউ বলেন কাঁথাটি তৈরি করেছিলেন স্বরূপ গোস্বামী। পূর্বে কাঁথাটি বড়ই ছিল। কিন্তু বহু ব্যক্তি কিছু কিছু গ্রহণ করে এখন সামান্য অংশই আছে। এছাড়া আর একটি কাষ্ঠ নির্মিত কমণ্ডলু আছে। অনুসন্ধানে

জানা গেছে এটি পরবর্তীকালে স্থাপিত হয়েছে। এটির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। মহাপ্রভুর স্মৃতি বলতে পাদুকাটি একমাত্র সম্বল।

॥ গরুড়স্তম্ভ ॥

জগন্নাথ মন্দিরের সিংহ দরজায় যে স্তম্ভটি আছে, ঐ স্তম্ভটির নাম অরুণ স্তম্ভ। উক্ত স্তম্ভটি পূর্বে কোনার্কের সূর্যমন্দিরের সম্মুখে ছিল। পরে মহারাষ্ট্রীয়গণ জগন্নাথ মন্দিরের মূল দরজায় স্থাপন করেছেন। ঐটি গরুড় স্তম্ভ নয়। নাটমন্দিরে আছে গরুড় স্তম্ত। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে আছে গরুড়ের প্রতিকৃতি। এই স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে শ্রীচৈতন্য-জগন্নাথকে দর্শন করতেন। গরুড় স্তম্ভের গায়ে হাতের তিনটি আঙ্গুলের ছাপ আছে। এই ছাপ নাকি শ্রীচৈতন্যদেবের। এই কথা নিতান্ত কিংবদন্তী মাত্র এই স্তম্ভের পিছনে মহাপ্রভুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

॥ বুড়ালেংকা ॥

বৈষ্ণবদাসের 'চৈতন্যচকড়া'য় আছে ঃ

বুড়ো লেংকা যাই বালি নবরে প্রবেশিল।
রাজা আজ্ঞা ছামুয়ে একথা নিবেদিল ॥

এই বুড়া লেংকা হলো শ্রীজগন্নাথদেবের ছত্রিশ-সেবকের অন্যতম একজনের উপাধি। পরিচালককে বলে 'পাটযোষী মহাপাত্র।' লেংকা—মন্দিরে যত প্রকার সেবক আছেন তাঁদের যথা সময়ে সেবাকার্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহবান করেন বা ডাক দেন। এক অর্থে ডাকুয়া ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-পঞ্জী

(এই জীবনপঞ্জী ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের পুস্তকের অনুসরণে লিখিত)

জন্ম—১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ ২৭ ফেব্রুয়ারী। ৮৯২ বঙ্গাব্দ) ২৩শে ফাল্গুন, শুক্র বা শনিবার পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে-সন্ধ্যায়।

বিবাহ—১৫০২ খ্রীষ্টাব্দ সম্ভবত ১৬।১৭ বৎসর বয়সের সময় বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন।

গয়া যাত্রা—১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ বৎসর বয়সে পিতৃ-পিণ্ড দানের জন্য গয়া যাত্রা।

নেতৃত্ব গ্রহণ—১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কীর্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ।

চাঁদ কাজীর অত্যাচার—কীর্তন শুনে।

একদিন দৈবে কাজী সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায় ॥

কাজী বলে ধর ধর আজি কর কার্য্য।
আজি বা কী করে তোর নিমাই আচার্য্য॥
যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥ (চৈ. ভা.)

সন্ন্যাস গ্রহণ—১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মাঘ (ফেব্রুয়ারী, ২য় সপ্তাহ) সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কাটোয়া যাত্রা। ২৯শে মাঘ, সংক্রান্তির দিন প্রাতে সন্ন্যাস গ্রহণ।

নীলাচল যাত্রা—১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফাল্গুন নীলাচলের পথে যাত্রা।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ—১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ নীলাচল থেকে যাত্রা আরম্ভ। (এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ)

দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন—১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারীর মধ্যভাগে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন। মোট ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিন।

নীলাচলে অবস্থান—২ বৎসর অবস্থান—১৫১২ থেকে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

গৌড় অভিমুখে যাত্রা—১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে বিজয়া দশমীর দিন নীলাচল থেকে গৌড় অভিমুখে যাত্রা।

নীলাচলে প্রত্যাবর্তন—১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে ফিরে আসেন।

বৃন্দাবন—যাত্রা—১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ফিরে আসেন নীলাচলে।

গৌড়ে প্রচার—১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য আদেশ দান।

শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
মূর্খ, নীচ, দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।

তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে ॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশ যাও ॥ —চৈ. ভা. অন্ত্য। ৫ম.

চৈতন্যের মূর্তি পূজা—১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রভুপাদ নিত্যানন্দ রাঢ়ে ও গৌড়ে ঘরে ঘরে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করাব আদেশ দেন ও ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়ে ভাস্কর দাস তাঁকে সাহায্য করেন। চৈতন্যমঙ্গল উত্তর খণ্ডে আছে।—

নিত্যানন্দ কহিলেন ভাস্কর দাসে।
ঘরে ঘরে শ্রীমূর্তি দেহ গৌড় দেশে ॥

এই ঘটনার এক শত বৎসর পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ বাংলায় রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পূজোর প্রচলন করেন।

নীলাচলে বাস—১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই (?) মাস থেকে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই, মোট ১৮ বৎসর নীলাচলে কাশী মিশ্রের বাসভবনে গম্ভীরাতে বাস করেন। আর কোথাও যাননি। চকড়ার মতে এ কাহিনী সত্য নয়।

উৎকলের রাজনীতিতে তখন ষড়যন্ত্র, আতঙ্ক, অস্থিরতা ও নানাবিধ বিপর্যয় চলছে। চৈতন্য এক ঘরে। বৃন্দাবন লীলায় বিভোর।

চৈতন্য-তিরোধান—১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন বা জুলাই, আষাঢ় মাসে (১৪৫৫ শক, ৯৪০ বঙ্গাব্দ বেলা তৃতীয় প্রহরে—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে) চৈতন্যদেব তিরোধান করেন।

হুসেন শাহের রাজত্বকাল—১৪৯৯ থেকে ১৫২০ ষ্টুয়ার্টের মতে। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন ১৪৯৩ থেকে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

নসরৎ শাহের রাজত্বকাল—১৫১৮ কিংবা ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। যে বৎসর পুরীতে তিরোভাব ঘটে মহাপ্রভুর সেই বৎসর (১৫৩৩ খৃঃ) একজন গুপ্ত ঘাতক নসরৎ শাহকে হত্যা করে।

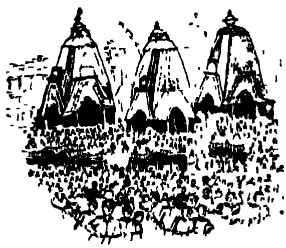
প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকাল—১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যার সিংহাসনে রাজত্ব করেন মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব। মোট ২৮ বৎসর।

ভোই রাজবংশ—গোবিন্দ বিদ্যাধরের বংশের উপাধি 'ভোইবংশ।' সম্ভবত নানা অশান্তির মধ্যে ১২ বছরের মত রাজত্ব করেন। (১৫৪২—৫৩ খ্রীঃ) মুসলমানদের সহায়তায় চৈতন্য এবং বৈষ্ণব নিধন করে সিংহাসনে আরোহন করেন।

পরবর্তী রাজা—১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দদেব উড়িষ্যার রাজা হন। তিনি ছিলে-

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। প্রতাপরুদ্রের রাজসভা থেকে বিতাড়িত বৌদ্ধ কবি বলরামদাস মুকুন্দদেবের রাজসভায় ফিরে আসেন। তাঁর রাজত্ব কালেই হয় কালাপাহাড়ের অত্যাচার। হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ধ্বংস করেন কালাপাহাড় নির্মমভাবে।

মূর্তি আবিষ্কারের কাহিনী থেকে বোঝা যায় শ্রীচৈতন্যদেব শুধু বিপ্লবী, সংগঠক, সমাজসেবক, মহাপণ্ডিত, অবতার সর্বোর্দ্ধে ভগবান ছিলেন না—ছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ ও বিরাট প্রতিভাশালী গবেষকও।



(আমার এই সংকলিত জীবন-পঞ্জী সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মাদলা পঞ্জীতে প্রতাপরুদ্রদেব-পরবর্তী রাজগণের যে বিবরণ আছে, তার সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দ মিলে না। চৈতন্য-দেবের জীবন-পঞ্জী সম্পর্কেও সকলে এক মত নন।—লেখক)

॥ শ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব বাল্যে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চৌপাঠিতে যখন পড়তেন, তখন লিখেছিলেন ব্যাকরণের টীকা। তৎকালে সেই টীকা নবদ্বীপের বিদ্বান-সমাজে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। তারপর 'দীধিতি'র ভাষ্য লেখা আরম্ভ করেছিলেন। সে ভাষ্য নিমাই-এর সহপাঠী রঘুনাথকে গঙ্গা পার হতে হতে নৌকায় বসে শুনিয়েছিলেন। রঘুনাথও লিখেছিলেন ভাষ্য। নিমাই-এর ভাষ্য শুনে রঘুনাথ তার নিজের ভাষ্যকে অত্যন্ত হীন বলে মনে করলেন। নিমাইকে দুঃখ করে বললেন—'ভাই, তোমার এ রচনা প্রকাশ হলে, আমার বই কেউ আর পড়বে না। আমার প্রতিষ্ঠার আর কোন আশাই নাই। এই বলে কেঁদে উঠলেন বালকের মত ডুক্‌রে।

নিমাই সতীর্থের দুঃখ দেখে ভাবলেন সামান্য একটা পুঁথি সহপাঠীর দুঃখের কারণ হবে। হবে তার যশের প্রতিবন্ধক। এই ভেবে পুঁথিটা গঙ্গায় ফেলে দিলেন নিমাই।

পরবর্তী জীবনে শ্রীচৈতন্যদেব নিজে আর কোন কবিতা বা গ্রন্থ লিখেছিলেন কিনা তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে তিনি সনাতন ও শ্রীরূপের দ্বারা যেসব ভক্তিশাস্ত্র রচনা করিয়েছিলেন, সেইসব ভক্তি শাস্ত্রের সূত্র সমূহ কাশীধামে অবস্থান কালে তাঁদের বলেছিলেন। সেই সব সূত্র অবলম্বন করে সনাতন ও রূপ গোস্বামী শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব প্রভৃতি রচনা করেন। শ্রীরূপের রচিত শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের সূত্রগুলি মহাপ্রভু প্রয়াগে বসে শ্রীরূপকে বলেছিলেন। সেই সূত্র অনুসারে শ্রীরূপ গোস্বামী লিখেছিলেন গ্রন্থরাজি।

শ্রীচৈতন্য নিজে ব্যাস-সূত্রের ভাষ্য লিখেছিলেন বলে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—"শ্রীচৈতন্য ব্যাস-সূত্রের যে ভাষ্য লিখেন, তাহা হয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, না হয় এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।"*

এছাড়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিজের লেখা কোন গ্রন্থ আছে বলে আজো জানা যায় নি। শিক্ষাষ্টকমের আটটি শ্লোক মহাপ্রভুর নিজের রচনা বলে প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে শ্লোকগুলি অনুবাদ সহ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর অনুবাদ সহ নিম্নে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করছি। ইতিমধ্যে অনেকে

---

* সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। যাহাতে সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের না হইলেও বিশেষ সূত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া শোনা যায়।

পরামর্শ দিয়েছেন, যেন 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যে' অন্ততঃ দ্বিতীয় সংস্করণে 'শিক্ষাষ্টকম্' সংযোজন করি। প্রথম সংস্করণে আমার নিজেরও শিক্ষাষ্টকম্ দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। অনেকে বলেন 'শিক্ষাষ্টকে'র ৫টি শ্লোক মাত্র মহাপ্রভুর রচনা। কৃষ্ণদাস বলেছেন শেষের দিনগুলিতে মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টক আস্বাদন করেছিলেন কাশী মিশ্রের গম্ভীরাতে। কৃষ্ণদাস লিখেছেন ঃ

পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোকার্থ আপনে আস্বাদিল ॥

—(চৈ. চ. অন্ত্য. ২০ পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যদেব শেষ দিনগুলিতে নিজকৃত শ্লোক আস্বাদন করে কৃষ্ণপ্রেমে হয়ে উঠেছিলেন উদ্বেল। বৈষ্ণববৃন্দের, কাছে শ্লোকগুলি নিত্য বন্দনীয়। আর গবেষকগণের নিকট অমূল্য সম্পদ। মহাপ্রভুর নিজকৃত ও নিজ মুখে গীত শ্লোকগুলি পড়তে পড়তে স্মৃতি ভারে অবনত হয়ে পড়ে হৃদয়। এক অনাস্বাদিত বিরহার্তি মনকে করে পরিপ্লাবিত। মুখ থেকে স্বতই স্ফুরিত হয় ঃ

১। চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

চেতোদর্পণমার্জনং (চিত্তরূপ দর্পণের পরিমার্জনকারী), ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং (সংসাররূপ মহাদাবানল (অগ্নি)—নির্বাপণকারী), শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং (পরম-মঙ্গলরূপ কুমুদের বিকাশক জ্যোৎস্নাবিতরণকারী), বিদ্যাবধূজীবনং (পরবিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ), আনন্দাম্বুধিবর্ধনং (আনন্দসমুদ্র-বর্ধনকারী), সর্বাত্মস্বপনং (নিখিল জীবাত্মার নির্মলতা ও স্নিগ্ধতাসম্পাদনকারী), পরং (অদ্বিতীয়) শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং (শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন), বিজয়তে (বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন)।

সংকীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন!
চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তি-সাধন-উদগম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত—আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥

—চৈ. চ. অন্ত্য. ২০ (১৪৩-১৪)

২। নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগ ॥

ভগবন্ (হে ভগবান্ !) [ভবতা—আপনাকর্তৃক] নাম্নাং (নাম সমূহের) বহুধা (বহুপ্রকার) আকারি (প্রকট হইয়াছে), তত্র (সেই শ্রীহরিনামে), নিজসর্বশক্তিঃ (আপনার সমস্ত শক্তি), অর্পিতা (অর্পিত হইয়াছে) ; স্মরণে (শ্রীনামস্মরণে), কালঃ (কোন কাল), ন নিয়মিতঃ (নিরূপিত হয় নাই)। তব (আপনার) এতাদৃশী (এবম্বিধা) কৃপা (দয়া), মম অপি (আমারও) ঈদৃশং (এতাদৃশ) দুর্দৈবম্ (অপরাধ, যে), ইহ (এরূপ হরিনামে) অনুরাগঃ (প্রীতি) ন অজনি (জন্মিল না)।

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিলা অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে, শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ ॥

—(চৈ. চ. অন্ত. ২০।১৭-১৯)

৩। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তণীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তৃণাৎ অপি (তৃণাপেক্ষাও) সুনীচেন (অতিশয় নীচ হইয়া), তরোঃ অপি (বৃক্ষের অপেক্ষাও) সহিষ্ণুনা (সহিষ্ণু হইয়া), অমানিনা (নিজে অমানী হইয়া), মানদেন (অপরকে মানদান পূর্বক) সদা (নিরন্তর) হরিঃ (শ্রীহরি) কীর্তনীয়ঃ (কীর্তিতব্য অর্থাৎ হরিনাম কীর্তন করা কর্তব্য)।

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥

এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥

—(চৈ. চ. অন্ত্য. ২০।২২-২৬)

৪। ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

জগদীশ। (হে জগন্নাথ !) [অহং—আমি] ধনং (ধন) ন কাময়ে (কামনা করি না), জনং ন [কাময়] (জন কামনা করি না), সুন্দরীং (কামিনী) বা কবিতাং (অথবা কাব্য ও পাণ্ডিত্য) ন [কাময়ে] (কামনা করি না); ঈশ্বরে ত্বয়ি (পরমেশ্বর তোমাতে) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) মম (আমাব) অহৈতুকী (অকিঞ্চনা) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভবতাৎ (হউক)।

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥

—(চৈ. চ. অন্ত্য. ২০।৩০)

৫। অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

অয়ি নন্দতনুজ ! (হে নন্দনন্দন !) বিষমে (ভয়ঙ্কর, দুষ্পার) ভবাম্বুধৌ (সংসার-সমুদ্রে) পতিতং (পতিত) কিঙ্করং (ভৃত্য আমি), মাং (আমাকে) কৃপয়া (কৃপাপূর্বক) তব (আপনার) পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং (পাদপদ্মস্থিত ধূলী-তুল্য) বিচিন্তয় (জ্ঞান করুন)।

তোমার নিত্য দাস মুই তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবন্ধ হঞা ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥

—(চৈ. চ. অন্ত্য ২০।৩৩ ৩৪)

৬। নয়নং গলদশ্রু ধারয়া, বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

[হে গোপীজনবল্লভ !] কদা (কবে) তব (আপনার) নামগ্রহণে (নাম-গ্রহণকালে) নয়নং (আমার নেত্রদ্বয়) গলদশ্রুধারয়া [যুক্তং] (দরদর অশ্রুধারাযুক্ত),

বদনং (বদন) গদগদরুদ্ধয়া (গদগদভাবে রুদ্ধা) গিরা [যুক্তং] (বাগযুক্ত), [এবং] বপুঃ (শরীর) পুলকৈঃ (পুলকসমূহে) নিচিতং (ব্যাপ্ত) ভবিষ্যতি (হইবে)?

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

—(চৈ. চ. অন্ত্য. ২০।৩৭)

৭। যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

গোবিন্দবিরহেণ (গোবিন্দের বিরহে) মে (আমার) নিমিষেণ যুগায়িতং (নিমিষকাল যুগতুল্য), চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং (চক্ষুঃ বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রুপ্লুত হইতেছে); সর্বং জগৎ (সর্ববিশ্ব) শূন্যায়িতম্ (শূন্যবোধ হইতেছে)।

উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন।
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥

—(চৈ চ. অন্ত্য. ২০।৪০-৪১)

৮। আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা,
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

পাদরতাং (পাদসেবানিরতা) মাং (আমাকে) আশ্লিষ্য (আলিঙ্গন করিয়া) বা পিনষ্টু (পেষণ করুণ), অদর্শনাৎ (দর্শন না দিয়া) মর্মহতাং (মর্মাহতই) বা করোতু (করুন), লম্পটঃ (সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৃষ্ণ) যথা তথা বা বিদধাতু (যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন), তু (তথাপি) স এব (তিনিই) মৎ প্রাণনাথঃ (আমার প্রাণনাথ), অপরঃ ন (অপর কেহ নহে)।

আমি কৃষ্ণপদ দাসী তেঁহো রস সুখ রাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন না জানে মোর তনুক্ষণ
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।

কিবা অনুরাগ করে কিবা দুখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ অন্য নয় ॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ তনুমন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা-সবারে দেয় পীড়া আমা সনে করে ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাঞা ॥
কিবা তেঁহো লম্পট শঠ ধৃষ্ট সকপট
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ।
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য
মোরে যদি দিয়া দুঃখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখ বর্য্য ॥

—(চৈ. চ. অন্ত্য. ২০।৪৮-৫২)

এই 'শিক্ষাষ্টকম্' ছাড়া আরো ৩টি সংস্কৃত গীত বা সংগীত পাওয়া গেছে শ্রীপদ্যাবলীতে। এই গীত ৩টি শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। এই ৩টি গীত বাংলা অনুবাদ সহ নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি কোন ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য নই বা শূদ্রও নই। আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নই। কিন্তু নিত্য সকল প্রকাশমান নিখিল-পরমানন্দ পূর্ণ অমৃতসমুদ্র স্বরূপ শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদকমলের দাস—দাসানুদাস।

দধিমথননিনাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমলসমীরৈরাশু নির্বাপ্য দীপান্
কবলিতনবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ ॥

প্রভাতে যশোমতীর দধিমন্থন শব্দ শুনে, যে নিদ্রা ত্যাগ করে, ধীরে ধীরে ব্রজ-গোপীগণের গৃহে নিঃশব্দে প্রবেশ করে, তারপর মুখে ফুঁ দিয়ে গৃহের প্রদীপ সমূহ নিবিয়ে দিয়ে নবনী ভক্ষণ করে—সেই বাল শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন।

সব্যে পানৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কিনীদাম ধৃত্বা
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্য।
অক্ষোর্ভঙ্গ্যা বিহসিত মুখীর্বারয়ণ সম্মুখীনা
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥

একদা কিঙ্কিনীধ্বনি নিয়মিত করিবার জন্য বামহস্তে কিঙ্কিনী-দাম-ধৃক, কুব্জদেহে পাদাগ্রভাগাবলম্বনে গতিশীল, মৃদুমন্দ-হাস্যবদন শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকনপূর্বক সম্মুখস্থিতা গোপীগণ হাস্য করিতে থাকিলে, শ্রীহরি নেত্রভঙ্গী-দ্বারা তাঁহাদের হাস্য নিবারণ করিতে করিতে মাতার পশ্চাদ্ভাগে স্থিত সদ্যোজাত নবনীত হরণ করিয়াছিলেন। —অনুবাদ, সুন্দরানন্দ বিদ্যানিধি।

॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান—জ্ঞান-সূর্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম দুইই ছিল।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, ৯ম খণ্ড ৪র্থ পরি·

কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে কোন সন্দেহ নেই।···

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম ভাগ ৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ

ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞানও হয়। ভগবান সর্বশক্তিমান, মনে করলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু', আমি ছেলে, তুমি মা', এই অভিমান রাখতে চায়।···

আর 'চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।' আমার এমন কখন ইচ্ছা হয় না যে বলি, আমি ব্রহ্ম।' আমি বলি, 'তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস'। পঞ্চম ভূমি আর ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ্ খেলানো চলে। ষষ্ঠভূমি পার হয়ে সপ্তম ভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নাম গুণগান করব, এই আমার সাধ। সেব্যসেবক ভাব খুব ভাল। আর দেখো, গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না। 'আমিই সেই', এ অভিমান ভাল নয়। দেহাত্ম বুদ্ধি থাকতে যে এ

অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়, এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায়, আবার নিজে নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না।

কিন্তু ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি—প্রেম অনুরাগ না হলে ভগবান লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপরে ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

আর এক রকম ভক্তি আছে। তার নাম বৈধীভক্তি। এতো জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো উপচারে পূজা করতে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে—এসব বৈধী ভক্তি। এসব অনেক করতে করতে ক্রমে রাগ ভক্তি আসে। কিন্তু রাগ ভক্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই, সংসার বুদ্ধি একেবারে চলে যাবে আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।

কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা আপনি হয়। স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি; যেমন হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপরে ভালবাসা আসবে বলে জপতপ উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপরে অনুরাগ, প্রেম আপনি এলে, জপাদি কর্মত্যাগ হয়ে যায়। হরি-প্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধী কর্ম কে করবে ?···

যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা উপদেশ ধারণা করতে পারে না। পাকা ভক্তি হলে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি (Silver nitrate) মাঝখানে থাকে, তাহলে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ তেমনি। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না।······

ভক্তিদ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম ভাগ ৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যেদেবের তিনটি অবস্থা হত। (১) বাহ্যদশা—তখন স্থূলে আর সূক্ষ্মে তাঁর মন থাকত। (২) অর্ধবাহ্যদশা—তখন কারণ শরীরে, কারণানন্দে মন গিয়েছে। (৩) অন্তর্দশা—তখন মহাকারণে মন লয় হত।

বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। স্থূল শরীর, অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ। সূক্ষ্ম শরীর, অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। কারণ শরীর

অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। মহাকারণ, পঞ্চকোষের অতীত। মহাকারণে যখন মন লীন হত তখন সমাধিস্থ।—এরই নাম নির্বিকল্প বা জড় সমাধি।······

চৈতন্যদেব ভক্তির অবতার; জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, ১১ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন—ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—ওঁ ওঁ ওঁ—মা আমি কি বলছি! মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁস কোরো না—মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না। আমি যে ছেলে! ভয়তরাসে! আমার মা চাই। ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটী নমস্কার! ও যাদের দিতে হয়, তাদের দাও গে। আনন্দময়ী! আনন্দময়ী!

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ ১০ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যদেব, গোপীপ্রেম ও স্বামী বিবেকানন্দ

।। এক ।।

একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক' জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা জাগিয়াছিল কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম-জীবনের সহভাগী হইয়াছিল।

একটু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শ্রীচৈতন্য একজন ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন সুতরাং ভারতী ছিলেন বটে, কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীই প্রথম তাঁহার ধর্ম-প্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন। বোধহয় পুরী সম্প্রদায় বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিকতা জাগাইতে বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তোতা-পুরীর নিটক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য ব্যাস-সূত্রের যে ভাষ্য লিখেন, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, না হয় এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।* তাঁহার শিষ্যেরা দাক্ষিণাত্যের মাধব সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিলেন। ক্রমশঃ রূপ-সনাতন ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আসন বাবাজীগণ অধিকার করিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যের মহান সম্প্রদায় ক্রমশঃ

* সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। যাহাতে সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের না হইলেও বিশেষ বিশেষ সূত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া শোনা যায়।

ধ্বংসাভিমুখে যাইতেছিল, কিন্তু আজকাল উহার পুনরভ্যুত্থানের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আশা করি উহা শীঘ্রই আপন লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবে।

সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানেই লোকে ভক্তি-মার্গ জানে, সেইখানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদরপূর্বক চর্চা করিয়া থাকে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা মাত্র। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না তাঁহার প্রভাব এখনও কিরূপে সমগ্র ভারতে কার্য করিতেছে। কিরূপেই বা জানিবেন? তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন।

[মাদ্রাজবাসিগণের অভিনন্দনের উত্তরে আমেরিকা হইতে প্রেরিত বার্তা, ১৮৯৪ খৃঃ অঃ]

।। দুই ।।

আমি এক্ষণে এই আর্যাবর্ত নিবাসী ভগবান শ্রীচৈতন্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া এই বক্তৃতা শেষ করিব। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন। (চৈতন্যদেব স্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখনকার এক খুব পণ্ডিত বংশে তাঁহার জন্ম হয়।) তিনি ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া বাগ্‌যুদ্ধে লোককে পরাস্ত করিতেন। ইহাই তিনি অতি বাল্যাবস্থা হইতে জীবনের উচ্চতম আদর্শ বলিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোন মহাজনের কৃপায় এই ব্যক্তির সারা জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল। তখন তিনি বাদ-বিবাদ, তর্ক, ন্যায়ের অধ্যাপকতা সবই পরিত্যাগ করিলেন। জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন এই প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়া সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। শুধু পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র-অপবিত্র, বেশ্যা-পতিত, সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল। সকলকেই তিনি দয়া করিতেন; এবং যদিও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায় ঘোরতর অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে (যেমন কাল প্রভাবে সবই অবনতি-প্রাপ্ত হইয়া থাকে) তথাপি আজ পর্যন্ত উহা দরিদ্র, দুর্বল, জাতিচ্যুত, পতিত, কোন সমাজে যাহার স্থান নাই এইরূপ সকল ব্যক্তির আশ্রয়স্থল।

—ভারতে বিবেকানন্দ

।। তিন ।।

তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা অতি দুর্বোধ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্র স্বভাব হইতেছে

ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা বুঝিবার চেষ্টা করাও উচিত নয়। সেই প্রেমের অত্যদ্ভুত বিকাশ যাহা সেই বৃন্দাবনের মধুর লীলায় রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে প্রেম মদিরা পানে যে একবার উন্মত্ত হইয়াছে সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে অক্ষম। কে সে গোপীদের প্রেমজনিত বিরহ-যন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সমর্থ যে প্রেম চরম আদর্শস্বরূপ, যে প্রেম আর কিছু চাহে না, যে প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্খা করে না, যে প্রেম ইহলোকের পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না। আর হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ-নির্গুণ ঈশ্বরবাদের একমাত্র সামঞ্জস্য সাধন হইয়াছে। আমরা জানি মানুষ সগুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা করিতে অক্ষম। আমরা ইহাও জানি দার্শনিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগদ্ব্যাপী—সমগ্র জগৎ যাঁহার বিকাশ মাত্র, সেই নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসই স্বাভাবিক। এদিকে আমাদের প্রাণ একটা সাকার বস্তু চায়, এমন বস্তু চায় যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারি। সুতরাং সগুণ ঈশ্বরই মানবস্বাভাবের চূড়ান্ত ধারণা। কিন্তু যুক্তি এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারেনা। এই সেই অতি প্রাচীন প্রাচীনতম সমস্যা—যাহা ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত হইয়াছে, যাহা লইয়া বনবাসকালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সহিত বিচার করেছিলেন—যদি একজন সগুণ সম্পূর্ণ দয়াময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকেন, তবে এই নরকবৎ সংসারের অস্তিত্ব কেন? কেন তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন? তাঁহাকে একজন পক্ষপাতী ঈশ্বর বলিতে হইবে। ইহার কোনরূপ মীমাংসই হয় নাই। কেবল গোপীপ্রেম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা পড়িয়া থাক, তাহাতেই ইহার মীমাংসা হইয়াছে। (গোপীগণ) কৃষ্ণের প্রতি কেন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে চাহিত না। তিনি যে সর্বশক্তিমান তাহা তাঁহারা জানিতে চাহিত না। তাঁহারা কেবল বুঝিত তিনি প্রেমময়, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। গোপীরা কৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিত। সেই বহু অনিকিনীর নেতা, রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট বরাবর সেই রাখাল বালকই ছিলেন।

'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভগবদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥' —শ্রীচৈতন্য

"হে জগদীশ! আমি ধন, জন কবিতা বা সুন্দরী—কিছুই প্রার্থনা করি না, হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি জন্ম জন্ম যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।" ধর্মের ইতিহাসে ইহা এক নতুন অধ্যায়। এই অহৈতুকী ভক্তি এই নিস্কাম কর্ম আর মানুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। ভয়ের ধর্ম, কামনার ধর্ম চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল; আর

মনুষ্য-হৃদয়ের-স্বাভাবিক নরকভীতি, স্বর্গ সুখ ভোগেচ্ছা সত্ত্বেও এই অহৈতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের অভ্যুদয় হইল।

এই প্রেমের মহিমা আর কি বলিব। এইমাত্র বলিয়াছি যে, গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন নির্বোধের অসম্ভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই অপূর্ব অংশের অদ্ভুত তাৎপর্য বুঝিতে অক্ষম। আমি আবার বলিতেছি, আমাদের সহিতই শোণিত সম্বন্ধে সম্বন্ধ অশুদ্ধাত্মা নির্বোধ অনেক আছে, যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে যেন উহাকে অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া দশ হাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাই, আপনার মনকে আগে বিশুদ্ধ কর, আর তোমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন তিনি আর কেহই নহেন, সেই আজন্ম-শুদ্ধ ব্যাসতনয় 'শুক'। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে, ততদিন ভগবৎপ্রেম অসম্ভব। উহা কেবল দোকানদারী; আমি তোমায় কিছু দিতেছি, তুমি আমায় কিছু দাও। আর ভগবান বলিতেছেন যদি তুমি এরূপ না কর তাহা হইলে তুমি মরিলে তোমায় দেখিয়া লইব। চিরকাল আমি তোমায় দগ্ধ করিয়া মারিব। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বর-ধারণা এইরূপ। যতদিন মাথায় এইসব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদের প্রেমজনিত বিরহের উম্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে?

"সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্মরতিবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥
—শ্রীমদ্ভাগবত

"একবার, একবার মাত্র যদি সেই অধরের চুম্বন লাভ করা যায়। যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, চিরকাল তোমার জন্য তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তখন অন্যান্য সকল বিচারে আসক্তি চলিয়া যায়। কেবল একমাত্র তুমিই প্রীতির বস্তুও হও।"

প্রথমে এই কাম, কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই—কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিস যে সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্তে যাহাদের হৃদয়ে কাম, কাঞ্চন যশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে, উহার সমালোচনা করিতে যায়। কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা। এমন কি দর্শন শাস্ত্রশিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই

অপূর্ব প্রেমোন্মত্তার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, গীতার সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদনের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্তা মাত্র বিদ্যমান, এখানে গুরুশিষ্য, শাস্ত্র উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ধর্মের ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে— আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছুই মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ—একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তাহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা!

* * * *

মানব ভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠতম আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমরা তাঁহার (বেদব্যাসের) গ্রন্থে গোপীজন-বল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ হইতে আর কোনও উচ্চতর আদর্শ দেখিতে পাই না। যখন তোমাদিগের মস্তিষ্কে এই উন্মত্ততা প্রবিষ্ট হইবে, যখন তোমরা মহাভাগা গোপীগণের ভাব বুঝিবে, তখনই প্রেম কি বস্তু জানিতে পারিবে। যখন সমগ্র জগৎ তোমাদের দৃষ্টি পথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোন কামনা থাকিবে না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, আর কোনও লক্ষ্য থাকিবে না, এমন কি, তোমাদের সত্যানুসন্ধান স্পৃহা পর্যন্ত থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহেতুক প্রেমের শক্তি বুঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যখন এই প্রেম পাইলে—তখন সব পাইলে।

—ভারতে বিবেকানন্দ



॥ নয় ॥



চিঠিপত্রে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য

(শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত অসংখ্য পত্র পেয়েছি। সব চিঠি প্রকাশ করতে হলে একটি সম্পূর্ণ আলাদা পুস্তকের পরিকল্পনা করতে হয়। তা কোন দিন সম্ভব নয়। এই সব পত্র থেকে কয়েকটির অংশ বিশেষ মাত্র এখানে প্রকাশ করছি। সকল পত্র লেখককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই। যুগান্তর, আনন্দবাজার ও আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা এতে স্থান পায়নি। —লেখক)

অভয়ঙ্করীর চিঠি। শান্তিনিকেতন থেকে। তারিখ ২।১২।৮৫। আপনার লেখা 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য'—বইখানা আমাব হাতে এসেছে অল্প কিছুদিন হল। যতই পড়ছি ততই অবাক রহস্যে মনটা তলিয়ে যাচ্ছে। পড়ছি বললে ঠিক বলা হবে না। অবগাহন করছি বললে কিছুটা ঠিক বলা হয়। শান্তিনিকেতনের একটি প্রান্তে বসে আপনার কাছে এই পত্র দিচ্ছি। আপনার কাছে আমি কিন্তু অন্তত একটি পত্র আশা করি। এখানে আমাদের আস্তানা 'আলোক তরণী'।

রবীন্দ্রনাথের অঞ্চলে এই 'আলোক তরণী'তে বসে আপনার বই পড়ছিলাম। আপনার রচনার রীতি নীতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। সত্যকে উদ্ঘাটন করবার প্রয়াস এবং সত্যের প্রতি ভালবাসা—আপনার এই দুটো জিনিস আমার কাছে লাগছে খুবই জীবন্ত এবং প্রাণস্পর্শী। এমন একটা বিষয় নিয়ে বই লিখতে গিয়েও আপনি অন্তরের রস বস্তুটিকে কোথাও হারিয়ে ফেলেন নি। এক কথায় বলা চলে, বইখানি অপূর্ব।

আর একটা কথা। আপনি ভক্ত তো নিশ্চয়। কিন্তু আপনার ভক্তি উদ্দামও নয়, উদ্দণ্ডও নয়। বরং কিছু উদ্বেল। তবে বেলাভূমিকে অতিক্রম করলেও আপনার লেখা সৌন্দর্যকে এবং মাধুর্যকে কিছু মাত্র অতিক্রম করেনি। আপনার অন্তরের বৈতালিক তালে একেবারে নিখুঁত।......

অরুণেন্দু নাথ নন্দী। তুলসীতলা, পোঃ রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর থেকে গত ১৬।৯।৮৫ তারিখে দীর্ঘ পত্র দিয়েছেন। অংশ বিশেষ।

আপনার গ্রন্থে কয়েকটি ভুলত্রুটি চোখে পড়ল।...আপনি লিখেছেন রাশিচক্রে বা জ্যোতিষমতে শ্রীচৈতন্যের পক্ষে দীর্ঘায়ু হওয়া সম্ভব না। সুতরাং তিনি অল্প বয়সেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আপনার বন্ধু সুকদেব বাবুর গণনা ভুল। কেন না শনি তুলায় নয়, রাশিচক্র দৃষ্টে শনি মকরে; মঙ্গল মকরে নয়, কুম্ভে; এবং শুক্র মীনে নয়, কুম্ভে রয়েছে। 'মীন' বানানও তিনি ভুল করেছেন 'মিন' লিখে। এতে সংস্কৃত জ্ঞানেরও অভাব প্রমাণিত হচ্ছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র অত সহজ নয়। অত্যন্ত জটিল এবং বহু রকমের বিচার আছে। অল্পবিদ্যা সত্যই ভয়ঙ্করী। ডিগ্রী থাকলেই পণ্ডিত হয় না। বৃশ্চিকে শনি থাকলে সাধারণতঃ শনি অশুভ ফল দেয়—তবে সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ঘাত প্রতিঘাতের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প, কষ্টসহিষ্ণু, সহ্য করতে পারলে বাধা অতিক্রম এবং মায়াজাল বিস্তারের শক্তিও দেয়। শুভদৃষ্টি হলে বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিলাভ হয়। সিংহ লগ্নের পক্ষে মঙ্গল তত ভাল নয়। কিন্তু বৃহস্পতিসহ মঙ্গল থাকায় (গুরু মঙ্গল যোগ) শুভ। ফল নেতৃত্ব। শুক্রবলী হলে ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী হয়। শ্রীচৈতন্য বিরাট ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী। সিংহ লগ্ন, লগ্নে চন্দ্র, মিত্র কেতু সহ। অতএব দীর্ঘ জীবন। সুন্দর দেবতুল্য কান্তিমান দেহ। ফলে ৪৮ বছর বয়সে মৃত্যু না হওয়ারই কথা। অষ্টমপতি বৃহস্পতি পঞ্চমে স্বক্ষেত্রী ও মিত্র সহ দীর্ঘায়ুর পরিচয় দেয়। তাঁর পবিত্র মৃত্যু অর্থাৎ ইচ্ছা মৃত্যু। সুতরাং শত্রু হস্তে মৃত্যু অসম্ভব। সাধনা দ্বারাও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা সম্ভব। পাতঞ্জলের 'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা' সূত্রানুসারে শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর কৃপায় সব সিদ্ধিই লাভ করতে পারেন। 'কায়াকাশ সম্বন্ধ সংযমে' যেমন লঘুত্ব লাভ হয়, তেমনি আবার 'কায়রূপ সংযমে' অন্তর্ধান শক্তি লাভ হয় (কায়রূপ সংযমাত্তদ্গ্রাহ্য শক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃ প্রকাশা সংযোগইহন্তর্ধানম্)। অদৃশ্য হয়ে থাকা বা চলে যাওয়া ও তাঁর পক্ষে অসাধ্য নয়। (আপনাদের হিসাব মত) ২৮৪ বছর বা ৩৬২ বছর বেঁচে থাকা মোটেই কঠিন নয়, মহাসাধকের পক্ষে। একবার একজন তান্ত্রিক যোগী (১২০ বছর বয়স) আমাদের বলেছেন তিনি হিমালয়ের দুর্গমস্থানে একাধিক সিদ্ধ পুরুষ দেখেছেন। এঁদের বয়স হাজার বছরের কম নয়। পাতঞ্জল সূত্রে ইচ্ছামৃত্যুর কথাও পাওয়া যায়। জীবন্মুক্ত হলেই দেহত্যাগ করে পরামুক্তি লাভ হবে তখনই—একথা সত্য নয়। ইচ্ছা না হলে দেহত্যাগ হয় না এঁদের। নানা কারণে এঁরা জীবন ধারণ করেন।

সম্প্রতি যুগান্তর পত্রিকায় 'ধর্মকর্মে'র স্তম্ভে বালক ব্রহ্মচারীকে শ্রীচৈতন্য বলে

প্রচার করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য নাকি বলেছিলেন তাঁর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যার চতুর্দশতম শাখায় তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। 'পরিবর্তন' এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তিনি নাকি বলেছেন, তাঁর প্রায় ৪ কোটি শিষ্য হয়েছে। তবে তো তিনি সাধারণ প্রভু বা মহাপ্রভু নন। মহা মহা বা অতি মহাপ্রভু। আপনারা বরং তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন শ্রীচৈতন্যের তিরোধান বিষয়ে বা অন্তর্ধান বিষয়ে। তিনিই আউলিয়া চাঁদ হয়েছিলেন কিনা তাও জানতে পারবেন তাঁর কাছে।...

(চিঠিতে অরুণেন্দু বাবু আরো জানিয়েছেন, 'আমার গুরু কৃপায় পূর্বজন্মের স্মৃতিজাগরিত হয়েছিল।' তিনি পূর্ব জন্মে নাকি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুর জেলায়। বর্তমান এঁর বয়স ৭৭ বছর।)

হরিপদ মণ্ডল। প্রধান শিক্ষক, মেদিনীপুর কলেজিয়েট হাই স্কুল। তারিখ—বিজয়া ১৩৯২।

সম্প্রতি সাগ্রহে আপনার লিখিত 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' পাঠ করলাম (২য় সংস্করণ)। প্রথম সংস্করণ আমার হাতে আসেনি। তাই একটু দেরীতে হলেও আপনার এই মহৎ ও দুঃসাধ্য গবেষণা কর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় ও আনন্দ অনুভব করছি।

আপনার এই গবেষণা নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক অভিযান। এই অভিযানের জন্য আপনাকে আমি সর্বান্তকরণে প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। 'দুঃসাহসিক কথাটি সম্পূর্ণ অর্থবহ। কারণ ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মনোভাব সম্বন্ধে আপনার গ্রন্থে যে কথা উল্লেখ করেছেন, আমি প্রত্যক্ষভাবে তা জানি। একটি সভায় আমি শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি শ্রীচৈতন্য-দেবের অন্তর্ধানের কাহিনী বলতে গিয়ে শেষ কথাটি বলতে চাইলেন না। বললেন, 'সে কথা আর বলতে চাই না : আমি জানি শ্রীচৈতন্য কিভাবে দেহত্যাগ করেছিলেন। ইতিহাস বলে দারুব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর মরদেহ লীন হয়ে যায়নি।

এত বড় একজন ঐতিহাসিক সত্যিই ভয় পেয়ে গেছিলেন। সত্য প্রকাশ করলে তিনি নির্যাতিত হবেন। এই আশংকা তাঁর ছিল। অন্ততঃ তাঁর বক্তৃতা শুনে আমার তাই মনে হয়েছিল।

প্রতাপ চন্দ্র রায়। ১/৫৮, যতীন দাস নগর, কলিকাতা-৫৬। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ' ৯৩

...আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, উল্লিখিত পুস্তকটির প্রচ্ছদপট দেখে নিতান্ত আগ্রহাকুল হৃদয়ে বইখানা টেনে নিলাম আমার এক 'বন্ধুর' থেকে তখন তার বইটির বার আনা পর্যন্ত পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। বন্ধুটিকে প্রশ্ন করিলাম, 'যতটুকু পড়েছেন

তার বিষয়মর্ম কি আমাকে বলুন। তদোত্তরে বন্ধুটির নিকট হইতে যাহা জানিতে পারিলাম, তাহার বিষয় মর্মে বড়ই বেদনার কারণ হ'লো যেহেতু কেননা, যে দেহ অত্যন্ত সযত্নে সোহাগ ভরে ধারণ কর্তে হয় তাঁহার প্রতি যে আচরণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবাইত পাণ্ডাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া আপনার লেখনিতে ধরা দিল, তাহা কি নিতান্তই মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক নয় ?

আপনি বহু পুস্তক, বহু গ্রন্থ, অনুসন্ধান করিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে যে সব তথ্যাদি আহরণ করিয়াছেন তাতে কিন্তু আপনি শেষ পর্যন্ত সঠিক সমাধান কিছুই দিতে পারেন নাই। ইহা শুধু 'মরুতে' জল ঢালার মত অবস্থা নয় কি ? আপনি যদি কোথাও এর সঠিক সমাধান পাইয়াও থাকেন, তবে কি তাহা নিতান্তই গোপনীয় নয় ?

কারণ যিনি বিশ্ববাসীর অন্তরের দেবতা পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'শেষ অবতার' তিনি নররূপে আবির্ভূত হয়ে জীব সকলের সঙ্গে মিশে 'কলিহত' জীবের কল্যাণে শ্রীনামে প্লাবন এনে প্রেমের বন্ধনে 'প্রেমাতুর' হয়ে 'গম্ভীরা'য় থাকতেন। নিজের পার্শ্বদদেরও চিনতেন না। এমনি ভাবে শ্রীমন্দিরে "পুরুষোত্তমের" সঙ্গে লীন হওয়া বিচিত্র কি ? তাঁহার "স্থূলদেহ" শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমে'র সঙ্গে লীন হয়ে গেলেন, ইহাই বাস্তব সত্য জেনে আপনার লেখনি স্তব্ধ হয়ে যায়নি কেন ? আপনি শ্রীপ্রভুর অর্থাৎ চৈতন্যের স্থূল দেহ অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে সাধারণ বটতলা সিরিজের ডিটেকটিভ গোয়েন্দাদের মত নেমে পড়লেন। বলিহারী আপনার সাধুবাদ।

প্রকাশ থাকে যে 'উৎকল' আর মেদিনীপুর' অঙ্গাঙ্গী জড়িত। কারণ নীলাচলের পথে অনেক বৈষ্ণব, সাধু সন্তদের পদরজ আজও মেদিনীপুরের বুকে বিদ্যমান।

অপূর্বকুমার কুন্ডু। পূর্ব পুটিয়ারী, ২৪ পরগণা। তারিখ ১৬।১১।৮৫

আপনার লেখা 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' পড়লাম। শুধু বলতে পারি 'অসাধারণ'। আপনার নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রইলো এই বইখানা। অনেক বাধা নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে আপনি এগিয়ে গেছেন। আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বিস্মৃত নিষ্ঠুর এক ইতিহাস। আপনাকে ধন্যবাদ।

এবার আমার প্রয়োজনে একটা কথা লিখছি—এবং আপনার কাছেই এর খোঁজ পাবো এই আশায়—শ্রীরূপ ও সনাতনের পূর্ণাঙ্গ জীবনী কোথায় পাবো। কলেজ স্ট্রীটের কোন প্রকাশকের কাছে পাবো অনুগ্রহ করে যদি জানান তবে কৃতজ্ঞ থাকবো।

সনৎকুমার পাল। মুথাডাঙ্গা, মায়াপুর, হুগলী। তারিখ ১৭।৪।৮৬

আপনার লেখা 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' বই পড়ে অনেক অজানা ঘটনা জানতে পারলাম। মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে এর আগে হয়তো অনেক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে।

হইলেও এমন নির্ভীকভাবে কেউ প্রকাশ করেন নি। এজন্য জানাই আপনাকে আমার হৃদয়ের সশ্রদ্ধ প্রণাম।... আমার মতে, অনুমান আপনার সত্য। তবে ঠিক কখন কোথায়, কিভাবে প্রভুকে প্রাণ দিতে হলো এবং এর নায়ক কে? কোথায় শায়িত আছেন প্রভুর কলেবর, তা এখনও সম্পূর্ণরূপে কিছু জানতে পারলাম না। এ কার্য আপনাকেই সম্পাদন করতে হবে।

এখন আপনার গ্রন্থ হতে দু'একটি ছত্র লিখি যা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। প্রথমত শ্রীচৈতন্যের জন্ম ইং ১৪৮৬ খ্রীঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী। পৃঃ নং ৫৪ এবং ইং ১৫৩০ খ্রীঃ ২৯শে জুন কিংবা জুলাই মাসে প্রভু অন্তর্ধান করেছিলেন। এখন প্রশ্ন প্রভু জীবিত ছিলেন ৪৮ কিংবা কিছু কম। এখানে তা হচ্ছে না। প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্তমদের ১৪৭৯—১৫৩৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ১৪৬৫ খ্রীঃ পুরুষোত্তমদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। (পৃ. ৬২)। আবার হুসেন শাহ আসাম পরাজয়ের ক্ষোভ মেটাতে উড়িষ্যা জয়ের জন্য পাঠিয়ে দিলেন একদল বীর সাহসী সৈন্য বাহিনী। এ হলো ১৪০৯ খ্রী. ঘটনা। উৎকলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব তখন যুদ্ধ ব্যপদেশে অবস্থান করছেন দূরদেশে বিজয়নগরে (পৃ. ৬৩)। এখানে প্রশ্ন যদি প্রতাপরুদ্রদেবের পিতা ১৪৬৫ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন তবে কি ভাবে পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব 'মহারাজ' হলেন ১৪০৯ খ্রীঃ। কি ভাবে সম্ভব হলো বুঝতে পারলাম না। মনের মধ্যে অনেক জটিলতা ভীড় করছে। এবং দুঃখ হচ্ছে প্রভুর প্রকৃত হত্যাকারী কে জানতে না পারায়। যাইহোক, গৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করে আপনি আরও অগ্রসর হউন এবং পরবর্তী গ্রন্থ প্রকাশ হইলে যেন জানতে পারি। দয়া পূর্বক আমার এই প্রশ্নগুলির (বাসনা) উত্তর দিয়া আমায় শান্তি দান করুন।

কিঙ্কর রামানন্দ। শ্রীশ্রীসীতারাম মন্দির, জনার্দনপুর, মেদিনীপুর।

...আপনার বইটি আমি আরও কয়েকবার পড়েছি। বেশ কয়েকটি জিজ্ঞাসা রয়েছে। ...২। শ্রীচৈতন্যদেবের পায়ের মাপ। শ্রীচৈতন্যদেবের পায়ের খড়ম বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কবে রাধাকান্ত মঠে দিলেন? আমার বয়স ৭২ বৎসর হইল। আবাল্য সে সময়কার বয়োবৃদ্ধদের কাছে শুনিয়া আসিতেছি শ্রীচৈতন্যদেবের পাদুকাযুগল নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেবিত গৌরাঙ্গ মন্দিরে শ্রীচৈতন্য বিগ্রহের সহিত অর্চিত হইয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতার পত্রিকাগোষ্ঠীর উদ্যোগে ঐ পাদুকা যুগল এক দোল পূর্ণিমার সময় কলিকাতায় লইয়া যাইয়া শোভাযাত্রা করা হইয়াছিল। এই পাদুকা হইতেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরণের মাপ সহজেই পাওয়া যাইতে পারে।

(বিঃ দ্রঃ—নবদ্বীপের ঐ পাদুকাযুগলও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত নয়। রাধাকান্ত

মঠে শোনা কথা। তবে 'চৈতন্য চকড়া'র সাক্ষ্য অনুসারে প্রভুর অন্তর্ধানের পর অতি-বড়ী জগন্নাথ দাস রাধাকান্ত মঠে এই পাদুকায় অর্ঘ্য দান করেছিলেন।—লেখক)

শংকর চৌধুরী। কাঁঠালপল্লী, পোঃ চাকদহ, জেলা—নদীয়া।

আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। তবে আপনার শ্রীহস্তনিসৃত বাণী কর্মের সঙ্গে পরিচিত। তাই আমার তথা চাকদহ ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশততম জন্মজয়ন্তী কমিটির সদস্যবৃন্দ একান্ত ভাবেই আপনার সান্নিধ্য কামনা করে। আপনার লেখনী যেমন বাঙময় সেইরূপ আপনার শ্রীমুখ হতেও কিছু অমৃত ভাষণ মহাপ্রভু সম্পর্কে শুনতে আগ্রহী। আগামী দোলপূর্ণিমার পূর্বে যে কোন এক রবিবার যদি আপনাকে পাই তবে চাকদহবাসীকে আহ্বান করে শোনতে আগ্রহী। আপনি কি এইটুকু অনুগ্রহ আমাদের করবেন না? আপনার কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তার জন্য যতটুকু সম্ভব যত্ন নিতে পরাঙ্মুখ হব না।—

সুবলচন্দ্র দাস। ইউকো ব্যাঙ্ক, শোভানগর, মালদহ।

আপনার তথ্য সমৃদ্ধ শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য পড়লাম। বেশ লাগল। তবে গবেষণা মূলক গ্রন্থে 'জানি কিন্তু বলবো না।' প্রমাণ নেই তথ্য নেই—কি করে বলবো প্রাণের ভয়'—এসব এড়িয়ে গেলেই ভালো হয়। আর শ্রীচৈতন্যদেব যে সব জায়গায় আক্রান্ত হন বলে কথিত—সে সবের জন্য একটা বা একাধিক ম্যাপ দিন—দেখবেন পাঠকদের খুবই সুবিধা হবে। পরিশেষে আপনার পরিশ্রমের জন্য রইল ধন্যবাদ।

অনুপম আচার্য। কালিন্দী, মেদিনীপুর। ১৪।৩।৮৬।

আপনার লেখা 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' রাত জেগে গভীর উৎকণ্ঠা ও আবেগের সঙ্গে পড়লাম। আপনি যে ব্যাখ্যা করেছেন আমি তার সঙ্গে প্রায়ই এক মত। কয়েকটি জায়গায় আমার বক্তব্য আছে। তা পরবর্তী কালে সময় মত জানাবো।

শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান সম্পর্কে আমি সদ্য গবেষণার দিকে এগোচ্ছি। আশা করি এতে আমি আপনার সাহায্য পাব। তরুণ গবেষকদের আপনি উড়িষ্যার পল্লীতে পল্লীতে খুঁজে ফিরতে হবে বলেছেন। কাজেই আমি কিভাবে আপনার সাহায্য ও আশীর্বাদ পেতে পারি অতি সত্বর উপরোক্ত ঠিকানায় দয়া করে জানাবেন। অগ্রজ গবেষকের কাছে অনুজ গবেষকের প্রার্থনা।

ভুবন দেবনাথ। সহ-সভাপতি, রাণাঘাট হরিসভা। বৈষ্ণবাচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ রোড। মনসাতলা পাড়া। রাণাঘাট, নদীয়া। তারিখ নাই। পেয়েছি

······আজ সেই অস্ত্র হাতে পেলাম আপনার লিখিত 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য।'······হরিসভায় আপনার শ্রীমুখের কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে আনন্দ পাওয়ার

অপেক্ষায় রহিলাম। তারপর নবদ্বীপ, সমাজ বাড়ী, চিন্তামণি বাড়ী, শ্রীবাস আঙিনায় এবং ইস্কন গৌড়ীয় মঠ মায়াপুর যাব। তারপর আমার এক ঘনিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীকানাই নাথ, যিনি 'মাতঙ্গিনী হাজরা' নাটক লিখে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন, বনগাঁ ২৪ পরগণা তাঁকে আপনার লিখিত অন্তর্ধান দেখাইয়াছি। 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান' একটি যাত্রা বই লিখবেন, যদি আপনার সম্মতি পায়। তাঁর নিকটও যাব। এবং এর প্রচারের দায়িত্ব আমি যদি নিতে পারি তবে মনে করিব শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কিছু করিতে পারি আপনাদের মত বৈষ্ণবগণের কৃপায়। আর লিখতে পারছি না চোখ ঝাপসা হয়ে এল। যখনই বইটি পড়তে বসি তখনই চক্ষুর জলে বক্ষ ভেসে যায়। আর আপনার বড় মা, আপনার ফটোর শ্রীচরণে এক ফোঁটা অশ্রুজল দিয়ে বৈষ্ণব চরণে প্রণতি জানাই।···আপনার পদার্পণে রাণাঘাট বৈষ্ণবগণ ধন্য হবেন প্রতীক্ষায় দিন গুণছি। শ্রীমন্ গৌরসুন্দরের চরণে প্রার্থনা জানাই যেন আপনার এত কর্ম সাধ্য গবেষণা সার্থক হয়। পত্র পাওয়া মাত্র উত্তর দিবেন। কবে আসতে পারেন সেই মত তৈরী থাকব।

তারকনাথ গুপ্ত। সেনপাড়া, কালনা, বর্ধমান।

'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' পড়লাম। আপনি যে পরিশ্রম করেছেন তা কতটুকু সার্থক হয়েছে প্রভুই জানেন। কিন্তু অকারণ হয়েছে সবটুকুই। একথা বলার জন্য অবশ্যই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের কাছে যা অজানা আজও ঠিক সেদিনও ঠিক সংবাদটি অজানাই ছিল। প্রভুর পার্ষদবর্গ তাঁর সঙ্গে সেদিন কেউই ছিলেন না—একমাত্র গদাধর ছাড়া। প্রভু দেহত্যাগ করেছিলেন······(পড়া যায় নি) তাঁর ইঁটের আঘাতে পায়ে ক্ষত হয়, তিনি কারো কাছে তা প্রকাশ করেননি, এবং কোন প্রকার প্রতিষেধকও ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি সম্পূর্ণ দেহমনে শূন্য হয়েই ভাবাবেগে থাকতেন। চেষ্টা করেও তাঁকে কিছু খাওয়ান যেত না। শরীরও অত্যন্ত, দুর্বল ও রক্তহীন হয়ে পড়েছিলেন। তবে দেহত্যাগের সঠিক সময় বৈকাল। প্রতাপরুদ্রদেব সংবাদ পান সঠিক কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর মরদেহও গুণ্ডা মন্দিরের প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়। অনেকেই পূর্বে স্থানটি দেখেছেন। পরবর্তী কালে তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয় নাই। পুরুষোত্তমের দেহেই লীন হওয়া ভক্তরা এই মতই প্রচারের যুক্তিতে চিহ্নিত স্থান নিশ্চিহ্ন করেন। এই কাজের প্রধান উদ্যোক্তা শিষ্য রামদাস বাবাজী মহাশয়।

মহাপ্রভুর সম্বন্ধে আর অকারণ মাথা ঘামাবেন না। মহাপ্রভুর কোন শত্রু ছিল না। তৎকালে রাজ্যের অবস্থা যতই শোচনীয় হোক প্রভুর মহাভাবের কোন বিঘ্ন সম্পাদন করতে সমর্থ হয়নি।

সেবক জীবনকৃষ্ণ। সম্পাদক, শ্রীগুরু আশ্রম-ত্রৈলঙ্গ মঠ। ৩৫, বিদ্যায়তন সরণী, কলিকাতা-৩৫।

পত্রে আমার সর্বান্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনার লিখিত 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' বইটি আগাগোড়া পড়ে খুব তৃপ্তি পেলাম আপনার সত্যানুসন্ধিৎসার।

বাংলা মায়ের সুসন্তান বাঙালীর গৌরব শ্রীচৈতন্যকে ভগবান সাজিয়ে-খোল করতালি ও গৌরহরির নাম করে তাঁর আসল সত্ত্বাকে চাপা দিয়ে রেখেছি। লৌকিক মানবদেহই যে আলৌকিক ঐশী ঐশ্বর্যের প্রকাশ ক্ষেত্র একথা জেনেও যেন জানি না। এই অন্তর্ধান রহস্যের সত্য উদ্ঘাটনে আপনার অসীম ধৈর্য অধ্যবসায় অক্লান্ত প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্হ। শ্রীচৈতন্য জীবনী সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত বলিয়া আপনার এই সত্য উদ্ঘাটন প্রচেষ্টা আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছে। আমার এ পত্র আপনার গবেষণার বিশেষ কিছু দিতে পারবে না জানি, তবু আপনার মত একজন অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসুর সহিত একটু আলোচনা করে আত্মতৃপ্ত হতে চাই।

প্রথমতঃ চৈতন্যদেবের জীবন বৃত্তান্ত বেশীর ভাগই ছন্দোবদ্ধ ভাব-ব্যঞ্জনায় ভরপুর হওয়ায় ইহার সরল অর্থবোধ কষ্টসাধ্য, আবার বিভিন্ন ভাবুকের ভাব-ভাবনায় সামঞ্জস্য পাওয়াও দুষ্কর। অন্তর্ধান রহস্যে যে দু'টি দৃষ্টান্ত রেখেছেন—একটি শিবাজী ও অপরটি নেতাজী, দুটিই রাজনৈতিক হলেও দু'জনেই ছিলেন ভারত মনীষার ঐশীশক্তির স্পর্শপূত। শিবাজীর অন্তর্ধান বিষয় সর্বজন জ্ঞাত হলেও নেতাজী আজও রাজনৈতিক রহস্যে ঢাকা। চৈতন্যের অন্তর্ধান সম্বন্ধে ভক্ত কবিগণের বার্তা যেমন সামঞ্জস্যহীন নেতাজীরও তাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে দু'জনার উদ্দেশ্য কিন্তু একই—চৈতন্য চেয়েছিলেন ভারতবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মের অবসান ঘটিয়ে প্রেম ও ভক্তির বিনিময়ে মানুষের মহানুভবতাকে জাগিয়ে দেওয়া, আর নেতাজী চেয়েছিলেন শক্তিপ্রয়োগে শোষণমুক্ত করে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দান করা। অবশ্য স্থান কাল ভেদে দুজনার সংগঠন কৌশলটা কিছু ভিন্ন ধরণের ছিল। দুঃখের বিষয় কি জানেন—৫০০ বছর পরে বা ৫০ বছর পরে দুজনার অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটিত হলেও, যারা চৈতন্যকে 'ধর্মদ্রোহী' ও নেতাজীকে 'দেশদ্রোহী' বলতে কুণ্ঠিত নয়—তাদের কাছে এই রহস্যই তৃপ্তিকর।... ... ...।

মনে হয় কি জানেন—এ রহস্যের সমাধান সমষ্টিভিত্তিক নয়, ইহা ব্যষ্টিভিত্তিক। চৈতন্যহারা মানুষ যদি কি ও কেনর জিজ্ঞাসা নিয়ে নিজের চিদাকাশের গোপন গম্ভীরায় প্রবেশ করতে পারে, ভাগ্যক্রমে যদি তার বোধের বোধন হয়, তবেই তার হৃদয় নির্মল হয়, আর সেই নির্মল হৃদয়েই সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়।

স্বামী বিরজানন্দ গিরি, **সম্পাদক :** সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

সাড়া জাগানো চাঞ্চল্যকর 'শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্যে'র লেখকের অবদান বাংলা সাহিত্য জগতে আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'মালীবুড়ো' শুধু বাংলার লেখক হিসাবে খ্যাত নয়, 'মালীবুড়ো' সারা জগতের চিরস্মরণীয় নাম।

চিত্তরঞ্জন দেবশর্মা। বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬।

আপনি বাস্তবধর্মী হইয়াও গল্প, গ্রাম্যকথা, কিম্বদন্তী, জনশ্রুতি এই সমস্তের খুব ভক্ত। পত্রে যদিও আপনি বলিয়াছেন যে, আপনি ঐতিহাসিক নহেন কিন্তু পুঁথিতে আপনি নিজেকে ঐতিহাসিক বলিয়া দাবী করিয়াছেন, বলিয়াছেন ঐতিহাসিকের ধর্ম পালন করিবেন অর্থাৎ সত্যানুসন্ধান করিবেন, কারো ধর্মে আঘাত করিবেন না। বলিয়াছেন আপনার পুঁথিতে 'তথ্য আছে, অনুসন্ধান আছে, তত্ত্ব কথা নাই।' এইসব কথা আপনি ঐতিহাসিক না হইলেও ঐতিহাসিক গবেষণামূলক কার্যে আগ্রহ থাকিতে পারে; কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে আধুনিকতা ও বাস্তবধর্মী মনোভাবের সমর্থনে ইতিহাসের ঘটনাগুলি যেন বিকৃত ব্যাখ্যার শিকার না হয়।

মোটামুটি আপনার পুঁথির বক্তব্য তাহার প্রকাশ ভঙ্গী এবং অপসিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি হইয়াছে ফলে তাহার পরিণতি সুখকর নাও হইতে পারে। এমনও শুনিতেছি কেহ কেহ ইতিমধ্যে সাংবিধানিক নিরাপত্তার পন্থা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন। এই সমস্ত কারণেই আপনার পুঁথির বক্তব্যাদির মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটি বিষয়ের প্রতিবাদ স্বরূপ ঐ দীর্ঘ পত্রটি দেওয়া হইয়াছিল। উদ্দেশ্য যদি ইতিমধ্যে আপনি আপনার অভিমতাদি সংশোধনের সুযোগ পান। আমার আশা অবশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। আপনার পুঁথির প্রারম্ভে (!) পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন আপনার পুঁথিতে "তথ্য আছে, অনুসন্ধান আছে, তত্ত্ব কথা নেই।" বাস্তবিক যদি তাহাই হইত তবে আমার বা আমার মত সাধারণের আপত্তির কোন প্রশ্নই উঠিত না। প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণবকবি ভক্ত, পণ্ডিত, দার্শনিকগণের রচিত গ্রন্থাদিতে পরিবেশিত তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে ভুল ব্যাখ্যা এবং ততোধিক অপ্রাসঙ্গিক অভিমত প্রকাশ করিবার উল্লাস পরিহার করিতে পারিলে ভাল হইত। চিঠি-পত্রাদিতেও আপনি বলিয়াছেন আপনি শুধুমাত্র সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে স্বাভাবিক প্রশ্নই তুলিয়া ধরিয়াছেন। কোন সিদ্ধান্ত দেন নাই। আপনার এই স্বীকৃতিও সত্য নহে। অন্যথা আপনার পুঁথির বক্তব্য এত বিতর্কিত

হইত না। আপনি স্পষ্ট বলিয়াছেন শ্রীচৈতন্যদেবকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে গদাধর গোস্বামীও স্বরূপদামোদরকেও। তাছাড়া রায় রামানন্দের হত্যার সংবাদও আছে। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে xiii পৃষ্ঠায় ঘোষণা মোতাবেক ধোপে টিকার মত কোন প্রমাণ পেশ না করিয়াই আপনি নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত সমূহ আপনার নিজ মস্তিষ্ক প্রসূত। উপরন্তু শ্রীমন মহাপ্রভু ও তাহার পারিষদগণের সম্পর্কিত মন্তব্য প্রকাশ খুবই অসৌজন্য মূলক এবং অপরের ধর্মবিশ্বাসে অযথা হস্তক্ষেপের সামিল বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, মুরারি গুপ্ত, কবিরাজ গোস্বামী কাহাকেও আপনি রেহাই দেন নাই।

এইসব কারণেই আপনাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করিয়া না দিলে অবিবেচনার কাজই হইবে যে, আপনার *শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য* নামক পুঁথির অনেক অভিমত এবং সিদ্ধান্ত কিন্তু একেবারেই মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না এবং আপনার অনেক বক্তব্য এবং সিদ্ধান্তই সংশোধন যোগ্য। আপনি আমার অভিপ্রায়ের মর্যাদা দেন নাই। জানিয়া শুনিয়াই এড়াইয়া গিয়াছেন এবং নতুন আরো ২।৪টি কাহিনী শুনাইয়া বিষয়টি জটিলতর করিয়া তুলিয়াছেন।

এই সমস্ত বিষয়ে মসী যুদ্ধের আর প্রয়োজন আমি বোধ করিতেছি না। আপনি একদা শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, এক গাছের ডাল ভাঙ্গাকে লুণ্ঠন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে দ্বিধা করেন নাই। পিতৃহন্তাকারী ও ভ্রাতৃহন্তাকারী সিংহাসন দখলকারী একদা ভারত সম্রাটের কার্যের সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দু ধর্মদ্বেষী, হিন্দু মন্দির লুণ্ঠনকারী সম্রাটের তৎকার্যাদির সমর্থনে বৃন্দাবনের পাণ্ডাগণদ্বারা তাহার মহিষীর (ভারত সম্রাজ্ঞীর) শ্লীলতাহানি (ধর্ষণ) করিবার মত দুঃসাহসিক কার্যদ্বারা। তৎকালে এই প্রকার ঘটনা কোনভাবেই সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আপনার হাতে ত আবার নূতন আবিষ্কৃত ইতিহাস রহিয়াছে।

এই পর্যন্ত যাহা দেখিতেছি আপনি শুধুমাত্র বৈষ্ণব ধর্ম নহে, সনাতন হিন্দু ধর্ম ও তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডাদের উপর খুব খাপ্পা। উড়িষ্যার পাণ্ডরা শ্রীচৈতন্য হত্যার আসামী এবং বৃন্দাবনের পাণ্ডারা মোঘল সম্রাজ্ঞীর শ্লীলতাহানির (আপনার কথায় ধর্ষণ) আসামী। আপনার আসল উদ্দেশ্য ক্রমশই রহস্যাবৃত হইয়া আসিতেছে।

শুধু মাত্র জীবিকার জন্যই যদি কেহ কলম ধরিয়া থাকেন, তবে বিতর্কিত বিষয়গুলি আকড়াইয়া না ধরাই কি অধিক অর্থাগমের প্রশস্ত পথ নহে?

সর্বশেষে লোচনদাসের *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে আপনি আপনার পুঁথির ৪৯ পৃষ্ঠায় যে ধরণের মন্তব্য করিয়াছেন তাহাই *শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য* রচনার কারণ বলিয়া আপনাকে শুনাইবার প্রবল ইচ্ছা সংযত করিলাম।

আপনাকে আর বিরক্ত করিব না। খোলাখুলি মতামত প্রকাশের জন্য ক্ষমা চাইছি। জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া।

একটি পত্র

শ্রদ্ধেয় যুধিষ্ঠির বাবু,

আপনার লেখা 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' বইটি আদ্যোপান্ত পড়লাম। প্রথমেই এই 'আপাত বিতর্কিত বিষয়টি' নিয়ে লেখার জন্য আপনাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। যথার্থই মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে যে সব প্রচলিত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তাতে প্রশ্ন জাগে বৈকি। কারণ, তিনি যত উচ্চকোটি স্তরের সাধকই হোন না কেন, দেহ থেকে প্রাণবায়ু নিষ্ক্রমণের পর নশ্বর দেহ পড়ে থাকবেই। তা কোনমতেই দারুময় বিগ্রহে লীন হয়ে গেছে একথা মেনে নেওয়া যায় না, অন্তত আমার কাছে। প্রথমেই আমার একটি অক্ষমতার কথা জানাই—আমি মহাপ্রভু সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করিনি। কাজে কাজেই কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব এ ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু আপনার বইটি পড়েই আমার আর একটি সংশয় বার বার মনে ধাক্কা দিচ্ছে এই পত্রের অবতারণা সেই সম্বন্ধেই।

এই বইটি লেখার সময়েই আপনার কাছে একটি ধারণা স্পষ্ট ছিল, তাহলো শ্রীচৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়েছিল, স্বাভাবিক মৃত্যু তাঁর হয়নি (পৃ. ১৩২)। আপনার এই বইয়ের মধ্যেই মহাপ্রভু সম্বন্ধে যে সব তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়েছে যে মহাপ্রভু যেমন ছিলেন একাধারে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক অপর দিকে তেমনি ছিলেন সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কুটবুদ্ধি প্রয়োগের বিচক্ষণতাও তিনি দেখিয়েছেন। যে ভাবে তিনি রূপ ও সনাতনকে নিজের চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন তা এখনও বর্তমানের বহু রাজনৈতিক নেতার কাছে ঈর্ষার বস্তু।

এ হেন একজন বিচক্ষণ পুরুষ যিনি বুঝতে পারছেন তাঁর প্রাণ সংশয়কর, বিপদ আসন্ন, তখন বোকার মত জগন্নাথদেবের মন্দিরে অরক্ষিত অবস্থায় প্রবেশ করেছিলেন এই তথ্য উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কি মেনে নেওয়া যায়? তাঁরই বিশ্বাসী পার্শ্বচরদের কাছ হতে তাঁর পক্ষে এই ধরণের কাজ স্ববিরোধী হয়ে পড়ে নাকি? (পৃ. ৬৫—৬৬)

মহাপ্রভু নীলাচলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক হলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হতেন স্ব-নিয়োজিত বিশ্বাসী ভক্তগণ মারফৎ। (পৃ. ৯০—৯১)। আপনার এই বইয়ে ৯৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে চৈতন্যের শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি গোবিন্দ বিদ্যাধরের দলে যোগ দিয়েছিলো।

এ বিষয়ে আপনি রায় রামানন্দের যে চিঠির কথা বলেছেন তা বিশ্বাসযোগ্য তখনই হোত যদি আপনি সেই চিঠির বয়ানটি ছেপে দিতেন। অন্যথায় এই দাবী

ধোপে টিকবে কি? ৯৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে মহাপ্রভু জানতে পেরেছিলেন তাঁর পার্শ্বচরদের মধ্যে কে কে বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু তা সত্বেও তিনি তাদের কাছ ছাড়া করেন নি, (যেটা তাঁর পক্ষে করা আদৌ অসম্ভব ছিল না)। কেন? তবে তিনি কি প্রকৃতই গোবিন্দ বিদ্যাধর চক্রের হাতের মুঠোয় পড়ে গিয়েছিলেন যার ফলে স্বাধীন-ভাবে কোন পজিটিভ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিংবা তিনি কি গোবিন্দ বিদ্যাধর চক্রকে লঘুভাবে গ্রহণ করেছিলেন? এ প্রশ্ন ক'টির কোনটিরই সঠিক উত্তর আপনি পরিবেশন করেন নি। তবে কি আপনার বিশ্বাস মত চৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়েছিলো পরিকল্পিতভাবে? এই ধরণের অনেক প্রশ্ন স্বভাবতই পাঠক হিসাবে আমার মনে উঁকি দিচ্ছে। যিনি হুসেন শাহের রাজত্বে যাচ্ছেন বলে সঙ্গে হাজার হাজার লোকের মিছিল নিয়ে যান, জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শনে যাত্রা করলে বহু-ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হয়ে চলেন, তিনি নিশ্চিত বিপদের গন্ধ পেয়েও জগন্নাথ মন্দিররূপ ভয়ঙ্কর স্থানে আচম্বিতে ঢুকে পড়েছিলেন, একথা কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কি হতে পারে, তা যত ভাবেই বর্ণিত হোক্ না কেন মহান জীবনীকার বা তথাকথিত পার্শ্বচরদের লেখনীর মধ্যে। মাত্র পাঁচ শত বছর আগেও বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে শব্দের এমন আকাল ঘটেনি যে বুকে বল্লম বা কুঠারাঘাতের চিহ্ন দেখেও তাকে বর্ণনা করা হোল বুক ফেটে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। আমরা সচরাচর 'বুক ফেটে গেছে' কথাটি আলঙ্কারিক অর্থেই প্রযুক্ত করি, কখনই আক্ষরিক অর্থে এর প্রয়োগ হয় না। আপনি যে ভাবে লিখেছেন চৈতন্যদেব হত্যা সম্বন্ধে—তাতে এটাই বুঝে নিতে হয় যে মহাপ্রভুকে হত্যা করা হয়েছিলো পূর্ব-পরিকল্পনা মাফিকই। তবে সেক্ষেত্রে গোবিন্দ বিদ্যাধর এমন কোন কাজ করবেন না যাতে সাধারণের মনে মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধেই প্রশ্ন জাগতে পারে, কারণ সেই সময়ে চৈতন্যদেবকে মানুষ জীবন্ত জগন্নাথদেব বলেই পূজা করত! বিভিন্ন রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে আপনি প্রমাণ দিতে চাইছেন যে ঐ দিন মন্দির বেলা ৩টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মোট ৮ ঘণ্টা সময় বন্ধ ছিলো। যদি সত্যিই মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রভুকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় তবে শুধু সেদিনই নয়, তার পরের দিনেও নিশ্চয় বন্ধ ছিলো জগন্নাথের মন্দির। কারণ ঐভাবে খুন করলে মন্দির চত্বরের কোথাও না কোথাও তার ছিঁটেফোঁটাও প্রমাণ ভক্ত তথা দর্শনার্থীদের চোখে পড়ে যেতে পারতো। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে চৈতন্য নিধন চক্র মহাপ্রভুকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবেই খুন করেছে, তবে তাঁর নশ্বর দেহটাকে কিভাবে সরিয়ে ফেলবে তারও নিখুঁত ব্যবস্থা (আমারা যাকে ব্লু-প্রিণ্ট বলি) আগে থেকেই ছ'কে রাখা ছিলো। তার জন্য মন্দিরের দরজা আট ঘণ্টা বন্ধ রাখার কোন প্রয়োজন হত না।

আপনি দ‍ুটি ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের কথা বলেছেন। তার একটি আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতাজীর। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান পরবর্তী কালে তাঁর পার্শ্বচরদের বক্তব্য যদি ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখি'তবে এই দ‍ুটি অন্তর্ধানের মধ্যে একটা মিল পাবেন। নেতাজীর ক্ষেত্রেও তাঁর সব সহকর্মীরাই বলেছেন বিমান দ‍ুর্ঘটনায় তাঁর ম‍ৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই তার স্থান সময় ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে একে অপরের সঙ্গে একমত হননি। আবার কেউ কেউ এক একবার এক এক রকম তথ্য পরিবেশন করেছেন। আর চৈতন্যদেবের সব জীবনীকারই তাঁর ম‍ৃত্যুর কথা বলেছেন কিন্তু কেউই স্থান বা ম‍ৃত্যুর প্রকৃতি সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি। এর কারণ একটাই—তাহলো মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলা, আসল ঘটনার প্রতি দ‍ৃষ্টি আকর্ষণ করানোই ছিলো এর ম‍ূল উদ্দেশ্য। সেই জন্যই এই ধরণের বিভ্রান্ত-ম‍ূলক পরস্পর বিরোধী তথ্য পরিবেশন। তাছাড়াও আপনি যে লেখকের উদ্ধ‍ৃতি দিয়েছেন তাঁদের লেখার মধ্যেই পেয়েছি যে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে বলছেন, রাত্রি দশ দণ্ডে তিনি স্থান ত্যাগ করবেন এবং তাও বলছেন গোপনে ডেকে নিয়ে। আমার কাছে এই উক্তিটির গ‍ুর‍ুত্ব ব্যাপক। কারণ, চৈতন্যদেবের বিগত কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে যথেষ্ট মিল ও সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়েছে।

আপনি লিখছেন যে মহারাজ প্রতাপর‍ুদ্রদেবও জানতেন চৈতন্যবিরোধী চক্রের কথা। তবে তিনিই বা কেন এদের দমনের ব্যাপারে কিছু করলেন না। এদিকটাও চিন্তা করার মত নয় কি ?

তবে এটা ঠিক যে মহাপ্রভুকে যে জগন্নাথ, গ‍ুণ্ডিচা বা অন্য কোন মন্দিরের মধ্যে খ‍ুন করা হয়েছে তা প্রমাণ নির্ভর নয়। আর জগন্নাথদেবের মন্দির যে সত্যিই বন্ধ রাখা হয়েছিলো তারও কি কোন নিশ্চিত তথ্য আমরা পেয়েছি কতকগ‍ুলো পঁ‍ুথির লেখা ছাড়া ? যে গোবিন্দ বিদ্যাধর তাঁর সিংহাসনকে কণ্টক ম‍ুক্ত করার জন্য প্রতাপর‍ুদ্রের এক একটি ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে আবার হত্যা করেছেন তাঁর কাছে এধরণের কাজ আরও অর্বাচীনের কাজ, তিনি আদতে বৈষ্ণব বিরোধী ছিলেন কিনা তা জানা যায় না, যদি হতেনও তবে তার জন্য চৈতন্য নিধনের প্রয়োজন ছিলো না। চৈতন্যের প‍ূর্বেই নীলাচল বা উড়িষ্যাতে বৈষ্ণব ধর্ম চালু ছিলো, চৈতন্যের আমলে তা আরও প‍ূর্ণতা পেয়েছে এই মাত্র। গোবিন্দ বিদ্যাধরের রাজশক্তি দখলের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেব তখন বাধাস্বর‍ূপ ছিলেন না। কারণ চৈতন্যদেবের প্রভাব দ্র‍ুত কমে আসছিল সেই সময়ে (প‍ৃ. ৭০-৮২)। কাজে কাজেই চৈতন্যদেবকে হত্যা করার অবশ্য প্রয়োজন বিদ্যাধরের ছিলো না।

আপনার সঙ্গে আমিও একমত যে প্রচলিত চৈতন্য জীবনীগ‍ুলোতে তাঁর তিরোধান

সম্বন্ধে যা বিবৃতি আছে তা সত্য নয়। সম্ভবতঃ তিনি তাঁকে হত্যার পরিকল্পনার কথা সব জানতে পেরেছিলেন (এ ব্যাপারে পুরীর পাণ্ডারা মূল উদ্যোক্তা ছিলো) যার ফলে তাঁকে হঠাৎই আত্মগোপন করতে হয়েছিলো' খুব গোপন পরিকল্পনার মাধ্যমে। আর পরবর্তী কালে নিষ্ঠুর ঘাতক চক্রের হাত থেকে ক্রমাগতভাবে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। সম্ভবত এটাই চরম সত্য যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো এমন একস্থানে যেখানে তিনিই যে আমাদের চৈতন্যদেব তা বলে দেবার বা সনাক্ত করে দেবার মত কেউ ছিলেন না। সত্যিই প্রেমের ঠাকুর বা সাম্যবাদের নেতা যাই বলি না কেন, তাঁর জীবনের এই পরিণতি সমগ্র জাতির কাছে লজ্জার। এবারে আসা যাক শান্তা মায়ির কথায়। তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ও দুটি পুঁথির মধ্যে যে লেখাগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন তাতে অনুমান করতে অসুবিধা হবে না যে, চৈতন্যদেবের আত্মগোপন থাকাকালীন অবস্থাতেই ঐগুলি লেখা।

আমাদের প্রকৃত ইতিহাস খুঁজে বার করতে গেলে সম্ভব, অসম্ভব এই দুয়ের মধ্যেই খুঁজে দেখতে হবে কোথায় আসল তথ্য লুকিয়ে আছে। আউলচাঁদ ও চৈতন্যদেব, এই দু'জনের যে শারীরিক বর্ণনা আমরা পেয়েছি তা এক, চৈতন্যদেবের পাদুকা আমাদের কাছে আছে, খুঁজতে হবে আউলচাঁদেরও কোন পাদুকা কোন ভক্তের কাছে আছে কিনা। আমার বিশ্বাস নিশ্চয় আছে। তারপরে দু'টি পাদুকার মধ্যে তুল্য মূল্য বিচার করে দেখতে হবে তাদের মধ্যে মিল আছে, না নেই।

এছাড়াও শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান যে আক্ষরিক অর্থই হয়েছিল (তিরোধান নয়) তারও প্রমাণ আমরা পাই শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্লোকটি থেকে (পৃ. ৪৪)। আপনি এই বইটির মধ্যে যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার সাহায্যে আমার এটাই বেশী করে মনে হচ্ছে যে চৈতন্যদেব আত্মগোপন করে নীলাচল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এমন স্থানে যেখানে তাঁর পার্শ্বচরদের সবাই পৌঁছতে পারেননি।

পরিশেষে জানাই বইটির অঙ্গসজ্জা, প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠার কাগজের মান উঁচুদরের হলেও অযোগ্য ও অপরিণত প্রকাশকের খপ্পরে পড়ায় একটি গবেষণা গ্রন্থ এত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার বিবরণ দিই ঃ—বইটির মধ্যে ৮৪-৮৫, ৮৮-৮৯,৯২ ৯৩,৯৪-৯৫ সংখ্যক পৃষ্ঠাগুলি নেই, পরিবর্তে বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা দু'বার তিন বার করে জোড়া আছে। এই আটটি পৃষ্ঠায় আপনি কি লিখেছেন তা জানতে পারলাম না। যদি দয়া করে আমাকে ঐ পৃষ্ঠাগুলিতে কি ছিল তা' দিয়ে সাহায্য করেন তবে বিশেষ ভাবে উপকৃত হবো।' বইটির ভূমিকাতে আপনি পাঠকদের কাছে মতামত জানাতে

লিখেছেন। সেই ভরসাতেই এই পত্রের অবতারণা। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠালাম। যদি আমার চিঠি সম্বন্ধে কোন মতামত দেন সেই আশায়।

আমার শ্রদ্ধাবনত নমস্কার গ্রহণ করবেন।

ঠিকানা
সমরনাথ মুখোপাধ্যায়
নারায়ণপুর পো. অ. কাছে,

আপনার গুণগ্রাহী পাঠক
সমরনাথ মুখোপাধ্যায়
নারায়ণপুর। ২৪ পরগনা

[আমার বই-এর প্রথম সংস্করণের সংগৃহীত তথ্যকে ভিত্তি করে পত্র লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিষয়টিকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। পত্রের ছত্রে ছত্রে লেখকের প্রজ্ঞা ও মননশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। লেখক যে সব প্রশ্ন তুলেছেন, এমনি আরো প্রশ্ন পাঠক মনে দেখা দিক, আমি হৃদয়ে এই আশা পোষণ করি। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটিত হোক যথাযথভাবে এই কামনা করি কায়-মন-বাক্যে। উল্লিখিত পৃষ্ঠাগুলির হেরফের ঘটছে দপ্তরীর। তার জন্য প্রকাশক দায়ী নহেন। পত্রলেখকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে—তাঁর বইটি পালটিয়ে দেওয়া হবে।—লেখক

